শংকর

আদিত্য প্রকাশালয়
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ
মে, ১৯৬৫

প্রকাশক:
শ্রীহরিপদ বিশ্বাস
২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীনিতাই চন্দ্র জানা
জয়তারা প্রেস
৩৫/সি, গোরাচাঁদ বোস রোড
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

উৎসর্গ

জন-অরণ্য ও সীমাবদ্ধর
বিশ্ববন্দিত চলচ্চিত্রকার
শ্রীসত্যজিৎ রায় শ্রদ্ধাস্পদেষু

"I am willing to believe that at the beginning you did not realise what was happening; later, you doubted whether such things could be true; but now you know, and still you hold your tongues... The blinding sun of torture is at its zenith; it lights up the whole country. Under that merciless glare, there is not a laugh that does not ring false, not a face that is not painted to hide fear or anger, not a single action that does not betray our disgust, and our complicity."

Jean-Paul Sartre

in his Preface to
THE WRETCHED OF THE EARTH
by Frantz Fanon

পাণ্ডুলিপির প্রতিচিত্র :

জন-অরণ্য

আজ পয়লা আষাঢ়। কলকাতার চিৎপুর রোড ও সি আর এভিনিউ রোডের মোড়ে একটা বিবর্ণ হতশ্রী শপিং সেন্টারের খুব কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমাদের সোমনাথ। পুরো নাম — সোমনাথ ব্যানার্জি।

রিকশা, ঠেলা-গাড়ি, বাস, লরি, ট্যাক্সি এবং মানুষের ভিড়ে চিৎপুর রোড পূর্ণিমার [illegible] ফুলে উঠেছে। এরই মধ্যে একটা পুরোনো ট্রামের বৃদ্ধ ড্রাইভার শ্যামবাজার থেকে বেরিয়ে আসবার সময় উৎকণ্ঠায় ঠং-ঠং করে ঘণ্টা বাজাচ্ছে। সোমনাথের মনে হলো প্রাগৈতিহাসিক যুগের এক বৃহজ্জন্তু বিশাল সরীসৃপ নিজের নিরাপদ আশ্রয় থেকে বিতাড়িত হয়ে কেমনভাবে [illegible] এই জন-অরণ্যে এসে পড়ে কাতর আর্তনাদ করছে।

আকারে বৃহৎ হওয়া সত্ত্বেও উদ্বাস্তু সরীসৃপটির জন্য সোমনাথের একটু মায়া লাগছে। পৃথিবীতে এত জায়গা থাকতে কোন দুর্ভাগ্যে বেচারা কলকাতার এই রাস্তায় [illegible] এসে পড়লো * ? কারুকাজের অভাব হলেও সোমনাথ এই ব্যস্তসমস্ত নগরীর পরিস্থিতি থেকে কবিতার উপাদান সংগ্রহ করে নিলো।

আজ পয়লা আষাঢ়। কলকাতার চিৎপুর রোড ও সি আই টি রোডের মোড়ে একটা বিবর্ণ হতশ্রী ল্যাম্প পোস্টের খুব কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে সোমনাথ। পুরো নাম—সোমনাথ ব্যানার্জি।

রিকশা, ঠেলাগাড়ি, বাস, লরি, ট্যাক্সি এবং টেম্পোর ভিড়ে চিৎপুর রোডে ট্রাফিকের গোলমেলে জট পাকিয়েছে। এরই মধ্যে একটা পুরানো ট্রামের বৃদ্ধ ড্রাইভার লালবাজার থেকে বেরিয়ে বাগবাজার যাবার উৎকণ্ঠায় টং টং করে ঘণ্টা বাজাচ্ছে। সোমনাথের মনে হলো প্রাগৈতিহাসিক যুগের এক জরাগ্রস্ত বিশাল গিরগিটি নিজের নিরাপদ আশ্রয় থেকে বিতাড়িত হয়ে কেমনভাবে কলকাতার এই জন-অরণ্যে আটকা পড়ে কাতর আর্তনাদ করছে।

আকারে বৃহৎ হওয়া সত্ত্বেও উদ্বাস্তু গিরগিটির জন্যে সোমনাথের একটু মায়া লাগছে। পৃথিবীতে এতো রাজপথ থাকতে কোন ভাগ্যদোষে বেচারা কলকাতার এই রবীন্দ্র সরণিতে এসে পড়লো? কয়েক বছর আগে হলেও সোমনাথ এই জ্যামজমাট জটিল পরিস্থিতি থেকে কবিতার উপাদান সংগ্রহ করে নিতো। পকেটের ছোট্ট নোট বইয়ে এই মুহূর্তের মানসিকতা নোট করতো, তারপর রাত্রে কবিতা লিখতে বসতো। হয়তো নাম দিতো জন-অরণ্যে প্রাগৈতিহাসিক গিরগিটি। নতুন-লেখা কবিতাটা পরের দিনই তপতীকে পড়াতো। কিন্তু এসব কথা এখন ভেবে লাভ কী? সোমনাথের জীবন থেকে কবিতা বিদায় নিয়েছে।

টেরিটি বাজারের কাছে সোমনাথ ব্যানার্জি কী জন্যে দাঁড়িয়ে আছে? সে কোথায় যাবে? কেন? এই মুহূর্তে কোনো পরিচিত জন এইসব প্রশ্ন করলে

সোমনাথ বেশ বিব্রত হয়ে পড়বে। অন্য যে-কোনোদিন হলে, মিথ্যা কিছু বলে দেওয়া যেতো। কিন্তু সোমনাথের পক্ষে ভোলা সম্ভব নয়—আজ ১লা আষাঢ়। আষাঢ়ের এই প্রথম দিবসকে কবেকার কোন কবি নির্বাসিত এক যক্ষের বিরহবেদনায় স্মরণীয় করে তুলেছে। ২রা, ৩রা, ৫ই, ১৩ই, ১৫ই—আষাঢ়ের যে-কোনোদিনই তো মহাকবি কালিদাস বিরহী মর্মব্যথা উদ্ঘাটন করতে পারতেন—তাহলে এই ১লা তারিখটা সোমনাথ একান্তভাবে নিজের কাছে পেতো।

১লা আষাঢ় সোমনাথের জন্মদিন। চব্বিশ বছর আগে এমনই একদিনে সোমনাথ যে-হাসপাতালে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল তার নাম সিলভার জুবিলী মাতৃসদন। পঞ্চম জর্জের রাজত্বের রজতজয়ন্তী উপলক্ষ্যে মহামান্য সম্রাটের অনুগত ভারতীয় প্রজাবৃন্দ নিজেদের উৎসাহে চাঁদা তুলে সেই হাসপাতাল তৈরি করেছিল। সিলভার জুবিলী হাসপাতালের বেবির নিজেরই সিলভার জুবিলী হতে চললো—সোমনাথ মনে মনে হাসলো।

চিৎপুর রোডের চলমান জনস্রোতের দিকে তাকিয়ে মায়ের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে সোমনাথের। মা বলতেন, জন্মদিনে ভাল হবার চেষ্টা করতে হয়। কাউকে হিংসে করতে নেই, কারুর ক্ষতি করতে নেই এবং মিথ্যে কথা বলা বারণ। ১লা আষাঢ়ের এই জটিল অপরাহ্ণে রবীন্দ্র সরণিতে দাঁড়িয়ে সোমনাথ তাই মিথ্যে কথা বলতে পারবে না। কেউ প্রশ্ন করলে সোমনাথকে স্বীকার করতে হবে, সে চলেছে মেয়েমানুষের সন্ধানে।

চমকে উঠছেন? বিব্রত বোধ করছেন? ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না? ভাবছেন, শুনতে ভুল করলেন? না, ঠিক শুনেছেন। ভদ্র, সভ্য, সুশিক্ষিত তরুণ সোমনাথ ব্যানার্জি চলেছে মেয়েমানুষের সন্ধানে—এই শহরে যাদের কেউ বলে বেশ্যা, কেউ-বা কলগার্ল।

সোমনাথের বাবার নাম কয়েক বছর আগে একবার খবরের কাগজে বেরিয়েছিল। কাগজের কাটিংটা সোমনাথ নিজেই কেটে রেখেছিল, তারপর কমলা বউদি পারিবারিক অ্যালবামে আঠা দিয়ে এঁটে রেখেছেন। দ্বৈপায়ন ব্যানার্জি নিঃস্বার্থ দেশসেবার জন্যে সরকারী প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। সেই অবসরপ্রাপ্ত সরকারী গেজেটেড অফিসার দ্বৈপায়ন ব্যানার্জির ছেলে সোমনাথ ব্যানার্জি রাস্তায় অপেক্ষা করছে—এখনই সে নারী সন্ধানে বেরুবে।

কালের অবহেলায় মলিন রবীন্দ্র সরণির দিকে আবার তাকালো সোমনাথ। এই গলিতনখদন্ত জরদ্গব চিৎপুর রোডকে নামান্তরিত করে চিরসুন্দরের কবির নামের সঙ্গে জড়িয়ে দেবার কুৎসিত বুদ্ধিটা কার মাথায় এলো?

কলকাতার নাগরিকরাও কেমন? কেউ কোনো প্রতিবাদ করলো না? বড়বাজারের আবর্জনায় মহাত্মা গান্ধীকে এবং চিৎপুরের পূতিগন্ধময় অন্ধকূপে রবীন্দ্রনাথকে নির্বাসিত করেও এঁরা কেমন আত্মতুষ্টি অনুভব করছেন।

উত্তেজনায় সোমনাথের দুটো কান ঈষৎ গরম হয়ে উঠছে। মিস্টার নটবর মিত্র এখনই এসে পড়বেন। মেয়েমানুষের ব্যাপারে নটবর মিত্র অনেক খবরাখবর রাখেন। কিন্তু কোথায় নটবর? তিনি কেন এতো দেরি করছেন?

বিব্রত সোমনাথ মুখ তুলে একবার আকাশের দিকে তাকালো। কোথাও এক টুকরো মেঘের ইঙ্গিত নেই। যদি আকাশে অনেক কালো মেঘ থাকতো; যদি বলা যেতো 'আসন্ন আষাঢ় ঐ ঘনায় গগনে'—তাহলে বেশ হতো। বাধাবন্ধহীন বর্ষার প্রবল ধারায় সোমনাথ যদি নিজের অতীতকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলতে পারতো তাহলে মন্দ হতো না।

কিন্তু অতীতকে ভোলা তো দূরের কথা, সোমনাথের অনেক কিছু মনে আসছে। অতীত ও বর্তমান মিলে মিশে একাকার হয়ে সোমনাথের মানস-আকাশকে বর্ষার মেঘের মতো ছেয়ে ফেলেছে। সোমনাথ পথেই দাঁড়িয়ে থাকুক। চলুন, আমরা ততক্ষণ ওর অতীত সম্পর্কে খোঁজখবর করি—ওর পারিবারিক জীবনের সঙ্গে কিছুটা পরিচয় হোক আমাদের।

যোধপুর পার্কে জলের ট্যাঙ্কের কাছে লাল রঙের ছোট্ট দোতলা বাড়িটার একতলার ঘরে ভোরবেলায় সোমনাথ যখন বিছানায় শুয়ে আছে তখনই ওকে ধরা যাক।

একটু আগেই তার ঘুম ভেঙেছে। কিন্তু নীল স্ট্রাইপ দেওয়া পাজামা আর হাতকাটা জালি গেঞ্জি পরে সোমনাথ এখনও পাশবালিশ জড়িয়ে চোখ বন্ধ করে চুপচাপ শুয়ে আছে।

সোমনাথের ঘরের বাইরেই এ-বাড়ির খাবার জায়গা; সেখানে চা তৈরির ব্যবস্থাও আছে। ওইখান থেকে চুড়ির ঠুং ঠুং আওয়াজ ভেসে আসছে। এই আওয়াজ শুনেই সোমনাথ বলে দিতে পারে, বড় বউদি অন্তত আধঘণ্টা আগে ঘুম থেকে উঠে পড়ে সংসারের কাজকর্ম শুরু করেছেন। কমলা বউদি এই সময় মিলের আটপৌরে শাড়ি পরেন, তাঁর পায়ে থাকে বাটা কোম্পানির লাল রঙের স্লিপার। চায়ের কাপ নামানোর আওয়াজ ভেসে আসছে

—সুতরাং লিকুইড পেট্রলিয়াম গ্যাসের উনুনে বউদি নিশ্চয় চায়ের কেটলি চাপিয়ে দিয়েছেন।

ভোরবেলায় এই বাড়ির চা দু' বউ-এর একজনকে তৈরি করতে হবে। কারণ, দ্বৈপায়ন ব্যানার্জি দিনের প্রথম চায়ের কাপটা ঝি-চাকরের হাত থেকে তুলে নিতে পছন্দ করেন না।

এ-বাড়ির অপর বউ দীপান্বিতা ওরফে বুলবুলের ওপরও মাঝে-মাঝে চা তৈরির দায়িত্ব পড়ে। সোমনাথের ছোটদা একদিন বড় বউদিকে বলেছিল, "তুমি রোজ-রোজ কেন ভোরবেলায় উঠবে? বুলবুলও মাঝে-মাঝে কষ্ট করুক।"

কমলা বউদি আপত্তি করেননি, কিন্তু মুখ টিপে হেসেছিলেন। হাসবার কারণটা সোমনাথের অজানা নয়। ছোটদার বউ বুলবুল বেজায় ঘুমকাতুরে। ঘড়ির মান-সম্মান বাঁচিয়ে ভোরবেলায় বিছানা থেকে উঠে চা তৈরি করা ওর পক্ষে বেশ শক্ত ব্যাপার।

আজ তো সোমবার? সুতরাং বুলবুলেরই চা তৈরি করার কথা। কিন্তু চুড়ির আওয়াজ তো বুলবুলের নয়। বিছানায় শুয়ে শুয়েই, ব্যাপারটা বুঝতে পারলো সোমনাথ। ছোটদার শোবার ঘরের দরজা খোলার শব্দ পাওয়া গেলো এবার। সেইসঙ্গে বুলবুলের হাতের চুড়ির আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছে।

বুলবুলের গলার স্বর একটু চড়া। এবার তার কথা শুনতে পাওয়া গেলো। "কি লজ্জার ব্যাপার বলুন তো? ঘুম থেকে উঠতে পনেরো মিনিট দেরি করে ফেললুম!"

কমলা বউদির কথাও সোমনাথের কানে আসছে। তিনি বুলবুলকে বললেন, "লজ্জা করে লাভ নেই। বাথরুমে গিয়ে চোখ মুখ ধুয়ে এসো।"

স্বামীর প্রসঙ্গ তুলে বুলবুল বললো, "ও আমাকে ডেকে না দিলে এখনও ঘুম ভাঙতো না বোধহয়।"

"ঠাকুরপো তোমাকে তাহলে বেশ শাসনে রেখেছে! ভোরবেলায় একটু ঘুমোবার সুখও দিচ্ছে না!" কমলা বউদির রসিকতা সোমনাথের বিছানা থেকেই শোনা যাচ্ছে। ছোট দেওর যে এই সময় জেগে থাকতে পারে তা ওরা দুজনে আন্দাজ করতে পারেনি।

বুলবুলের বেশিদিন বিয়ে হয়নি। এ-বাড়ির কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে একটা স্বাভাবিক লজ্জাবোধ এখনও আছে। কমলাকে সে বললো, "ভাগ্যে আপনি উঠে পড়েছেন। না হলে কি বিশ্রী ব্যাপার হতো! চায়ের অপেক্ষায় বাবা বারান্দায় চুপচাপ বসে থাকতেন।"

চায়ের কাপ সাজানোর আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। কমলা বউদি বললেন,

"অনেকদিনের অভ্যেস তো—ঠিক পৌনে ছ'টায় ঘুম ভেঙে গেলো। ছ'টা দশেও যখন কেটলি চড়ানোর আওয়াজ পেলাম না, তখন বুঝলাম তুমি বিছানা ছাড়োনি।"

বুলবুল বললো, "ভোরের দিকে আমার কী যে হয়! যত রাজ্যের ঘুম ওই সময় আমাকে ছেঁকে ধরে।"

কমলা বউদি অল্প কথার মানুষ—কিন্তু রসিকতা বোধ আছে পুরোপুরি। বললেন, "ঘুমের আর দোষ কি? রাত দুপুর পর্যন্ত বরের সঙ্গে প্রেমালাপ করবে, ঘুমকে কাছে আসতে দেবে না। তাই বেচারাকে শেষ রাতে সুযোগ নিতে হয়।"

কমলা বউদির কথা শুনে সোমনাথেরও হাসি আসছে। বুলবুলের সলজ্জ ভাবটা নিজের চোখে দেখতে ইচ্ছে করছে। হাজার হোক কলেজে একসময় বুলবুল ওর সহপাঠিনী ছিল। বুলবুল বলছে, "বিশ্বাস করুন, দিদিভাই, কাল সাড়ে-দশটার মধ্যে দুজনে ঘুমিয়ে পড়েছি। এখন তো আর নবদম্পতি নই।"

কমলা বউদি ছাড়লেন না। "বলো কি। এখনও পুরো দু'বছর বিয়ে হয়নি, এরই মধ্যে বুড়ো-বুড়ি সাজতে চাও?"

"কী যে বলেন।" বুলবুল আরও কিছু মন্তব্য করতে যাচ্ছিলো, কিন্তু তার কথা আর শোনা গেলো না। সোমনাথের কাছে বুলবুল যতই স্মার্ট হোক, গুরুজনদের কাছে সে বেশ নার্ভাস।

কমলা বউদি বললেন, "এ-নিয়ে লজ্জা পাবার কিছু নেই। বিছানায় শুয়ে-শুয়ে বরের সঙ্গে মনের সুখে গল্প করবে এটা তোমার জন্মগত অধিকার। তাছাড়া, ভোরবেলায় ঘুম ভাঙলেও ঠাকুরপোর হয়তো তোমাকে ছাড়তে ইচ্ছে করে না! বরের রিলিজ অর্ডার না পেলে তুমি কী করবে?"

"দাদা নিশ্চয় আপনাকে সকালবেলায় ছাড়তে চান না।" বুলবুল এবার পাল্টা প্রশ্ন করলো।

কমলা বউদি উত্তর দিতে একটু দেরি করছেন। বোধহয় চায়ের কাপগুলো শুকনো কাপড় দিয়ে মুছছেন—কিংবা লজ্জা পেয়েছেন। না, কমলা বউদি সামলে নিয়েছেন। অল্পবয়সী জা-কে ভয় দেখালেন, "বম্বেতে আজই প্রশ্ন করে পাঠাচ্ছি। লিখবো তোমার ভাদ্দর বউ জানতে চাইছিল!"

সোমনাথের চোখে আবার ঘুম নেমে আসছে। বাইরের কথাবার্তায় সে আর মনোযোগ করতে পারছে না। কিন্তু কমলা ও বুলবুল তাদের আলাপ চালিয়ে যাচ্ছে।

দাদাকে চিঠি লেখার প্রসঙ্গে বুলবুল বেশ অস্বস্তিতে পড়ে গেলো। সন্ত্রস্ত

হরিণীর মতো মুখভঙ্গি করে বুলবুল বললো, "লক্ষ্মীটি দিদিভাই। দাদা এসব শুনলে, আমি ওঁর সামনে লজ্জায় যেতে পারবো না। আপনার কাছেও মাপ চাইছি, কাল থেকে সময়মতো উঠবোই…"

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলো বুলবুল। কিন্তু কমলা চাপা অথচ শান্ত গলায় জা-এর বক্তব্যের শূন্যস্থান পূরণ করলো, "তার জন্যে যদি রাত্রিবেলায় বরের সঙ্গে প্রেম বন্ধ রাখতে হয় তাও!"

এবার কেটলি নামিয়ে কমলা মেপে-মেপে কয়েক চামচ চা চীনে মাটির পটে দিলো, আর একটা বাড়তি চামচ চা দিলো পটের জন্যে। কমলা তারপর বুলবুলকে বললো, "ছোটবেলা থেকে আমার সকালে ঘুম ভেঙ্গে যায়। সুতরাং তোমাকে কষ্ট করতে হবে না। সকালে বাবাকে আমিই চা করে দেবো।"

বুলবুলের মুখে কৃতজ্ঞতার রেখা ফুটে উঠেছিল। তবু সে আপত্তি জানাতে যাচ্ছিলো। কিন্তু কমলা বললো, "বাথরুমে গিয়ে চোখে মুখে জল দিয়ে এসো। ঘুম ভেঙে বউ-এর চোখে পিঁচুটি দেখলে বর মোটেই খুশী হবে না।"

বুলবুল বাথরুমে চলে গেলো। কমলা চটপট এক কাপ চায়ে দুধ মেশালো। তারপর মাথায় ঘোমটা টেনে, শাড়ির আঁচলটা ঠিক করে নিয়ে, একটা প্লেটে দু'খানা নোনতা বিস্কুট বার করে শ্বশুরমশায়ের উদ্দেশে দোতলায় চললো।

দোতলায় মাত্র একখানা ঘর। সেই ঘরে একমাত্র দ্বৈপায়ন ব্যানার্জি থাকেন। ভোরবেলায় কখন যে তিনি ঘুম থেকে উঠে পড়েছেন কেউ জানে না।

সকালবেলায় প্রাত্যহিক হাঙ্গামা সেরে দক্ষিণের ব্যালকনিতে দ্বৈপায়ন শান্তভাবে বসে রয়েছেন। বাড়ির পূর্ব দিকটা এখনও খোলা আছে। সেদিক থেকে ভোরবেলার মিষ্টি রোদ সলজ্জভাবে উঁকি মারছে। বাবা সেই দিকে চুপচাপ তাকিয়ে রয়েছেন। কমলার ধারণা, বাবা এই সময়ে মনে-মনে ঈশ্বরের আরাধনা করেন।

চায়ের কাপ নামিয়ে সনম্র কমলা বাবাকে প্রণাম করলো। পায়ের ধূলো নিতে গেলে গোড়ার দিকে বাবা আপত্তি করতেন—এখন মেনে নিয়েছেন। বধূমাতাকে তিনি প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন।

কমলা বললো, "সকালবেলায় একটু বেড়ানো অভ্যাস করুন না।"

দ্বৈপায়ন ব্যানার্জি বললেন, "করবো ভাবছি। কিন্তু শরীরে ঠিক জুত পাই না।"

শ্বশুরের উত্তরে সন্তুষ্ট হতে পারলো না কমলা। তাঁকে মনোবল দেবার

জন্যে সে বললো, "আমার বাবাও প্রথমে বেরোতে চাইতেন না। এখন কিন্তু সকালে বেড়িয়ে খুব আরাম পাচ্ছেন। বাতের ব্যথা কমেছে। খিদে হচ্ছে।"

দ্বৈপায়ন বললেন, "দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বসো না বউমা।"

এক সময় শ্বশুরমশায় গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। কারুর সঙ্গে বড় একটা কথা বলতেন না। কিন্তু স্ত্রী বিয়োগের পর কী যে হলো—বেশ পাল্টে গেলেন। এখন বড় বউমার সঙ্গে অনেক কথা বলেন—প্রায় আড্ডা জমিয়ে ফেলেন মাঝে-মাঝে।

আট বছর আগেও এই বাড়ির সর্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন প্রতিভা দেবী। কাজে কর্মে ও প্রাণোচ্ছল কথাবার্তায় তিনি একাই ব্যানার্জি পরিবারের সমস্ত কিছু পরিপূর্ণ রেখেছিলেন। দ্বৈপায়ন ব্যানার্জি নিজেই কমলাকে বলেছিলেন, "তোমার শাশুড়ী যে বলতেন এ-বাড়িতে তিনিই ভাগ্যলক্ষ্মীকে এনেছেন তা মোটেই মিথ্যে নয়।"

এর পরেই শ্বশুরমশায় ডুবে যেতেন পুরানো দিনের গল্পে। কমলাকে বলতেন, কেমন করে ওঁদের বিয়ে হলো—ছোটবেলায় প্রতিভা কী রকম একগুঁয়ে ছিল—দ্বৈপায়নের সঙ্গে ঝগড়া হলে শাশুড়ীর কাছে কীভাবে স্বামীর নামে লাগাতেন।

আজও বাবা বোধহয় বউমার সঙ্গে একটু কথা বলতে চান। আর এই ভোরবেলাটাই ওঁর যত কথা বলার সময়। চায়ে চুমুক দিয়ে দ্বৈপায়নের খেয়াল হলো বউমার নিজের হাতে চায়ের পেয়ালা নেই। ব্যস্ত হয়ে তিনি বললেন, "ওহো তোমাদের চা বোধহয় নিচের টেবিলে ঠাণ্ডা হচ্ছে। আমার মনে থাকে না যে প্রথমে আমার জন্যে বিনা চিনিতে চা তৈরি করো। তারপর অন্যদের চা-এ চিনি মেশানো হয়। তুমি বরং চায়ের হাঙ্গামা শেষ করে এসো বউমা। ইচ্ছে করলে নিজের কাপটা এনে এখানে বসতে পারো।"

কমলা বললো, "না-হয় একটু দেরি হবে। এখনও তো কেউ ওঠেনি।"

বাবা রাজী হলেন না। বললেন, "না, মেজ বউমা নিশ্চয় তোমার জন্যে বসে আছে। তোমার শাশুড়ী এই জন্যে আমাকে বকাবকি করতেন। বলতেন, সংসারটা কেমনভাবে চলছে তুমি মোটেই খোঁজ রাখো না। তুমি নিজের খেয়ালেই বুঁদ হয়ে থাকো।"

শ্বশুরের কথা অমান্য করতে পারলো না কমলা। বাবাকে যে কমলা খুব ভালবাসে তা ওর ভাবভঙ্গি দেখেই বোঝা যায়। বাড়ির সবার সঙ্গেই দ্বৈপায়নের একটু দূরত্ব আছে—যে একজন কেবল খুব কাছাকাছি চলে আসতে পারে সে কমলা।

আরামকেদারায় অর্ধশায়িত অবস্থায় দ্বৈপায়ন ব্যানার্জি অপস্রিয়মাণ কমলার দিকে সস্নেহে তাকিয়ে রইলেন। শুধু নামে নয়, আসল কমলাকেই একদিন প্রতিভা পছন্দ করে এই বাড়িতে নিয়ে এসেছিল। প্রতিভা বোধহয় জানতো সে এখানে চিরদিন থাকবে না।

যোধপুর পার্কের পুব-পশ্চিমমুখো রাস্তাটা এই বারান্দা থেকে পুরো দেখা যায়। দু-একজন পথচারী গভরমেণ্টের দুধের বোতল হাতে এই পথ দিয়ে যেতে-যেতে ব্যালকনির আরামকেদারায় সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বৈপায়নকে লক্ষ্য করছে। এই বাড়ির মালিককে তারা বোধহয় হিংসে করছে। বাড়িটা ছোট হলেও ছিমছাম —সর্বত্র রুচির পরিচয় ছড়িয়ে আছে। সে-কৃতিত্ব অবশ্য দ্বৈপায়ন ব্যানার্জির নয়,—প্রতিভা এবং বড় ছেলে সুব্রতর। আই-আই-টিতে এক মাস্টারমশায়কে দিয়ে সুব্রত নকশা আঁকিয়েছিল। দ্বৈপায়ন ব্যানার্জি ভেবেছিলেন বিলেত-ফেরত আর্কিটেক্টের ওই নকশা অনুযায়ী বাড়ি করতে অনেক খরচ লাগবে। রাজ্য সরকারের সাধারণ চাকরি করে এতো টাকা কোথায় পাবেন তিনি?

প্রতিভা কিন্তু দ্বৈপায়নের কোনো আপত্তি শোনেননি। নির্দ্বিধায় স্বামীকে মুখ-ঝামটা দিয়েছিলেন। ওঁরা তখন থাকতেন টালিগঞ্জের একটা সরকারী রিকুইজিশন-করা ফ্ল্যাটবাড়িতে। প্ল্যান দেখে দ্বৈপায়ন ব্যানার্জি বলেছিলেন, "ভোম্বল, এসব বাড়ি বিলেত আমেরিকায় চলে। কলকাতা শহরে জমিই কিনতে পারতাম না—নেহাত সরকারী কো-অপারেটিভ থেকে জলের দামে আড়াই কাঠা দিলো তাই। সে দামটাও তো শোধ করেছি মাসে-মাসে মাইনে থেকে।"

প্রতিভা বলেছিল, "তুমি এসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছো কেন? আমি আর ভোম্বল যা পারি করবো। ভোম্বল তো তোমার মতো আনাড়ি নয়—ভালভাবে আই-আই-টি থেকে পাস করেছে।"

কমলার তখন সদ্য বিয়ে হয়েছে। তখন থেকেই সে একটু শ্বশুরের দিকে ঝুঁকে কথা বলে। সে বলেছিল, "টাকাটা তো বাবাকেই বার করতে হবে।" শাশুড়ীকে বলেছিল, "বাবার কত অভিজ্ঞতা। কত আদালতে কত লোককে দেখেছেন।"

বউমার সঙ্গে প্রতিভা একমত হতে পারেননি। জোরের সঙ্গে বলেছিলেন, "শুধু বস্তা-বস্তা রায় লিখেছে কোর্টে বসে—কিন্তু কোনো কাণ্ডজ্ঞান হয়নি। সারাজন্ম আমাকেই চালিয়ে নিয়ে আসতে হয়েছে তোমার শ্বশুরমশায়কে। যোধপুর পার্কের এই জমিটুকুও কেনা হতো না—যদি-না পুলিন রায়ের কাছে খবর পেয়ে আমি রাইটার্স বিল্ডিংস-এ ওঁকে পাঠাতাম। উনি সব ব্যাপারেই

হাত গুটিয়ে বসে আছেন। জীবনে করবার মধ্যে একটা কাজ করেছিলেন. রিপন কলেজ থেকে আইনের ডিগ্রি নিয়ে বি-সি-এস পরীক্ষায় বসেছিলেন।"

দ্বৈপায়ন ব্যানার্জির মনে আছে স্ত্রীর কথা শুনে প্রথমে তিনি মিটমিট করে হেসেছিলেন। তারপর বউমার সামনেই স্ত্রীকে জেরা করেছিলেন, "প্রতিভা, আর কোনো কাজের কাজ করিনি ?"

গৃহিণী সস্নেহে কিন্তু প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন. "পরীক্ষায় পাস-দেওয়া ছাড়া সারাজীবনে তুমি আর কিছুই করোনি!"

আড়চোখে নববিবাহিতা পুত্রবধূর দিকে সকৌতুকে তাকিয়ে দ্বৈপায়ন বলেছিলেন, "বউমাকে আমি সালিশী মানছি।"

তারপর আস্তে-আস্তে অর্ধাঙ্গিনীকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, "চাকরির জন্যে পরীক্ষায় পাস করা ছাড়াও আর একটা কাজ করেছিলাম—তোমাকে এ-বাড়িতে নিয়ে এসেছিলাম।"

কমলা আন্দাজ করেছিল, বাবার এই সগর্ব ঘোষণায় মা খুব খুশী হবেন। হয়তো পুত্রবধূর সামনে লজ্জা পাবেন। কমলা তাই কোনো একটা ছুতোয় সেখান থেকে সরে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু শ্বশুর-শাশুড়ী কেউ যেতে দিলেন না। তাঁদের মেয়ে নেই—তাই কমলার ওপর স্নেহ একটু বেশি।

চোখে-মুখে আনন্দের ভাবটা ইচ্ছে করে চাপা দিয়ে প্রতিভা দেবী ঝগড়ার মেজাজে বলেছিলেন, "একেবারে বাজে কথা।" তারপর কমলার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, "এঁর কোনো কথা বিশ্বাস কোরো না বউমা। তুমি শুনে রাখো যদি কারুর জন্যে এ-বাড়ির বউ হয়ে থাকতে পারি, সে আমার পুঁটে মামার জন্যে। দেড় বছর মামা ওঁর পিছনে লেগেছিলেন, আর উনি নানান ছুতোয় মামাকে অন্তত দুশোবার ঘুরিয়েছেন! পুঁটে মামার অসীম ধৈর্য না-থাকলে আমার বিয়েই হতো না। আমি তখনই ঠিক করেছিলাম, আমার ছেলের বিয়ের সময় মেয়ের বাবাকে একেবারেই ঘোরাবো না।"

"করেওছেন তো তাই", কমলা এবার শাশুড়ীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিল। এ-বাড়িতে বধূ হিসাবে মেয়েকে পাঠাতে তার বাবা-মাকে মোটেই কষ্ট করতে হয়নি। সামান্য এক সপ্তাহের মধ্যে সব কথাবার্তা পাকাপাকি হয়েছিল।

প্রতিভা দেবী বলেছিলেন, "তোমার বিয়ের ব্যাপারে উনি অবশ্য কথার অবাধ্য হননি। ভোম্বল একবার আপত্তি তুলতে গিয়েছিল, একটু সময় দাও, ভেবে দেখি। কিন্তু এমন বকুনি লাগিয়েছিলাম যে আর কথা বাড়াতে সাহস পায়নি। কলেজে অমন শক্ত-শক্ত সব পরীক্ষায় উত্তর লিখতে তিন ঘণ্টার বেশি সময় দেয় না—আর সামান্য একটা বিয়ের ব্যাপারে মতামত জানাতে

হাজার দিন সময় কেন চাই ?"

"বিয়েটা সামান্য নয়, প্রতিভা", দ্বৈপায়ন ব্যানার্জি পুত্রবধূর সামনেই গৃহিণীর সঙ্গে রসিকতা করেছিলেন।

প্রতিভা এবার অরিজিন্যাল বিষয়ে ফিরে এসেছিলেন। বলেছিলেন, "বিয়ের তিরিশ বছর পরে রহস্যটা বুঝে তো লাভ নেই; এখন বাড়ি সম্বন্ধে যা-বলছি শোনো। তোমাকে এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। তোমার ব্যাঙ্কের পাশ বই আমার কাছেই আছে। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড এবং ইনসিওর থেকে কত টাকা পাবে তাও আমি পুলিনকে দিয়ে হিসেব করিয়েছি! ভোম্বলের নকশা অনুযায়ীই বাড়ি হবে। ছোট বাড়ি হোক, লোক যেন দেখলে খুশী হয়। বউমাকে তুমি যতই নিজের দলে টানো, আমি আর ভোম্বল যা করবো তাই হবে। তোমার কোনো কথায় কখনও কান দিইনি, এখনও দেবো না।"

দ্বৈপায়ন হেসে বলেছিলেন, "ঠিক আছে। বাড়িতে যখন আমার কোনো কথাই চলবে না, তখন বাড়ির বারান্দায় বসে যাতে নিজের কথা ভাবতে পারি এমন ব্যবস্থা যেন থাকে।"

"রিটায়ার করে তুমি যাতে নিজের খেয়াল মতো বসে থাকতে পারো তার ব্যবস্থা তো রাখা হয়েছে—বারান্দা নয়, দোতলায় রীতিমতো ব্যালকনি তৈরি হবে তোমার জন্যে।" প্রতিভার কথাগুলো এখনও কানে বাজছে দ্বৈপায়নের। সেই বাড়ি উঠলো, সেই ব্যালকনি রয়েছে—শুধু প্রতিভা নেই। দ্বৈপায়নের রীতিমতো সন্দেহ হয়, এমন যে হবে প্রতিভা জানতো। তাই আগে থেকে সব ব্যবস্থা করে রেখেছিল।

ব্যালকনি থেকে দ্বৈপায়ন আবার যোধপুর পার্কের রাস্তার দিকে তাকালেন। পথচারীরা ওঁর দিকে নজর দিয়ে হয়তো কত কী ভাবছে। আন্দাজ করছে, বৃদ্ধ ভদ্রলোক সব দিকে সফল হয়ে এখন কেমন নিশ্চিন্ত মনে স্বোপার্জিত অবসরসুখ ভোগ করছেন।

এ-রকম ভুল বুঝবার যথেষ্ট অবকাশ আছে। বিশেষ করে বাড়ির সামনে সুদৃশ্য বোর্ডে নামের তালিকা দেখলে। নেমপ্লেটে প্রথমেই দ্বৈপায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম লেখা—সকলেই জানে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিস থেকে অবসরপ্রাপ্ত। তারপরেই সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, খড়্গপুরের এম-ই। তারপর অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট। এখন তো চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্টদেরই যুগ। হিসাবেই তো শিব! অভিজিতের পরে সোমনাথের নামটাও ওখানে লেখা আছে।

ছোটছেলে সোমনাথের কথা মনে আসতেই দ্বৈপায়ন কেমন অস্বস্তি বোধ

করতে লাগলেন। ঘোষপুর পার্কের এই ছবির মতো সুখের সংসারে ছোট ছেলেটাই ছন্দপতন ঘটিয়েছে। সুব্রত ও অভিজিৎ দুজনেই স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় ভাল ফল করেছিল। সুব্রত তো অঙ্কে লেটার পেয়েছিল। অভিজিৎ ছোকরার নাম যে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় স্কলারশিপ-লিস্টে উঠবে তা দ্বৈপায়ন বা প্রতিভা দেবী কেউ কল্পনা করতে পারেননি। অথচ অভিজিৎ সম্বন্ধেই প্রতিভার বেশি চিন্তা ছিল—ছোকরা মাত্রাতিরিক্ত আড্ডা দিতো, সময়মতো পড়াশোনায় বসতো না, বুঁদ হয়ে রেডিও সিলোনে হিন্দী সিনেমার গান শুনতো।

অভিজিৎকে প্রতিভা বলতেন, "তোর কপালে অনন্ত দুর্গতি আছে। গেরস্ত বাঙালীর ঘরে পড়াশোনার জোরটাই একমাত্র জোর – আর কিছুই নেই তোদের! তুই এখন লেখাপড়া করছিস না, পরে বুঝবি।"

অভিজিৎ, ওরফে কাজল, ফিকফিক করে হাসতো। কোনো কথাই শুনতো না। পরীক্ষার রেজাল্ট যখন বেরুল তখন প্রতিভা বিশ্বাসই করতে পারেন না, কাজল স্কলারশিপ পেয়েছে। ছেলেটা একটু দূরে দাঁড়িয়ে সেই পুরানো কায়দায় ঠোঁট টিপে হাসছিল।

প্রতিভা বলেছিলেন, "দূরে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? আয় কাছে আয়!" তারপর ছেলেকে জড়িয়ে ধরে একটা চুমু খেয়েছিলেন। লজ্জা পেয়ে কাজল তখন মায়ের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল। প্রতিভা বলেছিলেন, "শুধু-শুধু আমাকে এতদিন ভাবিয়ে কষ্ট দিলি।"

সেই সব দিনের কথা ভেবে দ্বৈপায়নের মনে হাসি আসছিল। প্রতিভার খুব বিশ্বাস ছিল ছোটছেলের ওপরে। সোমনাথ মায়ের কথা শুনতো। ছোট বয়স থেকেই সোমনাথ খুব শান্ত। পড়ায় বসাবার জন্যে মাকে কখনও বকাবকি করতে হতো না। সন্ধ্যা হওয়া-মাত্র হাত-পা ধুয়ে পড়ার টেবিলে চলে যেতো খোকন। নিজের মনে পড়ে যেতো, মা ডাকলে তবে উঠে এসে চায়ের পেয়ালা নিতো। রাত্রে খাবার তৈরি হলে প্রতিভা ডাকতেন, বই-পত্তর গুছিয়ে রেখে খোকন খেতে বসতো। প্রতিভা বলতেন, "খোকনকে নিয়ে আমাকে একটুও ভাবতে হবে না।"

হাসলেন দ্বৈপায়ন। এখন যত ভাবনা সেই খোকনকে নিয়েই। তবে প্রতিভা এক দিকে ঠিকই বলেছিল। সোমনাথের ভাবনা প্রতিভাকে একটুও ভাবতে হচ্ছে না। সমস্ত দায়-দায়িত্ব দ্বৈপায়নের ওপর চাপিয়ে দিয়ে সে অসময়ে বিদায় নিয়েছে।

ওপরের ব্যালকনিতে চায়ের কাপে দ্বৈপায়ন যখন চুমুক দিলেন তখন

সোমনাথ একতলায় নিজের বিছানায় আর একবার পাশ ফিরে শুলো।

সোমনাথেরও এই মুহূর্তে মায়ের কথা মনে পড়ে গেল। মা সত্যিই আদরের ছোটছেলের ওপর অগাধ আস্থা রেখেছিলেন। মায়ের ভরসা ছিল, ছোটছেলে বাড়ির সেরা হবে। তাই সেবার যখন সেই দাড়িওয়ালা শিখ গণৎকার টালিগঞ্জের বাড়িতে যা-তা ভবিষ্যৎবাণী করে গেল তখন মা ভীষণ চটে গেলেন। সেই তারিখটা সোমনাথ বলে দিতে পারে—কারণ সেদিন ছিল সোমনাথের জন্মদিন। হাতে কিছু কাগজপত্তর নিয়ে শিখ গণৎকার তাদের দরজায় এসে কলিং বেল টিপেছিল।

বাড়িতে তখন মা এবং সোমনাথ ছাড়া আর কেউ ছিল না। দাদারা কলেজ বেরিয়েছে, বাবা অফিসে। সোমনাথ শুধু ইস্কুলে যায়নি—জন্মদিনে মায়ের কাছে আবদার করেছিল, "আজ তোমার কাছে থাকবো মা।" মা এমনিতে বেজায় কড়া কিন্তু ছোটছেলের জন্মদিনে নরম হয়েছিলেন। বেল বাজানো শুনে মা নিজেই দরজা খুলতে এসে গণৎকারের দেখা পেলেন।

মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে গণৎকার চটপট বললো, "তুই গণনায় বিশ্বাস করিস না। কিন্তু তোর মুখ দেখে বলছি আজ তোর খুব আনন্দের দিন।"

সেই কথা শুনেই মায়ের খানিকটা বিশ্বাস হলো। গণকঠাকুরকে বাইরের ঘরে বসতে দিলেন। বললেন, "আমার হাত দেখাবো না। আমার ছেলের ভাগ্যটা পরীক্ষা করিয়ে নেবো।" এই বলে মা সোমনাথকে ডাকলেন।

মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে, বিড়বিড় করে কী সব হিসেব-পত্তর সেরে শিখ বললো, "বেটী তোর তিনটে ঘড়া আছে।" ঘড়া বলতে গণকঠাকুর যে ছেলেদের কথা বলছেন তা মায়ের বুঝতে দেরি হলো না। গণনা মিলে যাচ্ছে বলে একটু আনন্দও হলো। কিন্তু এবার গণৎকার চরম বোকামি করে বসলো। বললো, "তোর প্রথম দুটো ঘড়া সোনার—আর ছোটটা মাটির।"

শোনা মাত্রই মায়ের মেজাজ বিগড়ে গেল। ইতিমধ্যে সোমনাথ সেখানে এসে পড়েছে। কিন্তু মা তখন গণকঠাকুরকে বিদায় করছেন, বলছেন, "ঠিক আছে আপনাকে আর হাত দেখতে হবে না।"

গণকের কথা মা বিশ্বাসই করতে চাননি। তাঁর ধারণা, তাঁর তিনটে ঘড়াই সোনার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী হলো?

সোমনাথ আর একবার পাশ ফিরলো। একটা মশা পায়ের কাছে জ্বালাতন করছে। অনেকগুলো দুশ্চিন্তা মাথার ভিতর জট পাকাচ্ছে এবং মাঝে-মাঝে মশার মতো পোঁ-পোঁ আওয়াজ করছে। চাকরির বাজারে কী যে হলো—এতো চেষ্টা করেও সামান্য একটা কাজ জোটানো গেলো না।

সোমনাথ হয়তো বড়দা এবং ছোটদার মতো ব্রিলিয়াণ্ট নয়, হয়তো সে স্কুল ফাইনালে ওদের মতো ফার্স্ট ডিভিসন পায়নি। কিন্তু যেসব ছেলে সেকেণ্ড কিংবা থার্ড ডিভিসনে পাস করেছে তাদের কি এদেশে বাঁচবার অধিকার নেই? তারা কি গঙ্গার জলে ভেসে যাবে?

গত আড়াই বছরে অন্তত কয়েক হাজার চাকরির অ্যাপ্লিকেশন লিখেছে সোমনাথ—কিন্তু ওই আবেদন-নিবেদনই সার হয়েছে। আজকাল, সত্যি বলতে কি চাকরির ব্যাপারটা আর ভাবতেই ইচ্ছে করে না সোমনাথের। কোনো লাভ হয় না, মাঝখান থেকে মেজাজটা খারাপ হয়ে যায়।

আবার একটু ঘুমের ঘোর আসছে সোমনাথের।

সোমনাথের মনে হচ্ছে চাকরির উমেদারী এবার শেষ হলো। ধবধবে সাদা শার্ট-প্যাণ্ট এবং নীল রংয়ের একটা টাই পরে সোমনাথ প্রখ্যাত এক বিলিতী কোম্পানির মিটিং রুমে বসে আছে। দিশী সায়েবরা ইণ্টারভিউ নিচ্ছেন। তাঁরা একের পর এক প্রশ্নবাণ ছাড়ছেন, আর সোমনাথ অবলীলাক্রমে সেই সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছে। একজন অফিসার তারই মধ্যে বললেন, "মিস্টার ব্যানার্জি, আপনি রিট্‌ন পেপারে ফরেন ক্যাপিটাল সম্পর্কে খুব সুন্দর উত্তর লিখেছেন। এ-বিষয়ে আরও দু-একটা কথা আপনার কাছ থেকে জানতে চাই।" ভদ্রলোকের প্রস্তাবে সোমনাথ একটুও ভয় পাচ্ছে না। কারণ ফরেন ক্যাপিটাল সম্পর্কে সবসময় সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর সোমনাথের মুখস্থ আছে।

ইণ্টারভিউ শেষ করে সৌজন্যমূলক ধন্যবাদ জানিয়ে সোমনাথ বেরিয়ে যাচ্ছিলো। এমন সময় সুন্দরী এক অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সেক্রেটারী মিটিং রুমের বাইরে ওর পথ আটকালো। বললো, "মিঃ ব্যানার্জি, আপনি চলে যাবেন না—রিসেপশন হল্-এ একটু অপেক্ষা করুন।"

মিনিট পনেরো পরে সোমনাথের আবার ডাক হলো। পার্সোনেল অফিসার অভিনন্দন জানালেন এবং করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "বুঝতেই পারছেন, আমরা আপনাকেই সিলেক্ট করেছি। দু-একদিনের মধ্যেই জেনারেল ম্যানেজারের সই করা চিঠি পাবেন। অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার পাওয়া মাত্রই আমাদের জানিয়ে দেবেন, কবে কাজে যোগ দিতে পারবেন!"

সেই চিঠিটার জন্যেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে সোমনাথ। কখন কমলা বউদি ঘরে টোকা দেবেন, হাসি মুখে বলবেন, "নাও তোমার চিঠি, এই মাত্র পিওন দিয়ে গেল।"

সত্যিই দরজায় টোকা পড়ছে। সোমনাথের ঘুম ভেঙে গেল। চুড়ির আওয়াজেই সোমনাথ বুঝতে পারছে কে ধাক্কা দিচ্ছে। তাহলে এই

ইণ্টারভিউ-এর ব্যাপারটাই মিথ্যা—ভোরবেলায় সোমনাথ এতক্ষণ ধরে স্বপ্ন দেখছিল।

সোমনাথ দরজা খুলে দিলো। মেজদার বউ বুলবুল দাঁড়িয়ে রয়েছে। বুলবুলের সঙ্গে সোমনাথের একটু রসিকতার সম্পর্ক। ওরা এক সঙ্গে চার বছর কলেজে পড়েছে। বুলবুল বললে, "গুড মর্নিং। পাখি সব করে রব, রাত্তি পোহাইল। আর কতক্ষণ ঘুমুবে ?"

মুখ গম্ভীর করে সোমনাথ শুয়ে রইলো। মনে মনে বললে, "বেকার মানুষ সকাল-সকাল উঠেই বা কী করবো ?"

বুলবুল বললে, "দিদির হুকুম, সোমকে তুলে দাও।"

"বউদি কোথায় ?" সোমনাথ জিজ্ঞেস করলে।

"বউদি এখন নিজের কাজে ব্যস্ত।"

সোমনাথ একমত হলো না। "বউদির একমাত্র ছেলে পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলে রয়েছে। বউদির কর্তাটি বেশ কিছুদিন অফিসের কাজে কলকাতার বাইরে। সুতরাং বউদি এখন নিজের কাজে কি করে ব্যস্ত থাকবেন ?"

বুলবুল ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে, "দাঁড়াও, দিদিকে রিপোর্ট করছি। কর্তা ছাড়া আমাদের বুঝি আর কোনো কাজকর্ম নেই।"

সোমনাথ অধৈর্য কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, "আঃ ! বলো না বউদি কোথায় ?"

বুলবুল হেসে বললে, "আমিও তো তোমার বউদি।"

সোমনাথ বললে, "তোমাকে তো আমি এখনও বউদি বলে রেকগনাইজ করিনি। দাদার বউ হলেই বউদি হওয়া যায় না বুঝলে ?"

"তবে কী হওয়া যায় ?" সহাস্যে বুলবুল চোখ দুটো বড়-বড় করে জানতে চাইলো।

"সে সব তোমাকে বোঝাতে অনেক সময় লাগবে," সোমনাথ উত্তর দিলো। "সময় মতো বলা যাবে। এখন বলো বউদি কোথায় ?"

বুলবুল বললে, "দিদি দোতলার ব্যালকনিতে বসে বাবার সঙ্গে কথা বলছেন। মাথায় অনেক দায়িত্ব, হাজার হোক বাড়ির বড় গিন্নি তো।"

সোমনাথ জিজ্ঞেস করলো, "তোমার কর্তা ঘুম থেকে উঠেছে ?"

"কোন সকালে উঠে পড়েছে। অফিসে কী সব জরুরী মিটিং আছে, এখনই গাড়ি আসবে। তাই বাথরুমে ঢুকেছে।"

বুলবুল আরও জানালো, "ওর অফিসে কী যে হয়েছে ! শুধু কাজ আর কাজ। লোকটাকে খাটিয়ে-খাটিয়ে মারছে।" সোমনাথের জন্য বুলবুল এবার চা আনতে গেলো।

অফিসে এই খাটিয়ে মেরে ফেলার প্রসঙ্গটা সোমনাথের ভাল লাগলো না। চাকরি পেলে অফিসে খুব খাটতে হাজার-হাজার বেকারের মোটেই আপত্তি নেই। চাকরিওয়ালা লোকগুলো বেশ আছে। চাকরি করছো এই না যথেষ্ট —তবু মন ওঠে না কাজেও আপত্তি।

চা খেয়ে সোমনাথ চুপচাপ বসেছিল। কী করবে ভেবে ঠিক করতে পারছিল না। হাত-পা গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া বেকারদের কীই বা করবার আছে।

কমলা বউদি ওপর থেকে ইংরিজি খবরের কাগজখানা নামিয়ে আনলেন। সোমনাথ দেখলো, বাবা ইতিমধ্যেই কয়েকটা চাকরির বিজ্ঞাপনে লাল পেন্সিলের মার্কা দিয়েছেন। বাবার এইটাই প্রাত্যহিক কাজ। খবরের কাগজে প্রথম পাতায় চোখ না-বুলিয়ে বাবা সর্বপ্রথম দ্বিতীয় পাতায়, 'চাকরি খালি' শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনগুলো পড়ে ফেলেন। প্রয়োজন মতো লাল দাগ মারেন। বিজ্ঞাপনগুলো তখন কাটেন না, কারণ বাড়ির অন্য লোকেরা কাগজ পড়বে। দুপুরে খাবার পর কমলা বউদি আবার খবরের কাগজগুলো বাবার কাছে পৌঁছে দেন। বাবা নিজের হাতে ব্লেড দিয়ে বিজ্ঞাপনগুলো কেটে সোমনাথের কাছে পাঠিয়ে দেন।

কমলা বউদির ইচ্ছে নয় সোমনাথ চুপচাপ বাড়িতে বসে সময় কাটায়। তাই প্রায় জোর করেই একবার ওকে গড়িয়াহাট বাজারে পাঠালেন। বললেন, "তোমার দাদা নেই—শ্রীমান ভজহরির ওপর প্রত্যেকদিন নির্ভর করতে সাহস হয় না। বেশি দাম দিয়ে খারাপ জিনিস নিয়ে আসে। ওর দোষ নয়, গরীব মানুষ দেখলে আজকাল দোকানদাররাও ঠকায়।"

পাজামার ওপর একটা পাঞ্জাবী গলিয়ে সোমনাথ বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো। হাতে থলে নিয়ে যে সোমনাথ গড়িয়াহাট বাজার থেকে পুকুরের বাটা মাছ কিনছে তা দেখে কে বলবে বাংলার লক্ষ-লক্ষ হতভাগ্য বেকারদের সে একজন? জিনিসপত্তর কিনতে-কিনতে অনেকে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অফিস যাবার মতো যথেষ্ট সময় আছে কিনা দেখে নিচ্ছেন। সোমনাথের কীরকম অস্বস্তি লাগছে—ওর যে অফিসে যাবার তাড়া নেই তা লোকে বুঝুক সে মোটেই চায় না।

কলেজে পড়বার সময়ে সোমনাথ কতবার বাজার করেছে। কিন্তু কখনও এই ধরনের অস্বস্তি অনুভব করেনি। পরিচিত কারুর সঙ্গে বাজারে বা রাস্তায়

দেখা হলে তার ভালই লেগেছে। কিন্তু এখন দূর থেকে কাউকে দেখলেই সে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে। কারণ আর কিছু নয়, লোকে বেমালুম জিজ্ঞেস করে বসে, "কী করছো?" যতদিন কলেজের খাতায় নাম ছিল, ততদিন উত্তর দেবার অসুবিধা ছিল না। যত মুশকিল এখনই।

যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধে হয়। বাজারের গেটের কাছেই সোমনাথ শুনতে পেলো, "সোমনাথ না? কী ব্যাপার তোমার অনেকদিন কোনো খবরাখবর নেই!"

সোমনাথ মুখ তুলে দেখলো অরবিন্দ সেন। ওদের সঙ্গেই কলেজে পড়তো। অরবিন্দ নিজেই বললো, "ইউ উইল বি গ্ল্যাড্‌ টু নো বেস্ট-কীন-রিচার্ডসে ম্যানেজমেণ্ট ট্রেনি হয়েছি। এখন সাতশ' টাকা দিচ্ছে। গড়িয়াহাট মোড় থেকে মিনি-বাসে কোম্পানির ফ্যাক্টরিতে নিয়ে যায়। এখানে সাড়ে-সাতটার সময় আমাকে রোজ দেখতে পাবে। রাস্তার ওপারে দাঁড়াই—সিগারেট কেনবার জন্যে ভাগ্যিস এই পারে এসেছিলাম তাই তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো।"

সোমনাথ দেখলো অরবিন্দের হাতে গোল্ড ফ্লেক সিগারেটের প্যাকেট। "খাবে নাকি একটা?" অরবিন্দ প্যাকেট এগিয়ে দিলো।

সোমনাথ সিগারেট নিলো না। অরবিন্দ হেসে ফেললো। "তুমি এখনও সেই ভাল ছেলে রয়ে গেলে? মেয়েদের দিকে তাকালে না, সিগারেট খেলে না, অশ্লীল ম্যাগাজিন পড়ো না।"

অরবিন্দ এবার জিজ্ঞেস করে বসলো, "তুমি কী করছো?"

সোমনাথ অত্যন্ত লজ্জা বোধ করছে। দিস্তে-দিস্তে চাকরির অ্যাপ্লিকেশন লেখা ছাড়া সে যে আর কিছুই করছে না তা জানাতে মাথা কাটা যাচ্ছে সোমনাথের। কোনোরকমে আমতা-আমতা করে বলতে যাচ্ছিলো, "দেখা যাক, ধীরে সুস্থে কী করা যায়।"

কিন্তু তার আগেই অরবিন্দ বললো, "চেপে রাখবার চেষ্টা করছো কেন ভাই? শুনলাম, ফরেনে যাবার প্রোগ্রাম করে ফেলেছো? তা ভাই, ভালই করছো। আমরা এই ভোর সাড়ে-সাতটার সময় বাড়ি থেকে বেরিয়ে, পাঁচ বছর কারখানায় তেল কালি মেখে বেস্ট-কীন-রিচার্ডসের জুনিয়ার অফিসার হবো। আর তুমি তিন বছর পরে ফরেন থেকে ফিরে এসে হয়তো বেস্ট-কীনেই আমার বস্‌ হয়ে বসবে।"

ফরেন যাবার কথাটা যদিও পুরোপুরি মিথ্যে, তবুও সোমনাথের মন্দ লাগছে না। "কে বললো তোমাকে?" সোমনাথ প্রশ্ন করলো।

"নাম বলতে পারবো না—তবে তোমারই কোনো ফ্রেণ্ড," অরবিন্দ উত্তর দিলো।

"গার্ল ফ্রেণ্ডও হতে পারে," এই বলে অরবিন্দ এবার রহস্যজনকভাবে হাসলো। "বেশ গোপনে কাজটা সেরে ফেলবার চেষ্টা করছো তুমি," বললে অরবিন্দ।

দূর থেকে বেস্ট-কীন-রিচার্ডসের ঝকঝকে মিনি-বাস আসতে দেখে অরবিন্দ বললে, "তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। দু-একদিনের মধ্যেই তোমার সঙ্গে দেখা করবার প্রয়োজন হবে। সামনের রবিবারে বিকেলটা ফ্রি রেখো। কারণটা যথা সময়ে জানতে পারবে। তোমার বাড়ির নম্বর?"

সোমনাথ বাড়ির নম্বরটা বলে দিলো। অরবিন্দ ততক্ষণে ছুটে গিয়ে মিনি বাস ধরে ফেলেছে।

বাজারের থলিটা বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে নিজের ঘরে বসে সোমনাথ ভাবছিল কেন যেতে পারে শুনে অরবিন্দ সেন বেশ খাতির করে কথা বললো। ওর বাবা কেন্দ্রীয় সরকারের বড় অফিসার। ছোট একটা গাড়ি ড্রাইভ করে কলেজে আসতো। সোমনাথের সঙ্গে তেমনভাবে মিশতো না অরবিন্দ। কিন্তু বিদেশে যাবার এই গল্পটা কে বানালো? দু-একজন পরিচিত মহিলার মুখ মনে পড়ে গেলো। কয়েকটা ছবি সরাবার পর হঠাৎ তপতীর মুখটাও চোখের সামনে ভেসে উঠলো। তপতীই হয়তো অস্বস্তি এড়াবার জন্য রত্নাকে গল্পটা বলেছে। কলেজে রত্নার সঙ্গে তপতীর খুব ভাব ছিল। অরবিন্দ যে রত্নার সঙ্গে জমিয়ে প্রেম করছে এ-খবর কারুর অজানা নয়।

কিন্তু তপতী জেনেশুনে কেন এইভাবে বন্ধু মহলে সোমনাথকে অপ্রস্তুত করতে যাবে? সোমনাথ আরও কিছু ভাবতে যাচ্ছিলো, কিন্তু তার চিন্তায় বাধা পড়লো। বাইরে ইলেকট্রিক কলিং বেল বাজছে।

কমলা বউদি খবর দিলেন সুকুমার এসেছে। রোগা, কালো, বেশ লম্বা, মিষ্টি স্বভাবের এই ছেলেটি সম্পর্কে কমলা বউদির একটু দুর্বলতা আছে। ও বেচারাও বেকার। ওর উজ্জ্বল অথচ অসহায় চোখ দুটোর দিকে তাকালে মায়া হয় কমলার।

বাইরের ঘরে সোমনাথ ঢুকতেই সুকুমার বললে, "তোর হলো কী? সাড়ে আটটা বেজে গেছে, এখনও বিছানার মায়া কাটাতে পারিসনি?"

সোমনাথ যে ইতিমধ্যে বাজার হাট সেরে ফেলেছে তা চেপে গেল। বললে, "বেকারের কী আর করবার আছে বল?"

"ফের আবার ওই অশ্লীল কথাটা মুখে আনলি। তোকে বলেছি না,

'বিধবার' মতো 'বেকার' কথাটা আমার খুব খারাপ লাগে। আমরা চাকরি খুঁজছি, সুতরাং আমাদের চাকুরী-প্রার্থী বলতে পারিস।"

"তুই যে আবার প্রথম ভাগের গোপাল হবার পরামর্শ দিচ্ছিস—কানাকে কানা, খোঁড়াকে খোঁড়া, বেকারকে বেকার বলিও না," সোমনাথ মন্তব্য করলো।

সুকুমার বলছে, "দাঁড়া মাইরি। কড়া রোদ্দুরে যাদবপুর কলোনি থেকে হাঁটতে-হাঁটতে এই যোধপুর পার্কে এসেছি। গলা শুকিয়ে গেছে, একটু খাবার জল পেলে মন্দ হতো না।"

কমলা বউদি ঠাণ্ডা জল নিয়ে এলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "চা খাবে তো, সুকুমার?"

সুকুমার খুব খুশী হলো। বললে, 'বউদি, যুগ যুগ জিও।"

বউদি চলে যেতে সুকুমার বন্ধুকে বললে, "তুই মাইরি খুব লাকি। যখন তখন চায়ের অর্ডার দেবার সিস্টেম আমাদের বাড়িতে বন্ধ হয়ে গিয়েছে বাই অর্ডার অফ দি হোম বোর্ড।" সুকুমারের কিন্তু সেজন্যে কোনো অভিমান নেই। ফিক করে হেসে, বন্ধুকে জানিয়ে দিলো, "দাঁড়া, একখানা চাকরি যোগাড় করি। তারপর বাড়িতে আমূল বিপ্লব এনে ছাড়বো। যখন খুশী চায়ের জন্যে একটা ইলেকট্রিক হিটার কিনে ফেলবো। চা চিনি দুধের খরচ পেলে বাড়িতে কেউ আর রাগ করবে না।"

সুকুমারটা সত্যিই অভাগা। ওর জন্যে সোমনাথেরও কষ্ট হয়। শুনেছে, যাদবপুরে একটা টালির ছাদের কাঁচা বাড়িতে থাকে। ওর তিনটে আইবুড়ো বোন। টাকার অভাবে বিয়ে হচ্ছে না। গতবছর সুকুমারের বাবার রিটায়ার হবার কথা ছিল। সায়েবের হাতে-পায়ে ধরে ভদ্রলোক এক বছর মেয়াদ বাড়িয়ে নিয়েছেন। কিন্তু তিন মাস পরেই চাকরি শেষ হবে। তারপর ওদের কী যে হবে। সুকুমারই বড়। আরও দুটো ভাই ছোট ক্লাসে পড়ে। এই ক'মাসে একটা কাজ যোগাড় না-হলে কেলেঙ্কারি। বাবার পেনসন নেই। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড থেকে টাকা ধার নেওয়া আছে। তার ওপর কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে কিছু দেনা আছে বাবার। বড়দির বিয়ে দিতে গিয়ে সেবার ধার না-করে উপায় ছিল না। এ-সব বাদ দিয়ে সুকুমারের বাবা হয়তো হাজার ছয়েক টাকা পাবেন। তিনি ভাবছেন তিনভাগ করে তিন মেয়ের নামে দু হাজার করে লিখে দেবেন। সুকুমারের বাবা অবশ্য জানেন, দু হাজার টাকায় আজকাল বস্তির ঝিদেরও বিয়ে হয় না। কিন্তু মেয়েরা যেন না ভাবে, বাবা তাদের জন্য কিছুই করেননি।

সুকুমারকে এ-বাড়ির সবাই জানে। সোমনাথের সঙ্গে সে একই কলেজে পড়েছে। সোমনাথের মতোই সেকেণ্ড ডিভিসনে পাস করেছিল সুকুমার। তারপর সোমনাথের মতোই সাধারণভাবে বি-এ পাস করেছে। সুকুমার হয়তো আর একটু ভাল করতে পারতো। কিন্তু পরীক্ষায় ঠিক আগে মায়ের ভীষণ অসুখ করলো। এই যায় এই যায় অবস্থা — ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত দিয়ে, সারা রাত জেগে রোগীর সেবা করে সুকুমারকে পরীক্ষায় বসতে হয়েছিল। মেজ বোন কথা বকাবকি না করলে সুকুমারের পরীক্ষাই দেওয়া হতো না।

চায়ের কাপ নামিয়ে কমলা বউদি জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন আছো, সুকুমার?"

এক গাল হেসে সুকুমার উত্তর দিলো, "খারাপ নয়, বউদি। সামনে অনেকগুলো চাকরির চান্স আসছে।"

কমলা বউদি সস্নেহে বললেন, "চা বোধহয় খুব কড়া হয়নি। তুমি তো আবার পাতলা চা পছন্দ করো না।"

সুকুমার দেখলো চায়ের সঙ্গে বউদি দুখানা বিস্কুটও দিয়েছেন। হাত দুটো দ্রুত ঘষে সুকুমার বললে, "বউদি, ভগবান যদি আপনাকে ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের পার্সোনেল ম্যানেজার করতেন!"

বুঝতে না-পেরে সোমনাথ প্রতিবাদ করলো। "কেন রে? বউদি কোন দুঃখে ব্যাঙ্কের চাকর হতে যাবে?"

সরল মনে সুকুমার বললে, "বউদির একটু কষ্ট হতো স্বীকার করছি। কিন্তু তোর এবং আমার একটা হিল্লে হয়ে যেতো। দুজনে বউদির অফিসঘরে ঢুকে পড়লে বউদি শুধু আদর করে চা খাইয়ে ছাড়তেন না — সঙ্গে-সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেণ্ট লেটারও দিয়ে দিতেন।"

সুকুমারের কথা শুনে কমলাও হেসে ফেললো। দুই বেচারার মুখের দিকে তাকিয়ে কমলার মনে হলো ওরকম একটা বড় পোস্ট থাকলে মন্দ হতো না। অন্তত এদের মুখে একটু হাসি ফোটানো যেতো।

সুকুমার কিন্তু চাকরির আশা এখনও ছাড়েনি। সব সময় ভাবে, এবারে একটা কিছু সুযোগ নিশ্চয় এসে যাবে। চা খেতে-খেতে সে সোমনাথকে বললে, "আর ক'টা দিন। তারপর হয়তো দেশে বেকার বলে কিছু থাকবেই না।"

সোমনাথ নিজেও একসময় এই ধরনের কথা বিশ্বাস করতো। এখন ভরসা কমেছে।

সুকুমার বললে, "একেবারে ভিতরের খবর। রেল এবং পোস্টাপিসে দু

হাজার নতুন পোস্ট তৈরি হচ্ছে। মাইনেও খুব ভাল—টু হানড্রেড টেন। সেই সঙ্গে হাউস রেন্ট, ডি-এ। তারপর যদি কলকাতায় পোস্টিং করিয়ে নিতে পারি তাহলে তো মার দিয়া কেল্লা। ঘরের খেয়ে পুরো মাইনেটা নিয়ে চলে আসবো, অথচ ক্যালকাটা কমপেনসেটার অ্যালাউন্স পাবো মোটা টাকা।"

সোমনাথ এবার একটু উৎসাহ পেলো। জিজ্ঞেস করলো, "কিন্তু এই 'ক্যালকাটা কমপেনসেটরি' ব্যাপারটা কী রে?"

সুকুমার হেসে ফেললো। "ওরে মূর্খ, তোকে আর কী বোঝাবো? চাকরি করবার জন্যে কলকাতায় থাকতে তো আমাদের কষ্ট হবে—তাই মাইনের ওপর ক্ষতিপূরণ ভাতা পাওয়া যাবে।"

এই ব্যাপারটা সোমনাথের জানা ছিল না। "বারে! চিরকালই তো তুই আর আমি কলকাতায় আছি—এর জন্যে ক্ষতিপূরণ কী?" সোমনাথ বোকার মতো জিজ্ঞেস করে। কাল্পনিক চাকরির সুখ-সুবিধে এবং মাইনে সম্পর্কে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা করতে ওদের দুজনেরই ভাল লাগে।

সুকুমার বিরক্ত হয়ে বললে, "বেশ বাবা, তোর যখন এতোই আপত্তি চাকরিতে ঢুকে তুই অ্যালাউন্স নিস না।"

এবার দুজনেই হেসে ফেললো। একসঙ্গে দুজনেই যেন হঠাৎ বুঝতে পারলে ওরা জেগে স্বপ্ন দেখছে, এমনভাবে কথা বলছে যেন চাকরিটা ওদের পকেটে।

সারাদিন টো-টো করে সমস্ত শহর চষে বেড়ায় সুকুমার। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ, রাইটার্স বিল্ডিংস, ক্যালকাটা কর্পোরেশন, বিভিন্ন ব্যাঙ্ক, কারখানা, অফিস কিছুই বাদ দেয় না। তাছাড়া বিভিন্ন দলের বেশ কয়েকজন এম-এল-এ এবং দুজন কর্পোরেশন কাউনসিলর-এর সঙ্গেও সুকুমার ভাব জমিয়ে এসেছে।

সুকুমার বললে, "ক'দিন আগে বাবা হঠাৎ আমার ওপর রেগে উঠলেন। ওঁর ধারণা আমি চাকরির জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করছি না। ভাইবোনদের সামনে চীৎকার করে উঠলেন, 'হাত পা গুটিয়ে চুপচাপ বাড়িতে বসে থাকলে কোলের ওপর চাকরি ঝপাং করে পড়বে না।' সেই থেকে এই 'ঘুরঘুরে' পলিসি নিয়েছি। দিব্যি কেটেছি, দুপুরবেলায় বাড়িতে বসে থাকবো না।"

সোমনাথ অজানা আশঙ্কায় চুপ করে রইলো। সুকুমারের সংসারের কথা শুনলে ওর কেমন অস্বস্তি লাগে। যে-সুকুমার দুঃখ ভোগ করছে, সে কিন্তু মান-অপমান গায়ে মাখছে না। বেশ সহজভাবে সুকুমার বললে, "আমি ভেবেছিলুম মা আমার দুঃখ বুঝবে। কিন্তু মা-ও সাপোর্ট করলো বাবাকে। আমি ভাবলুম, একবার বলি, কলকাতা শহরে ঘোরাঘুরি করতে গেলেও পয়সা

লাগে। যাদবপুর থেকে ডালহৌসি স্কোয়ার তো দুবেলা হেঁটে মারা যায় না।”

সুকুমারের কথাবার্তায় কিন্তু কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ নেই। অপমান ও দুঃখের বোঝাটা বেশ সহজভাবেই মাথায় তুলে নিয়েছে।

সুকুমারের সান্নিধ্য আজকাল সোমনাথের বেশ ভাল লাগে। কলেজে একসঙ্গে পড়েছে, তখন কিন্তু তেমন আলাপ ছিল না। সুকুমারকে সে তেমন পছন্দ করতো না—নিজের পরিচিত কয়েকজন বন্ধু ও বান্ধবীদের নিয়েই সোমনাথের সময় কেটে যেতো। চাকরি-বাকরির দুঃস্বপ্ন যে এমনভাবে জীবনটাকে গ্রাস করবে তা সোমনাথ তখনও কল্পনা করতে পারেনি।

কিন্তু বি-এ পরীক্ষায় পাসের পর আড়াই বছর আগে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের লাইনে দুই সহপাঠীতে দেখা হয়ে গেলো। সাড়ে-পাঁচ ঘণ্টা ধরে দুজনে একই লাইনে দাঁড়িয়েছিল। বাদাম ভাজা কিনে সুকুমার খাইয়েছিল সোমনাথকে। একটু পরে ভাঁড়ের চা কিনে সোমনাথ বন্ধুকে খাইয়েছিল। লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে সোমনাথের মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। এই ধরনের অভিজ্ঞতা আগে কখনও হয়নি। সোমনাথের মনের অবস্থা সুকুমার সহজেই বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু সুকুমারের মনে তখন অনেক আশা। বন্ধুকে উৎসাহ দিয়ে সে বলেছিল, “ভাবিস না, সোমনাথ। দেশের এই অবস্থা চিরকাল থাকতে পারে না। চাকরি-বাকরি আমাদের একটা হবেই।”

দুজনে ঠিকানা বিনিময় করেছিল। কয়েকদিন পরেই সুকুমার যোধপুর পার্কের বাড়িতে সোমনাথের খোঁজ করতে এসেছিল। সোমনাথের সাজানো-গোছানো বাড়ি দেখে সুকুমার খুব আনন্দ পেয়েছিল। কথায়-কথায় সুকুমার একদিন বলেছিল, “আমাদের মাত্র দেড়খানা ঘর। বসতে দেবার একখানা চেয়ারও নেই। চাকরি-বাকরি হলেই ওসব দিকে একটু নজর দিতে হবে। দুটো চেয়ার, একটা টেবিল, জানালার পর্দা—কিনতেই হবে। আমার বোন পর্দার রং পর্যন্ত ঠিক করে রেখেছে, কোন দোকান থেকে কিনবে তাও ঠিক, শুধু আমার চাকরি হবার অপেক্ষা।”

ওদের বাড়িতে যাবার মতলব করেছে সোমনাথ। কিন্তু সুকুমার উৎসাহ দেয়নি। সোজাসুজি বলেছে, “চাকরিটা হোক, তারপর একদিন তোকে নেমন্তন্ন করে নিয়ে গিয়ে খাওয়াবো। এখন যা বাড়ির মেজাজ, তোকে নিজে থেকে এক কাপ চা পর্যন্ত দেবে না। ঘরের মধ্যে বসাতে পারবো না, বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলতে হবে।”

সুকুমার বিব্রত হবে ভেবেই সোমনাথ ওদের বাড়িতে যাবার প্রস্তাব তোলেনি। কিন্তু দুই বন্ধুতে প্রায় দেখা হয়েছে। যোধপুর পার্ক থেকে গল্প

করতে-করতে ওরা কখনও সেলিমপুরের মোড়ে চলে গেছে। দুজনে সমব্যথী, সুখ-দুঃখের কত কথা হয় নিজেদের মধ্যে।

আজও সুকুমার বললে, "বাড়িতে বসে থেকে কী করবি? চল একটু ঘুরে আসি।"

বাড়ি থেকে বেরোবার সুযোগ পেয়ে সোমনাথ রাজী হয়ে গেলো। ট্রাউজারের ওপর একটা বুশ শার্ট গলিয়ে নিয়ে সুকুমারের সঙ্গে সে পথে বেরিয়ে পড়লো।

রাস্তায় সকালের জনপ্রবাহ দেখে সোমনাথ নিজের দুঃখের কথা ভাবে। পৃথিবীটা যে কত নিষ্করুণ তা সে বোধহয় এখনও পুরোপুরি বুঝতে পারেনি। বাড়িতে দাদা বউদি বাবা সবাই এতো ভালবাসেন—এতো তার প্রতিপত্তি—কিন্তু বাড়ির বাইরে এই জন-অরণ্যে তার কোনো দাম নেই। অন্যের সঙ্গে লড়াই করে একটা সামান্য দশটা-পাঁচটার চাকরি পর্যন্ত সে যোগাড় করতে পারছে না।

সুকুমার জিজ্ঞেস করলো, "কী হলো তোর? গম্ভীর হয়ে গেলি কেন?"

সোমনাথ বললে, "ভাবছি, বাড়ির ভিতরের সঙ্গে বাড়ির বাইরের কত তফাত।"

"মারো গুলি! কবিতা ছাড়," সুকুমার এবার বকুনি লাগালো। "তুই ভাগ্যবান। বেশির ভাগ লোকের ভেতর-বাইরে দুই-ই কেরোসিন। আমার অবস্থা দেখ না। জুলাই মাস থেকে বাবার চাকরি থাকবে না। বাড়ির বড় ছেলে, অথচ সংসারে কোনো প্রেস্টিজ নেই।"

"কেন?" সোমনাথ জিজ্ঞেস করে।

"চাকরি থাকলে প্রেস্টিজ হতো। এখন বাবা মা ভাই বোন সবাই বলে, গুড ফর নাথিং। অনেক ইয়ংম্যান নাকি এই বাজারেও চাকরি ম্যানেজ করেছে। শুধু আমি পারছি না। বাবা মাঝে-মাঝে বলেন, 'ভস্মে ঘি ঢেলেছি, সুকুমারকে বি-এ পড়িয়ে কী ভুলই যে করেছি।' বিদ্যে না-থাকলে আমি নাকি কারও বাড়িতে চাকর-বাকর হয়ে নিজের পেটটা অন্তত চালাতে পারতাম।"

সোমনাথ কোনো উত্তর না-দিয়ে চুপচাপ গড়িয়াহাটের দিকে হাঁটতে লাগলো। বাঁ হাতের আঙুল মটকিয়ে সুকুমার বললে, "আমিও কী ভুল যে করেছি! মা কালীকে পুজো দিয়ে ইস্কুল ফাইনালে যদি ফার্স্ট ডিভিসন বাগাতে পারতাম; তাহলে এতোদিন চাকরি কাকে বলে দেখিয়ে দিতাম।"

সোমনাথ বললে, "শুধু-শুধু কষ্ট পাচ্ছিস কেন? তোর আমার সেকেণ্ড ডিভিসন কাঁচিয়ে তো আর ফার্স্ট ডিভিসন করা যাবে না।"

সুকুমার বললে, "বড় দুঃখু লাগছে মাইরি। ব্রেবোর্ন রোডের একটা

ব্যাঙ্কে স্কুল ফাইনালে ফার্স্ট ডিভিসন হলে কেরানির চাকরি দিচ্ছে—মিনিমাম ৬৮% নম্বর দেখাতে হবে।"

সোমনাথ আপসোস করলো না। সে আজকাল অবিশ্বাস করতে শুরু করেছে। বললো, "ওটাও এক ধরনের চালাকি।"

সুকুমার বললো, "চালাকি বললেই হলো! ব্যাঙ্কের নোটিশ বোর্ডে ঝুলিয়ে দিয়েছে।"

"যে-ছেলে ইস্কুল ফাইনালে শতকরা ৬৮ নম্বর পেয়েছে, সে কোন দুঃখে লেখাপড়া কুলুঙ্গিতে রেখে ব্যাঙ্কে ঢুকতে যাবে?" সোমনাথ বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে জানতে চাইলো।

"এ-পয়েন্টটা আমার মাথায় আসেনি। সাধে কি আর বাবা বলেন, আমার মাথায় গোবর ছাড়া আর কিছু নেই!" সুকুমারের মুখটা মলিন হয়ে উঠলো।

হাঁটতে-হাঁটতে ওরা গোলপার্কের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। সকালবেলার অফিস টাইম। অনেকগুলো প্রাইভেট মোটর গাড়ি হুস হুস করে বেরিয়ে গেলো। বাসে, ট্যাক্সিতে, মিনি-বাসে তিল ধারণের জায়গা নেই। সুকুমার হাঁ করে ওই ব্যস্ত জনস্রোতের দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ বললো, "না ভাই, আর তাকাবো না। শেষ পর্যন্ত কারও চাকরিতে শনির দৃষ্টি লেগে যাবে। মনকে যতই শাসন করবার চেষ্টা করছি, বেটা ততই পরের চাকরিতে নজর দিচ্ছে। লোভের নাল ফেলতে-ফেলতে ভাবছে—এতো লোকের চাকরি আছে অথচ সুকুমার মিত্তির কেন বেকার?"

সোমনাথ বললো, "যত লোককে অফিস যেতে দেখছি, এরা প্রত্যেকে ফার্স্ট ডিভিসনে ইস্কুল ফাইনাল পাস করেছে বলছিস?"

সুকুমার বেশ চিন্তিত হয়ে উঠলো। মাথা চুলকে বললো, "খুব ডিফিকাল্ট কোশ্চেন করেছিস। তোর বেশ মাথা আছে। হাজার হোক ছোটবেলায় দুধ ঘি খেয়েছিস। তুই কেন পড়াশোনায় সোনার চাঁদ হলি না, বল তো?"

মন্দ বলেনি সুকুমার। পড়াশোনায় দাদাদের মতো ভাল হলে, সত্যিই সোমনাথের দুঃখের কিছু থাকতো না। নিজের মনের কথা সোমনাথ কিন্তু প্রকাশ করলো না। সুকুমারের যা স্বভাব, হয়তো কমলা বউদিকেই একদিন সব কথা বলে বসবে। সোমনাথ তাই পুরানো প্রসঙ্গ তুলে বললো, "শক্ত-শক্ত কোশ্চেন অনেক মাথায় আসে, কিন্তু উত্তর খুঁজে পাই না।"

সুকুমার মাথা চুলকোতে-চুলকোতে বললো, "তোর কোশ্চেনটা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। দাঁড়া একটু চিন্তা করে দেখি।"

দূরে একটা পাঁচ নম্বর গড়িয়া-হাওড়া বাসে বাদুড়-ঝোলা অবস্থায়

সুকুমারের বাবাকে মুহূর্তের জন্যে দেখা গেলো। জন পঞ্চাশেক লোক হাঁই-হাঁই করে সেই দিকে ছুটে গেলেও বাস থামলো না, নিপুণভাবে আরও দু'খানা বাসকে পাশ কাটিয়ে মুহূর্তের মধ্যে পালিয়ে গেলো। সুকুমার সেইদিকে তাকিয়ে বললো, "আমার বাবার কথাই ধর না। থার্ড ডিভিসনও নয়। রেঙ-আপ টু ম্যাট্রিক। অফিসে কেরানি হয়েছে তো?"

সোমনাথ বললো, "ও সব ইংরেজ আমলের ব্যাপার। তখন তো আমরা স্বাধীন হইনি।"

সুকুমার ছেলেটা সরল, একটু বোকাও বটে। সংসারের ঘাটে-ঘাটে অনেক ধাক্কা খেয়েও একেবারে সিনিক হয়ে ওঠেনি। সে বললো, "তাহলে তো ইংরেজরাই ভাল ছিল। নন-ম্যাট্রিকও তাদের সময়ে অফিসে চাকরি পেতো—আর এখন হাজার-হাজার গ্র্যাজুয়েট বাড়িতে বসে রয়েছে।"

"তোর চাকরির জন্যে তাহলে ইংরেজকে ফিরিয়ে আনতে হয়," সোমনাথ টিপ্পনী কাটলো।

"আমি ভাই তোকে ফ্র্যাঙ্কলি বলছি—সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা এসব কিছুই বুঝতে চাই না। যে আমাকে চাকরি দেবে, আমি তার দলে—সে মহম্মদ আলী জিন্নাহ্, মাও-সে-তুং হলেও আমার আপত্তি নেই।"

"আস্তে! আস্তে! সুকুমারকে সাবধান করে দিলো সোমনাথ। কেউ শুনলে বিপদ হবে। পাকিস্তানের স্পাই বলে চালান করে দেবে।"

বেজায় রেগে উঠলো সুকুমার। "মগের মুলুক নাকি! চালান করলেই হলো? অ্যারেস্ট করলে জেলের মধ্যে বসিয়ে রোজ খিচুড়ি, আলুচচ্চড়ি খাওয়াতে হবে। তার থেকে একখানা অ্যাপয়েন্টমেণ্ট লেটার পাঠিয়ে সমস্যা সমাধান করে ফেলো না বাবা! চাকরি পেলে তোমাদের কোনো হাঙ্গামা থাকবে না। তখন জিন্নাহ্, নিক্সন, মাও-সে-তুং, রানী এলিজাবেথ কারও নাম মুখে আনবো না—একেবারে সেণ্ট পারসেণ্ট স্বদেশী বনে যাবো। এখন দিল্ হ্যায় হিন্দুস্থানী!"

"সি-আই-ডি কিংবা আই-বির লোকরা যদি এসব শোনে, কোনোদিন তোর সরকারী চাকরি হবে না। জানিস তো, অ্যাপয়েন্টমেণ্ট লেটার ইস্যু করবার আগে পুলিশে খোঁজখবর হয়—দুজন গেজেটেড অফিসারের চরিত্র-সার্টিফিকেট লাগে।" সোমনাথের বকুনিতে সুকুমার এবার ভয় পেয়ে গেলো।

বললো, "যা বলেছিস, মাইরি। হাটের মধ্যে দাঁড়িয়ে রাজনীতির গোবর ঘেঁটে লাভ নেই। বহু ছেলে তো ওই করে ডুবেছে। তারা পলিটিকস করেছে, দেওয়ালে-দেওয়ালে পোস্টার মেরেছে, রাস্তার মোড়ে-মোড়ে পার্টি ফাণ্ডের জন্যে

চাঁদা আদায় করেছে, ঝাণ্ডা তুলেছে, মিছিলে যোগ দিয়েছে, স্লোগান তুলেছে, মনুমেন্টের তলায় নেতাদের বক্তৃতা শুনেছে—ভেবেছে এই সব করলেই সহজে চাকরি পাওয়া যাবে। এখন অনেক বাছাধন ভুল বুঝতে পেরে আঙুল চুষছে।"

সোমনাথ গম্ভীর হয়ে বললো, "এক-এক সময়ে মনে হয়, একেবারে কিছু না-করা থেকে যা হয় কিছু করা ভাল। তাতে ভুল হলেও কিছু আসে যায় না।"

সুকুমার তেড়ে উঠলো! "তিন মাস পরে যাদের পেটে ভাত থাকবে না তাদের এসব কথা মানায় না। আমাদের দলে টেনে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে কত ছেলেধরা যাদবপুরে ঘোরাঘুরি করছে—তাদের পকেটে কত রকমের পতাকা। কোনোটা একরঙা, কোনোটা তিনরঙা। তার ওপর আবার কত রকমের ছাপ! আমি ওসব ফাঁদে পা দিই না বলে, ছেলেধরাদের কী রাগ আমার ওপর। আমার সোজা উত্তর, আমার বাবার তিনমাস চাকরি আছে, আমার পাঁচটা নাবালক ভাইবোন। দেশোদ্ধার করবার মতো সময় নেই আমার।"

অফিস টাইমের যাত্রীদের দিকে সুকুমার আবার তাকিয়ে রইলো। তারপর বললো, "যে যা করছে করুক, আমার কী?"

কয়েক মিনিট ধরে সুকুমার নিজের মনে কী সব ভাবলো। তারপর সোমনাথের পিঠে আঙুলের খোঁচা দিয়ে আবার আরম্ভ করলো, "তুই যা বলছিলি—এই যে পিঁপড়ের মতো পিলপিল করে লোক অফিসের খামে মোড়া টিফিন কৌটো হাতে হাজরি দিতে চলেছে, এরা সবাই তো ইংরেজ আমলে চাকরিতে ঢোকেনি। ওই ছোকরাকে দেখ না—ইংরেজ রাজত্বে তো ওর জন্মই হয়নি। অথচ অফিস বেরুচ্ছে।"

সুকুমার এবার এক কেলেঙ্কারি করে বসলো। নিখুঁত ইস্ত্রি করা শার্ট ও প্যাণ্ট পরে এক ছোকরা বাসে উঠছিল; ঠিক সেই সময় ছুটে গিয়ে সুকুমার তাকে জিজ্ঞেস করলো, "দাদা, আপনি ফার্স্ট ডিভিসনে পাস করেছিলেন?"

অতর্কিত প্রশ্নে ভদ্রলোক চমকে উঠেছিলেন। ব্যাপারটা ঠিক মতো মাথায় ঢোকবার আগেই বাস ছেড়ে দিলো। বিরক্ত ভদ্রলোক চলন্ত গাড়ি থেকে সুকুমারের দিকে অগ্নিদৃষ্টি বর্ষণ করলেন—তার রসিকতার অর্থ বুঝতে পারলেন না।

সুকুমার বোকার মতো ফুটপাথে ফিরে এলো। বললো, "আমি ভাই রসিকতা করিনি। ওঁর পিছনেও লাগিনি—স্রেফ জানতে চাইতাম কী করে চাকরিটা যোগাড় করলেন।"

সোমনাথ বললো, "ও-রকম করিস না সুকুমার। কোন দিন বিপদে পড়ে

যাবি। ভদ্রলোক হয়তো পড়াশোনায় আমাদের মতো। তাহলে রেগে যেতে পারতেন।"

সুকুমার ক্ষমা চাইলো। তারপর কী ভেবে ওর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললো, "সোম, তুই ঠিক বলেছিস। ওইভাবে জ্বালাতন করাটা আমার উচিত হয়নি। ভদ্রলোক যদি আমাদের মতো সেকেণ্ড কিংবা থার্ড ডিভিশনের মাল হয়েও চাকরি পেয়ে থাকেন তাহলে নিশ্চয় সিডিউল কাস্ট।"

বন্ধুর ব্যাপার-স্যাপার সোমনাথ বুঝতে পারছিল না। সুকুমার গম্ভীরভাবে বললো, "ভদ্রলোকের নাকটা কি একটু চ্যাপ্টা ছিল?"

"তাতে কী এসে যায়?" বিরক্ত সোমনাথ প্রশ্ন করলো।

"খুবই এসে যায়। সিডিউল্ড কাস্টরাও এখন চাকরি পাচ্ছে না। ভদ্রলোক সিডিউল্ড-ট্রাইব হতে পারেন। চাকরির বিজ্ঞাপনে প্রায়ই লেখে তপশিলীভুক্ত উপজাতি হলে অগ্রাধিকার পাবে। ইণ্ডিয়াতে সিডিউল্ড-ট্রাইব গ্র্যাজুয়েট বোধহয় কেউ বসে নেই।"

দাঁত দিয়ে ডান হাতের কড়ে আঙুলের নখ কাটলো সুকুমার। তারপর সোমনাথকে বললো, "তোর বাবা তো অনেকদিন আদালতে ছিলেন। একবার খোঁজ করিস তো, কী করে সিডিউল্ড-ট্রাইব হওয়া যায়।

"আবার পাগলামী করছিস? তুই হচ্ছিস সুকুমার মিত্তির। মিত্তির কখনো সিডিউল্ড-ট্রাইব হতে পারে না।" সোমনাথ বন্ধুকে বোঝাবার চেষ্টা করে।

সুকুমার বুঝলো না। বললো, "আমাকে হেল্প করবি না তাই বল। চেষ্টা করে বিশ্বামিত্র যদি ক্ষত্রিয় থেকে ব্রাহ্মণে প্রমোটেড হতে পারে, তাহলে আমি কায়স্থ থেকে সিডিউল্ড-ট্রাইব হতে পারবো না কেন?"

"ওদের দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণার কথা আমরা জানি না বলেই রসিকতা করতে পারছি। ওদের বড় কষ্ট রে," সোমনাথ সরল মনে বললো।

সুকুমারও গম্ভীর হয়ে উঠলো। "তুই ভাবছিস আমি জাত তুলে ব্যঙ্গ করছি। চণ্ডালের পায়ের ধুলো জিভে চাটতে পর্যন্ত আমার আপত্তি নেই। কিন্তু জুলাই মাসের মধ্যে আমাকে একটা চাকরি যোগাড় করতেই হবে।" বন্ধুর চোখ দুটো যে ছলছল করছে তা সোমনাথ বুঝতে পারলো।

একটু দুঃখও হলো সোমনাথের। বন্ধুকে উৎসাহ দেবার জন্যে বললো, "জানিস সুকুমার, চাকরির কথা ভেবে-ভেবে আমার মনটাও মাঝে-মাঝে খারাপ হয়ে যায়। আধবুড়ো হয়ে গেলাম, এখনও একটা কিছু যোগাড় হলো না। কতদিন আর বাবার হোটেলের অন্ন ধ্বংসাবো? বউদি অত যত্ন করে ভাত বেড়ে দেন, দাদাদের যে-সাইজের মাছ দেন, আমার জন্যে তার থেকেও বড়টা

তুলে রাখেন। জিজ্ঞেস করেন, আর কিছু নেবো কিনা। তবু তেতো লাগে।"

এবার রেগে উঠলো সুকুমার। "রাখ রাখ বড় বড় কথা। পাকা রুই মাছের টুকরো পাতে পড়লে বেশ মিষ্টি লাগে। ওই তেতো লাগার ব্যাপারটা তোর মানসিক বিলাসিতা। আমার কিন্তু আজকাল খেতে বসলে সত্যি তেতো লাগে। কাল রাত্রে ডাল পুড়ে গিয়েছিল। একে তো নিরামিষ মেনু, তার ওপর ডাল পোড়া হলে কেমন মেজাজ হয় বল তো? মায়ের শরীর ভাল নয়, তাই বোন রাঁধছে ক'দিন। তা বোনকে বকতে গেলাম, বাড়িতে বসে-বসে কী করিস? রান্নাটাও দেখতে পারিস না? বোন অমনি ছ্যাড়-ছ্যাড় করে শুনিয়ে দিলো। বলে কিনা, 'তোমারও তো কাজকম্ম নেই—বাড়িতে বসে ডাল রাঁধলেই পারো।' "

"তুই কী উত্তর দিলি?" সোমনাথ জানতে চায়।

"কিছু বললাম না, মুখ বুজে দাঁত খিঁচুনি হজম করলাম। তবে, সুকুমার মিত্তির একদিন এর প্রতিশোধ নেবে।"

প্রতিশোধের ব্যাপারটা সোমনাথের ভাল লাগে না। সে নির্বিবাদী মানুষ। বললো, "দূর! আপনজনদের ওপর প্রতিশোধ নিতে নেই।"

সুকুমার তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলো, "টেবিল-চেয়ারে বসিয়ে বউদি তোকে মণ্ডা-মিঠাই খাওয়াচ্ছে, তাই তোর মাথায় প্রতিশোধের কথা ওঠে না। আমার পলিসি অন্য। যারা আমার সঙ্গে এখন যেরকম ব্যবহার করছে তা আমি নোট করে রাখছি। ভগবান যখন সময় দেবেন, তখন সুদসমেত ফিরিয়ে দেবো।"

"আঃ সুকুমার! হাজার হোক তোর নিজের বোন। তার ওপর আবার প্রতিশোধ কী?" সোমনাথ আবার বন্ধুকে বোঝাবার চেষ্টা করলো।

হাসলো সুকুমার। "প্রতিশোধ মানে কি সমর্থ বোনকে ধরে মারবো, না রেগে গিয়ে দোজবরে বুড়োর সঙ্গে বিয়ে দেবো? বোনের ব্যাপারে আমার প্রতিশোধের পলিসিই আলাদা। সব ঠিক করে রেখেছি এখন থেকে। চাকরিতে ঢুকে প্রথম মাসের মাইনে থেকে কণাকে একটা লাল রংয়ের ঝকঝকে শাড়ি কিনে দেবো। আর শাড়ির মধ্যেই একটা ছোট্ট চিরকুটে লেখা থাকবে—অমুক তারিখের রাত্রিতে যখন আমাকে রান্নাঘরে ঢুকতে বলেছিলি তখনই তোকে এই শাড়িটা দেবার ইচ্ছে হয়েছিল। ইতি দাদা।"

সোমনাথ একমত হতে পারলো না। বললো, "এখন তোর রাগ রয়েছে, তাই এসব কথা ভাবছিস। যখন প্রথম মাইনে পাবি তখন দেখবি শুধু শাড়িটা দেবার ইচ্ছে হচ্ছে, চিঠির কথা মনেই পড়বে না। হাজার হোক ছোট বোন তো, তার মনে ব্যথা দিতে তোর মায়া হবে।"

সুকুমার কথা বাড়ালো না। বললো, "হয়তো তাই। কিন্তু মাইনে পাবার মতো অবস্থাটা কবে হবে বল তো ?"

একটু থেমে সুকুমার বললো, "মাঝে-মাঝে তো এম-এল-এ-দের কাছে যাই। রাগের মাথায় ওঁদের যা-তা বলি। আপনাদের জন্যেই তো আমাদের এই অবস্থা। চাকরি দেবার মুরোদ না-থাকলে কেন ইংরেজ তাড়িয়েছিলেন, কেন নিজেরা গদি দখল করেছিলেন ?"

"ওঁরা কী বলেন ?" সোমনাথ জিজ্ঞেস করলো।

"মাইরি একটা আশ্চর্য গুণ, কিছুতেই রাগে না এম-এল-এ-গুলো। আমাকে ওইভাবে কেউ ফায়ার করলে, স্রেফ ঘাড় ধরে তাকে বাড়ির বাইরে বার করে দিতাম, বলতাম, পরের বারে ব্যাটাচ্ছেলে যাকে খুশী ভোট দিও।"

"যারা পাবলিককে সামলাতে পারে না তারা ভোটে হেরে যাবে," সোমনাথ বললো।

"ঠিক বলেছিস, অশেষ ধৈর্য লোকগুলোর," সুকুমার বিস্ময় প্রকাশ করলো। "অমন চ্যাটাং-চ্যাটাং করে শোনালাম, একটু রাগলো না। বরং স্বীকার করে নিলো, প্রত্যেকটি ইয়ংম্যানকে চাকরি দেবার দায়িত্ব গভরমেণ্টের। যে-সরকার তা পারে না, তাদের লজ্জিত হওয়া উচিত।"

"লজ্জা কিছু দেখলি ?" সোমনাথ জানতে চায়।

"অত লক্ষ্য করিনি ভাই। তবে এম-এল-এ-দা ভিতরের খবরের অনেক ছাড়লেন। মাস-কয়েকের মধ্যে অনেক চাকরি আসছে। সেল্‌স ট্যাক্স, স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড, হাউসিং ডিপার্টমেণ্টের হাজার-হাজার চাকরি তৈরি হলো বলে। এতো চাকরি যে সে অনুপাতে গভরমেণ্টের চেয়ার নেই। তা আমি বলে দিয়েছি সেজন্য চিন্তার কিছু নেই। চাকরি পেলে আমার বন্ধুর বাড়ি থেকে একটা চেয়ার চেয়ে নিয়ে যাবো। গভরমেণ্টের অসুবিধা করবো না।"

"উনি কী বললেন ?" সোমনাথ জানতে চাইলো।

"খুব ইমপ্রেস্‌ড হলেন। বললেন, সবার কাছ থেকে এ-রকম সহযোগিতা পেলে ওঁরা দেশে সোনা ফলিয়ে দেবেন। ভরসা পেয়ে তোর কথাটাও ওঁর কানে তুলে দিয়েছি। বলেছি, হাজার-হাজার লাখ-লাখ চাকরি যখন আপনার হাতে আসছে, তখন আমার বন্ধু সোমনাথ ব্যানার্জির নামটাও মনে রাখবেন। খুব ভাল ছেলে, আমারই মতো চাকরি না-পেয়ে বেচারা বড় মনমরা হয়ে আছে। চেয়ারের জন্যে কোনো অসুবিধে হবে না। ওদের বাড়িতে অনেক খালি চেয়ার আছে।"

সোমনাথ হাসলো।

সুকুমার একটু বিরক্ত হয়ে বললো, "এইজন্যে কারুর উপকার করতে নেই। দাঁত বার করে হাসছিল কী? এম-এল-এ-দা বলেছেন, শীগগির একদিন রাইটার্স বিল্ডিংস-এ নিয়ে যাবেন। খোদ মিনিস্টারের সি-এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন। সি-এ জানিস তো? মিনিস্টারের গোপন সহকারী—কনফিডেনশিয়াল অ্যাসিসট্যাণ্ট। আজকাল এরা ভীষণ পাওয়ারফুল—আই-সি-এস খোদ সেক্রেটারীরা পর্যন্ত সি-এদের কাছে কেঁচো হয়ে থাকে।"

"তাতে তোর আমার কী? বড়-বড় গভরমেণ্ট অফিসাররা চিরকালই কারুর কাছে গোখরো সাপ, কারও কাছে পাঁকাল মাছ।" সোমনাথ আই-এ-এস এবং আই-সি-এস সম্বন্ধে তার বিরক্তি প্রকাশ করলো।

সুকুমার কিন্তু নিরুৎসাহ হলো না। বন্ধুর হাত চেপে বললো, "আসল কথাটা শোন না। সি-এদের পকেটে ছোট্ট একটা নোটবুক থাকে। ওই নোটবুকে যদি একবার নিজের নাম-ঠিকানা তোলাতে পেরেছিস স্রেফ ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে সরকারী চাকরি পেয়ে যাবি।"

"তুই চেষ্টা করে দেখ! তদ্বিরের জন্য জুতোর শুকতলা খইয়ে ফেলে আমার চোখ খুলে গিয়েছে," সোমনাথ বিরক্তির সঙ্গে বললো।

সুকুমার বললো, "আশা ছাড়িস না। ট্রাই ট্রাই অ্যাণ্ড ট্রাই। একবারে না পারিলে দেখো শতবার।"

"শতবার! শালা সহস্রবারের ওপর হয়ে গেলো, কিছু ফল হলো না। মাঝখান থেকে রয়াল টাইপ রাইটিং কোম্পানির নবীনবাবু বড়লোক হয়ে গেলেন। আমার কাছ থেকে কত বার যে পঞ্চাশ পয়সা করে চিঠি ছাপাবার জন্যে বাগিয়ে নিলেন! আমি মতলব করেছিলুম, কার্বন কাগজ চড়িয়ে অনেকগুলো কপি করে রেখে দেবো, বিভিন্ন নামে ছাড়বো। কিন্তু বাবা এবং বউদি রাজী হলেন না। বললেন, অ্যাপ্লিকেশনটাই নাকি সবচেয়ে ইম্পর্টাণ্ট। ওর থেকেই ক্যাণ্ডিডেট সম্পর্কে মালিকরা একটা আন্দাজ করে নেয়। কার্বন কপি দেখলে ভাববে লোকটা পাইকিরী হারে অ্যাপ্লিকেশন ছেড়ে যাচ্ছে।"

"এটা মাইরি অন্যায়," সুকুমার এবার বন্ধুর পক্ষ নিলো। "তোমরা একখানা চাকরির জন্যে হাজার-হাজার দরখাস্ত নেবে, আর আমরা দশ জায়গায় একই দরখাস্ত ছাড়তে পারবো না?"

সোমনাথ বললো, "আসলে বউদির খেয়াল। টাইপ করার পয়সাও হাতে গুঁজে দিচ্ছেন, বলার কিছু নেই। তবে এখন বুঝতে পারছি সরকার-বেসরকার কেউ আমাদের চাকরি দিয়ে উদ্ধার করবে না।"

"ভগবান জানেন," সুকুমার রাস্তায় দাঁড়িয়ে নিজের মনেই বললো।

অফিসযাত্রীর ভিড় ইতিমধ্যেই অনেকটা পাতলা হয়ে এসেছে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সোমনাথ একবার বললো, "আমার বউদি কিন্তু মোটেই আশা ছাড়েনি। আমার কোষ্ঠীতে নাকি আছে যথাসময়ে অনেক টাকা রোজগার করবো!"

"আমার ভাই কোষ্ঠী নেই। থাকলে একবার ধনস্থানটা বিচার করিয়ে নেওয়া যেতো।" সুকুমার বললো।

সোমনাথ আবার বউদির কথা তুললো। "সেদিন চুপচাপ বসেছিলাম। বউদি বললেন, 'মন খারাপ করে কী হবে? ছেলেদের চাকরিটা অনেকটা মেয়েদের বিয়ের মতো। বাবা আমার বিয়ের জন্যে কত ছুটফট করেছেন। কত বাড়িতে ঘোরাঘুরি করেছেন। কিছুতেই কিছু হয় না। তারপর যখন ফুল ফুটলো, এ-বাড়িতে এক সপ্তাহের মধ্যে সব ঠিকঠাক হয়ে গেলো।' বউদি বলেছিলেন, আমার চাকরির ফুল হয়তো একদিন হঠাৎ ফুটে উঠবে, লোকে হয়তো ডেকে চাকরি দেবে।"

"তোর বউদির মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক। জুন মাসের মধ্যে যদি আমার ফুল ফোটে তাহলে বড় ভাল হয়, হাতে পুরো একটা মাস থাকে।" সুকুমার নিজের মনেই বললো।

"ফুল তো তোর আমার চাকর নয়। নিজের যখন ইচ্ছে হবে তখন ফুটবে," সোমনাথ উত্তর দিলো।

সুকুমার এবার মনের কথা বললো। "বড্ড ভয় করে মাইরি। আমাদের কলোনিতে আইবুড়ী দেঁতো পিসী আছে। বিয়ের সম্বন্ধ করতে-করতেই পিসী বুড়ী হয়ে গেলো—বর আর জুটলো না। আমাদের যদি ওরকম হয়? চুল দাড়ি সব পেকে গেলো, অথচ চাকরি হলো না!"

এরকম একটা ভয়াবহ সম্ভাবনা যে নেই, তা মোটেই জোর করে বলা যায় না। এই ধরনের কথা শুনতে সোমনাথের তাই মোটেই ভাল লাগে না। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সোমনাথ বললো, "এবার বাড়ি ফেরা যাক। বউদি বেচারা হয়তো জলখাবার নিয়ে বসে আছেন।"

"যা তুই জলখাবার খেতে। আমি এখন বাড়ি ফিরবো না। একবার আপিসপাড়াটা ঘুরে আসবো।"

"আপিসপাড়ায় ঘুরে কী তোর লাভ হয়? কে তোকে ডেকে চাকরি দেবে?" সোমনাথ বন্ধুর সমালোচনা করলো।

কিন্তু সুকুমার দমলো না। "সব গোপন ব্যাপার তোকে বলবো কেন? ভাবছিস ফর ন্যাথিং এই সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামের ভিড় ঠেঙিয়ে আমি আপিসপাড়ায়

ভেরেণ্ডা ভাজতে যাচ্ছি? সুকুমার মিত্তিরকে অত বোকা ভাবিস না।"

সোমনাথের এবার কৌতূহল হলো। বন্ধুকে অনুরোধ করলো, "গোপন ব্যাপারটা একটু খুলে বল না ভাই।"

"এবার পথে এসো দাদা! বেকারের কি দেমাক মানায়? বাড়িতে বসে শুধু খবরের কাগজ পড়লেই চাকরির গোপন খবর পাওয়া যায় না, চাঁদ।"

"তাহলে?" সোমনাথ জিজ্ঞেস করে।

সুকুমার বেশ গর্বের সঙ্গে বন্ধুকে খবর দিলো, "অনেক কোম্পানি আজকাল বেকার পঙ্গপালের ভয়ে কাগজে চাকরির বিজ্ঞাপন দেয় না। একটা কোম্পানি তো কেরানির পোস্টের জন্যে বিজ্ঞাপন দিয়ে যা ফ্যাসাদে পড়েছে না! খবরের কাগজে বক্স নম্বর ছিল। সেখান থেকে তিন লরি অ্যাপ্লিকেশন কোম্পানির হেড আপিসে পাঠিয়েছে। এখনও চিঠি আসছে। তার ওপর আবার কীভাবে খবরের কাগজের আপিস থেকে বক্স নম্বর ফাঁস হয়েছে। কারা বিজ্ঞাপন দিয়েছিল তা কিছু লোক জানতে পেরেছে। প্রতিদিন তিন-চারশ' লোক আপিসে ভিড় করছে। কোম্পানির পার্সোনেল অফিসার তো ঘাবড়ে গিয়ে কলকাতা থেকে কেটেছেন।"

"তাহলে উপায়?" সোমনাথ চিন্তিত হয়ে পড়ে।

"তাদের উপায় তারা বুঝবে, আমাদের কী? তা যা বলছিলাম, এই পঙ্গপালের ভয়ে অনেক কোম্পানি এখন বিজ্ঞাপন না দিয়ে নোটিশ বোর্ডে চাকরির খবর ঝুলিয়ে দিচ্ছে। আমাদের শম্ভু দাস, ছোকরা এইরকমভাবে হাইড রোডের একটা কারখানায় টাইপিস্টের চাকরি বাগিয়েছে। ছোকরার অবশ্য টাইপে স্পীড ছিল। বেটাকে একদিন দেখেছিলাম মেশিনের ওপর। পাঞ্জাব মেলের মতো আঙুল চলছে। ওর কাছ থেকে বুদ্ধি পেয়ে আমিও এখন আপিসে-আপিসে ঘুরে বেড়াই। মুখে কিছু বলি না—চাকরির খোঁজে এসেছি জানতে পারলে অনেক আপিসে আজকাল ঢুকতে দেয় না। তাই কোনো কাজের অছিলায় ডাঁটের মাথায় আপিসে ঢুকে পড়তে হয়, তারপর একটু ব্রেন খাটিয়ে স্টাফদের নোটিশ বোর্ডে নজর দিয়ে আসি।"

একটু থামলো সুকুমার। তারপর বললো, "ভাবছিস পণ্ডশ্রম হচ্ছে? মোটেই না। চারে মাছ আছে, বুঝলি সোমনাথ? এর মধ্যে তিন-চারখানা অ্যাপ্লিকেশন ছেড়ে এসেছি। কাল যে-আপিসে গিয়েছিলাম, সেখানে চাকরি হলে কেলেংকেরিয়াস কাণ্ড। প্রত্যেক দিন মাইনে ছাড়াও পঁচাত্তর পয়সা টিফিন—তাও বাবুদের পছন্দ হচ্ছে না! প্রতিদিন আড়াই টাকা টিফিনের দাবিতে কর্মচারি ইউনিয়ন কোম্পানিকে উকিলের চিঠি দিয়েছে।"

গোলপার্ক থেকে একলা বাড়ি ফিরে আসার পথে সুকুমারের কথা ভাবছিল সোমনাথ। ওর উদ্যমকে মনে-মনে প্রশংসা না-করে পারেনি সোমনাথ। হয়তো এই পরিশ্রমের ফল সুকুমার একদিন আচমকা পেয়ে যাবে। চাকরির নিয়োগপত্রটা দেখিয়ে সুকুমার চলে যাবে, কেবল সোমনাথ তখনও বেকার বসে থাকবে। এসব বুঝেও সোমনাথ কিন্তু সুকুমারের মতো হতে পারবে না।

বাবা সরকারী কাজ করতেন, একসময় অনেককে চিনতেন। কিন্তু সোমনাথ কিছুতেই তাঁদের বাড়ি বা অফিসে গিয়ে ধর্না দেবার কথা ভাবতে পারে না। বাবারও আত্মসম্মানজ্ঞান প্রবল—কিছুতেই বন্ধু-বান্ধবদের ধরেন না। দ্বৈপায়নবাবুর যে একটা পাস কোর্সে বি এ পাসকরা বেকার অর্ডিনারি ছেলে আছে সে খবর অনেকেই রাখে না। তাঁরা শুধু দ্বৈপায়ন ব্যানার্জির দুই হীরের টুকরো ছেলের কথা শুনেছেন—যাদের একজন আই-আই-টি ইনজিনীয়ার এবং আরেকজন বিলাতী কোম্পানির জুনিয়র অ্যাকাউনটেণ্ট।

হঠাৎ সোমনাথের রাগ হতে আরম্ভ করছে। সুকুমার বেচারা অত দুঃখী, কিন্তু কারুর ওপর রাগে না। সোমনাথের কিন্তু এই মুহূর্তে রাগে ফেটে পড়তে ইচ্ছে করছে। এই যে বিশাল সমাজ তার বিরুদ্ধে কোনো অপরাধই তো সোমনাথ বা তার বন্ধু সুকুমার করেনি। তারা সাধ্যমতো লেখাপড়া শিখেছে, সমাজের আইন-কানুন মেনে চলেছে। তাদের যা করতে বলা হয়েছে তারা তাই করেছে! তাদের দেহে রোগ নেই, তারা পরিশ্রম করতে রাজী আছে—তবু এই পোড়া দেশে তাদের জন্যে কোনো সুযোগ নেই। এমন নয় যে তারা বড় চাকরি চাইছে—যে-কোনো কাজ তো তারা করতে প্রস্তুত। তবু কেউ ওদের দিকে মুখ তুলে তাকালো না—মাঝখান থেকে জীবনের অমূল্য ক'টা বছর নষ্ট হয়ে গেলো।

একবার যদি সোমনাথ বুঝতে পারতো এর জন্যে কে দায়ী, তাহলে সত্যিই সে বেপরোয়া একটা কিছু করে বসতো। সুকুমার বেচারা হয়তো তার সঙ্গে যোগ দিতে সাহস করবে না—ওর দায়-দায়িত্ব অনেক বেশি। কিন্তু সোমনাথের পিছু টান নেই। তার রোজগার খাবার জন্যে সংসারে কেউ ফ্যালফ্যাল করে মুখের দিকে তাকিয়ে বসে নেই। ওর পক্ষে বেপরোয়া হয়ে বোমার মতো ফেটে পড়া অসম্ভব নয়।

বাড়ি ফিরতেই কমলা বউদি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "কারুর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে নাকি? মুখটা অমন লাল হয়ে রয়েছে।"

সোমনাথ সামলে নিলো নিজেকে। বললো, "বোধহয় একটু রোদ লেগেছে।"

বুলবুল অনেক আগেই চেতলায় বাপের বাড়ি বেড়াতে গেছে। ওখানে

ভাত খাবে সে। বাবা পুরানো অভ্যাস অনুযায়ী সাড়ে-দশটার সময় ভাত খেয়ে নিয়েছেন। শুধু কমলা বউদি সোমনাথের জন্যে অপেক্ষা করছেন।

তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নিলো সোমনাথ। তারপর দুজনে একসঙ্গে খেতে বসলো। মায়ের মৃত্যুর পর এই এতো বছর ধরে সোমনাথ কতবার কমলা বউদির সঙ্গে খেতে বসেছে। রান্না পছন্দ না-হলে বউদিকে বকুনি লাগিয়েছে। বলেছে, "বাবা কিছু বলেন না, তাই বাড়ির রান্না ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে।"

কমলা বউদিও দেওরের সঙ্গে তর্ক করেছেন। বলেছেন, "তেল-ঝাল না-থাকলে তোমাদের রান্না ভাল লাগে না। কিন্তু বাবা ওসব সহ্য করতে পারেন না। ডাক্তারবাবু বলে গেছেন, লঙ্কা আর অতিরিক্ত মসলা কারুর শরীরের পক্ষে ভাল নয়।"

কিন্তু এই দু-বছরেই অবস্থাটা ক্রমশ পালটে গেলো। সোমনাথ এখন খেতে বসে কেমন যেন লজ্জা পায়। রান্নার সমালোচনা তো দূরের কথা, বিশেষ কোনো কথাই বলে না। আর কমলা বউদি দুঃখ করেন, "তোমার খাওয়া কমে যাচ্ছে কেন, খোকন? হজমের কোনো গোলমাল থাকলে ডাক্তার দেখিয়ে এসো। একটু-আধটু ওষুধ খেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

সোমনাথ প্রশ্নটা এড়িয়ে যায়। ওর কেমন ভয় হয় কমলা বউদির কাছে কিছুই গোপন থাকে না। বউদি ওর মনের সব কথা বোধহয় বুঝতে পারেন।

অপরাহ্নের পরিস্থিতি আরও যন্ত্রণাদায়ক। জন্ম-জন্মান্তর ধরে কত পাপ করলে তবে এই সময় বাড়িতে চুপচাপ বসে থাকবার শাস্তি পায় পুরুষমানুষরা। কমলা বউদি সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর এই সময় একটু নিজের ঘরে বিছানায় গড়িয়ে নেন। বিনাশ্রম কারাদণ্ডের এই সময়টা সোমনাথ কীভাবে কাটাবে বুঝতে পারে না। এই সময় ঘুমোলে সারারাত বিছানায় ছটফট করতে হয়। চুপচাপ জেগে থাকলে, মনে নানা কিম্ভূতকিমাকার চিন্তা ভিড় করে। মাঝে-মাঝে বই পড়বার চেষ্টা করেছে সোমনাথ—এখন বই ভাল লাগে না। আগে ট্রানজিস্টর রেডিওতে গান শুনতো—এখন তাও অসহ্য মনে হয়।

অথচ কত লোক এই সময়ে অফিসে, আদালতে, কারখানায়, রেল স্টেশনে, পোস্টাপিসে, বাজারে কাজ করতে-করতে গলদঘর্ম হচ্ছে। মা বলেছিলেন, কাউকে হিংসে করবে না—কিন্তু এই মুহূর্তে কাজের লোকেদের হিংসে না করে পারছে না সোমনাথ।

সাড়ে-চারটের সময় বাবার বন্ধু সুধন্যবাবু এলেন। রিটায়ার করে তিনি এখানেই বাড়ি কিনেছেন। বিকেলের দিকে সুধন্যবাবু মাঝে-মাঝে বাবার সঙ্গে গল্প করতে আসেন।

'সুধন্যবাবু এলেই বাবার গাম্ভীর্যের মুখোস খসে যায়। বউমার কাছে চায়ের অনুরোধ যায়। তারপর দুজনের সুখ-দুঃখের গল্প শুরু হয়।

সুধন্যবাবুর দিকে সিগারেট এগিয়ে দিয়ে দ্বৈপায়ন জিজ্ঞেস করেন, "চিঠি-পত্তর পেলে?"

চিঠিপত্তর মানে জামাই-এর চিঠি—সুধন্যবাবুর জামাই কানাডায় থাকে। সুধন্যবাবু বলেন, "জানো ব্রাদার, এখানে তো এতো গরম, কিন্তু উইনিপেগে এখন বরফ পড়ছে। খুকী লিখেছে, রাস্তায় হাঁটা যায় না।"

"ওদের আর হাঁটবার দরকার কী? গাড়ি রয়েছে তো?" দ্বৈপায়নবাবু জিজ্ঞেস করেন।

"শুধু গাড়ি নয়—এয়ার কণ্ডিশন লিমুজিন। শীতকালে গরম, গরমকালে ঠাণ্ডা! এখানে বিড়লারাও অমন গাড়ি চড়তে পারে কিনা সন্দেহ। জামাই-বাবাজী গাড়ির একটা ফটো পাঠিয়েছে, তোমাকে দেখাবো'খন। জানো দ্বৈপায়ন, এখন গাড়ি যে গিয়ার চেঞ্জ করতে হয় না—সব আপনা-আপনি হয়। আর আমাদের এখানে দেশী কোম্পানির গাড়ি দেখো! সেবার খুকী যখন এলো, তখন আমার নাতনী তো ট্যাক্সিতে চড়ে হেসে বাঁচে না। তাও বেছে-বেছে নতুন ট্যাক্সিতে উঠেছিলাম আমরা।"

"কাদের সঙ্গে কাদের তুলনা করছো, সুধন্য?" দ্বৈপায়ন সিগারেটে টান দিয়ে বলেন। এ-দেশের অর্থনৈতিক ক্রমাবনতি সম্পর্কে দ্বৈপায়নের বিরক্তি ওঁর প্রতিটি কথায় প্রকট হয়ে উঠলো।

সুধন্যবাবু এবার সগর্বে ঘোষণা করলেন, "খুকী লিখেছে, জামাইয়ের মাইনে আরও বেড়েছে। এখন দাঁড়ালো, এগারো হাজার দুশো পঞ্চাশ টাকা। জানো ব্রাদার, গিন্নি তো এখনও সেইরকম সিমপল আছেন—উনি ভেবেছেন বছরে এগারো হাজার টাকা। বিশ্বাসই করতে চান না, প্রতি মাসে জামাইবাবাজী এতো টাকা ঘরে আনছে। আমি রসিকতা করলাম, গিন্নি একি তোমার স্বামী যে এগারো শো টাকায় রিটায়ার করবে!"

"আহা বেঁচে থাক, আরও উন্নতি করুক," দ্বৈপায়ন আশীর্বাদ জানালেন।

সুধন্যবাবু কিন্তু পুরোপুরি খুশী নন। বললেন, "খুকীর অবশ্য সুখ নেই।

লিখেছে, এমন অভাগা দেশ যে একটা ঠিকে-ঝি পর্যন্ত পাওয়া যায় না। জানো দ্বৈপায়ন, আদরের মেয়েটাকে জমাদারণীর কাজ পর্যন্ত করতে হয়। অবশ্য জামাইবাবাজী হেল্প করে।”

“বলো কী?” দ্বৈপায়ন সহানুভূতি প্রকাশ করেন।

“লোকের বড় অভাব, জানো দ্বৈপায়ন। কত চাকরি যে খালি পড়ে আছে, শুধু লোক পাওয়া যাচ্ছে না বলে।” সুধন্যবাবু সিগারেটে একটা টান দিলেন।

দ্বৈপায়ন কী মতামত দেবেন ভেবে পাচ্ছেন না। সিগারেটের ছাই ঝেড়ে তিনি বললেন, “রূপকথার মতো শোনাচ্ছে সুধন্য। বিংশ শতাব্দীতে একই চন্দ্র-সূর্যের তলায় এমন দেশ রয়েছে যেখানে একটা পোস্টের জন্য এক লাখ অ্যাপ্লিকেশন পড়ে, আবার অন্য দেশে চাকরি রয়েছে কিন্তু লোক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।”

সুধন্যবাবু বন্ধুর মতো বিস্ময় বোধ করলেন না। বললেন, “তবে কি জানো, দুটোই চরম অবস্থা। যে-দেশে নিজের বাসন নিজে মেজে খেতে হয় সে দেশকে ঠিক সুসভ্য দেশ বলা চলে না।”

হাসলেন দ্বৈপায়ন। “কিন্তু যাদের বাড়িতে বেকার ছেলে রয়েছে তারা বলছে, পশ্চিম যা করেছে তাই শতগুণে ভাল। এদেশে চাকরি-বাকরির যা অবস্থা হলো।”

সুধন্যবাবু বললেন, “ভাগ্যে আমার ছেলে নেই, তাই চাকরি-বাকরির কথা এ-জীবনে আর ভাবতে হবে না।”

“বেঁচে গেছ, ব্রাদার। ছোকরা বয়সের এই যন্ত্রণা চোখের সামনে দেখতে পারা যায় না। অথচ হাত-পা বাঁধা অবস্থা—সাহায্য করবার কোনো ক্ষমতা নেই।” দ্বৈপায়নের কণ্ঠে দুঃখের সুর বেজে উঠলো।

“এই অবস্থায় জামাই-এর মাথায় ভূত চেপেছে,” সুধন্যবাবু ঘোষণা করলেন। “বিদেশে থাকলে স্বদেশের প্রতি ভালবাসা বাড়ে তো। লিখেছে, দেশে ফিরে গিয়ে দেশের সেবা করবো। বলো দিকিনি, কি সর্বনাশের কথা!”

কথাটা যে মোটেই সুবিধের নয় এ-বিষয়ে দ্বৈপায়ন বন্ধুর সঙ্গে একমত হলেন।

সুধন্যবাবু বললেন, “সেইজন্যেই তো তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে এলাম। জামাই লিখেছে, হাজার টাকা মাইনে পেলে দেশের কোনো কলেজে লেকচারার হয়ে ফিরে যাবো। বাবাজী অনেকদিন ঘরছাড়া, বুঝতে পারছে না ইণ্ডিয়াতে এতো লোক যে এখানে মানুষের কোনো সম্মান নেই। মানুষের এই জঙ্গলে মানুষকে যোগ্য মূল্য দিতে ভুলে গিয়েছি আমরা।”

দ্বৈপায়ন বললেন, "মেয়েকে লিখে দাও, জামাইয়ের কথায় যেন মোটেই রাজী না হয়। এখানে এসে ওরা শুধু ভিড় বাড়াবে, তিন-চারখানা বাড়তি রেশন কাড হবে, অথচ দেশের কোনো মঙ্গল হবে না। তার থেকে ঐ যে বৈদেশিক মুদ্রা জমাচ্ছে, ওতে দেশের অনেক উপকার হচ্ছে।"

সুধন্যবাবুর মনের মধ্যে কোথাও একটু লোভ ছিল মেয়েকে অতদূরে না রাখার। চাপা গলায় বললেন, "তোমাকে বলতে লজ্জা নেই, গিন্নির চোখে জল। হাজার হোক একটি সন্তান—কোথায় পড়ে রয়েছে। ওর ইচ্ছে মেয়ে-জামাই ফিরে আসুক—অত টাকা নিয়ে কী হবে? এতো লোক তো এই দেশেই করে খাচ্ছে, গাড়ি চড়ছে, ভাল বাড়িতে থাকছে।"

একটু থেমে সুধন্যবাবু বললেন, "সেদিক থেকে তুমি ভাই লাকি। হীরের টুকরো সব ছেলে। ভোম্বলের আর কোনো প্রমোশন হলো নাকি?"

দ্বৈপায়ন ছেলেদের সব খবরাখবর রাখেন। ছেলেরা এসে অফিস সম্পর্কে বাবার সঙ্গে আলোচনা করে। দ্বৈপায়ন বললেন, "ভোম্বল এ-বছরেই টেকনিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের ডেপুটি ম্যানেজার হবে শুনছি। ছোকরা নিজের চেষ্টায় সামান্য টাকায় ঢুকেছিল, চাকরিতে এতোটা উঠবে আশা করিনি। কিন্তু বিয়ের পরই উন্নতি হচ্ছে—বউমার ভাগ্য।"

বউমা সম্পর্কে কোথাও কোনোরকম মতদ্বৈধ নেই। সুধন্যবাবু বললেন, "গিন্নি এবং আমি তো প্রায়ই বলি, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীকে তুমি নিয়ে এসেছো—নামে কমলা, স্বভাবে কমলা।"

দ্বৈপায়নের থেকে এ-বিষয়ে কেউ বেশি বোঝে না। তিনি কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "বড় বউমা না-থাকলে সংসারটা ভেসে যেতো সুধন্য। আজকালকার মেয়েদের সম্বন্ধে যা সব শুনি!"

পা নাড়াতে-নাড়াতে সুধন্যবাবু বললেন, "আজকাল মেয়েরা যে রসাতলে যাচ্ছে তা হয়তো ঠিক নয়। তবে স্বামীরটি এবং নিজেরটি ছাড়া অন্য কিছুই বোঝে না। সুপুরুষ রোজগেরে স্বামীটি যে ছাব্বিশ-সাতাশ বছর বয়সে আকাশ থেকে বেলুনে চড়ে মাটিতে নেমে আসেনি, অনেক দুঃখ-কষ্টে পেটে ধরে কেউ যে তাকে তিলতিল করে মানুষ করেছেন এবং তাঁদেরও যে সন্তানের ওপর কিছু দাবি আছে, তা বউমাদের মনে থাকে না।"

দ্বৈপায়ন বললেন, "এই ডেপুটি ম্যানেজার হবার খবরে বউমা কিন্তু খুব চিন্তিত।"

"সে কি?" অবাক হয়ে গেলেন সুধন্যবাবু। "প্রমোশন, এ তো আনন্দের কথা।"

"প্রয়োজন পেলে ভোম্বলকে হেড অফিসে বদলি করে দেবে," একটু থামলেন দ্বৈপায়ন। "মা আমার কথা কম বলে, কিন্তু বুদ্ধিমতী। কমলাবিহীন এ-সংসারের কী হবে তা নিশ্চয় বুঝতে পারো।"

"কেন? মেজ বউমা?" সুধন্যবাবু প্রশ্ন করেন।

দ্বৈপায়ন ঝুঁকে পড়েন সামনের দিকে। নিচু গলায় বললেন, "এখনও ছেলেমানুষ। মনটি ভাল, কিন্তু প্রজাপতির মতো ছটফট করে—একজায়গায় মন স্থির করতে পারে না। তাছাড়া কাজলের তো ঘন-ঘন ট্রান্সফারের কাজ। আমেদাবাদে পাঠিয়ে দেবার কথা হচ্ছে।"

সুধন্যবাবু কিছু বলার মতো কথা পাচ্ছেন না। দ্বৈপায়ন নিজেই বললেন, "এমনও হতে পারে যে এই বাড়িতে কেবল আমি এবং খোকন রয়ে গেলাম।"

কপালে হাত রাখলেন দ্বৈপায়ন। "আমি আর ক'দিন? কিন্তু সংসারটা গুছিয়ে রেখে যেতে পারলাম না, সুধন্য। প্রতিভার সঙ্গে দেখা হলে বকাবকি করবে। বলবে, দুটো ছেলেকে মানুষ করে, মাত্র একজনের দায়িত্ব তোমার ওপরে দিয়ে এলাম, সে-কাজটাও পারলে না?"

"চাকরির যে এমন অবস্থা হবে, তা কি কেউ কল্পনা করেছিল?" বন্ধুকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন সুধন্যবাবু। "শুধু তোমার ছেলে নয়, যেখানে যাচ্ছি সেখানেই হাহাকার। হাজার-হাজার নয়, লাখ-লাখ নয়, এখন শুনছি বেকারের সংখ্যা লক্ষমাত্রা ছাড়িয়ে কোটিতে হাজির হয়েছে।"

দ্বৈপায়ন শুধু বললেন, "হুঁ।" এই শব্দ থেকে তাঁর মনের সঠিক অবস্থা বোঝা গেলো না।

সুধন্যবাবু বললেন, "এখন তো আর কাজকর্ম নেই—মন দিয়ে খবরের কাগজটা পড়ি। কাগজে লিখছে, এতো বেকার পৃথিবীর আর কোনো দেশে নেই। এই একটা ব্যাপারে আমরা নিঃসন্দেহে ফার্স্ট হয়েছি—দুনিয়ার কোনো জাত অদূর ভবিষ্যতে আমাদের এই সম্মান থেকে সরাতে পারবে না। ইণ্ডিয়ার মধ্যে আবার আমরা বাঙালীরা বেকারীতে গোল্ড মেডেল নিয়ে বসে আছি।"

আরামকেদারায় শুয়ে দ্বৈপায়ন আবার বললেন, "হুঁ।"

সুধন্যবাবু বললেন, "জিনিসটা বীভৎস। লেখাপড়া শিখে, কত স্বপ্ন কত আশা নিয়ে লাখ-লাখ স্বাস্থ্যবান ছেলে চুপচাপ ঘরে বসে আছে, আর মাঝে-মাঝে কেবল দরখাস্ত লিখছে—এ দৃশ্য ভাবা যায় না। সমস্যাটা বিশাল বুঝলে দ্বৈপায়ন। সুতরাং তুমি একলা কী করবে?"

মন তবু বুঝতে চায় না। দ্বৈপায়নের কেমন ভয় হয়, প্রতিভার সঙ্গে দেখা হলে এইসব যুক্তিতে সে মোটেই সন্তুষ্ট হবে না। বরং বলে বসবে, তুমি-না

বাপ? মা-মরা ছেলেটার জন্যে শুধু খবরের কাগজী লেকচার দিলে!

সুধন্যবাবু বললেন, "সারাজন্ম খেটেখুটে পেনসন নিয়ে যে একটু নিশ্চিন্তে জীবন কাটাবে তার উপায় নেই। ছেলেরা মানুষ না হলে নিজেদের অপরাধী মনে হয়।"

সুধন্যবাবু উঠতে যাচ্ছিলেন। দ্বৈপায়ন বললেন, "এ-সম্বন্ধে তোমার মেয়ে একবার কি লিখেছিল না?"

সুধন্যবাবু আর একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, "একবার কেন? মেয়ে প্রায়ই লেখে। ওখানকার পলিসি হলো—নিজের বর নিজে খোঁজো—ওন-ইওর-ওন টেলিফোনের মতো। ইচ্ছে হলে বড়জোর বাপ-মাকে কনসাল্ট করো। কিন্তু দায়িত্বটা তোমার। তেমনি চাকরি খুঁজে দেবার দায়িত্ব বাপ-মায়ের নয়? তোমার গোঁফ-দাড়ি গজিয়েছে, সাবালক হয়েছো—এখন নিজে চরে খাও।"

সোমনাথের কথা সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়ে গেলো দ্বৈপায়নের। মনের সঙ্কোচ ও দ্বিধা কাটিয়ে তিনি বললেন, "ভাবছিলাম, খোকনের জন্যে কানাডায় কিছু করা যায় কিনা। এখানে চাকরি-বাকরির যা অবস্থা হলো।"

সুধন্যবাবু কোনো আশা দিতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত দায়সারাভাবে উত্তর দিলেন, "তুমি যখন বলছো, তখন খুকীর কাছে আমি সব খুলে লিখতে পারি। কিন্তু আমি যতদূর জানি, প্রতি হপ্তায় কলকাতা থেকে এ-ধরনের অনুরোধ জামাইয়ের কাছে দু-তিনখানা যায়। কানাডিয়ানরা আগে অনেক ইণ্ডিয়ান নিয়েছে—এখন ওরা চালাক হয়ে গিয়েছে। ডাক্তার, ইনজিনীয়ার, টেকনিশিয়ান ছাড়া আর কাউকে কানাডায় ঢোকবার ভিসা দিচ্ছে না।"

দ্বৈপায়ন এই ধরনের উত্তর পাবার জন্যেই প্রস্তুত ছিলেন। কানাডাকে তিনি দোষ দিতে পারেন না। ঢালাও দরজা খুলে রাখলে, কানাডার অবস্থা এ-দেশের মতো হতে বেশি সময় লাগবে না।

তবু মনটা খারাপ হলো দ্বৈপায়নের। সুধন্যর জামাইয়ের বিদেশে যাওয়ার সময় পাসপোর্টের গোলমাল ছিল। সে-গোলমাল দ্বৈপায়নই সামলে ছিলেন। খুকীর পাসপোর্ট তৈরির সময়েও দ্বৈপায়নকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল। সুধন্য তখন অবশ্য ওর দুটো হাত ধরে বলেছিলেন, "তোমার ঋণ জীবনে শোধ করতে পারবো না।"

বিরক্তিটা সুধন্যর ওপর আর রাখতে পারছেন না দ্বৈপায়ন। মনে হচ্ছে, তিনকাল গিয়ে জীবনের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। এখনও তাকে সংসারের কথা ভাবতে হবে কেন? দ্বৈপায়নের অকস্মাৎ মনে হলো, পাশ্চাত্য

দেশের বাপ-মায়েরা অনেক ভাগ্যবান—তাদের দায়দায়িত্ব অনেক কম। মেয়ের বিয়ে এবং ছেলের চাকরি—এই দুটো বড় অশান্তি থেকে তাঁরা বেঁচেছেন।

সুধন্যবাবু বিদায় নেবার পরও দ্বৈপায়ন অনেকক্ষণ চুপচাপ বারান্দায় বসেছিলেন। বাইরে কখন অন্ধকার নেমে এসেছে। রাস্তা দিয়ে অফিসের লোকেরা ইতিমধ্যে বাড়ি ফিরে এসেছে। মাঝে-মাঝে দু-একটা গাড়ি কেবল এ অঞ্চলের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছে।

"বাবা, আপনি কি ঘুমিয়ে পড়লেন?" বড় বউমার ডাকে সম্বিৎ ফিরে পেলেন দ্বৈপায়ন।

সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারে সদ্যপ্রসাধিতা শ্রীময়ী বউমাকে দেখতে পেলেন দ্বৈপায়ন।

"এসো মা," বললেন দ্বৈপায়ন।

"আপনি স্নান করবেন না, বাবা?" স্নিগ্ধ স্বরে কমলা জিজ্ঞেস করলো।

"এখানে বসে থাকলেই নানা ভাবনা মাথার মধ্যে এসে ঢোকে, বউমা। বুড়ো-বয়সে কিছু করবার ক্ষমতা থাকে না, কিন্তু ভাবনাটা রয়ে যায়। অথচ কী যে ভাবি, তা নিজেও অনেক সময় বুঝতে পারি না।"

"বাবা, বেশি রাত্রে স্নান করলে আপনার হাঁচি আসে। আপনি বরং ঠাণ্ডা জলে গা মুছে নিন," শ্বশুরকে কমলা প্রায় হুকুম করলো।

দ্বৈপায়ন জিজ্ঞেস করলেন, "মেজ বউমা কোথায়?"

"কাজলের মেজ সায়েব নাইজিরিয়াতে বদলী হয়ে যাচ্ছেন—তাই পার্টি আছে। ওরা দুজন একটু আগেই বেরুলো। ফিরতে হয়তো দেরি হবে।"

দ্বৈপায়ন বললেন, "বিলিতী অফিসের এই একটা দোষ। অনেক রাত পর্যন্ত পার্টি না করলে সায়েবরা খুশী হন না।"

কমলা শ্বশুরকে আশ্বাস দিলো, "এবার কমে যাবে। কারণ, নতুন মেজ সায়েব ইণ্ডিয়ান।"

"কী নাম?" দ্বৈপায়ন জিজ্ঞেস করলেন।

"মিস্টার চোপরা, বোধহয়," কমলা জানালো।

"ওরে বাবা! তাহলে বলা যায় না, হয়তো বেড়েও যেতে পারে।"

কমলা বললো, "সিধু নাপিতকে কাল আসতে বলে দিয়েছি, বাবা! অনেকদিন আপনার চুল কাটা হয়নি।"

"কালকে কেন? পরশু বললেই পারতে," দ্বৈপায়ন মৃদু আপত্তি জানালেন।

"পরশু যে আপনার জন্ম বার," কমলা মনে করিয়ে দিলো। জন্ম বারে যে চুল ছাঁটতে নেই, এটা শাশুড়ীর কাছে সে অনেকবার শুনেছে।

দ্বৈপায়ন নিজের মনেই হাসলেন। তারপর বললেন, "চুল ছাঁটার কথা বলে ভালই করেছো, বউমা। ঠিক সময়ে চুল ছাঁটা না হলে তোমার শাশুড়ী ভীষণ চটে উঠতেন।"

মুখ টিপে হাসলো কমলা। শ্বশুর-শাশুড়ীর অনেক ঝগড়া সে নিজের চোখে দেখেছে এবং নিজের কানে শুনেছে। শাশুড়ী রেগে উঠলে বলতেন, "যদি আমার কথা না শোনো তাহলে রইলো তোমার সংসার। আমি চললাম।"

শ্বশুরমশায় বলতেন, "যাবে কোথায়?"

শাশুড়ী ঝাঁঝিয়ে উঠতেন, "তাতে তোমার দরকার? যেদিকে চোখ যায় সেদিকে চলে যাবো।"

বাবার কী সেসব কথা মনে পড়ছে? নইলে উনি অমন অসহায়ভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন কেন? মায়ের কথা ভেবে বাবা রাতের নক্ষত্রের দিকেই তাকিয়ে থাকেন।

দ্বৈপায়ন নিজেকে শান্ত করে নিলেন। তারপর সস্নেহে বললেন, "ভোম্বলের কোনো খবর পেলে?"

স্বামী ট্যুরে গিয়েছেন বোম্বাইতে। কমলা বললো, "আজই অফিস থেকে খবর পাঠিয়েছেন। টেলেক্সে জানিয়েছেন, ফিরতে আরও দেরি হবে। হেড অফিসে কী সব জরুরী মিটিং হচ্ছে।"

দ্বৈপায়ন বললেন, "হয়তো ওর প্রমোশনের কথা হচ্ছে। টেকনিক্যাল ডিভিসনের ডেপুটি ম্যানেজার হলে তো অনেক বেশি দায়িত্ব নিতে হবে।"

কমলা চুপ করে রইলো। দ্বৈপায়ন বললেন, "জানো বউমা, আই অ্যাম প্রাউড অফ ভোম্বল। ওর জন্যে কোনোদিন একটা প্রাইভেট টিউটর পর্যন্ত আমি রাখিনি। নিজেই পড়াশুনা করেছে, নিজেই আই-আই-টিতে ভর্তি হয়েছে, নিজেই ফ্রি স্টুডেন্টশিপ যোগাড় করেছে, তারপর চাকরিটাও নিজের মেরিটে পেয়েছে। এগারো বছর আগে যখন তোমার সঙ্গে বিয়ের সম্পর্ক হলো, তখনও ভোম্বল ছিল একজন অর্ডিনারি টেকনিক্যাল অ্যাসিসট্যান্ট। আর চল্লিশে পা দিতে-না-দিতে ডেপুটি ম্যানেজার।"

হঠাৎ চুপ করে গেলেন দ্বৈপায়ন। তিনি কি ভাবছেন কমলা তা সহজেই বলতে পারে। সোমনাথের কথা চিন্তা করে তিনি যে হঠাৎ বিমর্ষ হয়ে পড়েছেন তা কমলা বুঝতে পারছে। যোধপুর পার্কের এই বাড়ির একটা

ভবিষ্যৎ কল্পনাচিত্র যে দ্বৈপায়নের মনে মাঝে-মাঝে উঁকি মারে তা কমলার জানা আছে।

ছবিটা এইরকম। ভোম্বল বোম্বাই বদলি হয়েছে। বউমাকেও স্বামীর সঙ্গে যেতে হয়েছে। যাবার আগে সে বাবাকে নিয়ে যাবার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছে। বাবা রাজী হননি। কাজলও বদলি হয়েছে আমেদাবাদে। আর মেজ বউমা (বুলবুল) তো স্বামীর সঙ্গে যাবার জন্যে এক-পা বাড়িয়েই আছে। তখন এ-বাড়িতে কেবল দ্বৈপায়ন এবং সোমনাথ।

বড় বউমার দিকে অসহায়ভাবে তাকালেন দ্বৈপায়ন। কিন্তু কোনো কথা বললেন না। সঞ্চয় বলতে তাঁর বিশেষ কিছুই নেই—মাত্র হাজার দুয়েক টাকা। আর পেনসন, সে তো তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই শেষ হয়ে যাবে। তারপর সোমনাথ কী করবে? এ-বাড়িটাও তাঁর নিজস্ব নয়। দোতলা করবার সময় ভোম্বল ও কাজল দুজনেই কিছু-কিছু টাকা দিয়েছে। কাজলের মাইনে থেকে এখনও কো-অপারেটিভের ঋণের টাকা মাসে-মাসে কাটছে।

কমলা বললো, "বাবা আপনাকে একটু হরলিক্স এনে দেবো? আপনাকে আজ বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে।"

দ্বৈপায়ন নিজের ক্লান্তি অস্বীকার করতে পারলেন না। বললেন, "কিছুই করি না তবু আজকাল মাঝে-মাঝে কেন যে এমন দুর্বল হয়ে পড়ি।"

কমলা বললো, "আপনি যে কারুর কথা শোনেন না, বাবা। দিনরাত খোকনের জন্যে চিন্তা করেন।"

দ্বৈপায়ন একটু লজ্জা পেলেন। মনে হলো পুত্রবধূর কাছে তিনি ধরা পড়ে গিয়েছেন।

কমলার মধ্যে কি মধুর আত্মবিশ্বাস। সে বললো, "আপনি শুধু-শুধু ভাবেন ওর জন্যে। আমার কিন্তু একটুও চিন্তা হয় না। অত ভাল ছেলের ওপর ভগবান কখনও নির্দয় হতে পারেন না।"

বার্ধক্যের প্রান্তরে দাঁড়িয়ে দ্বৈপায়ন যদি বত্রিশ বছর বয়সের বউমার অর্ধেক বিশ্বাসও পেতেন তাহলে কি সুন্দর হতো। লক্ষ্মী-প্রতিমার মতো বউমার প্রশান্ত মুখের দিকে তাকালেন দ্বৈপায়ন।

ধীর শান্ত কণ্ঠে কমলা বললো, "ওঁর প্রমোশন অত তাড়াতাড়ি হচ্ছে বলে মনে হয় না। আর হলেও, খোকনের বিয়ে না দিয়ে আমি কলকাতা ছাড়ছি না।"

অনেক দুঃখের মধ্যেও দ্বৈপায়নের হাসি আসছে। ভাবলেন, একবার বউমাকে মনে করিয়ে দেন—রুজি-রোজগার না থাকলে কোনো ছেলের বিয়ের

কথা ভাবা যায় না। আড়াই বছর ধরে সোমনাথ চাকরির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অনেক অ্যাপ্লিকেশন তিনি নিজে লিখে দিয়েছেন। প্রতিদিন তিনখানা করে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন তিনি তন্ন তন্ন করে দেখেন। সেগুলোতে লাল পেন্সিলে দাগ দেন প্রথমে। তারপর ব্লেড দিয়ে নিখুঁতভাবে কেটে পিছনে কাগজের নাম এবং তারিখ লিখে রাখেন।

দ্বৈপায়নের মনে পড়ে গেলো আজকের খবরের কাগজের কাটিংগুলো ওঁর কাছেই পড়ে আছে। কাটিংগুলো বউমার হাতে দিয়ে বললেন, "সোমকে এখনই দিয়ে দাও।"

বাবার উদ্বেগের কথাও বউমা জানে। আগামীকাল ভোরবেলায় বউমাকে জিজ্ঞেস করবেন, "কাটিংগুলো খোকনকে দিয়েছো তো? ও যেন বসে না থাকে। তাড়াতাড়ি অ্যাপ্লিকেশন পাঠিয়ে দেওয়া ভাল। দুটো অ্যাপ্লিকেশনে আবার পাঁচ টাকার পোস্টাল অর্ডার চেয়েছে।"

কমলা জানে সোমকে ডেকে সোজাসুজি এসব কথা বলতে আজকাল বাবা পারেন না। দুজনেই অস্বস্তি বোধ করে। অনেক সময় বাবা ডাকলেও সোম যেতে চায় না। যাচ্ছি-যাচ্ছি করে একবেলা কাটিয়ে দেয়। কমলাকে দু'পক্ষের মধ্যে ছুটোছুটি করতে হয়। কমলা বললো, "সোমকে আমি সব বুঝিয়ে বলে দিচ্ছি। পোস্টাল অর্ডারের টাকাও তো ওর কাছে দেওয়া রয়েছে।"

দ্বৈপায়ন তবুও নিশ্চিত হতে পারলেন না। ওঁর ইচ্ছে, সোমনাথ নাইট পোস্টাপিস থেকে এখনই পোস্টাল অর্ডার কিনে আনুক এবং আধ ঘণ্টার মধ্যে অ্যাপ্লিকেশন টাইপ হয়ে যাক, যাতে কাল সকালেই রেজেস্ট্রি ডাকে পাঠানো যায়।

কমলা বাবাকে শান্ত করবার জন্যে বললো, "দরখাস্ত নেবার শেষ দিন তো তিন সপ্তাহ পরে।"

নিজের অস্বস্তি চেপে রেখে দ্বৈপায়ন বললেন, "তুমি জানো না, বউমা আজকাল ডাকঘরের যা অবস্থা হয়েছে, গিয়ে দেখবে পাঁচ টাকার পোস্টাল অর্ডার ফুরিয়ে গেছে। তারপর রেজেস্ট্রি ডাকের তো কথাই নেই। তিন ঘণ্টার পথ যেতে তিন সপ্তাহ লাগিয়ে দেয়। যারা চাকরির বিজ্ঞাপন দেয় তারাও ছুতো খুঁজছে। লাস্ট ডেটের আধঘণ্টা পরে চিঠি এলেও খুলে দেখবে না— একেবারে ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে ফেলে দেবে।"

নিজের ইচ্ছে যাই হোক, বউদির অনুরোধ এড়ানো যায় না। কমলা বউদি সোমনাথকে বললেন, "লক্ষ্মীটি সকালবেলাতেই পোস্টাপিসে অ্যাপ্লিকেশনটা

রেজেস্ট্রি করে এসো—বাবা শুনলে খুশী হবেন। বুড়ো মানুষ, ওঁকে কষ্ট দিয়ে কী লাভ?"

চিঠি ও খাম টাইপ করিয়ে সোমনাথ পোস্টাপিসের দিকে যাচ্ছিলো। পোস্টাল অর্ডার কিনে ওখান থেকেই সোজা পাঠিয়ে দেবে।

পোস্টাপিসের কাছে সুকুমারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। সুকুমার চিৎকার করে বললো, "কী হে নবাব বাহাদুর, সকালবেলায় কোথায় প্রেমপত্তর ছাড়তে চললে?"

সোমনাথ হেসে ফেললো? "তোর কী ব্যাপার? দু-তিনদিন পাত্তা নেই কেন?"

"তুমি তো মিনিস্টারের সি-এ নও যে তোমার সঙ্গে আড্ডা জমাতে পারলে চাকরি পাওয়া যাবে। নিজের মাথার ব্যথায় পাগল হয়ে যাচ্ছি। রাইটার্স বিল্ডিংসের ভিতরে ঢোকা আজকাল যা শক্ত করে দিয়েছে মাইরি, তোকে কী বলবো!"

"মিনিস্টারের সি-এরাই হয়তো চায় না বাজে লোক এসে জ্বালাতন করুক," সোমনাথ বললো।

"সে বললে তো চলবে না, বাবা। মিনিস্টারের সি-এ যখন হয়েছো, তখন লোকের সঙ্গে দেখা করতেই হবে। বিশেষ করে আমাদের মতো যারা এম-এল-এর থ দিয়ে এসেছে তাদের এড়িয়ে যেতে পারবে না।"

সুকুমার এবার বললো, "চল তোর সঙ্গে পোস্টাপিসে ঘুরে আসি। ভয় নেই তোর অ্যাপ্লিকেশনে ভাগ বসাতে যাচ্ছি না। তুই যেখানে খুশী চিঠি পাঠা, আমি বাগড়া দেবো না।"

এবার সুকুমার বললো, "তোকে কেন মিথ্যে বলবো, গত দু-দিন জি-পি-ওর সামনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চাকরির সাইক্লোস্টাইল করা ফর্ম বেচে টু-পাইস করেছি। কেরানির পোস্ট তো, হুড়-হুড় করে ফর্ম বিক্রি হচ্ছে মাইরি। এক ব্যাটা কাপুর তাল বুঝে হাজার-হাজার ফর্ম সাইক্লোস্টাইল করে হোলসেল রেটে বাজারে ছাড়ছে। টাকায় দশখানা ফর্ম কিনলুম কাপুরের কাছ থেকে, আর বিক্রি হলো পনেরো পয়সা করে। তিরিশখানা ফর্ম বেচে পুরো দেড়টাকা পকেটে এসে গেলো।"

"কাপুর সায়েব তো ভাল বুদ্ধি করেছে," সোমনাথ বললো।

সুকুমার বললো, "এদিকে কিন্তু কেলেংকেরিয়াস কাণ্ড। বাজারে কেউ জানে না—মিনিস্টারের সি-এর সঙ্গে দেখা না করতে গেলে আমার কানেও আসতো না। পাঁচজোড়া পোস্টের জন্যে ইতিমধ্যে এক লাখ অ্যাপ্লিকেশন জমা-

পড়েছে। সেই নিয়ে ডিপার্টমেন্টে প্রবল উত্তেজনা। টপ অফিসার দুবার মিনিস্টারের পি-এর সঙ্গে দেখা করে গেলো।”

“তাহলে ওদের টনক নড়েছে। দেশের অবস্থা কোনদিকে চলছে ওরা বুঝতে পেরে ছোটাছুটি করছে,” সোমনাথ খবরটা পেয়ে কিছুটা আশ্বস্ত হলো।

“দূর, দেশের জন্যে তো ওদের ঘুম হচ্ছে না। ওরা নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত। এক লাখ অ্যাপ্লিকেশন ইতিমধ্যে এসে গেছে শুনে পি-এ বললেন, কীভাবে এর থেকে সিলেকশন করবেন?

“অফিসার বললেন, সিলেকশন তো পরের কথা। তার আগে আমি কী করবো তাই বলুন? প্রত্যেক অ্যাপ্লিকেশনের সঙ্গে তিন টাকার ক্রসড্ পোস্টাল অর্ডার এসেছে। তিন টাকার পোস্টাল অর্ডার হয় না, তাই মিনিমাম এক টাকার তিনখানা অর্ডার প্রত্যেক চিঠির সঙ্গে এসেছে। তার মানে এক লাখ ইনটু থ্রি অর্থাৎ তিন লাখ ক্রসড্ পোস্টাল অর্ডারের পিছনে আমাকে সই করতে হবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা দেবার আগে। সব কাজ বন্ধ করে, দিনে পাঁচশোখানা সই করলেও আমার আড়াই বছর সময় লেগে যাবে। অথচ ফাইনানসিয়াল ব্যাপার, সই না করলেও অডিট অবজেকশনে চাকরি যাবে।”

হা-হা করে হেসে উঠলো সুকুমার। বললো, “লোকটার মাইরি, পাগল হবার অবস্থা। বলছে, হোল লাইফে কখনও এমন বিপদে পড়েনি।”

“কোন ডিপার্টমেন্ট রে?” সোমনাথ জিজ্ঞেস করলো। তারপর উত্তরটা শুনেই ওর মুখ কালো হয়ে গেলো। ওই পোস্টের জন্যেই আরো তিন টাকার পোস্টাল অর্ডার কিনতে যাচ্ছে সে।

সুকুমার বললো, “তোর তিনটে টাকা জোর বেঁচে গেলো। ওই টাকায় ফুটবল খেলা দেখে, বাদাম ভাজা খেয়ে আনন্দ করে নে।”

খেলার মাঠের নেশাটা সোমনাথের অনেকদিনের। সুকুমারও ফুটবল পাগল। দুজনে অনেকবার একসঙ্গে মাঠে এসেছে। সোমনাথ বললো, “চল মাঠেই যাওয়া যাক।” সুকুমারের আত্মসম্মান জ্ঞান টনটনে। সে কিছুতেই সোমনাথের পয়সায় মাঠে যেতে রাজী হলো না।

সোমনাথের হঠাৎ অরবিন্দর কথা মনে পড়ে গেলো। সুকুমারকে বললো, “শুনেছিস, রত্নার সঙ্গে অরবিন্দর বিয়ে। বাড়িতে একটা কার্ড রেখে গেছে।”

সুকুমার বললো, “আমাকেও একটা কার্ড পাঠিয়েছে ডাকে। শুভবিবাহ মার্কা কার্ড দেখে বাড়িতে আবার কতরকম টিপ্পনী কাটলো। ভেবেছিলুম, অরবিন্দর বিয়েতে যাবো—হাজার হোক বর কনে দুজনেই আমার ফ্রেণ্ড।

কিন্তু বিয়ে মানেই তো বুঝতে পারিস।"

সোমনাথ চুপ করে রইলো। সুকুমার বললো, "আমি ভেবেছিলুম, খালি হাতেই একবার দেখা করে আসবো। সেই শুনে আমার বোনদের কি হাসি। বললো, 'তোর কি লজ্জা শরম কিছুই রইলো না দাদা? লুচি মাংস খাবার এতোই লোভ যে শুধু হাতে বিয়ে বাড়ি যেতে হবে?' "

সোমনাথের বোন নেই। সুতরাং বোনদের সঙ্গে ভাইদের কী রকম রেষারেষির সম্পর্ক হয় তা সে জানে না।

সুকুমার বললো, "কণাকেও দোষ দিতে পাবি না। ওর বন্ধুর বিয়েতেও নেমন্তন্নের চিঠি এসেছিল। উপহার কিনতে পারা গেলো না, তাই বেচারা যেতে পারলো না।"

সোমনাথ বললো, "অরবিন্দ ছেলেটার ক্রেডিট আছে বলতে হবে। বেস্ট-কীন-রিচার্ডসের মতো কোম্পানিতে ঢুকেছে।"

সোমনাথের কথা শুনে সুকুমার ফিক করে হেসে ফেললো। "ক্রেডিট ওর বাবার। আয়রন স্টীল কনট্রোলে বড় চাকরি করেন—ঝোপ বুঝে কোপ মেরেছেন।"

একটু থেমে সুকুমার বললো, "তবে ভাই আমার রাগ হয় না।"

"কেন?" সোমনাথ জিজ্ঞেস করলো।

"ওদের ব্যাচে বারোজন ম্যানেজমেণ্ট ট্রেনি নিয়েছে—তার মধ্যে অরবিন্দই একমাত্র লোকাল বয়। আর সব এসেছে হরিয়ানা, পাঞ্জাব এবং তামিলনাড়ু থেকে। সব ভাগ্যবানের পিছনে হয় মামা না-হয় বাবা আছেন! অথচ অরবিন্দ বলছিল, 'কোনো ব্যাটা স্বীকার করবে না যে দিল্লীতে বড়-বড় সরকারী পোস্টে ওদের আত্মীয়স্বজন আছেন।। সবাই নাকি নিজেদের বিদ্যে বুদ্ধি এবং মেরিটের জোরে বেস্ট-কীন-রিচার্ডসে ঢুকেছে! কলকাতার ছেলেদের তো কোনো মেরিট নেই!' জানিস সোমনাথ, এই বেস্ট-কীন-রিচার্ডস যেদিন ঝুনঝুনওয়ালা কিংবা বাজোরিয়ার হাতে যাবে, সেদিন দেখবি সমস্ত মেরিট আসছে রাজস্থানে ওঁদের নিজেদের গ্রাম থেকে।"

সোমনাথ ও সুকুমার দুজনেই গম্ভীর হয়ে উঠলো। তারপর একসঙ্গে হঠাৎ দুজনেই হেসে উঠলো। সুকুমার বললো, "আমরা আদার ব্যাপারী জাহাজের খোঁজ করে মাথায় রক্ত তুলছি কেন? আমরা তো অফিসার হতে চাইছি না। আমরা কেরানির পোস্ট চাইছি। আর আমার যা অবস্থা, আমি বেয়ারা হতেও রাজী আছি।"

আজকাল বাবাকে দেখলে কমলার কষ্ট হয়। ওপরের ওই বারান্দায় বসে অসহায়ভাবে ছটফট করেন ছোট ছেলের জন্যে।

আরামকেদারায় সোজাভাবে বসে দ্বৈপায়ন বললেন, "জানো বউমা, যে-কোনো একটা চাকরি হলেই আমি সন্তুষ্ট। খোকনের একটা স্থিতি প্রয়োজন।"

কমলা গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে বললো, "নিশ্চয় স্থিতি হবে বাবা।"

"কোনো লক্ষণ তো দেখছি না, মা," গভীর দুঃখের সঙ্গে বললেন দ্বৈপায়ন।

চোখের চশমাটা খুলে সামনের টেবিলে রেখে দ্বৈপায়ন বললেন, "যার দাদারা ভাল চাকরি করে, তার পক্ষে একেবারে সাধারণ হওয়া বড্ড যন্ত্রণার। খোকন সেটা বোঝে কি না জানি না, কিন্তু আমার খুব কষ্ট হয়।"

কমলা অনেকবার ভেবেছে, দাদারা নিজেদের অফিসে সোমের জন্যে একটু চেষ্টা করে দেখলেই পারে। আজ শ্বশুরের কাছে সেই প্রস্তাব তুললো কমলা।

দ্বৈপায়ন বললেন, "কথাটা যে আমার মাথায় আসেনি তা নয়। ভোম্বল এবং কাজল দুজনকেই খোঁজখবর করতে বলেছিলাম। কিন্তু উপায় নেই, নিজের ভাইকে অফিসে ঢুকোলে ইউনিয়ন হৈ-চৈ বাধাবে। ভোম্বলের অফিসে তো বড় সায়েব গোপন সার্কুলার দিয়েছেন, কোনো অফিসারের আত্মীয়কে চাকরিতে ঢোকাতে হলে তাঁর কাছে পেপার পাঠাতে হবে। সোজাসুজি বলে দিয়েছেন ব্যাপারটা তিনি মোটেই পছন্দ করেন না।"

"দুই ভাই যদি গুণের হয়? তবু তারা এক অফিসে জায়গা পাবে না?" কমলা বড় সায়েবের সঙ্গে ঠিক একমত হতে পারলো না।

দ্বৈপায়ন বললেন, "তা হলেও নয়। সায়েবদের ধারণা, একই পরিবারের বেশি লোক একই অফিসে ঢুকলে নানা সমস্যা দেখা দেয়।"

কমলার তবু ভাল লাগছে না। সে বললো, "একই পরিবারের লোক এক অফিসে থাকলে বরং সুবিধে। এ ওকে দেখবে।"

হাসলেন দ্বৈপায়ন। বললেন, "বউমা, কর্মস্থল এবং ফ্যামিলি এক নয়, তুমি ভোম্বলকে জিজ্ঞেস করে দেখো।"

কমলা কিছুতেই একমত হতে পারছে না। সে বললো, "কেন বাবা? ওঁদের অফিস থেকে যে হাউস-ম্যাগাজিন আসে তাতে যে প্রত্যেক সংখ্যায় লেখা হয়, কোম্পানিও একটা পরিবার। প্রত্যেকটি কর্মচারি এই পরিবারের লোক।"

হাসলেন দ্বৈপায়ন। "ওটা সত্যি কথা নয়, বউমা। নাম-কা-ওয়াস্তে বলতে হয়, তাই বড় কর্তারা বলেন। কিন্তু কেউ বিশ্বাস করেন না। ভোম্বল একটা বই এনে দিয়েছিল, তাতে পড়েছিলাম—অফিসটা হলো পরিবারের উল্টো। অফিসে আদর্শের কোনো দাম নেই—সেখানে যে ভাল কাজ করে, যে বেশি লাভ দেখাতে পারে তারই খাতির। সে লোকটা মানুষ হিসেবে কেমন তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। অথচ ফ্যামিলিতে মনুষ্যত্বের দামটাই বেশি দেবার চেষ্টা করি আমরা। দয়া মায়া স্নেহ মমতা এসবের কোনো স্বীকৃতি নেই অফিসে। যে ভুল করে, দোষ করে, নিয়ম ভাঙে, ঠিক মতো প্রোডাকশন দেয় না, কর্মক্ষেত্রে তাকে নির্দয়ভাবে শাসন করতে হয়—সংসারে কিন্তু তা হয় না। অফিসে যে ভাল কাজ করে তার দাম। বাড়িতে কোনো ছেলে পরীক্ষায় ফেল করলেও তার ওপর ভালবাসা কমে যায় না। বরং অনেক সময় ভালবাসা বাড়ে।"

কমলা এতো বুঝতো না। সে সবিস্ময়ে সরল মনে বললো, "তাহলে পরিবারটাই তো অনেক ভাল জায়গা, বাবা।"

দ্বৈপায়ন হাসলেন। "সে-কথা বলে। সংসারটাই তো আমাদের আশ্রয়—সংসারের ভালর জন্যেই তো লোকে অফিসে যায়।"

কমলা বললো, "অফিসে তো যাইনি, তাই ব্যাপারটা কখনও বুঝিনি বাবা।"

"অনেকে সারাজন্ম অফিস গিয়েও ব্যাপারটা বোঝে না, মা। সংসারের মূল্যও তারা জানে না।"

কমলা তার পদ্মের মতো চোখ দুটো বড়-বড় করে বিস্ময়ে শ্বশুরের দিকে তাকিয়ে থাকে। দ্বৈপায়ন বললেন, "ভোম্বলকে বোলো তো বইটা আবার নিয়ে আসতে। আর একবার উল্টে দেখবো, তুমিও পড়ে নিও। একটা কথা আমার খুব ভাল লেগেছিল—আমাদের এই সমাজটাও এক ধরনের অরণ্য। ইট-কাঠ-পাথর দিয়ে তৈরি এই অরণ্যে জঙ্গলের নিয়মই চালু রয়েছে। এরই মধ্যে পরিবারটা হলো ছোট্ট নিরাপদ কুঁড়েঘরের মতো। এখান থেকে বেরোলেই সাবধান হতে হবে; সবসময় মনে রাখতে হবে আমরা মানুষের জঙ্গলে বিচরণ করছি।"

হতাশ হয়ে পড়লো কমলা। "তাহলে বলছেন, ভাইদের অফিসে সোমের কোনো আশা নেই?"

দুঃখের সঙ্গেই দ্বৈপায়ন স্বীকার করলেন, "কোনো সম্ভাবনাই নেই। এবং চেষ্টা করাও ঠিক হবে না, কারণ তাতে দুই দাদার কাজের ক্ষতি হতে পারে।"

দ্বৈপায়ন এবার বাথরুমে গা মুছবার জন্যে ঢুকলেন। কমলা সেই ফাঁকে দ্রুত এক গ্লাস হরলিক্‌স তৈরি করে নিয়ে এলো।

ঠাণ্ডা জলের সংস্পর্শে এসে দ্বৈপায়ন এবার বেশ তাজা অনুভব করছেন। শরীরের অবসাদ নষ্ট হয়েছে।

কমলা উঠতে যাচ্ছিলো। দ্বৈপায়ন বললেন, "রান্না তো শেষ হয়ে গিয়েছে?"

"খাবার লোক তো এবেলায় কম। নগেনদি কেবল রুটিগুলো সেঁকছেন," কমলা জানালো।

দ্বৈপায়নের ইচ্ছে বউমা আরও একটু বসে যায়। বললেন, "তোমার যদি অসুবিধে না হয়, তাহলে আরও একটু বসো না, বউমা।"

বাবার মন বোঝে কমলা। বউমার সঙ্গেই একমাত্র তিনি সহজ হতে পারেন। আর সবার সঙ্গে কথা বলার সময় কেমন যেন একটা দূরত্ব এসে যায়। এই দূরত্ব কীভাবে গড়ে উঠেছে কেউ জানে না। ছেলেরা কাছে এসে তাঁর কথা শুনে যায়, কিছু খবর দেবার থাকলে দেয়, কিন্তু সহজ পরিবেশটা গড়ে ওঠে না। কমলা বাবাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে, কিন্তু প্রয়োজন হলে প্রশ্ন তোলে। আর বাবারও যে বউমার ওপর বেশ দুর্বলতা আছে তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। বউমা প্রশ্ন করলে রাগ তো দূরের কথা তিনি খুশী হন। ছেলেদের অত সাহস নেই। তারা প্রতিবাদও করে না, প্রশ্নও করে না। তবে তারা বাবার অবাধ্যও হয় না।

কমলা বললো, "বাবা, আপনি দুবেলা বেড়াতে বেরোবেন।"

"বেশ তো আছি, বউমা। এখানে বসে-বসেই তো পৃথিবীর অনেকটা দেখতে পাচ্ছি," দ্বৈপায়ন সস্নেহে উত্তর দেন। তারপর একটু থেমে বললেন, "আজকাল হাঁটতে ভাল লাগে না। বয়স তো হচ্ছে।"

"আপনার কিছুই বয়স হয়নি," মৃদু বকুনি লাগালো কমলা। "আপনার বন্ধু দেবপ্রিয়বাবু তো আপনার থেকে ছ'মাস আগে রিটায়ার করেছেন। সকাল থেকে টোটো করছেন, তাস খেলছেন।"

"দেবুটা চিরকালই একটু ফচকে। তাসের নেশা অনেকদিনের। আমার আবার তাসটা মোটেই ভাল লাগে না," দ্বৈপায়ন বললেন।

ছোট মেয়ের মতো উৎসাহে কমলা বললো, "কাকীমা সেদিন দেবপ্রিয়বাবুকে খুব বকছিলেন। কাকাবাবু নাকি কোনো সিনেমা বাদ দেন না। আজকাল ম্যাটিনী শোতে হিন্দী বই পর্যন্ত লাইন দিয়ে দেখে আসেন একা-একা।"

গম্ভীর দ্বৈপায়ন এবার হাসি চাপতে পারলেন না। বললেন, "দেবু তাহলে বুড়ো বয়সে হিন্দী ছবির খপ্পরে পড়লো। বউকে নিয়ে গেলেই পারে—তাহলে

বাড়িতে আর অশান্তি হয় না।"

"দোষটা তো কাকাবাবুর নয়," কমলা জানায়। "কাকীমা যে ঠাকুর-দেবতার বই ছাড়া দেখতে যাবেন না।"

এই ধরনের কথাবার্তা বাবার সঙ্গে এ-বাড়ির কেউ বলতে সাহস করবে না।

বাবা যে আবার সোমনাথ সম্পর্কে চিন্তা আরম্ভ করেছেন তা কমলা ওঁর মুখের ভাব দেখেই বুঝলো।

দ্বৈপায়ন জিজ্ঞেস করলেন, "খোকন কোথায় ?"

সোমনাথ এখনও ফেরেনি শুনে প্রথমে একটু বিরক্তি এলো দ্বৈপায়নের। ভাবলেন, কোনো দায়িত্ব জ্ঞান নেই—বেশ টো-টো করে ঘুরছে। তারপর নিজেকে সামলে নিলেন। ঘোরা ছাড়া ওর কী-ই বা করবার আছে ?

ঠিক সময়ে সোমনাথ বাড়ি ফিরলে দ্বৈপায়ন তবু একটু নিশ্চিন্ত হতে পারেন। আজকাল যেরকম খুনোখুনীর যুগ পড়েছে, তাতে মাঝে-মাঝে দুশ্চিন্তা হয় দ্বৈপায়নের। কয়েকবছর আগে সমর্থ মেয়েদেরই একলা বাইরে বেরুতে দিতে ভয় করতো বাবা-মায়েরা। এখন জোয়ান ছেলেদের নিয়ে বেশি চিন্তা। গোপনে-গোপনে এদের মনের মধ্যে কখন কীসের চিন্তা আসবে কে জানে। তারপর রাজনীতির নেশায় দলে পড়ে, সমাজের ওপর বিরক্ত হয়ে, কী করে বসবে কে জানে ? দ্বৈপায়ন ভাবলেন, আত্মহনন ছাড়া এযুগের অভিমানী ছেলেগুলো অন্য কিছুই জানে না।

কমলা এবার শ্বশুরের চিন্তা নিরসন করলো। বললো, "সোমের বন্ধু অরবিন্দর বৌভাত আজ। যেতে চাইছিল না। আমি জোর করে পাঠিয়েছি।"

"অরবিন্দ তাহলে কাজ পেয়েছে ? পড়াশুনোয় ও তো খুব ভাল ছিল না ?" দ্বৈপায়ন নিজের মনেই বললেন।

"ওর বাবা চেষ্টা করে কোন বড় অফিসে ঢুকিয়ে দিয়েছেন, সোম বলছিল।"

দ্বৈপায়ন বউমার এই কথা শুনে অস্বস্তি বোধ করলেন। নিজের অক্ষমতাকে চাপা দেবার জন্যেই যেন সমস্ত দোষ সোমের ওপর চাপাবার চেষ্টা করলেন। বেশ বিরক্তির সঙ্গে বউমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কেন এমন হলো বলো তো ?"

কমলা উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলো।

দ্বৈপায়ন বললেন, "আমি তো কখনও পরীক্ষায় খারাপ করিনি। নিজের চেষ্টায় কম্পিটিশনে স্ট্যাণ্ড করে সরকারী কাজে ঢুকেছিলাম। ওর দাদাদের জন্যে কোনোদিন তো মাস্টার পর্যন্ত রাখিনি। তারা অত ভাল করলো। অথচ খোকন কেন যে অত অর্ডিনারি হলো ?"

কমলা শ্বশুরের সঙ্গে একমত হতে পারছে না। সোম মোটেই অর্ডিনারি

নয়। ওর বেশ বুদ্ধি আছে। কমলা বললো, "পরীক্ষাটা আজকাল পুরোপুরি লটারি, বাবা। সোমনাথ তো বেশ বুদ্ধিমান ছেলে।"

দ্বৈপায়ন ঠোঁট উল্টোলেন। "তুমি বলতে চাও, ওর ওপর এগজামিনারের রাগ ছিল?"

"তা হয়তো নয়। কিন্তু আজকাল কীভাবে যে পরীক্ষা-টরিক্ষা নেওয়া হয়। পরীক্ষকরাও বোঝেন না যে এর ওপর ছেলেমেয়েদের জীবন নির্ভর করছে।"

"এর মধ্যেই অনেকে ভাল রেজাল্ট করছে, বউমা।" দ্বৈপায়নের গলার স্বরে ছোট ছেলে সম্পর্কে ব্যঙ্গ ফুটে উঠলো।

ছোট দেওর সম্পর্কে কমলার একটু দুর্বলতা আছে। বিয়ের পর থেকে এতোদিন ধরে ছেলেটাকে দেখছে কমলা। দুজনে খুব কাছাকাছি এসেছে।

"ওর মনটা খুব ভাল বাবা," কমলা শান্তভাবে বললো।

"মন নিয়ে এ-সংসারে কেউ ধুয়ে খাবে না, বউমা," বিরক্ত দ্বৈপায়ন উত্তর দিলেন। "পড়াশোনায় ভাল না করলে, দুনিয়াতে কোনো দাম নেই।"

"পড়াশোনায় ভাল অথচ স্বভাবে পাজী এমন ছেলে আজকাল অনেক হচ্ছে, বাবা। তাদের আমার ভাল লাগে না," কমলা বললো। তার ঘোমটা খসে পড়েছিল, সেটা আবার মাথার ওপর তুলে নিলো।

"যে-গরু দুধ দেয় তার লাথি অনেকে সহ্য করতে রাজী থাকে, বউমা," দ্বৈপায়ন বিরক্তভাবেই উত্তর দিলেন।

"খোকন তো চেষ্টা করছে বাবা," কমলা ব্যর্থ চেষ্টা করলো শ্বশুরকে বোঝাবার।

"চেষ্টা নিয়ে সংসারে কী হবে? রেজাল্ট কী, তাই দিয়েই মানুষের বিচার হবে," দ্বৈপায়ন যে সোমনাথের ওপর বেশ অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছেন তা তাঁর কথা থেকেই বোঝা যাচ্ছে।

কিন্তু কমলা কী করে সোমনাথের বিরুদ্ধে মতামত দেয়? সোমনাথ তো কখনও বড়দের অবাধ্য হয়নি। বাড়ির সব আইনকানুন খোকন মেনে চলেছে। পড়ার সময় পড়তে বসেছে। অন্য কোনো দুষ্টুমির সঙ্গেও জড়িয়ে পড়েনি। গোড়ার দিকে সে তো পড়াশোনায় খারাপ ছিল না কিন্তু মা দেহ রাখার পর কী যে হলো। ক্রমশ সোমনাথ পিছিয়ে পড়তে লাগলো। সেকেণ্ড ডিভিসনে স্কুল ফাইনাল পাস করলো। বাবার ইচ্ছে ছিল এক ছেলে ইনজিনীয়ার, এক ছেলে চার্টার্ড অ্যাকাউনটেণ্ট এবং ছোট ছেলেকে ডাক্তার করবেন। কিন্তু ভাল নম্বর না-থাকলে ডাক্তারিতে ঢোকা যায় না।

কমলার মনে পড়লো, সোমনাথ একবার বউদিকে বলেছিল, "আমাকে অত

ভালবাসবেন না বউদি। আপনার বিশ্বাসের দাম তো আমি দিতে পারবো না। আমি সব বিষয়ে অর্ডিনারি।"

কমলা বলেছিল, "তোমাকে আর পাকামো করতে হবে না।"

সোমনাথ বলেছিল, "মায়ের রং কত ফর্সা ছিল আপনি তো দেখেছেন। দাদারা ফর্সা হয়েছে। আমার রং দেখুন—কালো। ভাগ্যে মেয়ে হইনি, তাহলে বাবাকে এই বাড়ি বিক্রি করতে হতো। পড়াশোনায় কখনও ফাঁকি দিইনি—কিন্তু অর্ডিনারি থেকে গেছি। অনেকে গান-বাজনা কিংবা খেলা-ধুলোয় ভাল হয়। আমার তাও হলো না।"

দুনিয়ার সব মানুষকে ব্রিলিয়ান্ট হতে হবে, এ কী রকম কথা? পৃথিবীর কোন দেশে ক'টা লোক ব্রিলিয়ান্ট হয়? বেশির ভাগ মানুষই তো অতি সাধারণ। কিন্তু তারা কেমন সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে রয়েছে। কমলা বুঝতে পারে না, এই দেশের কী হতে চলেছে। ব্রিলিয়ান্ট হোক না-হোক সোমকে খুব ভাল লাগে কমলার। ছেলেটা খুব নরম। ওর মনে নোংরামি নেই। অনেক বাড়িতে এক ভাই আরেক ভাইকে হিংসে করে। সোমের শরীরে হিংসে নেই। আর বউদিকে সে যে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে তা কমলা ভালভাবে জানে।

বাবাকে আবার বোঝাবার চেষ্টা করলো কমলা। বললো, "আজকালকার ছেলেদের সম্বন্ধে যা শুনি তার থেকে সোম অনেক ভাল। ওর মনটা এখনও সংসারের নোংরামিতে বিষিয়ে যায়নি বাবা।"

দ্বৈপায়ন বিশেষ ভিজলেন না। বললেন, "তোমার কাছে বলতে বাধা নেই, এক-এক সময় মনে হয়—কাউকে বেশি প্রোটেকশন দিতে নেই। বেশি সুখ, বেশি স্বাচ্ছন্দ্য, বেশি নিশ্চয়তার মধ্যে থাকলে অনেক সময় মানুষের ভিতরের আগুনটা জ্বলে ওঠবার সুযোগ পায় না। যাদের দেখবে প্রচণ্ড অভাব, প্রচণ্ড অপমান, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যাদের কোনো ভরসা নেই—তারা অনেক সময় নিজেদের দুঃখের শিকল নিজেরাই ছিঁড়ে ফেলে। তারা অপরের মুখ চেয়ে বসে থাকে না।"

কমলা বুঝতে পারলো বাবা কী বলতে চাইছেন। কিন্তু সব সময় কথাটা সত্যি নয়। সুকুমারকে তো বাবা চেনেন, তাহলে সে তো এতোদিন আশ্চর্য কিছু একটা করে ফেলতো।

কমলা এবার একতলায় নেমে এলো। তার ভয়, সোমনাথ এসব না জেনে ফেলে। রাগের মাথায় বাবা কোনোদিন না সোমনাথের সঙ্গেই এসব আলোচনা করে বসেন। বাইরের সমস্ত দুনিয়া তো বেচারাকে অপমান করছে, এর পর বাড়ির আত্মসম্মানটুকু গেলে ছেলেটা কোথায় দাঁড়াবে?

দ্বৈপায়নও একটু লজ্জা পেলেন। সত্যি, এই সব ছেলে যে এখনও সভ্যভব্য রয়েছে, এটা কম কথা নয়। সুযোগ সুবিধা না-পেয়ে ঘরে-ঘরে লক্ষ-লক্ষ ছেলে যদি উচ্ছন্নে চলে যায়, তাহলে সেও এক ভয়াবহ ব্যাপার হবে। সত্যিই তো সোমনাথের বিরুদ্ধে বেকারত্ব ছাড়া তাঁর আর কোনো অভিযোগ নেই। একটা চাকরি সে যোগাড় করতে পারেনি। কিন্তু আর কোনো কষ্ট সোমনাথ তো বাবাকে দেয়নি। আজকাল ছেলেপুলে সম্বন্ধে যেসব কথা কানে আসে, তারা যেসব কাণ্ড বাধিয়ে বসেছে, তাতে বাপ-মায়ের পাগল হয়ে যাওয়া-ছাড়া উপায় নেই।

গতকালই তো দ্বৈপায়ন শুনলেন, অনেক বেকার ছেলে বাড়িতে আজকাল চরম দুর্ব্যবহার করছে। তারা বাড়ির সব সুবিধে নিচ্ছে, অথচ চোখও রাঙাচ্ছে। তারা নিজেদের জামাকাপড় পযন্ত কাচে না, এক গ্লাস জল পর্যন্ত গড়িয়ে খায় না, বাড়ির কোনো কাজ করে না এবং বাড়ির কোনো আইন মানতেও তারা প্রস্তুত নয়। বাড়িটাকেও ওরা জঙ্গল করে তুলছে।

দ্বৈপায়ন ভাবলেন, এই সব ছেলে বাইরে হেরে গিয়ে, বাড়ির ভিতরে এসে যেন-তেন-উপায়ে জিততে চায়। এরা প্রত্যেকে এক একটা সাইকলজিক্ কেস। গতকালই তো নগেনবাবুর কথা শুনলেন। ওঁর বড় ছেলেটা মস্তান হয়েছে. সকাল সাড়ে-ন'টার আগে ঘুম থেকে ওঠে না। জলখাবার খেয়ে বাড়ি থেকে কেটে পড়ে। ভাত খাবার জন্যে ফিরে আসে তিনটের সময়। আবার বেরিয়ে পড়ে। ফেরে রাত এগারোটায়। বিড়ি সিগারেট টানে। বাবার পকেট থেকে টাকা চুরি করেছে। নগেনবাবু খুব বকুনি লাগিয়ে বলেছিলেন, "তোমাকে ছেলে বলে পরিচয় দিতে আমার লজ্জা হয়।" ছেলে সঙ্গে-সঙ্গে বলেছিল, "দেবেন না।" চরম দুঃখে নগেনবাবু বলেছিলেন. "এই জন্যেই বুঝি লোকে সন্তান কামনা করে?" ছোকরা এতোখানি বেয়াদপ, বাবার মুখের ওপর বলেছে, "ছেলের জন্ম হওয়ার পিছনে আপনার অন্য কামনাও ছিল, সন্তান একটা বাই প্রোডাক্ট মাত্র।"

ছেলের কথা শুনে নগেনবাবু শয্যাশায়ী হয়েছিলেন দু-দিন। এখনও লুকিয়ে-লুকিয়ে চোখের জল ফেলেন।

বউমাকে বলে দিলে হতো, খোকন যেন এদের কথাবার্তার কিছু জানতে না পারে। তারপর দ্বৈপায়ন ভাবলেন, বউমা বুদ্ধিমতী, ওকে সাবধান করবার প্রয়োজন নেই।

দুপুরের ক্লান্ত ঘড়িটা যে সাড়ে-তিনটের ঘরে ঢুকে পড়েছে তা সোমনাথ এবার বুঝতে পারলো। কমলা বউদি ঠিক এই সময় বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েন। প্রতিদিনের অভ্যাস মতো এই সময় কমলা বউদি বাড়ির লেটার বাক্সটা দেখেন। পিওন আসে তিনটে নাগাদ এবং তারপর থেকেই বাবা ছটফট করেন। মাঝে-মাঝে জিজ্ঞেস করেন, "চিঠিপত্তর কিছু এলো নাকি?" বাবার নামে প্রায় প্রতিদিনই কিছু চিঠিপত্তর আসে। চিঠি লেখাটা বাবার নেশা। দুনিয়ার যেখানে যত আত্মীয়স্বজন আছেন বাবা নিয়মিত তাঁদের পোস্টকার্ড লেখেন। তার ওপর আছেন অফিসের পুরানো সহকর্মীরা। রিটায়ার করবার পরে তাঁরাও দ্বৈপায়নের খোঁজখবর নেন।

সোমনাথেরও চিঠি পেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু বিদেশী এক এমব্যাসির বিনামূল্যে-পাঠানো একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা ছাড়া তার নামে বিশেষ কিছুই আসে না। এই পত্রিকা পাবার বুদ্ধিটাও সুকুমারের। দুখানা পোস্টকার্ডে দুজনের নামে চিঠি লিখে দিয়েছিল দিল্লীতে এমব্যাসির ঠিকানায়। বলেছিল, "পড়িস না-পড়িস কাগজটা আসুক। প্রত্যেক সপ্তাহে পত্রিকা এলে পিওনের কাছে সুকুমার মিত্তির নামটা চেনা হয়ে যাবে। আসল চাকরির চিঠি যখন আসবে তখন ভুল ডেলিভারি হবে না।"

এই সাপ্তাহিক পত্রিকা ছাড়া গত সপ্তাহে সোমনাথের নামে একটা চিঠি এসেছিল। বিশ্ববিখ্যাত কোম্পানির বিশেষ যন্ত্রে প্রতিদিন পাঁচ মিনিট দৈহিক কসরত করলে টারজানের মতো পেশীবহুল চেহারা হবে। ডাকযোগে মাত্র আশি টাকা দাম। বিফলে মূল্য ফেরত। বিজ্ঞাপনের চিঠি পেয়ে প্রথমে বিরক্তি লেগেছিল। তারপর সোমনাথের মন কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠলো। বম্বের কোম্পানি কষ্ট করে নাম-ঠিকানা জেনে চিঠি পাঠিয়ে তাকে তো কিছু সম্মান দিয়েছে। চাকরিতে ঢুকলে, সোমনাথ ওই যন্তর একটা কিনে ফেলবে—পয়সা জলে গেলেও সে দুঃখ পাবে না।

এ-ছাড়া সোমনাথের পাঠানো রেজিস্টার্ড অ্যাকনলেজমেণ্ট ডিউ ফর্মগুলো দু-তিনদিন অন্তর ফিরে আসে। নিজের হাতে লেখা নিজের নাম সোমনাথ খুঁটিয়ে দেখে। তলায় একটা রবার-স্ট্যাম্পে কোম্পানির ছাপ থাকে—তার ওপর একটা দুর্বোধ্য হিজিবিজি পাকানো রিসিভিং ক্লার্কের সই।

আজও কয়েকটা অ্যাকনলেজমেণ্ট ফর্ম ফিরেছে। সেই সঙ্গে সোমনাথের নামে একটা চিঠিও এসেছে। কয়েকদিন আগে বক্স নম্বরে একটা চাকরির-

বিজ্ঞাপনের উত্তর দিয়েছিল। তারাই উত্তর দিয়েছে। লিখেছে, অবিলম্বে ওঁদের কলকাতা প্রতিনিধি মিস্টার চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে। মিস্টার চৌধুরী মাত্র কয়েকদিন থাকবেন, সুতরাং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেখা করা উচিত।

ঠিকানাটা কীড্ স্ট্রীটের। সময় নষ্ট না-করে সোমনাথ বেরিয়ে পড়লো। বউদি জিজ্ঞেস করলেন, "বেরুচ্ছো নাকি?"

ফর্সা সাদা শার্ট প্যান্ট ও সেই সঙ্গে টাই দেখে কমলা বউদি আন্দাজ করলেন চাকরির খোঁজে বেরুচ্ছে সোমনাথ।

মনে-মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন, "ওর একটা চাকরি করে দাও ঠাকুর। বিনা অপরাধে ছেলেটা বড্ড কষ্ট পাচ্ছে।"

কমলার মনে পড়লো, কী আমুদে ছিল সোমনাথ। সবসময় হৈ চৈ করতো। বউদির পিছনেও লাগতো মাঝে-মাঝে! বলতো, "বউদি আপনাকে একদিন আমাদের কলেজে নিয়ে যাবো। মেয়েগুলোকে দেখলে, মডার্ন স্টাইল কাকে বলে আপনার ধারণা হয়ে যাবে। অফিসারের বউ হয়েছেন, কিন্তু আপনার গেঁয়ো স্টাইল পাল্টাচ্ছে না।"

কমলা হেসে বলতো, "আমরা তো সেকেলে, ভাই। তোমার বিয়ের সময় বরং দেখেশুনে আধুনিকা মেয়ে পছন্দ করে আনা যাবে।"

সোমনাথ বলতো, "আমরা নিজেদের পছন্দমতো বিয়ে করবো! কলেজের মেয়েগুলো তো আগে থেকেই ঠিক করে রাখছে, কাকে বিয়ে করবে।"

কমলা বলতো, "আমরাও তো কলেজে পড়েছি। তখন তো এমন ছিল না।"

সোমনাথ বলতো, "সেসব দিনকাল পাল্টেছে। এখন সব মেয়ে নিজের পছন্দমতো বিয়ে করতে চায়।"

কমলার জন্মদিনে সোমনাথ একবার কাগজের মুকুট তৈরি করেছিল। ঝলমলে রাঙতা লাগানো মুকুট বউদিকে পরতে বাধ্য করেছিল সে—তারপর ছবি তুলেছিল।

কাজলের সঙ্গে বুলবুলের বিয়ের প্রস্তাব এসেছিল যখন, তখন সোমনাথই গোপন তদন্তের দায়িত্ব পেয়েছিল। সহপাঠিনী সম্বন্ধে সোমনাথ বলেছিল, "দীপান্বিতার বেজায় ডাঁট। ওর সঙ্গে মেজদার বিয়েটা লাগলে বউদি বেশ হয়। ওর তেজ একেবারে মিইয়ে যাবে!"

•

সন্ধ্যের আগেই সোমনাথ ফিরে এলো। সে যখন শার্ট খুলছে তখনই কমলা ওর ঘরে ঢুকলো। সোমনাথের মুখে যেন একটু আশার আলো দেখা যাচ্ছে।

কীড্ স্ট্রীটের মিস্টার চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করেছে সোমনাথ। চাকরিটা সেল্‌স লাইনের। কলকাতার বাইরে-বাইরে ঘুরতে হবে। তাতে সোমনাথের মোটেই আপত্তি নেই। কিন্তু লোকটা কিছু টাকা চাইছে।

লোকটাকে অবিশ্বাস করতে পারতো সোমনাথ। কিন্তু খোদ এম-এল-এ গেস্ট হাউসে বসে ভদ্রলোক কথাবার্তা বললেন। সোমনাথের চোখে-মুখে দ্বিধার ভাব দেখে মিঃ চৌধুরী বললেন, "চারশ' টাকা মাইনের চাকরির জন্যে আড়াইশ' টাকা পেমেণ্ট আজকালকার দিনে কিছু নয়। রেল, পোস্টাপিস, ইলেকট্রিসিটি বোর্ডে চাকরি এখন নীলামে উঠছে। বহুলোক ছ'মাসের মাইনে সেলামী দিতে রাজী রয়েছে।"

সোমনাথের মনে যতটুকু সঙ্কোচ ছিল, কমলা তা কাটিয়ে দিলো। সে বললো, "বাবা শুনলে, হয়তো রেগে যাবেন। কড়া প্রিন্সিপ্যালের লোক - উনি এইসব ঘুষঘাষে রাজী হবেন না। কাজলকেও অতশত বোঝাতে পারবো না। কিন্তু সামান্য কয়েকটা টাকার জন্যে সুযোগটা ছেড়ে লাভ কী? আমার কাছে আড়াইশ' টাকা আছে।"

সংসার-খরচের টাকা থেকে লুকিয়ে বউদি যে টাকাটা দিচ্ছেন সোমনাথ তা বুঝতে পারলো। আগামীকাল কীড্ স্ট্রীটের এম-এল-এ কোয়ার্টারের সামনে লোকটার সঙ্গে দেখা করবে সোমনাথ। ভদ্রলোক চব্বিশ ঘণ্টার সময় দিয়েছেন।

প্রবল উত্তেজনার মধ্যে সময় কাটছে। মিস্টার চৌধুরী বলছেন, "এখন আড়াইশ' দিয়ে বিহারে পোস্টিং নিন, তারপর আরও আড়াইশ' খরচ দেবেন, কলকাতায় ট্রান্সফার করিয়ে দেবো।"

ভোরবেলার দিকে চাকরি পাবার স্বপ্ন দেখলো সোমনাথ। আড়াইশ' টাকা পকেটে পুরে মিস্টার চৌধুরী একটা ভাল চাকরির ব্যবস্থা করেছেন। তাই নিয়ে বাড়িতে চাপা আনন্দের উত্তেজনা। বাবা মুখে কিছু না বললেও, বেশ জোর গলায় বড় বউদিকে আর এক কাপ চায়ের হুকুম দিচ্ছেন। সোমনাথকে সামনে বসিয়ে অফিসের পলিটিকস সম্বন্ধে সাবধান থাকতে বলছেন। কী করে কর্মস্থানে সবার মনোহরণ করতে হয় সে সম্বন্ধে উপদেশ দিচ্ছেন।

ভূতপূর্ব কলেজবান্ধবী এবং বর্তমানে বউদি বুলবুলেরও খুব আনন্দ হয়েছে। বুলবুল বলছে, "কোনো কথা শুনছি না সোম—প্রথম মাসের মাইনে পেয়েই সায়েবপাড়ায় একখানা ইংরেজী সিনেমা দেখাতে হবে এবং ফেরবার পথে পার্ক স্ট্রীটে গোল্ডেন ড্রাগনে চাইনিজ ডিনার।" সোমনাথ রাজী হয়েও রসিকতা করছে, "পয়সা সস্তা পেয়েছো? সিনেমা দেখাবো, কিন্তু নো চাইনিজ ডিনার।" বুলবুল রেগে গিয়ে বলছে, "আমাকে খাওয়াবে কেন? তার বদলে যাকে নিয়ে

যাবে তার নাম আমি জানি না, এটা ভেবো না!"

চীনে রেস্তরাঁর দোতলায় নিয়ে যাবার সোমনাথের অন্য কেউ আছে এমন একটা সন্দেহ বুলবুল অনেকদিন থেকেই করছে। হাজার হোক কলেজে প্রতিদিন সোমনাথকে দেখেছে সে। আর এসব ব্যাপারে মেয়েদের সন্ধানী চোখ ইলেকট্রনিক রাডারকে হারিয়ে দেয়।

সোমনাথের চাকরিতে সবচেয়ে খুশী হয়েছেন কমলা বউদি। বউদি কিন্তু কিছুই চাইছেন না। মাঝে-মাঝে শুধু ছোট দেওরের পিঠে হাত দিয়ে বলছেন, "উঃ! যা ভাবনা হয়েছিল। আজই কালীঘাটে যেতে হবে আমাকে। কাউকে না-বলে পঞ্চাশ টাকা মানত করে বসে আছি।"

বুলবুল বললো, "নো ভাবনা দিদি! ঐ পঞ্চাশ টাকাও সোমের প্রথম মাসের মাইনে থেকে ডেবিট হবে।"

কিন্তু এসবই স্বপ্ন। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলো। কোথায় চাকরি? চাকরির ধারে-কাছে নেই সোমনাথ।

সকালবেলা বউদি চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলেন, "কখন যাবে? টাকাটা বার করে রেখেছি!"

টাকাটা পকেটে পুরে যথাসময়ে সোমনাথ বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলো।

সোমনাথ ফিরতে দেরি করছে কেন? কমলা অধীর আগ্রহে ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে। বিকেল গড়িয়ে সন্ধে নামলো। এখনও সোমনাথের দেখা নেই।

সাতটা নাগাদ সোমনাথ বাড়ি ফিরলো। ওর ক্লান্ত কালো মুখ দেখেই কমলার কেমন সন্দেহ হলো।

চিবুকে হাত দিয়ে সোমনাথ চুপচাপ বসে রইলো। বউদির দেওয়া টাকা নিয়ে সোমনাথ এম-এল-এ কোয়ার্টারে লোকটার সঙ্গে দেখা করেছিল। মিস্টার চৌধুরী নোটগুলো পকেটে পুরে সোমনাথকে ট্যাক্সিতে চড়িয়ে ক্যামাক স্ট্রীটের একটা বাড়ির সামনে নিয়ে গিয়েছিলেন। "আপনি বসুন, আমি ব্যবস্থাটা পাকা করে আসি," এই বলে লোকটা সেই যে বেপাত্তা হলো আর দেখা নেই। আরও পনেরো মিনিট ওয়েটিং ট্যাক্সিতে বসে থেকে তবে সোমনাথের চৈতন্য হলো, হয়তো লোকটা পালিয়েছে। ভাগ্যে পকেটে আরও একখানা দশ টাকার নোট ছিল। না-হলে ট্যাক্সির ভাড়াই মেটাতে পারতো না সোমনাথ।

বড় আশা করে বউদি টাকাটা দিয়েছিলেন। সব শুনে বললেন, "তুমি এবং আমি ছাড়া কেউ যেন না জানতে পারে।"

খুব লজ্জা পেয়েছিল সোমনাথ। সব জেনেশুনেও একেবারে ঠকে গেলো সোমনাথ। বউদি বললেন, "ওসব নিয়ে ভেবো না। ভাল সময় যখন আসবে তখন অনেক আড়াইশ' টাকা উসুল হয়ে যাবে।"

তবু অস্বস্তি কাটেনি সোমনাথের। বউদিকে একা পেয়ে কাছে গিয়ে বলেছিল, "খুব খারাপ লাগছে বউদি। আড়াইশ' টাকার হিসেব কী করে মেলাবেন আপনি?"

বউদি ফিসফিস করে বললেন, "তুমি ভেবো না। তোমার দাদার পকেট কাটায় আমি ওস্তাদ! কেউ ধরতে পারবে না।"

জানাজানি হলে ওরা দুজনেই অনেকের হাসির খোরাক হতো। এই কলকাতা শহরে এমন বোকা কেউ আছে নাকি যে চাকরির লোভে অজানা লোকের হাতে অতগুলো টাকা তুলে দেয়?"

নিজের ওপর আস্থা কমে যাচ্ছে সোমনাথের। পরের দিন দুপুরবেলায় বউদিকে একলা পেয়ে সোমনাথ আবার প্রসঙ্গটা তুলেছিল। "বউদি, কেমন করে অত বোকা হলাম বলুন তো?"

"বোকা নয়, তুমি আমি সরল মানুষ। তাই কিছু গচ্চা গেলো। তা যাক। মা বলতেন বিশ্বাস করে ঠকা ভাল।"

বউদির কথাগুলো ভারি ভাল লাগছিল সোমনাথের। কৃতজ্ঞতায় চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসছিল। বউদির এই স্নেহের দাম সে কীভাবে দেবে? বউদি কিন্তু স্নেহ দেখাচ্ছেন এমন ভাবও করেন না।

কিন্তু ঠকে যাবার অপমানটা ঘুরে-ফিরে সোমনাথের মনের মধ্যে এসেছে। এই কলকাতা শহরে এতো বেকার রয়েছে, তাদের মধ্যে সোমনাথই বা ঠকতে গেলো কেন?

এই ভাবনাতে সোমনাথ আরও দুর্বল হয়ে পড়তো, যদি-না দুদিন পরেই বেকার-ঠকানো এই জোচ্চোরটাকে গ্রেপ্তারের সংবাদ খবরের কাগজে বেরুতো। কীড্ স্ট্রীটে এম-এল-এ হোস্টেলের সামনেই লোকটা ধরা পড়েছিল। সোমনাথের লোভ হয়েছিল একবার পুলিশে গিয়ে জলঘোলা করে আসে, লোকটার আর-একটা কুকীর্তি ফাঁস করে দেয়। কিন্তু বউদি সাহস পেলেন না। দুজনে গোপন আলোচনার পরে, ব্যাপারটা চেপে-যাওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে হলো।

সোমনাথের আত্মবিশ্বাস কিছুটা ফিরে এসেছে। সোমনাথ একাই তাহলে ঠকেনি, আরও অনেকেই এই ফাঁদে পা দিয়েছে এবং সোমনাথের থেকে বেশি টাকা খুইয়েছে।

এবার বোধহয় মেঘ কাটতে শুরু করেছে। একখানা দরখাস্তের জবাব এসেছে। লিখিত পরীক্ষা হবে। নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা-ফি বাবদ দশ টাকা নগদ সহ চাকুরি প্রার্থীকে পরীক্ষার হল্-এ দেখা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পরের দিন ভোরবেলাতেই সুকুমার খবর নিতে এলো। সুকুমারের আর তর সয় না। বউদিকে দেখেই জিজ্ঞেস করলো, "সোমটা কোথায়?" সুকুমারও পরীক্ষার চিঠি পেয়েছে। সে বেজায় খুশী।

ঠোঁট উল্টে সুকুমার বললো, "দেখলি তো তদ্বিরে ফল হয় কি না? আমাদের পাড়ার অনেকে অ্যাপ্লাই করেছিল, কিন্তু কেউ চিঠি পায়নি। সাধে কি আর মিনিস্টারের সি-এ-কে পাকড়েছি! কেন মিথ্যে কথা বলবো, সি-এ বলেছিলেন, আমরা দুজনেই যাতে চান্স পাই তার ব্যবস্থা করবেন।"

আবার বউদির খোঁজ করলো সুকুমার। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে কমলাকে বললো, "সি-এ তাঁর কাজ করেছেন, এখন আশীর্বাদ করুন আমরা যেন ভাল করতে পারি।"

"নিশ্চয় ভাল পারবে," বউদি আশীর্বাদ করলেন।

সুকুমারের একটা বদ অভ্যাস আছে। উত্তেজিত হলেই দুটো হাত এক সঙ্গে দ্রুত ঘষতে থাকে। ঐভাবে হাত ঘষতে-ঘষতে সুকুমার বললো, "বউদি, এক ঢিলে যদি দুই পাখি মারা যায়, গ্রাণ্ড হয়। একই অফিসে দুজনে চাকরিতে বেরুবো।"

সুকুমার বললো, "বিরাট পরীক্ষা। ইংরেজী, অঙ্ক, জেনারেল নলেজ সব বাজিয়ে নেবে। সুতরাং আজ থেকে পরীক্ষার দিন পর্যন্ত আমার টিকিটি দেখতে পাবেন না। মিনিস্টারের সি-এ আমাদের চান্স দিতে পারেন। কিন্তু পরীক্ষায় পাসটা আমাদেরই করতে হবে।"

সুকুমার সত্যিই সোমনাথকে ভালবাসে। যাবার আগে বললো, "মন দিয়ে পড় এই ক'দিন। তোর তো আবার পরীক্ষাতেই বিশ্বাস নেই। শেষে আমার সিকে ছিঁড়লো আর তুই চান্স পেলি না, তখন খুব খারাপ লাগবে।"

নির্দিষ্ট দিনে কপালে বিরাট দই-এর ফোঁটা লাগিয়ে সুকুমার এগজামিনেশন হল্-এ হাজির হয়েছিল। সোমনাথ ওসব বাড়াবাড়ি করেনি। তবে বউদি জোর করে ওর পকেটে কালীঘাটের জবাফুল গুঁজে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "রাখো সঙ্গে। মায়ের ফুল থাকলে পথে-ঘাটে বিপদ আসবে না।"

সোমনাথ এসব বিশ্বাস করে না। কিন্তু বউদির সঙ্গে তর্ক করতে ইচ্ছে হয়নি।

হল্-এর কাছাকাছি এসেই সোমনাথ কিন্তু আশা ছেড়ে দিয়েছিল। এ-যে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার বাড়া। হাজার-হাজার ছেলে আসছে। এবং তাও নাকি দফে-দফে ক'দিন ধরে পরীক্ষা। রোল নম্বরের দিকে নজর দিয়েই ব্যাপারটা বোঝা উচিত ছিল সোমনাথের। চব্বিশ হাজার কত নম্বর তার। আরও কত আছে কে জানে? হিন্দুস্থানী ফেরিওয়ালারা খবর পেয়েছে। তারা মুড়ি, বাদাম, পাঁউরুটি, চা ইত্যাদির বাজার বসিয়েছে।

দিনের শেষে মুখ শুকনো করে সোমনাথ বাড়ি ফিরলো। বউদি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন, জিজ্ঞেস করবেন কেমন পরীক্ষা হলো। কিন্তু সোমনাথের ক্লান্ত মুখ-চোখ দেখে কিছুই জানতে চাইলেন না। কাজের অছিলায় বাবাও নেমে এলেন। কায়দা করে জিজ্ঞেস করলেন, "ফেরবার সময় বাস পেতে অসুবিধে হয়নি তো?"

সোমনাথ সব বুঝতে পারছে। বাবা কেন নেমে এসেছেন তাও সে জানে। সে গম্ভীরভাবে বললো, "এইভাবে লোককে কষ্ট না দিয়ে চাকরিগুলো লটারী করলে পারে। ন'টা পোস্টের জন্য সাতাশ হাজার ছেলেমেয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে। এর থেকে কে যোগ্য কীভাবে ঠিক করবে?"

বাবা ব্যাপারটা বুঝলেন। আর কথা না-বাড়িয়ে আবার ওপরে উঠে গেলেন, যদিও প্রশ্নগুলো তাঁর দেখবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু কোশ্চেন পেপার নিয়ে আসতে দেয়নি, পরীক্ষা হল্-এই ফেরত নিয়েছে।

পরের দিন সকালে সুকুমার আবার এসেছে। ওর মুখ চোখের অবস্থা দেখে বউদি পর্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে তোমার? রাত্রে ঘুমোওনি?"

সুকুমার কষ্ট করে হাসলো। তারপর সোমনাথের খোঁজ নিলো। "কীরে? তোর পরীক্ষা কেমন হলো?"

সোমনাথ বিছানাতে শুয়ে ছিল। উঠে বললো, "যা হবার তাই হয়েছে।"

সুকুমার বললো, "ইংরাজী রচনায় কোনো অলটারনেটিভ ছিল না। এম-এল-এ-দার কাছে শুনে গেলাম 'গরিবী হটাও' পড়বে। ওই প্রবন্ধটা এমন মুখস্থ করে গিয়েছিলাম যে চান্স পেলে ফাটিয়ে দিতাম। জীবেন মুখুজ্যে গোল্ড মেডালিস্টের লেখা।"

সোমনাথ চুপচাপ সুকুমারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। সুকুমার বললো, "আনএমপ্লয়মেন্ট সম্বন্ধেও একটা রচনা খেটেখুটে তৈরি করেছিলাম। বেকার সমস্যা দূর করবার জন্যে অর্ডিনারি বইতে মাত্র ছ'টা কর্মসূচী থাকে,

তার জায়গায় আমি সতেরটা দফা ঢুকিয়েছিলাম। পড়লে ফাটিয়ে দিতাম। কিন্তু এমনই পোড়া কপাল যে রচনা এলো 'ভারতীয় সভ্যতায় অরণ্যের দান'।"

মুখ কাঁচুমাচু করে সুকুমার জিজ্ঞেস করলো, "তুই কি লিখলি রে? তোর নিশ্চয় বিষয়টা তৈরি ছিল।"

"মুণ্ডু ছিল," সোমনাথ রেগে উত্তর দিলো।

"আমারও রাগ হচ্ছিলো, কিন্তু চাকরি খুঁজতে এসে রাগ করলে চলবে না। তাই ফেনিয়ে-ফেনিয়ে লিখে দিলুম, অরণ্য না-থাকলে ভারতীয় সভ্যতা গোল্লায় যেতো—কেউ তাকে বাঁচাতে পারতো না।" সুকুমার অসহায়ভাবে বললো।

"তুই তো তবু লিখেছিস, আমি ছেড়ে দিয়ে এসেছি।"

সুকুমার সমস্ত বিষয়টাকে ভীষণ গুরুত্ব দিয়েছে। এবার মুখ কাঁচুমাচু করে বললো, "ভাই সোম, লাস্ট পেপারে এসে ডুবলাম। জেনারেল নলেজে ভীষণ খারাপ করেছি।"

সোমনাথের এসব বিষয় আলোচনা করতেই ভাল লাগছিল না। কিন্তু সুকুমার নাছোড়বান্দা।

সুকুমার বললো, "একটা মাত্র প্রশ্ন পেরেছি—ভারতে বেকারের সংখ্যা কত? মুখস্থ ছিল—পাঁচ কোটি। দু'নম্বর কোনো বেটা আটকাতে পারবে না।"

"একশ'র মধ্যে দু নম্বর মন্দ কী?" ব্যঙ্গ করলো সোমনাথ।

সুকুমারের মাথায় ওসব সূক্ষ্ম ইঙ্গিত ঢুকলো না। সে বললো, "আরেকটা কোশ্চেনে দু নম্বর দিতেও পারে, নাও দিতে পারে। সেইটে নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেছি। 'নীলগিরি' সম্বন্ধে আমি ভাই লিখে দিয়েছি—দাক্ষিণাত্যের পর্বত। কিন্তু অন্য ছেলেরা বললো, আমাকে নম্বর দেবে না। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার চাকুরি তো! লিখতে হবে ভারতের নতুন ফ্রিগেট।"

খুব দুঃখ করতে লাগলো সুকুমার। "আমার মাথায় সত্যিই গোবর। কাগজে বেরিয়েছিল প্রধানমন্ত্রী নিজে নীলগিরি জলে ভাসালেন—আর আমি কিনা ছাই লিখে ফেললাম নীলগিরি পর্বত।"

বউদি চা দিতে এসে ব্যাপারটা শুনলেন। বললেন, "আমার তো মনে হয় তুমিই ঠিক লিখেছো। নীলগিরি পর্বত তো চিরকাল থাকবে, যুদ্ধ জাহাজ নীলগিরির পরমায়ু ক'বছর?"

সুকুমার আশ্বস্ত হলো না। "আপনি ভুল করছেন বউদি। ফ্রিগেট নীলগিরি যে গভরমেণ্টের। গভরমেণ্টের কোম্পানিতে চাকরির চেষ্টা করবে আর গভরমেণ্টের জিনিস সম্বন্ধে লিখবে না, এটা কেন চলবে? নেহাত আমাকে যদি বাঁচাতে চায়, এগজামিনার হয়তো দুই-এর মধ্যে এক নম্বর দেবে।"

"ওসব ভেবে কী হবে?" সোমনাথ এবার বন্ধুকে বোঝাবার চেষ্টা করে।

কিন্তু সুকুমার নিজের খেয়ালেই রয়েছে। বললো, "যা দুঃখু হচ্ছে না, মাইরি। পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট প্রজাতন্ত্রের নামটা জেনে যাইনি।"

"ডজন-ডজন দেশ যখন রয়েছে, তখন তার মধ্যে একটা বৃহত্তম এবং একটা ক্ষুদ্রতম হবেই," সোমনাথের কথায় এবার বেশ শ্লেষ ছিল।

সুকুমার কিন্তু এসব চিন্তা ঝেড়ে ফেলতে পারছে না। বললো, "খবরের কাগজ অফিসের নকুল চ্যাটার্জির সঙ্গে বাসে দেখা হলো। উনি বলে দিলেন: উত্তর হবে, স্যান মেরিনো রাজ্য, ইটালির কাছে। দেশটার সাইজ কলকাতার মতো, মাত্র পনেরো হাজার লোক থাকে।" খুব দুঃখ করতে লাগলো সুকুমার। "আগে থেকে জেনে রাখলে আরও দু নম্বর পেতুম।"

সোমনাথ এবার রাগে ফেটে পড়লো। "আপিসের জেনারেল ম্যানেজার এই সব প্রশ্নের উত্তর জানে?"

সুকুমার এমনই বোকা যে ভাবছে ওরা নিশ্চয়ই অনেক কিছু জানে, নাহলে বড়-বড় পোস্টে কী ভাবে বসলো?

সুকুমার বললো, "পরের কোশ্চেনটায় অবশ্য অনেকেই মার খাবে—পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রাণীর নাম। আমি তো ভাই সরল মনে হাতির নাম লিখে বসে আছি। নকুলবাবু বললেন, সঠিক উত্তর হবে ব্লু হোয়েল। এক-একটার ওজন দেড়শ' টন। হাতি সে তুলনায় শিশু!"

"চুলোয় যাক ওসব।" আবার তেড়ে উঠল সোমনাথ। "করবি তো কেরানির চাকরি। তার জন্য হাতির ডাক্তার হয়ে লাভ কী?"

বেচারা সুকুমার একটু মুষড়ে পড়লো। বললো, "তোর তো আমার মতো অবস্থা নয়। তুই এসব কথা বলতে পারিস। তুই মজাসে বাবা-দাদার হোটেলে আছিস। যে কোনো কোশ্চেন তুই ছেড়ে দিতে পারিস। আমার বাবাকে রিটায়ারের বিল্লিপত্তর শুঁকিয়ে দিয়েছে। সামনের মাস থেকে বাবার চাকরি থাকবে না। পরের মাস থেকে মাইনে পাবে না। প্রতি সপ্তাহে আটটা লোকের রেশন তুলতে হবে আমাদের। বাড়ি ভাড়া আছে। মায়ের অসুখ। সুতরাং সমস্ত কোশ্চেনের উত্তর আমাকে দিতে হবে। আমার যে একটা চাকরি চাই-ই।"

সুকুমার সেদিন চলে গিয়েছিল। যাবার পর সোমনাথের একটু দুঃখ হয়েছিল। দুনিয়ার ওপরে তার যে রাগ সেটা সুকুমারের ওপর ঢেলে দেওয়া উচিত হয়নি।

সুকুমার বেচারার কী যে হলো সেই থেকে। বিশেষ আসে না। দিনরাত নাকি সাধারণ জ্ঞান বাড়াচ্ছে। একদিন বিকেলে সুকুমার দেখা করতে এলো। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। বললো, "বাবার কাছে খুব বকুনি খেলাম। বোনটাও আবার দলে যোগ দিয়ে বললো, কোনো কাজকম্মই তো নেই। শুধু নমো-নমো করে একটা দশ টাকা মাইনের টিউশনি সেরে আসো। বসে না-থেকে সাধারণ জ্ঞান বাড়াতে পারো না?"

সোমনাথকে কেউ এইরকম কথা বলেনি। কিন্তু হঠাৎ কেমন যেন ভয় হলো সোমনাথের। এ-বাড়িতে তো একদিন এমন কথা উঠতে পারে।

সুকুমারের মন যে শক্ত নয় তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। ওর কীরকম ধারণা হয়ে যাচ্ছে, সাধারণ জ্ঞানটা ভাল থাকলেই ও সেদিনের চাকরিটা পেয়ে যেতো।

সুকুমার নিজেই বললো, "বাবা ঠিকই বলেছিলেন—সুযোগ রোজ-রোজ আসে না। অত বড় সুযোগ এলো অথচ পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম রিপাবলিকের নামটা লিখতে পারলাম না। দোষ তো কারো নয়, দোষ আমারই। বাঙালীদের তো এই জন্যেই কিছু হয় না। নিজেরা একদম চেষ্টা করে না, পরীক্ষার জন্যে তৈরি হয় না।"

সুকুমারের চোখ দুটো লাল হয়ে আছে। ঠিক গাঁজাখোরের মতো দেখাচ্ছে। "সুকুমার মিত্তির আর ভুল করবে না। সবরকমের জেনারেল নলেজ বাড়িয়ে যাচ্ছি। এবার চান্স পেলে ফাটিয়ে দেবো।"

"তা দিস। কিন্তু দাড়ি কাটছিস না কেন? বুরুশ কোম্পানিকে নিজের খোঁচা দাড়ি বিক্রি করবি নাকি?" সোমনাথ রসিকতা করলো।

ঠোঁট উল্টোলো সুকুমার। বললো, "সুকুমার মিত্তির বেকার হতে পারে কিন্তু এখনও বেটাছেলে আছে। সুকুমার মিত্তির প্রতিজ্ঞা করেছে বাপের পয়সায় আর দাড়ি কামাবে না। টিউশনির মাইনে দিতে দেরি করছে। তাই ব্লেড কেনা হচ্ছে না।"

সোমনাথ উঠে দাঁড়ালো। ঘরের কোণ থেকে একটা ব্লেড বার করে সুকুমারকে বললো, "নে। এটা তোর বাবার পয়সায় কেনা নয়।"

সুকুমার শান্ত হয়ে গেলো। প্রথমে ব্লেড নিলো। পকেটে পুরলো। তারপর কী ভেবে পকেট থেকে ব্লেডটা বার করে ফিরিয়ে দিলো। বললো, "কারুর বাবার ব্লেড আমি নেবো না।"

হন হন করে বেরিয়ে গেলো সুকুমার। বেশ মুষড়ে পড়লো সোমনাথ। যাবার

আগে সুকুমার কি তাকেই অপমান করে গেলো? সকলের সামনে মনে করিয়ে দিয়ে গেলো, সোমনাথও রোজগার করে না, অন্যের পয়সায় দাড়ি কামায়।

সুকুমারের অবস্থা যে আরও খারাপ হবে তা সোমনাথ বুঝতে পারেনি।

মেজদা একদিন বললেন, "তোর বন্ধু সুকুমারের কী হয়েছে রে?"

"কেন বলো তো?" সোমনাথ জিজ্ঞেস করলো।

মেজদা বললেন, "তোর বন্ধুর মুখে এক জঙ্গল দাড়ি গজিয়েছে। চুলে তেল নেই। পোস্টাপিসের কাছে আমার অফিসের গাড়ি থামিয়ে বললো, 'একটা আর্জেন্ট প্রশ্ন ছিল।' আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি। ও নিজেই পরিচয় দিলো, 'আমি সোমনাথের বন্ধু সুকুমার!' আমি ভাবলাম সত্যিই কোনো প্রশ্ন আছে। ছোকরা বেমালুম জিজ্ঞেস করলো, 'চাঁদের ওজন কত?' আমি বললাম, জানি না ভাই। সুকুমার রেগে উঠলো। 'জানেন। বলবেন না তাই বলুন।' আমি বললাম, বিশ্বাস করো, আমি সত্যিই চাঁদের ওজন জানি না। ছোকরা বললো, 'এত বড় কোম্পানির অফিসার আপনি, চাঁদের ওজন জানেন না? হতে পারে?' তারপর ছোকরা কী বিড়বিড় করতে লাগলো, পুরো দুটো নম্বর কাটা যাবে।"

মেজদা বললেন, "এর পর আমি আর দাঁড়াইনি। অফিসের ড্রাইভারকে গাড়িতে স্টার্ট দিতে বললাম।" একটু থেমে মেজদা বললেন, "এর আগে ছোকরা তো এমন ছিল না। বদসঙ্গে আজকাল কী গাঁজা খাচ্ছে নাকি?"

সৎ কিংবা বদ কোনো সঙ্গীই নেই সুকুমারের। নিজের খেয়ালে সে ঘুরে বেড়ায়। গড়িয়াহাট ওভার ব্রিজের তলায় সুকুমারকে দূর থেকে সোমনাথ একদিন দেখতে পেলো। খুব কষ্ট হলো সোমনাথের। কাছে গিয়ে ওর পিঠে হাত দিলো, "সুকুমার না?"

সুকুমারের হাতে একখানা শতচ্ছিন্ন হিন্দুস্থান ইয়ারবুক, একখানা জেনারেল নলেজের বই, আর কমপিটিশন রিভিউ ম্যাগাজিনের পুরানো কয়েকটা সংখ্যা। একটা বড় পাথরের ওপর বসে সুকুমার পাতা ওল্টাচ্ছিল। বিরক্ত হয়ে সোমনাথের দিকে তাকিয়ে সুকুমার বললো, "মন দিয়ে একটু পড়ছি, কে ডিসটার্ব করলি?"

"আঃ! সুকুমার," বকুনি লাগালো সোমনাথ।

সুকুমার বললো, "তোকে একটা কোশ্চেন করি। বল দিকিনি, বেকার ক'রকমের?"

মাথা চুলকে সোমনাথ উত্তর দিলো, "শিক্ষিত বেকার এবং অশিক্ষিত বেকার।"

বেশ বিরক্ত হয়ে সুকুমার চিৎকার করে উঠলো, "তুই একটা গর্দভ। তুই চিরকাল ধর্মের ষাঁড় হয়ে বউদির দেওয়া ভূষি খেয়ে যাবি। তোর কোনোদিন চাকরি-বাকরি হবে না—তোর জেনারেল নলেজ খুবই পুওর।"

হাঁপাতে লাগলো সুকুমার। তারপর বললো, "টুকে নে—বেকার দু'রকমের। কুমারী অথবা ভার্জিন বেকার এবং বিধবা বেকার। তুই এবং আমি হলুম ভার্জিন বেকার—কোনোদিন চাকরি পেলুম না, স্বামী কি দোব্য জানতে পারলুম না। আর ছাঁটাই হয়ে যারা বেকার হচ্ছে তারা বিধবা বেকার। যেমন আমার ছাত্তরের বাবা। রাধা গ্লাস ওয়ার্কসে কাজ করতো, দিয়েছে'আর-পি-এল—রানিং পোঁদে লাথি। আমার বাকি মাইনেটা দিলো না—এখনও ব্লেড কিনতে পারছি না। আমার বাবাও বিধবা হবে, এই মাসের শেষ থেকে।"

সোমনাথ বললো, "বাড়ি চল। তোকে চা খাওয়াবো।"

সুকুমার রেগে উঠলো। "চাকরি হলে অনেক চা খাওয়া যাবে। এখন মরবার সময় নেই। জেনারেল নলেজের অনেক কোশ্চেন বাকি রয়েছে।"

একটু থেমে কী যেন মনে করার চেষ্টা করলো সুকুমার। তারপর সোমনাথের হাতটা ধরে বললো, "তুই জানিস 'পেরেডেভিক' কী? নকুলবাবু বললেন, পেরেডেভিক এক ধরনের সূর্যমুখীফুলের বিচি—ওয়েস্ট বেঙ্গলে আনানো হচ্ছে রাশিয়া থেকে, যাতে আমাদের রান্নার তেলের দুঃখ ঘুচে যায়। কিন্তু কোনো জেনারেল নলেজের বইতে উত্তরটা খুঁজে পাচ্ছি না! ভুল হয়ে গেলে দুটো নম্বর নষ্ট হয়ে যাবে।"

পাথরের মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো সোমনাথ। সুকুমার বললো, "রাখ রাখ—এমন পোজ দিচ্ছিস যেন সিনেমার হিরো হয়েছিস। চাকরি যদি চাস, আমার সঙ্গে জেনারেল নলেজে লড়ে যা। কোশ্চেন অ্যানসার দুই-ই বলে যাচ্ছি। কারুর মুরোদ থাকে তো চ্যালেঞ্জ করুক। ডং হা কোথায়?—দক্ষিণ ভিয়েৎ-নামের বিখ্যাত জেলা। গাম্বিয়া এবং জাম্বিয়া কী এক?—মোটেই না। গাম্বিয়া পশ্চিম আফ্রিকায়, আর পুরানো উত্তর রোডেশিয়ার নতুন নাম জাম্বিয়া।"

বন্ধুকে থামাতে গেলো সোমনাথ। কিন্তু সুকুমার বকে চললো, "শুধু পলিটি-াল সাইন্স জানলে চলবে না। ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, স্বাস্থ্য, ফিজিকস্, কেমিসট্রি, ম্যাথামেটিকস—সব বিষয়ে হাজার-হাজার কোশ্চেনের উত্তর রেডি রাখতে হবে। আচ্ছা, বল দিকি শরীরের সবচেয়ে বড় গ্ল্যাণ্ডের নাম কী?"

চুপ করে রইলো সোমনাথ। প্রশ্নটার উত্তর সে জানে না।

"লিভার, লিভার," চিৎকার করে উঠলো সুকুমার। তারপর নিজের খেয়ালেই বললো, "ফেল করিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু হাজার হোক বউদির

ধর্মশালায় আছিস, দেখলে দুঃখ হয়, তাই আর একটা চান্স দিচ্ছি। কোন ধাতু সাধারণ ঘরের টেমপারেচারে তরল থাকে ?"

এবারেও সোমনাথকে চুপ করে থাকতে দেখে সুকুমার বললো, "তুই কি চিরকাল বৌদির আঁচল ধরে থাকবি ? এই উত্তরটাও জানিস না ? ওরে মূর্খ, 'পারা', – মার্কারির নাম শুনিসনি ?"

সুকুমার তারপর বললো, "দুটো ইমপর্টেন্ট কোশ্চেনের উত্তর জেনে রাখ। 'লাস্ট সাপার' ছবিটা কে এঁকেছিলেন ? উত্তর : লিওনার্দো দা ভিঞ্চি। দ্বিতীয় কোশ্চেন : 'বিকিনি' কোথায় ? খুব শক্ত কোশ্চেন। যদি লিখিস মেমসায়েবদের স্নানের পোশাক, স্রেফ গোল্লা পাবি। উত্তর হবে : প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ – এটম বোমার জন্যে বিখ্যাত হয়ে আছে।"

সোমনাথকে আরও অনেক কোশ্চেন শোনাতো সুকুমার। সোমনাথ বুঝলো, ওর মাথার গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। মনের দুঃখে সে হাঁটতে আরম্ভ করলো। সুকুমার বললো, "তোর আর কি ! হোটেল-ডি-পাপায় রয়েছিস – পড়াশোনা না-করলেও দিন চলে যাবে। আমাকে দশদিনের মধ্যে চাকরি যোগাড় করতেই হবে।"

চোখের সামনে সুকুমারের এই অবস্থা দেখে সোমনাথের চোখ খুলতে আরম্ভ করেছে। একটা অজানা আশঙ্কা ঘন কুয়াশার মতো অসহায় সোমনাথকে ক্রমশ ঘিরে ধরেছে। তার ভয় হচ্ছে, কোনোদিনই সে চাকরি যোগাড় করতে পারবে না। সুকুমারের মতো তার ভাগ্যেও চাকরির কথা লিখতে বিধাতা ঠাকুর বোধহয় ভুলে গেছেন।

মেজদা অফিসের এক বন্ধুকে সস্ত্রীক বাড়িতে নেমন্তন্ন করেছে। জুনিয়রমোস্ট অ্যাকাউনটেন্ট কাজলের তুলনায় এই ভদ্রলোক অনেক বড় চাকরি করেন। কিন্তু কাজলের সঙ্গে ইনি মেলামেশা করেন। একবার বাড়িতে নেমন্তন্ন না করলে ভাল দেখাচ্ছিল না।

বুলবুলের বিশেষ অনুরোধে সোমনাথকে গড়িয়াহাটা থেকে বাজার করে আনতে হয়েছে।

হাতে কোনো কাজ-কর্ম নেই, তবুও আজকাল বাজারে যেতে প্রবৃত্তি হয় না সোমনাথের। অরবিন্দর সঙ্গে ওইখানে দেখা হয়ে যেতে পারে। এবং

দেখা হলেই জিজ্ঞাসা করবে, ফরেনে যাবার ব্যবস্থা কতদূর এগলো। বাজারে যাবার আগে বুলবুল বলেছিল, "তোমার মেজদাকে বাজারে পাঠিয়ে লাভ নেই। হয়তো পচা মাছ এনে হাজির করবেন।"

দূর থেকে কমলা বউদি হাসতে-হাসতে বললেন, "দাঁড়াও, কাজলকে ডাকছি।"

বুলবুল ঘাড় উঁচু করে বললো, "ভয় করি নাকি? মা-সত্যি, তাই বলবো। অফিসে ঠাণ্ডা ঘরে বসে হিসেব করা আর সব জিনিস বুঝে শুনে সংসার করা এক জিনিস নয়।"

মেজদার কানে দুই-বউয়ের কথাবার্তা এমনিতেই পৌঁছে গেলো। মাথার চুল মুছতে-মুছতে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে বউদিকে অভিজিৎ জিজ্ঞেস করলো, "কী বলছো?"

বউদি রসিকতার সুযোগ ছাড়লেন না। বললেন, "আমাকে কেন? নিজের বউকেই জিজ্ঞেস করো।"

বউকে কিছুই জিজ্ঞেস করলো না মেজদা। বললো, "নিজে বাজারে বেরোলেই পারো।"

"কী কথাবার্তার ধরন! দেখলেন তো দিদি।" বুলবুল স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো কমলা বউদির কাছে!

সোমনাথের এইসব রস-রসিকতা ভাল লাগছে না। সে নিজের ঘরের ভিতর ঢুকে বসে রইলো।

এখান থেকেও ওদের সমস্ত কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। কমলা বউদি কাজলকে বললেন, "কেন তুমি বুলবুল বেচারার পিছনে লাগছো?"

বুলবুল সাহস পেয়ে গেলো। বরকে সোজা জানিয়ে দিলো, "ইচ্ছে হলে বাজার করতে পারি। কিন্তু অগ্নিসাক্ষী রেখে মন্তর-পড়ে খাওয়ানো-পরানোর দায়িত্ব নিয়েছিলে কেন?"

স্বামী-স্ত্রীর এই খুনসুটি অন্য সময় মন্দ লাগে না সোমনাথের। বুলবুলের মধ্যে সখীভাবটা প্রবল, আর কমলা বউদির মধ্যে মাতৃভাব। কমলা বউদি দু-একবার সোমনাথকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, "বুলবুলও বউদি, ওকে বউদি বলবে।" ওই জিনিসটা পারবে না সোমনাথ! ভূতপূর্ব কলেজ-বান্ধবীকে রাতারাতি বউদি করে নিতে পারবে না। বুলবুলও একই পথ ধরেছে। সোমনাথকে ঠাকুরপো বলে না, কলেজের নাম ধরেই ডাকে।

কমলা বউদি বলেছিলেন, "নিদেনপক্ষে সোমদা বোলো।"

বুলবুল তাতেও রাজী হয় নি—"আমার থেকে বয়সে তো বড় নয়।

স্থতরাং হোয়াই দাদা ?"

কমলা বউদির গলা শোনা গেলো। "বিছানায় শুয়ে-শুয়ে রাত্রে ঝগড়া কোরো বুলা। এখন খোকনকে ছেড়ে দাও।"

সোমনাথের ঘরে ঢুকে বুলবুল বললো, "ভাই সোম, রক্ষে করো।"

সোমনাথ নিজেই এবার হাল্কা হবার চেষ্টা করলো। বললো, "দাদার হাত থেকে কী করে রক্ষে করবো ? জেনে-শুনেই তো বিয়ের মন্ত্র পড়েছিলে !"

দেওরের দিকে তির্যক দৃষ্টি দিলো বুলবুল। তারপর শাড়ির আঁচলে ভিজে হাতদুটো মুছলো। বললো, "তুমিও আমার পিছনে লাগছো সোম ? অফিসের যে-লোকটা খেতে আসবে সে বেজায় খুঁতখুঁতে। বউটা তেমনি নাক উঁচু। যদি আপ্যায়নের দোষ হয় অফিসে কথা উঠবে। আর তোমার দাদা আমাকে আস্ত রাখবে না।"

সোমনাথ কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললো, "বাজারে আস্ত থেকে কাটার দাম বেশি।"

বুলবুল ছাড়লো না। আঁচলটা কোমরে জড়াতে-জড়াতে বললো, "এর প্রতিশোধ একদিন আমিও নেবো, সোম। তোমারও বিয়ে হবে এবং বউকে আমাদের খপ্পরে পড়তে হবে।"

রসিকতায় খুশী হতে পারলো না সোমনাথ। এ-বাড়িতে বেকার সোমনাথের বিয়ের কথা তোলা যে ব্যঙ্গ তা মোক্ষদা ঝিও জানে।

বুলবুল বললো, "ইলিশ এবং ভেটকি দু রকমই মাছ নিও, সোম। ওরা আবার আমাদের চিংড়ি মাছও খাইয়েছিল। আমি কিন্তু টেক্কা দেবার চেষ্টা করবো না।"

বাজার ঠিকমতো করেছিল সোমনাথ। কিন্তু বাড়িতে অতিথি আসবে শুনলেই সে অস্বস্তি বোধ করে। অতিথির সঙ্গে পরিচয়ের পর্বটা সোমনাথ মোটেই পছন্দ করে না। দুপুরবেলা হলে সোমনাথ কোথাও চলে যেতো— ন্যাশনাল লাইব্রেরির দরজা তো বেকারদের জন্যেও খোলা রয়েছে। কিন্তু অতিথি আসছেন রাত্রিবেলাতে।

অতিথি পরিচয়ের আধুনিক বাংলা কায়দাটা সোমনাথের কাছে মোটেই শোভন মনে হয় না। "নমস্কার, ইনি অভিজিৎ ব্যানার্জির ভাই, বললেই পর্বটা চুকে যাবে না। একটা অলিখিত প্রশ্ন বিরাট হয়ে দেখা দেবে। 'ভাই তো বুঝলাম, কিন্তু ইনি কী করেন ?' কলকাতার তথাকথিত ভদ্রসমাজে এ-প্রশ্ন এড়িয়ে যাবার কোনো উপায় নেই।

অতিথিরা সন্ধ্যা সাড়ে-সাতটার সময় এলেন। মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস এম কে

নন্দীকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে বুলবুল এক্সট্রা স্পেশাল সাজ করে সময় গুণছিল। এই সাজের পিছনে বুলবুলের অনেক চিন্তা আছে। মেজদার সঙ্গে জল্পনা-কল্পনা হয়েছে। বুলবুলকে দেখে কমলা বউদি মন্তব্য করলেন, "এত ভেবে-চিন্তে শেষ পর্যন্ত এই সাধারণ সাজ হলো!"

বুলবুল উত্তর দিলো, "আর বলেন কেন, দিদি। এইটাই নাকি এখনকার চালু স্টাইল। নিজের বাড়ি তো—খুব ব্রাইট কোনো শাড়ি পরলে এবং লাউড মেক-আপ থাকলে ভাববে ইনি নিজেই বাইরে নেমন্তন্ন রাখতে যাচ্ছেন! তাই মেক-আপ খুব টোন-ডাউন করতে হবে এবং শাড়িটা যেন সাধারণ মনে হয়। কিন্তু শাড়ির দামটা যে মোটেই সাধারণ নয় তা যেন অভ্যাগতরা বুঝতে পারেন। ভাবটা এমন, এতক্ষণ রান্নাঘরেই ছিলাম, আপনারা এসেছেন শুনে আলতোভাবে মুখের ঘামটা মুছে দ্রুত চলে এসেছি। অতিথি আপ্যায়নের সময় কী নিজের সাজ গোজের কথা খেয়াল থাকে?"

সোমনাথের হাসি আসছিল। অফিসার হয়েও তাহলে শান্তি নেই—কত রকমের অভিনয় করতে হয়। বুলবুল অবশ্য পারবে—ওর এইসব ব্যাপারে বেশ ন্যাক আছে।

মিস্টার-মিসেস নন্দীকে গেটেই কাজল ও বুলবুল অভ্যর্থনা করলো। এ-বাড়ির রীতি অনুযায়ী অতিথি দম্পতিকে একবার ওপরে বাবার কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। বাবার সঙ্গে দু-একটা কথার পর মিস্টার-মিসেস নন্দী নিচে নেমে এলেন।

মুখে মিষ্টি হাসি ফুটিয়ে বুলবুল বললো, "আমার ভাশুরের সঙ্গে আপনার আলাপ হলো না। উনি এখন ট্যুরে রয়েছেন।"

মেজদা বললো, "বউদিকে ডাকো।" কমলা বউদিকে ধরে আনবার জন্যে বুলবুল বেরিয়ে যেতেই মিস্টার নন্দীকে মেজদা বললো, "দাদা ব্রিটিশ বিস্কুট কোম্পানিতে আছেন। কয়েক সপ্তাহের জন্যে বোম্বাই গিয়েছেন। ওদের কোম্পানির নাম পাল্টাচ্ছে—ইণ্ডিয়ান বিস্কুট হচ্ছে।"

মিস্টার নন্দী বললেন, "হতেই হবে। সমস্ত জিনিসই আমাদের ক্রমশ দিশী করে ফেলতে হবে, মিস্টার ব্যানার্জি।"

"রাখো তোমার স্বদেশী মন্তর," মিসেস নন্দী স্বামীকে বকুনি লাগালেন। "তোমাদের আপিসের সব সায়েবগুলো চলে গিয়ে যখন হরিয়ানী বসবে তখন মজা বুঝতে পারবে।"

মিস্টার নন্দী যে বউয়ের বকুনিতে অভ্যস্ত তা বোঝা গেল। বেশ শান্তভাবে ইণ্ডিয়া কিং সিগারেট ধরিয়ে বউকে তিনি বললেন, "হরিয়ানা এবং স্বদেশীয়ানা

যে একই জিনিস তা এখন অনেকেই হাড়ে-হাড়ে বুঝছে। কিন্তু মিন্থ, সায়েবদের চলে যেতে বলছে কে? শুধু খোলস পাল্টাতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।"

মিসেস নন্দী বললেন, "কোম্পানির পার্টিতে যেতে আমার মোটেই ভাল লাগে না। কিন্তু বাধ্য হয়ে প্রেজেন্ট থাকতে হয়।"

"কী করবেন বলুন। যে-পুজোর যে-মন্ত্র," সুদর্শনা ও সুসজ্জিতা মিসেস নন্দীকে সান্ত্বনা দিলো অভিজিৎ।

মিসেস নন্দী বললেন, "সেদিনের ককটেল পার্টিতেও স্বদেশীর কথা উঠেছিল। মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস চোপরা তিনমাস ফরেন বেড়িয়ে এসে ভীষণ স্বদেশী হয়ে উঠেছেন। বললেন, মেয়েদের কসমেটিক্স এবং ছেলেদের স্কচ হুইস্কি ছাড়া আর সব জিনিস স্বদেশী হয়ে গেলে তাঁদের কোনো আপত্তি নেই।"

বুলবুল সেদিন পার্টিতে উপস্থিত ছিল। পার্টির শেষের দিকে বেশ কয়েক পেগ ফরেন হুইস্কি পান করে মিসেস চোপরা আরও উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। বুলবুলের কোমরে হাত রেখে পঞ্চাশ বছরের যুবতী মিসেস চোপরা বলেছিলেন, "দেশের মঙ্গলের জন্যে ইমপোর্টেড কসমেটিক্স আনা কয়েক বছর বন্ধ হলে তাঁর আপত্তি নেই।"

বুলবুলের কথা শুনে হা-হা করে হেসে উঠলেন মিস্টার নন্দী। "মিসেস ব্যানার্জি, আপনি সত্যিই খুব সরল প্রকৃতির মানুষ। আপনি মিসেস চোপরার কথা বিশ্বাস করলেন? উনি বলবেন না কেন? এবার ফরেন থেকে ফেরবার সময় মহিলা যা কসমেটিক্স এনেছেন তাতে ওঁর সমস্ত জীবন সুখে কেটে যাবে!"

"ও মা!" মিসেস নন্দী ইস্কুলের কিশোর বালিকার মতো বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

মিস্টার নন্দী বললেন, "এসব ভিতরের খবর। বিশ্বাস না হলে, ট্র্যাভেল ডিপার্টমেন্টের অ্যারো মুখার্জিকে জিজ্ঞেস করবেন। কাস্টমসের নাকের সামনে দিয়ে বিনা-ডিউটিতে ওই মাল ছাড়িয়ে আনতে বেচারার ব্লাড-প্রেসার বেড়ে গিয়েছে। উপায়ও নেই—রিজিওন্যাল ম্যানেজারের বউ। লিপস্টিকের ওপর ডিউটি ধরলে অ্যারো মুখার্জির চাকরি থাকবে না।"

"ওমা! তুমি তখন বললে না কেন চুপি-চুপি।" মিসেস নন্দী আবার বালিকা-বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

"কেন মিসেস নন্দী? সি-বি-আইকে খবর পাঠাতেন নাকি?" অভিজিৎ রসিকতা করলো।

"কিছুই করতাম না। শুধু মহিলাকে নেশার ঘোরে ভুলিয়ে-ভালিয়ে দু-একটা লিপস্টিক হাতিয়ে নিতাম," মিসেস নন্দী আপসোস করলেন।

মিস্টার নন্দী সন্দেহ প্রকাশ করে বললেন, "সে-মুরোদ তোমাদের নেই। মিসেস চোপরার কালচারে মানুষ হলে চক্ষুলজ্জা থাকতো না, তখন হেসে কেঁদে কিংবা স্রেফ অঙ্গভঙ্গী দেখিয়ে ঠিক ম্যানেজ করে আনতে। ওরা যেমন নির্লজ্জভাবে বড়কর্তাদের জন্যে তেল পাম্প করে, তেমনি নির্দয়ভাবে নিচু থেকে তেলের সাপ্লাই প্রত্যাশা করে।"

একতলা ঘুরে-ঘুরে দেখতে-দেখতে চারজনের মধ্যে কথা হচ্ছে। নিজের ঘরে বসেই সোমনাথ এসব স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে।

ঘুরতে-ঘুরতে ওরা যে এবার সোমনাথের ঘরের সামনে দাঁড়িয়েছে তা সোমনাথ বুঝতে পারলো। দরজাটা অর্ধেক খোলা ছিল। অভিজিৎ একটা আলতো টোকা মারলো। সোমনাথ চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো।

"উঠবেন না, উঠবেন না, বসুন।" হাঁ-হাঁ করে উঠলেন মিস্টার নন্দী।

মেজদা বললো, "আমার ইয়ংগেস্ট ভাই, সোমনাথ।" তারপর সোমনাথকে বললো, "খোকন আমাদের অফিসের ট্রেনিং অ্যাণ্ড স্টাফ ম্যানেজার মিস্টার নন্দী।"

সোমনাথ সম্পর্কে শূন্যস্থান পূরণের জন্যে মিসেস নন্দী স্বভাবসিদ্ধ কৌতূহলী দৃষ্টিতে বুলবুলের দিকে তাকালেন। বুলবুলের বুঝতে বাকি রইলো না, মিসেস নন্দী কী জানতে চাইছেন। বুলবুলের বেশ অস্বস্তি লাগছে।

অভিজিৎও অস্বস্তি বোধ করছে। কিন্তু সে কায়দা করে উত্তর দিলো, "সামনে ওর নানা পরীক্ষা রয়েছে। বাড়ির ছোট ছেলে তো, আমরা তাই একটু বেশি করে ভাবছি।"

"ঠিক করছেন মশায়," উৎসাহিত হয়ে উঠলেন মিস্টার নন্দী। "মার্চেন্ট ফার্মে অফিসার পোস্টে ঢুকিয়ে ওর জীবনটা বরবাদ করে দেবেন না। তার থেকে আই-এ-এস-টেস অনেক ভাল।"

কান লাল হয়ে উঠেছিল সোমনাথের। অপমান ও উত্তেজনার মাথায় সে হয়তো কিছু বলেই ফেলতো। কিন্তু মিস্টার নন্দী বাঁচিয়ে দিলেন। বুলবুলকে বললেন, "ওঁর পড়াশোনায় ডিসটার্ব করে লাভ নেই। চলুন আমরা অন্য কোথাও যাই।"

সোমনাথের মুখটা যে কালো হয়ে উঠছে, তা দাদা ছাড়া কেউ লক্ষ্য করলো না।

কমলা বউদি ভিতরে খাবারের ব্যবস্থা করছেন। আর বাইরের ঘরে ওঁরা চারজন এসে বসলেন। ওঁদের সব কথাবার্তা সোমনাথ এখান থেকে শুনতে পাচ্ছে।

মিস্টার নন্দী অভিযোগ করলেন, "জিনিসপত্তরের দাম যেভাবে বাড়ছে তাতে আর চলছে না, মিস্টার ব্যানার্জি। আপনারা অ্যাকাউনটেণ্টরা দেশের যে কী হাল করলেন।"

"আমরা কী করলাম? দেশের ভার তো অ্যাকাউনটেণ্টদের হাতে দেওয়া হয়নি, তাহলে ইণ্ডিয়ার এই অবস্থা হতো না!" অভিজিৎ হাসতে-হাসতে উত্তর দিলো।

"পার্সোনেল অফিসারদের হাতেও দেশটা নেই। থাকলে, অন্তত ইস্কুলে-কলেজে, পথে-ঘাটে, কল-কারখানায়, অফিসে-আদালতে ডিসিপ্লিনটা বজায় রাখা যেতো," দুঃখ করলেন মিস্টার নন্দী।

"তাহলে দেশটা রয়েছে কার হাতে?" একটু অবাক হয়েই প্রশ্ন করলেন মিসেস নন্দী।

"মা জননীদের হাতে!" রসিকতা করলেন মিস্টার নন্দী। "সঙ্গে তালিম দিচ্ছেন কয়েকজন ব্রীফলেস উকিল এবং কিছু টেক্সট-বুক পড়া প্রফেসর। ম্যানেজমেণ্টের 'ম' জানেন না এঁরা।"

এবার তুলনামূলক সমালোচনা আরম্ভ করলেন মিসেস নন্দী। "পার্সোনেল অফিসারদের থেকে আপনারা অনেক ভাল আছেন, মিস্টার ব্যানার্জি।"

"এতো দুঃখ করছেন কেন, মিসেস নন্দী?" বুলবুল জিজ্ঞেস করলো।

"অনেক কারণে ভাই। বাড়িতে পর্যন্ত শান্তি নেই। লোকে যেমনি শুনলো পার্সোনেল অফিসার, অমনি তদ্বির শুরু হয়ে গেলো।"

মিস্টার নন্দীও সায় দিলেন। "বন্ধুর বাড়ি, বিয়ে বাড়ি, এমনকি বাজার-হাটেও যাবার উপায় নেই। চেনা-অচেনা হাজার-হাজার চাকরির জন্যে খাই-খাই করছে। চাকরি কি মশাই আমি তৈরি করি?"

মিসেস নন্দী বললেন, "আগে ওঁর ঠাণ্ডা মাথা ছিল, লোকের সঙ্গে ভালভাবে কথা বলতেন—এখন চাকরির নাম শুনলে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন।"

"ধৈর্য থাকে না, মিস্টার ব্যানার্জি," এম কে নন্দীকে বলতে শোনা গেলো।

"মেয়ের বিয়ে এবং ছেলের চাকরির জন্যে বাঙালীরা তো চিরকালই ধরাধরি করে এসেছে, মিস্টার নন্দী," বুলবুল হঠাৎ বলে ফেললো। পরে বুলবুলের মনে হলো, কথাটা মিস্টার নন্দীর মনঃপূত নাও হতে পারে।

"বাঙালী ছেলেদের চাকরি?" আঁতকে উঠলেন মিস্টার নন্দী। তারপর বললেন, "কিছু যদি মনে না করেন, তাহলে সত্যি কথাটা বলি। বাংলার শিক্ষিত বেকাররা বিধাতার এক অপূর্ব সৃষ্টি। এরা ইস্কুল-কলেজে দুলে-দুলে কিছু মানে-বই মুখস্থ করেছে—কিন্তু এক লাইন ইংরিজী স্বাধীনভাবে লিখতে

শেখেনি। বারো-চোদ্দ বছর ধরে প্রতিদিন ইস্কুলে এবং কলেজে গিয়ে এরা এবং এদের মাস্টারমশায়রা যে কী করেছেন ভগবান জানেন! পৃথিবীর কোনো খোঁজই এরা রাখে না। এরা জানে না মোটর গাড়ি কীভাবে চলে; কোন সময়ে ধান হয়, সিপিয়া রংয়ের সঙ্গে লাল রংয়ের কী তফাত। এরা কলমের থেকে ভারী কোনো জিনিস তিন-পুরুষের মধ্যে তোলেনি। এরা রাঁধতে জানে না, খাবার খেয়ে নিজেদের থালাবাসন ধুতে পারে না, মায় নিজেদের জামা-কাপড়ও কাচতে পারে না। অন্য লোকে ঝাঁটা না-ধরলে এদের ঘরদোর পরিষ্কার হবে না। দৈহিক পরিশ্রম কাকে বলে এরা জানে না। এরা কোনো হাতের কাজ শেখেনি, ম্যানার জানে না, কোনো অভিজ্ঞতা নেই এদের। এরা শুধু আনএমপ্লয়েড নয়, আমাদের প্রফেশনে বলে আন-এমপ্লয়েব্‌ল। এদের চাকরি দিয়ে কোনো লাভ নেই।"

এ-ঘরে বসে সোমনাথ ভাবছে, মেজদা কিছু মতামত দিচ্ছে না এই যথেষ্ট।

মিস্টার নন্দী বোধহয় আর একটা সিগারেট ধরালেন। কারণ দেশলাই জ্বালানোর শব্দ হলো। তাঁর গলা আবার শোনা গেলো। "এই ধরনের লক্ষ-লক্ষ অদ্ভুত জীব আমাদের এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জগুলোতে নাম লিখিয়ে চাকরির আশায় বাড়িতে কিংবা পাড়ার রকে বসে আছে। হাজার পঞ্চাশেক ইস্কুল-কলেজ আরও কয়েক লাখ একই ধরনের জীবকে প্রতিবছর চাকরির বাজারে উগরে দিচ্ছে। অথচ এই সব অভাগাদের জন্যে দেশের কারও কোনো মাথা ব্যথা নেই। এরা সমাজের কোন কাজে লাগবে বলতে পারেন? ইস্কুল-কলেজে এমন ধরনের অপদার্থ বাবু আমরা কেন তৈরি করছি পৃথিবীর কেউ জানে না।"

"আমাদের সমাজই তো এদের এইভাবে তৈরি করছে, মিস্টার নন্দী." অভিজিৎ গভীর দুঃখের সঙ্গে মৃদু প্রতিবাদ করলো।

মিস্টার নন্দী বোধহয় সিগারেটে একটা টান দিলেন। তারপর বললেন, "ইনটারভিউতে বসে এইসব বেঙ্গলী ছেলেদের তো দেখছি আমি। চোখ ফেটে জল আসে। উগ্রপন্থীরা যে বলতো ইস্কুল-কলেজ বোমা মেরে বন্ধ করে দাও, তার মধ্যে কিছু লজিক ছিল মিসেস ব্যানার্জি। কারণ ইস্কুল-কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের এইসব ছেলেদের স্বয়ং ভগবানও এই সমাজে প্রোভাইড করতে পারবেন না।"

"দোষটা তো এই ছেলেদের নয়।" অভিজিতের গলা শোনা গেলো।

"সেইটাই তো আরো দুঃখের। এরা জানে না, এদের কি সর্বনাশের পথে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। যে-হারে নতুন চাকরি হচ্ছে তাতে ইতিমধ্যেই যারা এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের লিস্টে নাম লিখিয়েছে তাদের ব্যবস্থা করতে আশি-

পঁচাশি বছর লেগে যাবে। অর্থাৎ, এখন যদি বাইশ-তেইশ বছর বয়স হয়, চাকরির চিঠি আসবে একশ' দুই বছর বয়সে!"

মিস্টার নন্দী বললেন, "শতখানেক সরকারী চাকরির জন্যে লাখদশেক অ্যাপ্লিকেশন পড়তে পারে এমন খবর পৃথিবীর কেউ কোথাও কোনোদিন শুনেছে? সবচেয়ে দুঃখের কথা, গভরমেণ্টও এদের কাছে বেমালুম মিথ্যা কথা বলছে। ওরে বাবা, মুরোদ থাক-না-থাক অন্তত সত্যবাদী হও। ইয়ংমেনদের কাছে স্বীকার করো, এ-সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা কোনো সরকারের নেই। তাহলে ছেলেগুলোর অন্তত চৈতন্যোদয় হয়, নিজের ব্যবস্থা নিজেরা করে ফেলতে পারে।"

"নিজের ব্যবস্থা আর কী করবে, মিস্টার নন্দী?" অভিজিৎ দুঃখের সঙ্গে বললো।

"যাদের কেউ নেই, তাদের করতেই হয়," মিস্টার নন্দী উত্তর দিলেন। "আপনি কলকাতার চীনেদের দেখুন। তিন-চারশ' বছর ধরে তো ওরা কলকাতায় রয়েছে। ওদের ছেলেপুলেরাও তো লেখাপড়া শিখছে। কিন্তু কখনও এম্প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে কোনো চীনেকে দেখেছেন? ওদের যে চাকরির দরকার নেই এমন নয়। কিন্তু ওরা জানে, এই সমাজে কেউ ওদের দেখবে না, কেউ ওদের সাহায্য করবে না, নিজেদের ব্যবস্থা নিজেদেরই করতে হবে। তাই নীরবে সেই অবস্থার জন্যে ছেলেদের ওরা তৈরি করেছে। এবং খুব দুঃখে কষ্টে নেই ওরা।"

মিসেস নন্দী একটু বিরক্ত হলেন। "আমরা তো আর চীনে নই—সুতরাং বার-বার চীনের কীর্তন গেয়ে কী লাভ?"

হেসে ফেললেন মিস্টার নন্দী। "গিন্নির ধারণা আমি প্রো-চাইনীজ।"

"আমরাও প্রো-চাইনীজ—বিশেষ করে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে।" অভিজিৎ মন্তব্য করলো।

একবার হাসির হুল্লোড় উঠলো।

মিস্টার নন্দী বললেন, "সুইডেনের প্রফেসার জোরগেনসেন এসেছিলেন কিছুদিন আগে। জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত। এই চাকরি-বাকরির ব্যাপারে নানা দেশে অনেক গবেষণা করেছেন। আমার সঙ্গে এক ডিনারে আধঘণ্টার জন্যে দেখা হয়ে গেলো। তিনি বললেন, অর্থনীতি এবং রাজনীতির অনেক প্রাথমিক আইনই তোমাদের এই বেঙ্গলে খাটে না। অন্য দেশে বেকার বললেই একটা ভয়াবহ ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। একটা রুক্ষ মেজাজের সর্বনাশা চেহারার লোক—যার কোনো সামাজিক দায়দায়িত্ব নেই, যে প্রচণ্ড রেগে

আছে। ইংলণ্ডের কিছু-কিছু প্রি-ওয়ার উপন্যাসে এদের পরিচয় পাবে। লোকটা বোমার মতো—কারণ সে অনাহারে মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তার আশ্রয় নেই, জামা-কাপড় নেই। যে-কোনো মুহূর্তে সে ফেটে পড়তে পারে।"

একটু থামলেন মিস্টার নন্দী। তারপর আরম্ভ করলেন, "প্রফেসর জোরগেনসেন বললেন, তোমাদের এই বেঙ্গলে এসে কিন্তু তাজ্জব বনে গেলাম। রাস্তায়-রাস্তায় পাড়ায়-পাড়ায় এমন কি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের সামনে দাঁড়িয়েও বেকার সমস্যার বাহ্যিক ভয়াবহতা দেখলাম না। অথচ তোমাদের এখানে যত বেকার আছে তার এক দশমাংশ কর্মহীন অন্য যে-কোনো সভ্য দেশকে লণ্ডভণ্ড করে দিতো। তোমাদের বেকাররা অস্বাভাবিক শান্ত। আর বেকারি ভাতা না-থাকলেও তোমাদের জয়েণ্ট ফ্যামিলি এদের সর্বনাশ করে দিচ্ছে। অনেকেরই যেন-তেন উপায়ে খাওয়া জুটে যাচ্ছে। তোমাদের পারিবারিক জীবন এই বোমাগুলোকে ফিউজ করে দিচ্ছে—এরা ফেটে পড়তে পারছে না। নতুন জীবনের অ্যাডভেঞ্চারেও নামতে পারছে না এরা। তাই সমস্যা সমাধানে কোনো তাড়াতাড়ি নেই—নাউ অর নেভার, একথা কারও মুখে শোনা যাচ্ছে না।"

মিস্টার নন্দী থামলেন না। বললেন, "জানেন মিস্টার ব্যানার্জি, প্রাইভেট ফার্মে চাকরি না-করলে বলতাম—বেকারি অনেকটা ম্যালেরিয়া এবং কালাজ্বরের মতো। এখনই মৃত্যুভয় নেই, কিন্তু আস্তে-আস্তে জীবনের প্রদীপ শুকিয়ে আসছে। পৃথিবীর সর্বত্র মানুষ যুগে যুগে যৌবনকে জয়টীকা পরিয়েছে। ক্যাপিটালিস্ট বলুন, সোসালিস্ট বলুন, কম্যুনিস্ট বলুন, সবদেশে যৌবনের জয়-জয়কার। আর আমাদের এই পোড়া বাংলায় যুবকদের কি অপমান। লাখ-লাখ নিরপরাধ শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের যৌবন কেমন বিষময় হয়ে উঠেছে দেখুন। ওরা যদি বলতো, সমাধান আজই চাই। আজ সমাধান না হলে, কাল সকালেই যা হয় করবো—তাহলে হয়তো দেশের ভাগ্য পাল্টে যেতো।"

মিস্টার নন্দীর কথাগুলো শুনতে-শুনতেই সোমনাথের রক্তে আগুন ধরে যাচ্ছিলো। একবার মনে হলো, তাকে শোনাবার জন্যেই যেন গোপন ষড়যন্ত্র করে নন্দীকে আজ এ-বাড়িতে আনা হয়েছে।

কিন্তু এ-সমস্ত কথা যে সোমনাথের কানে যাচ্ছে তা মেজদা এবং বুলবুল কল্পনাও করতে পারেনি। সোমনাথের ঘরে ঢুকে বুলবুল একবার বলতে এলো, "সোম, তুমিও এসো। সবাই একসঙ্গে খেয়ে নেওয়া যাবে।"

সোমনাথ রাজী হলো না। বললো, "আজকে খাওয়াটা বাদ দেবো ভাবছি। পেটের অবস্থা খারাপ।"

বুলবুল চলে গেলো। খবর পেয়ে কমলা বউদি এলেন। "কখন পেট খারাপ

করলো? আগে বলোনি তো।"

সোমনাথ বললো, "এমন কিছু নয়, আপনি অতিথিদের দেখুন।"

কমলা বউদি বললেন, "ফ্রিজে রুই মাছ রয়েছে—একটু পাতলা ঝোলের ব্যবস্থা করে ফেলি?"

"পাগল হয়েছেন," সোমনাথ আপত্তি করলো। "একদিন শাসন করলেই ঠিক হয়ে যাবে। পেটকে অনেকদিন আস্কারা দিয়ে এই অবস্থা হয়েছে।"

সোমনাথ মনস্থির করে ফেলেছে। কিন্তু বাড়ির লোকেরা বুঝতে পারেনি। সেদিন সকালে বেরোবার সময় বউদি আবার সোমনাথকে মনে করিয়ে দিলেন, "বাবা বলছিলেন, আজ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের কার্ড রিনিউ করবার দিন।"

সোমনাথের যে এ-বিষয়ে আগ্রহ নেই তা বউদি বুঝলেন—তাই বললেন, "বাবা বলছিলেন, আজকাল এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের কার্ড না-থাকলে অনেক অফিসে কথাই শুনবে না।"

সোমনাথ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে সকাল কাটালো। ওখান থেকে বেরুবার সময়ে বিশুবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো।

বিশুবাবুর সঙ্গে ফুটবল খেলার মাঠে আলাপ। সুকুমারই বিশুবাবুর সঙ্গে প্রথম ভাব জমিয়েছিল। ভদ্রলোক ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের বিশ্বস্ত ভক্ত। বিশুবাবু বিজনেস করেন, এ-খবরও খেলার মাঠে অনেকবার শুনেছে সোমনাথ।

বিশুবাবুর কালো আবলুশ কাঠের মতো গায়ের রং। মাথার চুলগুলো কপালের দিক থেকে পাতলা হতে আরম্ভ করেছে। তার ফলে কপালটা চওড়া মনে হয়। মধ্যপ্রদেশেও ঈষৎ মেদ জমতে শুরু করেছে বিশুবাবুর। বয়স চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ হবে।

হাতে একটা ফোলিও ব্যাগ নিয়ে বিশুবাবু রাস্তার হিন্দুস্থানী দোকান থেকে বাংলা পান কিনছিলেন। সোমনাথকে দেখে বিশুবাবু চিৎকার করে উঠলেন, "কী মোহনবাগান? খবর কী?"

সোমনাথের মতামত না নিয়েই বিশুবাবু আর একটা পানের অর্ডার দিলেন। পান নিতে সোমনাথ একটু ইতস্তত করছিল। বিশুবাবু বকুনি লাগালেন। "এটা জেনে রাখবে পানের কোনো সময় নেই। যে কোনো সময় যতগুলো ইচ্ছে চিবোতে পারো—শুধু ওই লাল মসলাগুলো খেয়ো না।"

পানওয়ালার কাছে নিজের গুণ্ডিমোহিনী বিশুবাবু আলাদাভাবে চেয়ে নিলেন। তারপর বললেন, "মোহনবাগানের কতগুলো অপয়া ছেলে কালকে ইস্টবেঙ্গল-স্পোর্টিং ইউনিয়নের খেলা দেখতে এসেছিল। উদ্দেশ্য ইস্টবেঙ্গলের একটা পয়েন্ট-খাওয়া। দিস্ ইজ ব্যাড।" মতামত দিলেন বিশুবাবু। "তোমার ক্লাবকে তোমার সাপোর্ট করবার রাইট আছে, কিন্তু গায়ে-পড়া অপয়া ছেলেকে অন্য ক্লাবের সাপোর্টে পাঠিয়ে তাদের পয়েন্ট খাওয়া মোটেই স্পোর্টসম্যান-লাইক নয়।"

অন্য সময় হলে ফিক করে হেসে ফেলতো সোমনাথ। এমনকি বিশুবাবুর সঙ্গে তর্ক করে বলতো শত্রুকে হারাবার জন্যে কোনো চেষ্টাই অন্যায় নয়। সত্যি কথা বলতে কি, সুকুমারের প্ররোচনায় সোমনাথ একবার ইস্টবেঙ্গলের পয়েন্ট খেয়ে এসেছে। আজকে এসব প্রসঙ্গের অবতারণা করবার মতো মনের অবস্থা নেই সোমনাথের।

পান চিবোতে-চিবোতে বিশুদা জানতে চাইলেন, "হোয়ার ইজ ইওর ফ্রেণ্ড সুকুমার ?"

সুকুমার গোল্লায় যেতে বসেছে। আজ সকালেও বাসস্ট্যাণ্ডের কাছে সুকুমারকে দেখতে পেয়েছে সোমনাথ। এক ভদ্রলোককে মোটর সাইকেল থেকে নামিয়ে জিজ্ঞেস করছে, পৃথিবীর ওজন কত ?

সোমনাথ ছুটে না-এলে ভদ্রলোক হয়তো বেচারা সুকুমারকে মেরে বসতেন। মারের হাত থেকে বেঁচে সুকুমার বললো, "দেখছিস তো, কোনো লোক জেনারেল নলেজে হেল্প করতে চায় না। আমার চাকরি হলে তোমার কি ক্ষতি বাবা ?" কোনোরকমে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সোমনাথ ওকে যাদবপুরের বাসে তুলে দিয়েছিল। কণ্ডাকটরের হাতে বাসের ভাড়া দিয়ে বলেছিল সুলেখা স্টপেজের পরেই নামিয়ে দিতে।

বিশুবাবুর কাছে সোমনাথ এসব কিছুই বললো না।

"তোমার খবর কী ?" বিশুবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

সঙ্কোচ কাটিয়ে সোমনাথ এবার জিজ্ঞেস করলো, "বিশুদা, যাদের চাকরি-বাকরি হয় না তাদের কী করা উচিত ?"

পানের পিচটা হজম করে নিয়ে জাঁদরেল বিশুদা বললেন, "ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। সামনে যা পাওয়া যায় তাই পাকড়ে ধরতে হয়।" একটু ভেবে একগাল হেসে বিশুদা বললেন, "এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে লাইন মেরে বিরক্তি ধরে গিয়েছে বুঝি ? বোম কালী কলকাত্তাওয়ালী বলে ঝাঁপিয়ে পড়ো !"

"কোথায় ঝাঁপাবো ?" সোমনাথ একটু ঘাবড়ে যায়।

"ঘাবড়াবার কিছুই নেই," বিশুদা সোমনাথের পিঠে এক আলতো চাপড় লাগালেন। "চলো আমার সঙ্গে।"

বিশুবাবুর সঙ্গে হাঁটতে আরম্ভ করলো সোমনাথ। জি পি ও, রাইটার্স বিল্ডিংস এবং লালবাজার পেরিয়ে ওরা দুজনে এবার চিৎপুর রোডে পড়লো। আরও একটু এগিয়ে ডানদিকে পোদ্দার কোর্ট। তারপরে বাগড়ি মারকেট। বিশুবাবু বললেন, "ব্যাটাছেলের কোনো ইচ্ছে হলে সঙ্গে-সঙ্গে কাজে নেমে পড়তে হয়।"

সোমনাথ বললো, "আচ্ছা বিশুদা, বিজনেস করতে হলে কত টাকা লাগে?"

বিশুদা হেসে ফেললেন। বললেন, "হোল বিজনেস লাইফে এমন ডিফিকাল্ট কোশ্চেন আমাকে কেউ করেনি। এর উত্তর হলো,—দশ পয়সা থেকে দশ কোটি টাকা। ঐ যে কলাওয়ালা দেখছো ওর দু টাকাও পুঁজি নেই। আর সামনে পোদ্দার কোর্ট দেখছো, বুঝতেই পারছো কত টাকা খরচ হয়েছে বাড়িটা করতে। টাটা-বিড়লাদের টাকার যদি হিসেব চাও তাহলে মাথায় হাত দিয়ে বসবে। ওদের কোম্পানিগুলোর ব্যালান্সসীট থেকে ফিগার বার করে যোগ দিতে গেলে স্রেফ হেদিয়ে যাবে।"

"টাকা না-হলেও বিজনেস হতে পারে?" সোমনাথ একটু ভয়ে-ভয়েই জিজ্ঞেস করলো।

"আলবৎ হয়! এই যে কলকাতার সব লক্ষপতি কোটিপতি গোয়েঙ্কা, জালান, থাপর, কানোরিয়া, বাজোরিয়া, সিংঘানিয়া দেখছো এরা সব কি রাজস্থান, হরিয়ানা থেকে লাখ-লাখ টাকা পকেটে নিয়ে কলকাতায় বিজনেস করতে এসেছিল? খোঁজ নিলে দেখা যাবে, মূলধন বলতে অনেকেরই আদিতে রয়েছে ওয়ান লোটা এবং ওয়ান কম্বল।"

বিশুদা বললেন, "অন্য লোক কেন? আমার নিজেরই কেস ভাখো না। পার্টিশনের সময় যশোর থেকে চলে এসেছিলাম। ক্যাপিটাল বলতে পৈতৃক এই গতরটি। বিদ্যেরও জাহাজ—টি টি এম পি অর্থাৎ কিনা টেনে-টুনে ম্যাট্রিক-পর্যন্ত। কলকাতায় হাইকোর্ট বিল্ডিং ছাড়া কিছুই চিনি না। ওই বাড়িটা নেহাত প্রত্যেক বাঙালকেই তখন চিনতে হতো, ঘটিরা প্রথম চান্সেই বাঙালকে হাইকোর্ট দেখিয়ে দিতো। এই শহরে কে তখন আমাকে চাকরি দেবে? তাই জয়-মা-কালী কলকাত্তাওয়ালী বলে ব্যবসায় লেগে গেলুম। তারপর কোয়ার্টার-অফ-এ সেঞ্চুরি তো ম্যানেজ হয়ে গেলো।"

বিশুদা এরপর সোমনাথকে কানোরিয়া কোর্টে তাঁর অফিসে নিয়ে গেলেন। বললেন, "এ আর-এক অজানা জগৎ, বুঝলে ব্রাদার। সত্তর-আশিখানা ঘর

আছে এই বাড়িতে। আবার প্রত্যেক ঘরে যে কতগুলো করে কোম্পানি আছে তা ভগবানই জানেন। পনেরো বছর আগে তখন আমার রমরমা অবস্থা চলছিল, সেই সময় ছ'তলার বাহাত্তর নম্বর ঘরখানা বাড়িওয়ালার দারোয়ানকে আড়াই হাজার টাকা সেলামী দিয়ে ম্যানেজ করেছিলুম। এখনও চালাচ্ছি সেই অফিস থেকে।"

এই বাড়িতে একটা প্রাগৈতিহাসিক লিফট আছে। লিফটের সামনে বিরাট লাইন। বিশুদা বললেন, "সর্বদাই ভিড় লেগে রয়েছে। আগে দিন-কাল ভাল ছিল, মাসে পাঁচ টাকা বকশিশ পেলে লিফটম্যান সুন্দরলাল প্রেফারেন্স দিয়ে নিয়ে যেতো। বলতো মালিকের আদমী। এখন সে-উপায় নেই। বাবু থেকে আরম্ভ করে বেয়ারা পর্যন্ত সবাই আপত্তি তোলে। সুতরাং লাইনে দাঁড়াতে হয়। অনেক সময় লেগে যায়।"

সোমনাথ অবাক হয়ে শুনছিল বিশুদার কথা। বিশুবাবু বললেন, "জানো ব্রাদার, বিজনেসম্যান হলেই সোজাপথে কিছু করতে ইচ্ছে হয় না। তাড়াতাড়ি ম্যানেজ করবার জন্যে ছটফটানি লেগে থাকে! হয় লাইন ভেঙে এগিয়ে যাবো, দু-চার পয়সা দিয়ে ম্যানেজ করবো—আর তা যদি সম্ভব না হয় সিঁড়ি বেয়েই উঠবো।"

এরপর সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যাওয়ার প্রস্তাব করলেন বিশুদা। সোম-নাথের আপত্তি নেই। হাঁপাতে-হাঁপাতে ছ'তলায় উঠে বিশুবাবু বললেন, "বুঝতে পারছি বয়স হচ্ছে—এখন ছ'তলায় উঠতেই কষ্ট হয়। তোমাদের আর কি ইয়ংম্যান—কেমন তরতর করে উঠে এলে।"

ছ'তলাটাও একটা ছোটোখাটো পাড়ার মতো। অসংখ্য সরু গলি এদিক-ওদিক চলে গিয়েছে। সোমনাথ বললো, "এর মধ্যে লোকে নিজেদের অফিস খুঁজে পায় কী করে?"

বিশুবাবু হেসে উত্তর দিলেন, "প্রথম-প্রথম আমারও তাই মনে হতো। নিজের অফিসই খুঁজে পেতাম না। তারপর অভ্যাস হয়ে গেলো।"

বাহাত্তর নম্বর ঘরের সামনে এসে বিশুবাবু বললেন, "এই আমার অফিস।"

বিশুবাবু আরও যা বললেন তার থেকে জানা গেলো অফিসটা একসময় পুরোপুরি বিশুবাবুর ছিল। এখন তিনি অনেককে সাবলেট করেছেন। এই ঘরখানার মধ্যেই গোটা কুড়ি কোম্পানি চালু রয়েছে। এরা কিছু-কিছু ভাড়া দেয় বিশুদাকে। তার থেকে বাড়িওয়ালার পাওনা চুকিয়েও বিশুবাবুর সামান্য লাভ থেকে যায়।

বিশুবাবু বলছেন এতোগুলো অফিস। কিন্তু ঘরে লোকজন তেমন দেখা

গেলো না। গোটা দশেক টেবিল অবশ্য রয়েছে। বিশুবাবু হাসলেন। বললেন, "প্রত্যেক টেবিলে দুখানা করে কোম্পানি। এক কোম্পানি এধারে এবং আরেক কোম্পানি ওধারে। অফিসে বসে থাকলে তো আর পেট চলবে না। মালিকরা সবাই বাজারে মাছ ধরতে বেরিয়েছেন।"

বিশুবাবুর ওখানেই আর একটি লোকের সঙ্গে আলাপ হলো। বিশুবাবু বললেন, "ইনিই আমাদের কমাণ্ডার-ইন-চীফ ফকিরচন্দ্র সেনাপতি। নামে সেনাপতি কাজেও সেনাপতি। আমার সঙ্গে লাস্ট বাইশ বছর আছে। বাবা সেনাপতি, সোমনাথবাবু নতুন এলেন, একটু চা খাওয়াবি নাকি?"

সেনাপতি এতোক্ষণ পিটপিট করে সোমনাথের দিকে তাকাচ্ছিল। সে ময়লা একটা ধুতি পরেছে, তার ওপর ঘরে-কাচা পরিষ্কার কিন্তু ইস্তিরিবিহীন খাকি কোট। সেনাপতির ঠোঁট লাল, দাঁতে পানের ছোপ। ফকিরচন্দ্র কেটলি হাতে নিয়ে বিশুবাবুর দিকে ইঙ্গিত করে কী যেন জানতে চাইলো।

বিশুবাবু হাসতে-হাসতে বললেন, "ও-হরি ভুলেই গিয়েছিলুম। তিন নম্বর চা নিয়ে আয়।"

সেনাপতি চলে যেতেই বিশুবাবু বললেন, "এই নম্বরের ব্যাপারটা বুঝলে না নিশ্চয়। তিন নম্বর হলো ভাল চা উইথ ওমলেট অ্যাণ্ড টোস্ট। দু নম্বর হলো ভাল চা উইথ বিস্কুট। এবং এক নম্বর হলো স্রেফ অর্ডিনারি চা। যে কোনো ভদ্র জায়গা হলে অর্ডিনারি চায়ের নম্বর হতো তিন। কিন্তু এটা বিজনেসের জায়গা। কাস্টমার বা গেস্ট কিছুই বুঝতে পারবে না—ভাববে মিস্টার বোস এক নম্বর কায়দাতেই আপ্যায়ন করছেন।"

ফকির সেনাপতি চা ও খাবার নিয়ে আসতেই বিশুবাবু বললেন, "এই শ্রীমানকেই দেখো। আগে যেখানে কাজ করতো সেখানে সবাই ফকির বলে ডাকতো। ব্যাপারটা আমার ভাল লাগলো না। বিজনেসে আমরা কেউ ফকির হতে আসিনি। এখানে সব সময় ঐ অপয়া ডাক মোটেই ভাল লাগলো না। তখন থেকে শ্রীমানকে সেনাপতি করে দিলুম।"

লাজুক-লাজুক মুখভঙ্গিতে ফকিরচন্দ্র ফিক করে হাসলো। বিশুবাবু বললেন, "শ্রীমানের গুণের শেষ নেই। সব ক্রমশ জানতে পারবে। মিঃ সেনাপতি এই ঘরে রাত্রে থাকেন এবং এই অফিসের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা।"

ফকির সেনাপতি আবার ফিক করে হাসলো।

বিশুবাবু এবার সোমনাথকে বললেন, "তোমার যদি ইচ্ছে হয় বিজনেসে লেগে যাও। আমার ঘরটা তো রয়েছে। ছ'নম্বর টেবিলের এগারো নম্বর সীট খালি পড়ে আছে। নোপানি নামে এক ছোকরা ভাড়া নিয়েছিল। মাস

তিনেক তার কোনো পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। খবর নেবার জন্যে নোপানির বাড়িতে সেনাপতিকে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু সেখান থেকেও শ্রীমান কেটে পড়েছেন। সুতরাং তুমি ইচ্ছে করলে শূন্য চেয়ারে বসে পড়তে পারো।"

বিশুবাবু বললেন, "আমার খুব ইচ্ছে বাঙালীরা বিজনেস লাইনে আসুক। কিন্তু আসে কই?" তুমি যদি সাহস দেখাতে পারো খুব খুশী হবো। তিনটে মাস লাক ট্রাই করে ত্থাখো না? ওই তিন মাস আমি ভাড়া চার্জ করবো না। কিন্তু তারপর আশি টাকা করে নেবো। আশি টাকা ড্যাম চিপ বলতে পারো। এর মধ্যে বাড়ি ভাড়া, ফার্নিচার ভাড়া, সেনাপতির সার্ভিস এবং আলো পাখার সব খরচ থাকবে। বাইরে থেকে কল এলে টেলিফোনও ফ্রি। শুধু এখান থেকে ফোন করলে কল পিছু চল্লিশ পয়সা চার্জ। সঙ্গে-সঙ্গে পয়সা দিতে হবে না, সেনাপতি পাতায় লিখে নেবে। টেলিফোনে চাবি মারা থাকে—সেনাপতিকে বললেই খুলে দেবে।"

সোমনাথ একটু ভরসা পাচ্ছে। চাকরি পাবার ইচ্ছেটা যদিও পুরোপুরি মন থেকে মুছে যাচ্ছে না, তবু সে ভাবছে ব্যবসা জিনিসটা মন্দ কী?

বিশুবাবু বললেন, "বসে থেকো না ব্রাদার। বসে থাকলেই মরচে পড়ে। বিবেকানন্দ স্বামী বলতেন, মরচে পড়ে-পড়ে খতম হওয়ার থেকে ঘষে-ঘষে শেষ হয়ে যাওয়া শতগুণে ভাল।"

ঘড়ির দিকে তাকালেন বিশুবাবু। বললেন, "আজ আমার বাজারে একটু কাজ আছে। তুমি যদি কালকে এখানে মুখ দেখাও তাহলে বুঝবো বিজনেসে ইচ্ছে আছে। না হলে, যেমন মাঠে দেখা হচ্ছে তেমন হবে।"

কানোরিয়া কোর্ট থেকে বেরিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে ডালহৌসি স্কোয়ারে এসেছে সোমনাথ। পথের দুধারে অনেক লোককে দেখে সে একটু ভরসা পাচ্ছে। এরা সবাই তো চাকরি করে না, কিন্তু মোটামুটি খেয়ে-পরে বেঁচে আছে। তাহলে সোমনাথের একবার চেষ্টা করে দেখতে আপত্তি কি?

পাঁচ নম্বর বাসে বসেও সোমনাথ ভেবেছে। ওর মনে পড়ে গেলো, কিছুদিন আগে কমলা বউদিকে নিয়ে ট্রেনে চড়ে শ্রীরামপুর গিয়েছিল। ফেরবার পথে ইলেকট্রিক ট্রেনে এক ছোকরা চিৎকার করে ভারি মজার কথা বলেছিল: "আমার নাম নিশীথ রায়। বয়স তেইশ। পড়াশোনা স্কুল ফাইনাল। আমি নিজের চাকরির অ্যাপয়েন্টমেণ্ট লেটারে নিজে সই করেছি অ্যাজ ম্যানেজিং ডিরেকটর। আমার কর্মচারি হিসেবে আমার মাইনে ঠিক করি। গত মাসে দিয়েছি ছিয়াশি টাকা। নিশীথ রায় যদি খাটতে পারে তাহলে তাকে

ঠকাবো না। দেড়শ-দু'শ-আড়াইশ পর্যন্ত মাইনে করে দেবো।" এরপর ছোকরা পকেট থেকে কিছু ফাউনটেনপেন বার করেছিল বিক্রির জন্যে।

বাড়ি ফিরে এসে চুপচাপ ঘরে ঢুকে পড়লো সোমনাথ। কমলা বউদি চা নিয়ে এলেন। বললেন, "বাবা চিন্তা করছিলেন। নিশ্চয় এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে বিরাট লাইন পড়েছিল।"

"না, ওখানে ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে কাজ শেষ," সোমনাথ বললো।

কমলা বউদি খবরের কাগজ থেকে দুখানা কাটিং দিলেন, "বাবা আজ কেটে রেখেছেন।"

কাটিং দুটো সোমনাথ হাতে নিলো, কিন্তু তাকিয়েও দেখলো না।

বউদি জিজ্ঞেস করলেন, "রোদে ঘুরেছো নাকি? মুখ শুকিয়ে গেছে।" দেওরের জন্যে বউদির যে খুব মায়া হচ্ছে তা যে-কেউ বলে দিতে পারে।

সোমনাথ বউদির মুখের দিকে তাকালো। কিন্তু কোনো উত্তর দিলো না।

বউদি বললেন, "দুপুরে সুকুমার এসেছিল। তোমার জন্যে দুখানা জেনারেল নলেজের কোশ্চেন রেখে গেছে, সঙ্গে চিঠি। বলেছে যেখান থেকে পারো উত্তর যোগাড় করে রাখবে।"

সুকুমারের ইংরেজী চিঠিটা পড়লো সোমনাথ। সুকুমার অত্যন্ত জরুরী-ভাবে জানতে চেয়েছে, সমুদ্রের জল কেন লোনা? এবং ফরাসী বিপ্লবের সময় কোন নেতা স্নানের টবে খুন হয়েছিলেন।

বউদি বললেন, "বেচারা। ওর কী হয়েছে বলো তো? আমাকেও একটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করলো। বললো, আমাকে উত্তর যোগাড় করে দিতেই হবে।"

বেশ উদ্বিগ্নভাবে সোমনাথ জিজ্ঞেস করলো, "কী প্রশ্ন?"

কমলা বউদি বললেন, "সুকুমার জিজ্ঞেস করলো, দশরথের চার পুত্র রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্নের নাম সবাই জানে, কিন্তু তাঁর মেয়ের নাম কী?"

"আপনাকে এভাবে জ্বালাতন করার মানে?" সোমনাথ একটু চিন্তিত হয়ে উঠলো।

কমলা বউদি বললেন, "উত্তরটা আমার জানা ছিল, মায়ের কাছে শুনে-ছিলাম, রামচন্দ্রের বোনের নাম শান্তা। সেই শুনে খুব খুশী হলো সুকুমার। বললো, 'আপনাকে আর চিন্তা করতে হবে না। আমি কালই অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার পাঠিয়ে দেবো।'"

বদ্ধ পাগল হয়ে উঠেছে সুকুমারটা। কিন্তু কী করতে পারে সোমনাথ? আপনি পায় না খেতে আবার শঙ্করাকে ডাকে।

সোমনাথ বললো, "আপনাকে তাহলে খুব জ্বালিয়ে গেছে।"

বউদি চুপ করে রইলেন। কারুর সমালোচনা করা তাঁর স্বভাব নয়।

সোমনাথ বললো, "আমি কিন্তু পাগল হচ্ছি না, বউদি।"

"বালাই-ষাট। তুমি কোন দুঃখে পাগল হতে যাবে? মা নিজে বলে গেছেন, তোমার ভাগ্য খুব ভাল।"

"কবে কে একজন কী বলে গেছে, তা আপনি বিশ্বাস করেন বউদি?" সোমনাথ জিজ্ঞেস করলো।

"কেন করবো না? মায়ের কোনো কথা তো মিথ্যে হয়নি।" বউদি বললেন।

বউদির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো সোমনাথ। তারপর গভীর কৃতজ্ঞতায় বললো, "আমি যদি শরৎ চাটুজ্যে হতাম তাহলে আপনাকে নিয়ে মস্ত একখানা নবেল লিখতাম।"

"থাক। আগে তবু বউদির জন্যে দু-একটা কবিতা লিখতে—এখন তাও বন্ধ করে দিয়েছো!" বউদি দেওরকে বকুনি লাগালেন। বাবা ডাকছেন। কমলা বউদি এবার ওপরে গেলেন।

এ-বাড়িতে কমলা বউদিই একমাত্র সোমনাথকে অ্যাডমায়ার করতেন। মা তখনো বেঁচে। অঙ্কের খাতায় সোমনাথ একটা কবিতা লিখেছিল। তার জন্যে মায়ের কি বকুনি। "অঙ্কের খাতায় কবিতা লিখে তুমি রবিঠাকুর হবে?"

বউদি কিন্তু ছোট দেওরকে তুচ্ছ করেননি। গোপনে দাদাকে দিয়ে অক্সফোর্ডের দোকান থেকে নরম চামড়ায় মোড়া কালো রংয়ের একটা সুন্দর খাতা কিনে আনিয়েছিলেন। তার প্রথম পাতায় নিজের হাতে লিখেছিলেন 'একজন তরুণ কবিকে—তার বউদি', খাতাটা হাতে দিয়ে সোমনাথকে বউদি অবাক করে দিয়েছিলেন। বউদি বলেছিলেন, "কবিতা আমার খুব ভাল লাগে, ঠাকুরপো। যত তাড়াতাড়ি পারো ভরিয়ে ফেলবে, তারপর আবার খাতা দেবো।"

সোমনাথের দুঃখ, কমলা বউদি অপাত্রে আস্থা স্থাপন করেছিলেন এবং আজও অপাত্রে নিজের ভালবাসা অপচয় করে চলেছেন।

ছোটবেলায় সেই খাতাটা সোমনাথ দ্রুত বোঝাই করে ফেলেছিল। অনেকগুলো কবিতা লিখেছিল সোমনাথ। দুপুর বেলায় সবাই যখন শুয়ে পড়তো তখন বউদির সাথে সোমনাথের কাব্য-আলোচনা চলতো। সোমনাথ বলতো, "ইস্কুলে দু-একটা কবিতা শুনিয়েছি বউদি। কিন্তু মাস্টারমশাই বললেন কিসসু হয়নি।" বউদি দমতেন না—"বলুক গে যাক। তোমার কবিতা আমার খুব ভাল লাগে। লিখতে-লিখতে তোমার কবিতা নিশ্চয় আরও ভাল হবে। তখন দেশের সবাই তোমার নাম করবে।"

খাতাটা যত্ন করে রাখতে বলেছিলেন বউদি। বউদি কোথায় শুনেছিলেন,

কবিদের প্রথম কবিতার খাতা পরে অনেক দামে বিক্রি হয়।

সোমনাথ কিছু বলেনি। কিন্তু খাতার এক কোণে তার অলিখিত প্রথম কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গটা লিখে রেখেছিল। যদি কখনও বই ছাপা হয়, তাহলে প্রথমেই লেখা থাকবে - যিনি আমাকে কবি বলে প্রথম স্বীকার করেছেন তাঁকে।

বউদি বলেছিলেন, "এর মানেটা সন্দেহজনক। কারণ মোক্ষদাও হতে পারে। তুমি যখনই মোক্ষদাকে কবিতা শুনিয়েছো সে শুনেছে। ঐতিহাসিকরা প্রমাণ করে দেবে তখন এ-বাড়িতে বিয়ে হয়নি।"

সোমনাথ হেসেছিল। বলেছিল, "ঐতিহাসিকদের কে পাত্তা দিচ্ছে? নিজের জীবনস্মৃতিতে সমস্ত গোপন কথা ফাঁস করে দেবো। লিখে দেবো, মোক্ষদার স্বীকৃতির পিছনে রীতিমতো লোভ ছিল। দু-আনা পয়সার পান-দোক্তা প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি না পেলে সে কিছুতেই কবিতা শুনতে বসতো না। অথচ বৌদির স্বীকৃতিতে কোনো স্বার্থ ছিল না। রবীন্দ্রনাথের কাব্যলক্ষ্মী এবং সোমনাথের কাব্যকমলা।"

বউদি তখনও ছোট্ট মেয়ের মতো সরল ছিলেন। জিনিসটাকে রসিকতা ভেবে পুরোপুরি উড়িয়ে দিতে পারেননি। আন্তরিক বিশ্বাস ছিল দেওরটির ওপর। বলেছিলেন, "তুমি বিখ্যাত কবি হলে গ্র্যাণ্ড হয়। কবি সোমনাথের সঙ্গে আমারও নাম হয়ে যাবে।"

স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার সময়েও কবিতা লিখেছে সোমনাথ। কবিতার নেশা না-থাকলে সে হয়তো পরীক্ষায় ভাল করতে পারতো। কারণ ইনটেলিজেন্সের কোনো অভাব ছিল না সোমনাথের। কলেজে ঢুকেও অজস্র কবিতা লিখেছে সোমনাথ। বেশ কয়েকটা খাতা কখন যে কবিতায় বোঝাই হয়ে উঠেছে তা সোমনাথ নিজেই বুঝতে পারেনি।

কিন্তু কলেজ থেকে বেরিয়ে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের খাতায় নাম লেখানো মাত্রই কবিতার ধারা অকস্মাৎ শুকিয়ে গেলো। সোমনাথ আর খাতা কলম নিয়ে বসে না। বউদি কতবার অভিযোগ করেছেন, কিন্তু সোমনাথ লিখতে পারে না। বেকার সোমনাথের জীবন থেকে কাব্যলক্ষ্মী বিদায় নিয়েছেন। যে বেকার এ-সংসারে তার কিছুই মানায় না।

কেন এমন হলো, সোমনাথ ভেবেছে। যেসব মানুষের আত্মপ্রত্যয় থাকে সোমনাথ তাদের দলে নয়। যতটুকু আত্মবিশ্বাস ছিল, হাজারখানেক চাকরির চিঠি লিখে তা উধাও হয়েছে। যে-মানুষের আত্মবিশ্বাস নেই সে কেমন করে কবি হবে?

সোমনাথের এই মানসিক অবস্থার কথা একমাত্র সুকুমার জানতো। সুকুমার

বলেছিল, "দাঁড়া না। চাকরি যোগাড় করি আমরা—তখন ম্যাজিকের মতো আত্মবিশ্বাস ফিরে আসবে। তখন তুই কিন্তু কুঁড়েমি করিস না—আমাকে নিয়েও একটা কবিতা লিখিস। বাবা, মা, ভাই, বোন সবাইকে শুনিয়ে দেবো—চড়চড় করে প্রেস্টিজ বেড়ে যাবে!"

বাবার সঙ্গে কথা বলে বউদি আবার ফিরে এলেন। সোমনাথ বললো, "বউদি আপনার সঙ্গে খুব গোপন কথা আছে।"

বউদি হেসে ফেললেন, "গোপন কথা শুনতে আমার ভয় হয়। যা পেট-আলগা মানুষ, শেষে যদি কাউকে বলে ফেলি?"

সোমনাথ বললো, "আপনাকে ছাড়া আর কাউকে বলবো না, বউদি। আপনিও চুপচাপ থাকবেন।" তারপর বিজনেসের ব্যাপারটা সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে সোমনাথ বললো, "ট্রেনের সেই ছোকরার মতো নিজের অ্যাপয়েন্টমেণ্ট লেটার নিজেই সই করে দেখি।"

বউদি বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "বাবাকে বলতে আপত্তি কী।"

সোমনাথ রাজী হলো না। "কি হয় তার ঠিক নেই। আবার হয়তো লোক হাসাবো। আগে নেমে দেখি, ভাল করলে তখন বাবাকে জানাবো।"

বউদি রাজী হয়ে গেলেন। হেসে বললেন, "তোমার দাদার কাছে মিথ্যে কথা বলা মুশকিল। কিন্তু সে-সমস্যা সমাধান হয়ে গেছে। উনি আরও মাস-খানেক বম্বেতে থেকে যাচ্ছেন। কে একজন ছুটিতে যাবেন, তাঁর কাছে ট্রেনিং নিচ্ছেন।"

বউদি বললেন, "বাবার কথাও শুনো কিন্তু। যেখানে অ্যাপ্লিকেশন পাঠাতে বলেন, পাঠিয়ে দিও। আর বাকি সময়টা নতুন লাইনে যথাসাধ্য চেষ্টা কোরো।"

"জানেন বউদি, ব্যবসা জিনিসটা অনেকটা লটারির মতো। অনেকে তাড়াতাড়ি বড়লোক হয়ে যায়।"

প্রবল উৎসাহে বউদি বললেন, "তুমি হঠাৎ বিজনেসে দাঁড়িয়ে গেলে বেশ মজা হবে! বাবা তো বিশ্বাসই করতে চাইবেন না। আমাকেই তখন বকুনি খেতে হবে। বলবেন, বউমা সব জেনে-শুনে আমার কাছে চেপে গেলে কেন?"

ভবিষ্যতের রঙীন কল্পনায় দুজনে একসঙ্গে খুব হাসলো। বউদি জানতে চাইলেন, "বিজনেস করতে গেলে টাকার দরকার হয় না, খোকন?"

এ-ব্যাপারটা এখনও পর্যন্ত খেয়ালই হয়নি সোমনাথের। মাথা চুলকে বললো, "আগে হতো। এখন সম্ভবত দরকার হয় না। শিক্ষিত বেকারদের ধার দেবার জন্যে ব্যাঙ্কগুলো উচিয়ে বসে আছে।"

কমলা বউদির বিশ্বাস এত বেশি যে ওসবের মধ্যে তেমন ঢুকলেন না। শুধু বললেন, "মায়ের টাকাটা তো তোমার এবং আমার জয়েন্ট নামে ব্যাঙ্কে পড়ে আছে। পাশ বইটা দেখবে? তা তিন হাজার টাকা তো হবেই!"

এই টাকার কথা সোমনাথের খেয়ালই ছিল না।

বউদি চলে যাবার একটু পরেই বুলবুল ঘরে ঢুকলো।

যত বয়স বাড়ছে মেজদার বউ তত খুকী হচ্ছে। বাড়িতেও আজকাল ডলপুতুলের মতো সেজেগুজে বসে থাকতে ভালবাসে। এই দীপান্বিতা ঘোষাল আবার কলেজের ইউনিয়ন ইলেকশনের অন্যতম নায়িকা ছিল! ভোটের জন্যে দীপান্বিতা তখন সোমনাথকেও ধরেছিল। 'দেশকে যদি ভালবাসেন, যদি শোষণ থেকে মুক্তি চান তাহলে আমাদের দলকে ভোট দেবেন,' এইসব কী কী যেন তখনকার দীপান্বিতা ঘোষাল তড়বড় করে বলেছিল। বিয়ে করে ঐসব বুলি কোথায় ভেসে গিয়েছে। এখন বর, বরের চাকরি এবং নিজেদের শায়া ব্লাউজ ছাড়া কিছুই বোঝে না ভূতপূর্ব ইউনিয়ন নেত্রী বুলবুল ঘোষাল।

বুলবুল নিজে পড়াশোনায় ভাল ছিল না। সোমনাথ ও সুকুমার দুজনের থেকেই খারাপ রেজাল্ট করেছিল। কিন্তু বুলবুলের রূপ ছিল—মেয়েদের ওইটাই আসল। মোটামুটি ভালভাবে বি-এ পাস করেও সোমনাথ ও সুকুমার জীবনের পরীক্ষায় পাস করতে পারলো না। আর বি-এতে কমপার্টমেণ্টাল পেয়েও বুলবুল কেমন জিতে গেলো। কেউ তাকে প্রশ্ন করে না কেন পরীক্ষায় ভাল করোনি? মেয়েদের মলাটই ললাট!

বুলবুলের হাতে একটা ইনল্যাণ্ড চিঠি। সোমের চিঠি, কোনো মহিলার হস্তাক্ষর। বুলবুল বললো, "এই নাও! লেটার বক্সে পড়েছিল। আমি তো ভুলে খুলেই ফেলেছিলাম!" এই বলে বুলবুল আবার ফিক করে হাসলো।

এই হাসির মাধ্যমে বুলবুল যে একটা মেয়েলী প্রশ্ন করছে, তা সোমনাথ বুঝতে পারে। কিন্তু মেজদার বউকে সে বেশি পাত্তা দিলো না।

খামের ওপর হাতের লেখাটা সোমনাথ আবার দেখলো। তারপর চিঠিটা না-খুলেই বালিশের তলায় রেখে দিলো।

"আমার সামনে এসব চিঠি পড়বে না, আমি যাচ্ছি," একটু অভিমানের সুরে বললো বুলবুল।

বুলবুল চলে যাবার পরেও সোমনাথ একটু অস্বস্তি বোধ করলো। চিঠিটা কারুর হাতে না-পড়লেই খুশী হতো সোমনাথ। খামটার দিকে সে আর একবার তাকালো। এই চিঠি লেখবার মতো মেয়ে পৃথিবীতে একটি আছে। তার হাতের লেখার সঙ্গে যে পরিচিত। কিন্তু যার চাকরি নেই, ভবিষ্যৎ নেই, যে বাবার এবং দাদার গলগ্রহ সে তো এমন চিঠি পাবার যোগ্য নয়। এ ধরনের চিঠি সোমনাথকে মানায় না।

চিঠিটা খুলতে সাহস হচ্ছে না সোমনাথের। এক কাজল চোখের খেয়ালী মেয়ের নিষ্পাপ মুখচ্ছবি তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। শান্ত, স্নিগ্ধ, গভীর চোখের এই মেয়ের নাম কে যে রেখেছিল তপতী? ওকে দেখেই ঘরে বাইরে উপন্যাসের বিমলার মায়ের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল সোমনাথের। "আমাদের দেশে তাকেই বলে সুন্দর যার বর্ণ গৌর। কিন্তু যে আকাশ আলো দেয় সে নীল।"

আঙুল দিয়ে খামটা এবার খুলে ফেললো সোমনাথ। তপতী লিখেছে: "একেবারেই ভুলে গেলে নাকি? এমন তো কথা ছিল না। গতকাল ইউ-জি-সি স্কলারশিপের খবরটা এসেছে। এর অর্থ—সরকারী প্রশ্রয়ে ডি-ফিল করার স্বাধীনতা। ভাবলাম, খবরটা তোমারই প্রথম পাওয়া উচিত। কেমন আছো? ইতি তপতী।"

ইতি এবং তপতীর মধ্যে একটা কথা লেখা ছিল। কিন্তু লেখার পরে কোনো কারণে যত্ন করে কাটা হয়েছে। কথাটা কী হতে পারে? সোমনাথ আন্দাজ করার চেষ্টা করলো। চিঠিটা আলোর সামনে ধরে কাটা কথাটা পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করলো সোমনাথ। মনে হচ্ছে লেখা ছিল 'তোমারই'। যদি সোমনাথের আন্দাজ ঠিক হয়ে থাকে, তাহলে কথাটা তপতী কেন কাটতে গেলো? 'তোমারই তপতী' লিখতে তপতী কী আজকাল দ্বিধা করছে? নিজের চিঠি থেকে যে-কোনো অক্ষর কেটে দেবার অধিকার অবশ্যই তপতীর আছে। কিন্তু তাহলে চিঠি লেখার কী প্রয়োজন ছিল? তার ইউ-জি-সি স্কলারশিপের খবর প্রথম সোমনাথকেই দেওয়ার কথা ওঠে কেন?

এদিকে বাবা নিশ্চয় সোমনাথের জন্য অপেক্ষা করছেন। ভাবছেন এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের সমস্ত ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা সোমনাথের কাছ থেকে শোনা যাবে। কত লোক লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল? কতক্ষণ সময় লাগলো? অফিসার ডেকে কোনো কথা বললেন কি না? অথবা কেরানিরাই কার্ড নতুন করে দিলো।

ও বিষয়ে ছেলের কিন্তু বিরক্তি ধরেছে। এক্সচেঞ্জ অফিসের সামনে সাড়ে-পাঁচ ঘণ্টা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার অপমানকর অভিজ্ঞতা সে ভুলতে চায়।

সমবয়সিনী এক বালিকার মিষ্টি চিঠি বুকে নিয়ে সে শুয়ে থাকতে চাইছে। তপতীর সঙ্গে অনেকদিন যোগাযোগ করেনি সোমনাথ। ওর সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছে হয়েছে অনেকবার। ভবানীপুরের রাখাল মুখার্জি রোড তো বেশি দূর নয়। কিন্তু দ্বিধা ও সংকোচ কাটিয়ে উঠতে পারেনি সোমনাথ।

যাকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল, তার চিঠিই আজকে তাকে কাছে নিয়ে আসছে। চিঠিটা আরেকবার পড়তে বেশ ভাল লাগলো। অথচ ছোট্ট চিঠি। যা ভাল লাগছে তা এই চিঠির না-লেখা অংশগুলো—যেসব শূন্যস্থান একমাত্র সোমনাথের পক্ষেই পূরণ করা সম্ভব। যেমন তপতীর চিঠিতে কোনো সম্বোধন নেই। এখানে অনেক কিছুই বসিয়ে নেওয়া যায়: সবিনয় নিবেদন—খোকন—সোমনাথ—সোমনাথবাবু—প্রীতিভাজনেষু—প্রিয়বরেষু···। আরও একটা শব্দ তপতীর মুখে শুনতে ইচ্ছে করে, হাতের লেখায় দেখতে প্রবল লোভ হয়। শব্দটার প্রতিচ্ছবি তপতীর শ্যামলী মুখে সোমনাথ অনেকবার দেখেছে। কিন্তু বড় গম্ভীর এবং কিছুটা চাপা স্বভাবের মেয়ে। কেউ-কেউ আছে যা অনুভব করে তার ডবল প্রকাশ করে ফেলে। তপতী যা অনুভব করে তার থেকে অনেক কম জানতে দেয়। তবু কাল্পনিক সেই কথাটা সোমনাথ চিঠির ওপরেই আন্দাজ করে নিলো। তপতীর অনভ্যস্ত বাংলা হাতের লেখায় প্রিয়তম কথাটা কী রকম আকার নেবে তা কল্পনা করতে সোমনাথের কোনোরকম অসুবিধে হচ্ছে না।

তারপর তপতী লিখেছে: একেবারেই ভুলে গেলে নাকি? তপতীর ছোট্ট নরম গোল-গোল হাত দুটো দেখতে পাচ্ছে সোমনাথ। লেখার সময় বাঁ হাত দিয়ে এই চিঠির কাগজটা তপতী নিশ্চয়ই চেপে ধরেছিল। এই হাতে সুন্দর একগাছি সোনার কাঁকন পরে তপতী—অনেকটা বউদির কাঁকনে যে-রকম ডিজাইন আছে।

তপতীর ডান হাতের কড়ে আঙুলের নখটা বেশ বড় আকারের। এই নখটা নিয়ে ছাত্রজীবনে সোমনাথ একবার রসিকতা করেছিল। "মেয়েরা শখ করে নখ রাখে কেন?" তপতী প্রথমে লজ্জা পেয়েছিল—ওর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতিটি খুঁটিনাটি কেউ অডিট করছে এই বোধটাই ওর অস্বস্তির কারণ। তপতীর সঙ্গে সেদিন বান্ধবী শ্রীময়ী রায় ছিল। ভারি সপ্রতিভ মেয়ে। শ্রীময়ী বলেছিল, "অনেক দুঃখে মেয়েরা আজকাল নখ রাখছে, সোমনাথবাবু। মেয়ে হয়ে ট্রামে-বাসে যদি কলেজে আসতেন তাহলে বুঝতেন। কিছু লোক যা ব্যবহার করে। সভ্য মানুষ না জঙ্গলের জানোয়ার বোঝা যায় না।"

শ্রীময়ীর কথার ভঙ্গীতে তপতী ভীষণ লজ্জা পেয়েছিল। বন্ধুকে থামাবার

চেষ্টা করেছিল। "এই চুপ কর। ওদের ওসব বলে লাভ নেই, ওরা কী করবে।"

জন-অরণ্য কথাটা সোমনাথের মনে তখনই এসেছিল। কবিতা লেখার উৎসাহে তখনও ভাঁটা পড়েনি। কলেজের লাইব্রেরিতে বসে সোমনাথ একটা কবিতা লিখে ফেলেছিল। বিশাল এই কলকাতা শহরকে এক শ্বাপদসঙ্কুল গহন অরণ্যের সঙ্গে তুলনা করেছিল সোমনাথ—যেখানে অরণ্যের আইনই ভদ্রতার কোট পরে চালু রয়েছে। কেউ এখানে নিরাপদ নয়। সুতরাং অরণ্যের আদিম পদ্ধতিতেই আত্মরক্ষা করতে হবে। প্রকৃতিও তাই চায়—না-হলে সুদেহিনী সুন্দরীর কোমল অঙ্গেও কেন তীক্ষ্ণ নখ গজায়। দন্ত কৌমুদীতেও কেন আদিম যুগের শাণিত ক্ষুরধারের সহ অবস্থান?

কবিতার প্রথম কয়েকটা লাইন এখনও সোমনাথের মনে পড়ছে: "এও এক আদিম অরণ্য শহর কলকাতা / অগণিত জীব পোশাকে-আশাকে মানুষের দাবিদার / প্রকৃতি তালিকায় জন্তু মাত্র—।" কবিতার নাম দিয়েছিল: জন-অরণ্য।

কোনো নকল না-রেখেই কবিতাটা খাতার পাতা থেকে ছিঁড়ে তপতীর হাতে দিয়েছিল সোমনাথ। সেই ছেঁড়া পাতাটা তপতী যত্ন করে রেখে দিয়েছিল।

বিছানায় শুয়ে-শুয়ে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের কার্ড-হোল্ডার সোমনাথ হাসলো। কলেজের সেই সবুজ দিনগুলোতে তপতী প্রত্যাশা করেছিল সোমনাথ মস্ত কবি হবে। জন-অরণ্য সে মুখস্থ করে ফেলেছিল। কলেজ থেকে বেরিয়ে রাস্তায় বাসের জন্যে অপেক্ষা করতে-করতে তপতী বলেছিল, "একটা কবিতা শুনুন। 'এও এক আদিম অরণ্য শহর কলকাতা…।'।" সমস্ত কবিতাটা সে আবৃত্তি করে ফেললো। তপতীর মুখে কী সুন্দর শোনাচ্ছিল কবিতাটা।

শ্রীময়ী রায় কাছেই দাঁড়িয়েছিল। তপতীর মুখে কবিতা শুনে সে অবাক হয়ে গেলো। জিজ্ঞেস করলো, "তোর আবার কবিতায় আগ্রহ হলো কবে? আমি তো জানতাম হিসট্রি ছাড়া কোনো বিষয়ে তোর হুঁস নেই।"

তপতী লজ্জা পেয়েছিল। শ্রীময়ী জিজ্ঞেস করেছিল, "কবিতাটা কার লেখা?" তপতী ও সোমনাথ দুজনেই উত্তরটা চেপে গেলো। তপতী বলেছিল, "কবিতা ভাল লাগলে পড়ি। কবির নাম-টাম আমার মনে থাকে না।"

শ্রীময়ী অন্য বাসে রিজেণ্ট পার্কে চলে গিয়েছিল। দু নম্বর বাসের জন্যে অপেক্ষা করতে-করতে তপতী বলেছিল, "আপনার কবিতা ভাল হয়েছে—কিন্তু নেগেটিভ। বিরক্ত হয়ে আপনি আঘাত করেছেন, কিন্তু সমাজের মধ্যে আশার কিছু লক্ষ্য করেননি।"

কবি সোমনাথ মনে-মনে ধন্য হলেও প্রতিবাদ জানিয়েছিল। লাবণ্যময়ী

তপতীর ঝলমলে দেহটার ওপর চোখ বুলিয়ে মৃদু হেসে বলেছিল, "দাঁত, নখ এগুলো তো আঘাতেরই হাতিয়ার।"

ওর স্বরের গাঢ়তা তপতী উপভোগ করেছিল। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিয়েছিল, "মেয়েদের আপনি কিছুই বোঝেননি। নখ কি কেবল আঁচড়ে দেবার জন্যে? মেয়েরা নখে তাহলে রং লাগায় কেন?"

উত্তরটা খুব ভাল লেগেছিল সোমনাথের। তপতীর বুদ্ধির দীপ্তি অকস্মাৎ ওর মসৃণ কোমল দেহে ছড়িয়ে পড়েছিল। মুগ্ধ সোমনাথ বলেছিল, "এখন বুঝতে পারছি, লম্বা সরু এবং ধারালো নখ দিয়ে কোনো কবির কলমও হতে পারে।"

এমন কিছু নিবিড় পরিচয় ছিল না দুজনের মধ্যে। ফস করে এই ধরনের কথা বলে ফেলে সোমনাথ একটু বিব্রত হলো। হঠাৎ দু নম্বর বাস আসছে দেখে তপতী দ্রুত এগিয়ে গিয়ে রাষ্ট্রীয় পরিবহনের ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেলো—সে বিরক্ত হলো কিনা সোমনাথ বুঝতে পারলো না।

পরের দিন কলেজের প্রথম পিরিয়ডে তপতী সাইড বেঞ্চির প্রথম সারিতে বসেছিল। দূর থেকে ওর গম্ভীর মুখ দেখে সোমনাথের চিন্তা আরও একটু বেড়েছিল—ফলে অধ্যাপকের লেকচার কানেই ঢুকলো না সোমনাথের। প্রায় পনেরো মিনিট নজর রাখার পর দুজনের চোখাচোখি হলো। দৃষ্টিতে বিশেষ কোনো বিরক্তির চিহ্ন ধরা না-পড়ায় নিশ্চিন্ত হলো সোমনাথ। তপতীর সর্দি হয়েছে। মাঝে-মাঝে রুমাল বার করে নিজেকে সামলাচ্ছে।

দুপুরবেলায় দুজনে আবার দেখা হয়েছিল। ক্লাস থেকে আরেক ক্লাসে যাবার পথে তপতী দ্রুত ওর হাতে একটা ছোট্ট প্যাকেট গুঁজে দিয়ে উধাও হয়েছিল। বন্ধুদের সতর্কদৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে কলেজের লাইব্রেরিতে গিয়ে প্যাকেট খুলেছিল সোমনাথ। একটা পাইলট পেন—সঙ্গে ছোট্ট চিরকুট। কোনো সম্বোধনই নেই—লেখিকার নামও নেই। শুধু লেখা: "নখকে কলম করা নিতান্তই কবির কল্পনা। কবিতা লিখতে হয় কলম দিয়ে।"

সবুজ রংয়ের সেই কলম আজও সোমনাথের হাতের কাছে রয়েছে। তপতীর সেই প্রত্যাশার সম্মান রাখতে পারেনি সোমনাথ। কবিতা না লিখে, বস্তা-বস্তা আবেদন পত্র বোঝাই করে-করে কলমকে ভোঁতা করে ফেলেছে সোমনাথ। অসুস্থ কলমটা মাঝে-মাঝে বমি করে—হঠাৎ বিনা কারণে ভক-ভক করে কালি বেরিয়ে আসে। সোমনাথ ব্যানার্জির এই পরিণতি হবে জানলে, তপতী নিশ্চয় তাকে কলম উপহার দিতো না। কলম দিয়ে তপতীর চিঠির ওপর হিজিবিজি দাগ কাটতে-কাটতে নানা অর্থহীন চিন্তার জালে সোমনাথ জড়িয়ে পড়লো।

সকাল দশটা। হাতে অ্যাটাচি কেস নিয়ে নতুন জীবন আরম্ভ করতে বেশ লাগছে সোমনাথের। অ্যাটাচি কেসটা কমলা বউদি জোর করে হাতে ধরিয়ে দিলেন—বড়দার নাকি একাধিক আছে, কোনো কাজে লাগছে না।

এবারেও ওর পকেটে ফুল গুঁজে দিলেন কমলা বউদি। আশীর্বাদ করে বললেন, "তুমি মানুষ হবে—আমার কোনো সন্দেহ নেই।"

সোমনাথ মনে-মনে নিজেকে প্রশ্ন করলো, মানুষ হওয়া কাকে বলে? তারপর ওর মনে হলো, নিজের অন্ন নিজে জুটিয়ে নেবার ব্যবস্থা করা মানুষ হবার প্রাথমিক পদক্ষেপ।

সোমনাথ বুঝতে পারছে, বেশ দেরি হয়ে গিয়েছে। এখনও নিজের পায়ে না দাঁড়ালে আর মনুষ্যত্ব থাকবে না।

কানোরিয়া কোর্টের বাহাত্তর নম্বর ঘরে বিশুবাবু বসেছিলেন। সোমনাথকে দেখেই উৎফুল্ল বিশুবাবু বললেন, "এসো এসো।"

সোমনাথ তখনও বুঝতে পারছিল না, হৃদয়হীন উদাসী সময় তাকে কোন পথে নিয়ে চলেছে।

এসব চিন্তা তার মাথায় হয়তো আজ আসতো না, যদি-না বাস স্ট্যাণ্ডের কাছে সুকুমারের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতো। সোমনাথের ফর্সা জামাকাপড় দেখে সুকুমার বললো, "বেশ বাবা! লুকিয়ে-লুকিয়ে চাকরির ইণ্টারভিউ দিতে যাচ্ছিস।"

সুকুমারের রুক্ষ চাহনি ও খোঁচাখোঁচা দাড়ি দেখে কষ্ট হচ্ছিল সোমনাথের। সুকুমার বললো, "মিনিট দশেক দাঁড়া—জামাকাপড় পাল্টে আমিও তোর সঙ্গে ইণ্টারভিউ দিয়ে আসবো।"

সোমনাথকে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সুকুমার কাতরভাবে বললো, "আমি গ্যারাণ্টি দিয়ে বলতে পারি লাট সাহেব, চীফ মিনিস্টার, টাটা, বিড়লা কেউ আমার সঙ্গে জেনারেল নলেজে পেরে উঠবে না।"

সোমনাথ ওর হাত দুটো ধরে বললো, "বিশ্বাস কর, আমি ইণ্টারভিউ দিতে যাচ্ছি না।"

"তুইও আমাকে মিথ্যে কথা বলছিস?" হঠাৎ চীৎকার করে উঠলো সুকুমার। তারপর অকস্মাৎ কান্নায় ভেঙে পড়লো সে। বললো, "আমার যে একটা চাকরি না হলে চলছে না, ভাই।"

সোমনাথের গম্ভীর মুখ দেখে বিশুবাবু ভুল বুঝলেন। বললেন, "কী ব্রাদার। অফিসার না হয়ে বিজনেসম্যানদের খাতায় নাম লেখাতে হলো বলে মন খারাপ নাকি?"

সোমনাথ বললো, "চাকরি যখন আমাকে চাইছে না, তখন আমি চাকরিকে চাইতে যাবো কেন?"

বিশুবাবু বললেন, "পাকিস্তানে সব খুইয়ে যখন এসেছিলুম তখন আমার অবস্থা শোচনীয়। মুরগীহাটায় মুটেগিরি করেছিলুম ক'দিন। তারপর চটা সুদে দশ টাকা ধার করে একঝুড়ি কমলালেবু কিনতে গেলাম। আনাড়ী লোক, ফলের বাক্সর ওপর লাল-নীল সাঙ্কেতিক দাগ থেকে কী বুঝবো? আমার অবস্থা দেখে চিৎপুর পাইকারী বাজারে এক বুড়ো মুসলমানের দয়া হলো। দেখে শুনে কমলালেবুর একটা বাক্স ভদ্রলোক কিনিয়ে দিলেন। প্রথম দিন বেশ মাল বেরুলো। পাঁচ ঘণ্টা রাস্তায় বসে ছ টাকা নেট লাভ করে ফেললুম—মনের আনন্দে নিজের অজান্তে দুটো লেবুও খেয়ে ফেলেছি। চটা সুদ-কোম্পানির গোঁফওয়ালা যণ্ডামার্কা যে লোকটা সন্ধেবেলায় পাওনা টাকা আদায় করতে আসতো, সে তো অবাক। ভেবেছিল আমি টাকা শোধ করতে পারবো না। দশ টাকা দশ আনা তাকে ফেলে দিলুম। রইলো এক টাকা ছ' আনা।"

নিজের গল্প বন্ধ করলেন বিশুবাবু। বললেন, "থাক ওসব কথা। এখন তোমার হাতে-খড়ির ব্যবস্থা করি। মল্লিকবাবুকে ডেকে পাঠাই।"

সেনাপতি ছুটলো মল্লিকবাবুকে ডাকতে। একটু পরেই চোখে একটা হ্যাণ্ডেল-ভাঙা চশমা লাগিয়ে হাজির হলেন বুড়ো মল্লিকবাবু। পরনে ফতুয়া, পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি। ভদ্রলোক এ-পাড়ার ছাপাখানা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করেন।

বিশুবাবু বললেন, "মল্লিকমশাই, সোমনাথের লেটার হেড এবং ভিজিটিং কার্ডের ব্যবস্থা করে দিন। আমার ঘরের নম্বর এবং টেলিফোন দিয়ে দেবেন।"

"নাম কী হবে?" মল্লিকবাবু ঝিমোতে-ঝিমোতে জিজ্ঞেস করলেন।

"সত্যি তো, নাম একটা চাই," বিশুবাবু বললেন। "কিছু প্রিয় নাম-টাম আছে নাকি?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

প্রিয় নাম একটা আছে—কমলা। কিন্তু এই জীবনের জটের সঙ্গে তাঁকে শুধু-শুধু জড়িয়ে ফেলে কী লাভ? তার থেকে বরং দায়িত্বটা পুরোপুরি নিজের ওপরেই থাক—কোম্পানির নাম দেওয়া যাক: সোমনাথ উদ্যোগ।

নাম শুনেই বিশুবাবু বললেন, "ফার্স্ট ক্লাস। এই উদ্যোগ কথাটা মাড়ওয়ারীরা খুব ব্যবহার করছে। আর তোমার নিজের নামখানিও খাসা।

কার সাধ্য ধরে বাঙালীর কারবার? প্রয়োজন হলে গুজরাতী কনসার্ন বলে চালিয়ে দেওয়া যাবে। সোমনাথ নামটা গুজরাতীদের খুব প্রিয়—ওদের সেন্টিমেণ্টেও লাগে। সোমনাথ মন্দিরটা কতবার যে বিদেশীরা এসে ঝেড়েঝুড়ে সাবাড় করে দিলো।"

মল্লিকবাবু চলে যেতেই বিশুবাবু বললেন, "এই যে পাড়া দেখছো, এখানে লাখ-লাখ কোটি-কোটি টাকা উড়ে বেড়াচ্ছে। যে-ধরতে জানে সে হাওয়া থেকেই টাকা করছে। এসব গল্পকথা নয়—দু-দশটা লাখপতি এই কলকাতা শহরে এখনও প্রতিমাসে তৈরি হচ্ছে। আমি বাপু তোমাকে জলে ছেড়ে দিলুম, কিন্তু সাঁতার নিজে থেকেই শিখতে হবে। ঝিনুকে করে এই লাইনে দুধ খাওয়া শেখানো হয় না।"

বিশুবাবু কথা বলতে-বলতেই ঘরের মধ্যে কম বয়সী এক ছোকরা ঢুকলো। বয়স সতেরো-আঠারোর বেশি নয়। বিশুবাবু বললেন, "অশোক আগরওয়ালা। ওর বাবা শ্রীকিষণজী আমার ফ্রেণ্ড। রাজস্থান ক্লাবের অন্ধ ভক্ত। তবে শীল্ডে রাজস্থান হেরে যাবার পর ইস্টবেঙ্গলকে সাপোর্ট করে।"

অশোককে ডাকলেন বিশুবাবু। "অশোক কেমন আছো? পিতাজীর তবিয়ত কেমন?"

পিতাজী যে ভাল আছেন, অশোক বিনীতভাবে বিশুবাবুকে জানালো। বিশুবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "অশোক তুমি কার সাপোর্টার?"

অশোক নির্দ্বিধায় বললো, "রাজস্থান অ্যাণ্ড ইস্টবেঙ্গল।"

"রাজস্থান তো বুঝলাম। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল কেন, আমার ফ্রেণ্ড মিস্টার সোমনাথকে একটু বুঝিয়ে বলো তো।"

অশোকের উত্তরে জানা গেলো, ইস্টবেঙ্গল তার বাবার জন্মস্থান। নারায়ণগঞ্জে তাদের পাটের কারবার ছিল। তাই ওরা ভাল বাংলা জানে। শ্রীকিষণজী তো বাংলা নবেলও পড়েন।

ওদের দুজনের আলাপ হয়ে গেলো। অশোক ছেলেটি বেশ ভাল। বিশুবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আজ কিছু জালে পড়লো?"

অশোক বললো, "বাজার খারাপ, কিছুই হচ্ছিলো না। শেষপর্যন্ত চল্লিশখানা ফ্ল্যাট ফাইলের অর্ডার ধরেছি। মাত্র চার টাকা থাকবে।"

অশোকের হাতে একটা বড় কাগজের প্যাকেট। অশোক বললো, "ট্যাক্সি চড়তে গেলে কিছুই থাকবে না। তাই বাসের ভিড় কম থাকতে-থাকতে ডেলিভারি দিয়ে আসবো ভাবছি।"

ফাইলের তাড়া নিয়ে অশোক বেরিয়ে গেলো। বিশুবাবু বললেন, "ওর

বাবা টাকার পাহাড়ে বসে আছেন। দু-তিনটে বড়-বড় কোম্পানির মালিক। তিন-চারশ' লোক ওঁর আণ্ডারে কাজ করে। আবার একটা কেমিক্যাল ফ্যাকটরি বানাচ্ছেন। অশোক মর্নিং ক্লাসে বি কম পড়ে। বাবা কিন্তু ছেলেকে দুপুরবেলায় ধান্দায় লাগিয়ে দিয়েছেন।"

সোমনাথ শুনলো অশোকের জন্যে নিজের কোম্পানিতে স্থান করেননি শ্রীকিষণ আগরওয়ালা। ছেলের হাতে আড়াইশ' টাকা দিয়ে চরে খেতে পাঠিয়েছেন। শ্রীকিষণজী চান ছেলে নিজের খুশী মতো বিজনেস করুক। বিশুবাবুর অফিসে বসে অশোক। আর বাজারে একলা ঘুরে-ঘুরে ঠিক করে কোন বিজনেস করবে।

"বাঙালী বড়লোকেরা এসব ভাবতে পারে?" বিশুবাবু দুঃখ প্রকাশ করলেন। "তাঁদের ছেলেদের গায়ে একটু রোদ লাগলে ননী গলে যাবে।"

অশোকের উৎসাহ আছে। নিজের কলেজেই বিজনেসের সুযোগ নিয়েছে। ওখানেই ফাইলগুলো সাপ্লাই করবে।

বিশুবাবু বললেন, "বিজনেসের অনেক জিনিস গোপন রাখতে হয়। সুতরাং তোমাকে আমি রোজ পাখি-পড়া করাবো না। নিজের ময়লা নিজে সাফ করবে, নিজের গোলমাল নিজে মেটাবে। আমি জিজ্ঞেস করতেও আসবো না।"

বিশুবাবুর নিজের কিন্তু তেমন ব্যবসায় মন নেই। কোনোরকমে চালিয়ে নেন। সেনাপতি বলে, "সায়েবের আর কী? বিয়ে-থা করেননি। সংসারের টান বলতে মা ছিলেন। দু বছর হলো মা দেহ রেখেছেন। এখন দুর্বলতা বলতে ওই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবটুকু। ইস্টবেঙ্গলের খেলা থাকলে মাঠে যাবেনই। তাতে বিজনেস থাকুক আর যাক।"

বিশুবাবুর আর একটা দোষ আছে। সন্ধেবেলা একটু ড্রিঙ্ক করেন বিশু-বাবু। ওঁর ভাষায়, "রাত্রে একটু আহ্নিকে বসতে হয় ব্রাদার। ব্যাড্ হ্যাবিট হয়ে গিয়েছে। ঐ এলফিনস্টোন বার-এ গিয়ে বসি। ইয়ার বন্ধুদের সঙ্গে দুটো প্রাণের কথা হয়। ওখান থেকেও মাঝে-মাঝে দু-চারটে বায়না এসে যায়। গত সপ্তাহে এলফিনস্টোন বার-এ শুনলাম এক ভদ্রলোক একখানা লরি বেচবেন। শ্রীকিষণজীর একখানা লরি কিছুদিন আগে ধানবাদের কাছে অ্যাক্সিডেন্টে নষ্ট হয়ে গিয়েছে শুনেছিলুম। এলফিনস্টোন বার থেকে পোদ্দার কোর্টে শ্রীকিষণজীকে ফোন করলুম। তারপর গডেস কালীর নাম করে দুই পার্টিকে ছাদনাতলায় হাজির করিয়ে দিলুম। পকেটে পাঁচশ' টাকা এসে গেলো উইদাউট এনি ইনভেস্টমেণ্ট। এর নাম ভগবানের বোনাস। হঠাৎ হয়তো বিশ্বনাথ বোসের কথা মনে পড়ে গেলো ভগবানের—ভাবলেন, হতভাগার জন্যে

অনেকদিন কিছু করা হয়নি।"

বিশুবাবু এরপর সোমনাথকে নিয়ে বাজারে বেরিয়েছিলেন। ভিড় ঠেলে রাস্তায় হাঁটতে-হাঁটতে বিশুবাবু বলছিলেন, "দুনিয়াতে যত ব্যবসা আছে তার মধ্যে এই অর্ডার সাপ্লায়ের ব্যবসাটা সব চেয়ে সহজ। সুখেরও বলতে পারো —অবশ্য যদি চলে।"

ব্যাপারটা কি জানতে চাইলো সোমনাথ। বিশুবাবু বললেন, "অপরের শিল অপরের নোড়া, তুমি শুধু কারুর দাঁতের গোড়া ভেঙ্গে টু-পাইস করে নিলে।"

এরপর বিশুবাবু ব্যাখ্যা করলেন, "অপরের ঘরে মাল রয়েছে। তুমি খোঁজ-খবর করে দাম জেনে নিলে। তারপর যদি একটা খদ্দের খুঁজে বার করতে পারো যে একটু বেশি দামে নিতে রাজী আছে—তা হলেই কম্ম ফতে।"

"তাহলে দাঁড়ালো কী?" বিশুবাবু প্রশ্ন করলেন। "বাজারে কোন জিনিস কত সস্তায় কার ঘরে পাওয়া যায় জানতে হবে। তারপরে সেই মাল কাকে গছানো যায় খবর করতে হবে। ব্যস—আমার কথাটি ফুরলো, নোটের তাড়াটি পকেটে এলো!"

এই নতুন জগতে সোমনাথ এখনও বিশেষ ভরসা পাচ্ছে না। কোনো অজানা জগতে বেপরোয়াভাবে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজের মনস্কামনা সিদ্ধি করবার মতো মানসিকতা সোমনাথের নেই। থাকবেই বা কী করে? বড় নিরীহ প্রকৃতির মানুষ সে। কলকাতার লক্ষ-লক্ষ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেদের মতোই সে মানুষ হয়েছে—জন-অরণ্যে নিরীহ মেষশাবক ছাড়া আর কিছুর সঙ্গেই এদের তুলনা করা চলে না।

বিশুবাবু এসব নিয়ে মাথা ঘামান না। আপন মনে তিনি বললেন, "বিজনেসের ডেফিনিশন দিতে গিয়ে যে-ভদ্রলোক বলেছিলেন—ব্যবসা মানে সস্তায় কেনা এবং বেশি দামে বেচা, তাঁকে অনেকে সমালোচনা করে। কিন্তু সার সত্যটি এর মধ্যেই আছে।"

কয়েকটা লোক দেখিয়ে বিশুবাবু বললেন, "এই বাজারে হাজার-হাজার লোক অর্ডার সাপ্লায়ের ওপর বেঁচে আছে। অফিসের আলপিন থেকে আরম্ভ করে চিড়িয়াখানার হাতি পর্যন্ত যা-বলবে সব সাপ্লাই করবে এরা। তবে মার্জিন চাই।"

হাতির কথা শুনে বোধহয় সোমনাথের মুখে হাসি ফুটে উঠেছিল। বিশুবাবু বললেন, "হাসছো? বিশ্বাস হচ্ছে না? চলো শ্যামনাথবাবুর কাছে।"

একটা ছোট্ট আপিসে মুখ শুকনো করে বসে আছেন শ্যামনাথ কেদিয়া। মোটাসোটা মধ্যবয়সী ভদ্রলোক। একটু তোতলা। বিশুবাবুকে দেখে

কেদিয়াজী মৃদু হাসলেন। বললেন, "কী বোসবাবু, কুছ এনকোয়ারি পেলেন

বিশুবাবু বললেন, "না কেদিয়াজী, তুটো-তিনটে সার্কাস কোম্পানির খবরা-খবর করলাম—কিন্তু হাতির বাজার খুব নরম। সামনে বর্ষা, কেউ এখন স্টকে হাতি তুলতে চাইছে না।"

কেদিয়াজী ঠোঁট উল্টে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, "এখোন লিচ্ছে না—পরে আফসোস করবে। একই হাতি তিন হাজার রুপীয়া জাদা দিয়ে লিতে হোবে।"

বিশুবাবু বললেন, "সার্কাস কোম্পানি তো—মাথায় অত বুদ্ধি নেই। আপনি বরং হাতিটাকে শোনপুরের মেলায় পাঠিয়ে দিন। ওখানে এক গ্রোস হাতি বিক্রি করতেও অসুবিধা হবে না।"

"সোব জায়গায় গণ্ডগোল। হাতির ওয়াগন মিলতেই বহুত টাইম লেগে যাচ্ছে," তুঃখ করলেন কেদিয়াজী।

"আপনি তাহলে এক্সপোর্টের চেষ্টা করুন। পৃথিবীর অন্য জায়গায় হাতির খুব কদর।" বিশুবাবু মতলব দিলেন।

কেদিয়াজী সে-খোঁজও নিয়েছিলেন। ওয়েলিংটন বলে এক সাহেব মাঝে-মাঝে জন্তুজানোয়ার কিনতে কলকাতায় আসেন। তিনি এলেই কেদিয়াজী সাডার স্ট্রীটে ফেয়ারল্যাণ্ড হোটেলে লোক পাঠাবেন। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসের আগে ওয়েলিংটন সায়েবের কলকাতায় আসবার সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া 'ফোরেন' মার্কেটে কেবল বেবি হাতির কদর। এরোপ্লেনে পাঠাতে খরচ কম। পকেট থেকে প্লেন ভাড়া দিয়ে কয়েক টন ওজনের ধাড়ি হাতি বিদেশে পাঠাতে হলে ঢাকের দায়ে মনসা বিকিয়ে যায়।

বিশুবাবু এবার সোমনাথের পরিচয় দিয়ে কেদিয়াজীকে বললেন, "ইয়ং মিস্টার ব্যানার্জি হাই সোসাইটিতে ঘোরেন। ওঁর আত্মীয়স্বজন সব বড়-বড় কোম্পানির বড়-বড় পোস্টে রয়েছেন।"

কেদিয়াজী এবার বিশুবাবুকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে কি সব আলোচনা করলেন। তারপর ফিরে এসে কেদিয়াজী ফিক-ফিক করে হাসতে লাগলেন। সোমনাথকে বললেন, "আচ্ছা কোনো কোম্পানিকে আপনি হাতিটা সেল করুন। আচ্ছা কমিশন মিলবে।"

"বড়-বড় কোম্পানি কেন হাতি কিনতে যাবে?" বিজনেসে অনভ্যস্ত সোমনাথ খোলাখুলি সন্দেহ প্রকাশ করলো।

এ-লাইনে কোনো সেল্‌সম্যান এইভাবে প্রশ্ন করে না। কিন্তু কেদিয়াজী বিরক্তি প্রকাশ করলেন না। বললেন, "জানা-শোনা থাকলে ফোরেন কোম্পানির বড় সায়েবরা সোব চিজ লিয়ে লেবে।"

অনেককেদিয়াজীর ওখান থেকে বেরিয়ে বিশুবাবু বললেন, "অতি লোভে কেদিয়া ডুবতে বসেছেন। ইলেকট্রিকাল গুডসের দালালি করে হাজার পঁচিশেক কামিয়েছিলেন লাস্ট ইয়ারে। এ-বছরের গোড়ার দিকে এক হিন্দী সিনেমা কোম্পানির খপ্পরে পড়েছিলেন। ওরা একটা হাতি কিনে শুটিং করছিল। শুটিং-এর শেষে ফিল্ম কোম্পানি বোম্বাইতে হাতি ফিরিয়ে নিয়ে গেলো না। জলের দামে হাতি পাচ্ছেন ভেবে কেদিয়া কিনে ফেললেন। তখন এক সার্কাস কোম্পানির দালালের সঙ্গে কেদিয়াজীর যোগাযোগ ছিল, সে লোভ দেখিয়েছিল মোটা দামে হাতি বেচে দেবে।"

যা জানা গেলো সেই দালালই কেদিয়াজীকে ডুবিয়েছে। হাতির বাজারে উন্নতির জন্যে কেদিয়াজী মাস কয়েক অপেক্ষা করতে তৈরি ছিলেন। কিন্তু হাতির খোরাক যোগাতে প্রতিদিন যে পঞ্চাশ-ষাট টাকা খরচ করতে হবে, এই হিসেবটা তিনি ধরেননি।

"খোঁজখবর না নিয়ে হাতির ব্যবসায়ে ঝাঁপিয়ে পড়লে এই হয়," বিশুদা বললেন। "এখন হাতির খরচ এবং একটা মাহুতের মাইনে গোনো! তার ওপর পুলিশের হাঙ্গামা। হাতির জন্যে যে লাইসেন্স করতে হয় তাও জানতেন না কেদিয়াজী।" হাতি বাজেয়াপ্ত হতে বসেছিল। জানা-শোনা এক পুলিশের সাহায্যে বিশুদা ক'দিন বহু চেষ্টা করে ম্যানেজ করে দিয়েছেন। কিন্তু এবার হাতি সরাতেই হবে। তাই জলের দামে হাতি বেচে দিতে চাইছেন কেদিয়াজী।

বিশুদা নিজেও মুচকি হাসলেন। তারপর বললেন, "আমরা হাসছি—কিন্তু সিরিয়াসলি কাজ করলে এর থেকেও হাজার খানেক টাকা রোজগার করতে পারো। বলা যায় না, বড় কোনো কোম্পানির পাবলিসিটি ডিপার্টমেণ্ট প্রচারের জন্যে হাতি লিজ নিতে পারে। তারপর পুজো নাগাদ শিক্ষিত হাতির দাম বেশ উঠে যাবে। সার্কাস কোম্পানিদের তখন ঘুম ভাঙবে।"

সমস্ত ব্যাপারটা রসিকতা মনে হয়েছিল তখন। কিন্তু পরের দিন বিকেলেই সোমনাথ শুনলো কেদিয়াজীর হাতি বিক্রি হয়ে গিয়েছে। কোনো এক দালাল দশ পারসেণ্ট কমিশনে হাতি হাওয়া করে দিয়েছে। কেদিয়াজী অবশ্য প্রতিজ্ঞা করেছেন যে-লাইনে অভিজ্ঞতা নেই সে ব্যবসায় তিনি আর হাত বাড়াবেন না।

মল্লিকবাবু ছাপানো প্যাডগুলো দিয়ে গেলেন। কিন্তু যাবার সময় বললেন, "একখানা মাত্র কোম্পানি করবেন?"

মল্লিকবাবু ভেবেছেন কী? সোমনাথ কি মস্ত ব্যবসায়ী? "একটা কোম্পানি সামলাতে পারি কিনা দেখি।" সোমনাথ সলজ্জভাবে মল্লিকবাবুকে বললো।

অনভিজ্ঞ সোমনাথের কথা শুনে হেসে ফেললেন মল্লিকবাবু। চশমার মোটা কাঁচের ভিতর দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, "ফরটি ইয়ারস এ-লাইনে হয়ে গেলো—একটা কোম্পানি করলে বিজনেসে টেকা যায় না।"

"মানে?" একটু অবাক হয়েই সোমনাথ জিজ্ঞেস করলো।

"আপনি বাঙালীর ছেলে, তাই বলছি। অন্তত তিনখানা কোম্পানি চাই। না-হলে কোটেশন দেবেন কী করে? পারচেজ অফিসারকে পোষ মানাবেন আপনি—কিন্তু তিনি তো নিজের গা বাঁচিয়ে চলবেন। পোষ মানাবার পরে পারচেজ অফিসার নিজেই আপনাকে বলবে, তিনটে কোম্পানির নামে কোটেশন নিয়ে আসুন। দুটো কোটেশনে বেশি দাম লেখা থাকবে—আর আপনারটায় দাম কম লেখা থাকবে।"

অর্ডার সাপ্লাই লাইনের গোড়ার কথাটাই যে সোমনাথ এখনও জানে না তা আবিষ্কার করে বৃদ্ধ মল্লিকবাবু বেশ কৌতুক বোধ করলেন।

"শুধু আলাদা কোম্পানি হলে তো চলবে না। ঠিকানাও তো আলাদা চাই?" সোমনাথ জিজ্ঞেস করলো।

"সে তো একশোবার," মল্লিকবাবু একমত হলেন। "সাপ ব্যাঙ দুটো ঠিকানা লাগিয়ে দিলেই হলো। কলকাতায় ঠিকানার অভাব? অনেকে তো আমার ছাপাখানার ঠিকানা লাগিয়ে দিতে বলে।" বিজ্ঞের মতো মল্লিকবাবু বললেন, "আপনি তিনখানার কথা ভাবছেন! আর আপনার পাশের শ্রীধরজীর এগারোখানা কোম্পানি। এগারো রকমের চালান, এগারো রকমের বিল, এগারো রকমের রসিদ, এগারো রকমের চিঠির কাগজ। আমার দুটো পয়সা হয়।"

সোমনাথের মুখের অবস্থা দেখে মল্লিকবাবু বললেন, "টাকাকড়ির টানাটানি থাকলে এখন একটা কোম্পানিই করুন। তেমন আটকে গেলে আমার কাছে আসবেন, দু-চারখানা পুরানো কোম্পানির লেটারহেড এমনি দিয়ে দেবো। কত কোম্পানি হচ্ছে, কত কোম্পানি আবার ডকে উঠছে—আমার কাছে

অনেক চিঠির কাগজের স্যাম্পেল থেকে যাচ্ছে।”

মল্লিকবাবু যে শ্রীধরজীর কথা বললেন তিনি ফিনফিনে পাঞ্জাবি, ফর্সা ধুতি এবং চপ্পল পরে সকালের দিকে মিনিট পনেরোর জন্য অফিসে আসেন। চিঠি-পত্তর কিছু এসেছে কিনা খোঁজখবর করেন। তারপর গোটাচারেক পান একসঙ্গে গালে পুরে বাজারে বেরিয়ে যান।

শ্রীধরবাবুর এক পার্টটাইম খাতা রাখার বাবু আছেন। তিনি দু-তিনবার অফিসে ঘুরে যান। এঁর নাম আদকবাবু। রোগা পাকানো চেহারা। বহু লোকের হিসেব রেখে বেড়ান। সোমনাথ শুনলো, এ-লাইনে আদকবাবুর খুব নামডাক—বিশেষ করে সেল্‌স ট্যাক্স সমস্যা নাকি গুলে খেয়েছেন। লোকে বলে সেল্‌স ট্যাক্সের বিধান রায়! যত মর-মর কেসই হোক, আদকবাবু ঠিক পার্টিকে বাঁচিয়ে দেবেন।

আদকবাবু একদিন সোমনাথকে বললেন, “আপনি চালিয়ে যান। বেচা-কেনা করে পয়সা আনুন—তারপর তো খাতা তৈরির জন্যে আমি আছি।”

সোমনাথ চুপচাপ ওঁর কথা শুনে যাচ্ছিলো। কোথায় বিজনেস তার ঠিক নেই, এখন থেকে সেল্‌স ট্যাক্স ইনকাম ট্যাক্সের চিন্তা! আদকবাবু বোধহয় একটু মনঃক্ষুণ্ণ হলেন। সোমনাথকে বললেন, “বিজনেসে যখন নেমেছেন তখন এই খাতা জিনিসটাকে ছোট ভাববেন না, স্যর। আপনার ওই টেবিলেই তো মোহনলাল নোপানি বসতো। বিজনেসের কূটবুদ্ধি তো খুব ছিল। বম্বে থেকে প্লাস্টিক পাউডার আনিয়ে তার সঙ্গে ভেজাল মিশিয়ে বেশ টু-পাইস করছিল। কিন্তু হঠাৎ ঘটিবাটি ফেলে নোপানিকে উধাও হতে হলো কেন?”

উত্তরটা আদকবাবু নিজেই দিলেন। “খাতা ঠিক মতো রাখেনি। ভেবেছিল ওটাও নিজে ম্যানেজ করবে। এখন ইনকাম ট্যাক্স ও সেল্‌স ট্যাক্সের—শনি রাহু দুজনেই একসঙ্গে ছোকরার ওপর নজর দিয়েছেন!”

নোপানির কথাই তো বিশুবাবু বলেছিলেন, সোমনাথের মনে পড়লো। “মিস্টার বোস তো সেনাপতিকে ভদ্রলোকের বাড়িতেও পাঠিয়েছিলেন। নোপানি সেখানে নেই। কলকাতা ছেড়ে চলে গিয়েছেন।” সোমনাথ বললো।

পানের ছোপধরা দাঁতের পাটি বার করে আদকবাবু হাসলেন। ফিসফিস করে বললেন, “বাড়ি না-ছেড়ে উপায় আছে? সাতাশ হাজার টাকার প্রেম-পত্তর নিয়ে সেল্‌স ট্যাক্স ঘোরাঘুরি করছেন। প্রেমপত্তর বোঝেন তো?” আদকবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

না-বুঝে উপায় আছে? তপতীর চিঠিখানা গতকালই তো পাঁচবার পড়েছে সোমনাথ। কপাল কুঞ্চিত করে আদকবাবু বললেন, “আমাদের লাইনে

প্রেমপত্তর মানে সার্টিফিকেট। ট্যাক্সো ঠিক সময় না দিলে আলিপুরের সার্টিফিকেট অফিসার ঘটিবাটি বাজেয়াপ্ত করার জন্যে এই সার্টিফিকেট ইস্যু করে। সার্টিফিকেট অফিসের বেলিফ রসময় হাজরাকে তো দেখেননি—সাক্ষাৎ চেঙ্গিজ খাঁ! টাকা না দিলে ভাতের হাঁড়ি পর্যন্ত ঠেলাগাড়িতে চড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে। কোনো মায়াদয়া করে না।"

কোনোরকম রোজগার না-করেই সার্টিফিকেট অফিসের পেয়াদা রসময় হাজরার কাল্পনিক কালাপাহাড়ী মূর্তি সোমনাথকে একটু বিমর্ষ করে তুললো। এতোদিন সার্টিফিকেট বলতে বেচারা পরীক্ষার সার্টিফিকেট এবং ক্যারেকটার সার্টিফিকেট বুঝতো। আলিপুরের সার্টিফিকেট অফিসারের নাম সে কোনোদিন শোনেইনি। আদকবাবু ফিসফিস করে খবর দিলেন, "আপনি ভাবছেন, নোপানি চম্পট দিয়েছে কলকাতা থেকে? একেবারে বাজে কথা। এই কলকাতাতেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবে এখন যদি নোপানি বলে ডাকেন চিনতেই পারবে না। নাম নিয়েছে, প্রেমনিধি গুপ্তা!"

খাতা লেখা বন্ধ রেখে আদকবাবু বললেন, "আপনাকে সত্যকথা বলছি, এখন লুকিয়ে-লুকিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করছে, আমার হাতে ধরছে। বলছে, 'আদকবাবু বাঁচান।' রোগী মরে যাবার পর খবর দিলে ডাক্তার কী করবে বলুন?"

আদকবাবু ওঁর চশমার ফাঁক দিয়ে সোমনাথের দিকে তাকালেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "কী বুঝলেন?"

"বুঝলুম নোপানি ফ্যাসাদে পড়েছে।"

সোমনাথের উত্তরে সন্তুষ্ট হলেন না আদকবাবু। বললেন, "নোপানি হচ্ছে জাত ব্যবসাদার—ওর বিপদ ও ঠিকই সামলাবে। আপনি কী বুঝলেন? আপনাকে দেখে শিখতে হবে—ঠেকে শিখতে গেলে এ লাইনে স্রেফ গাড়ি চাপা পড়ে যাবেন। শিক্ষাটা হলো এই যে শুধু রোজগারের চেষ্টা করলে হবে না—সেই সঙ্গে হিসেবের খাতাখানি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখে যেতে হবে।"

বুড়ো আদকবাবুর যে সোমনাথের ওপর মায়া পড়েছে তা সেনাপতি দরজার কাছে বসে থেকেই বুঝতে পারছে। আদকবাবু ফিসফিস করে বললেন, "যে-লাইনে এসেছেন—টু-পাইস আছে। অনেকে এখন রাতারাতি লাল হচ্ছে। এই যে শ্রীধরজী—কেমিক্যাল বেচে বেশ কামাচ্ছেন! কিন্তু এগারোখানা কোম্পানি—এর টুপি ওর মাথায় এমন কায়দায় পরিয়ে যাচ্ছেন যে আপনার মনে হবে রামকৃষ্ণ মিশনের অ্যাকাউন্ট। সেল্‌স ট্যাক্স অফিসার নাক দিয়ে শুঁকলে ধূপধুনোর গন্ধ পাবে!"

এ-লাইনের প্রথম বউনি আদকবাবুর অনুগ্রহেই হলো। জয়সোয়ালদের স্টেশনারি দোকানের খাতা উনি রাখেন। ওখানকার ব্রিজবাবুর সঙ্গে সোমনাথের আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন আদকবাবু। বলেছিলেন, "বসে থাকবেন কেন? চেষ্টা করুন।"

ব্রিজবাবু খুব বেশি ভরসা করেননি ছোকরা সোমনাথের ওপর। তবে বলেছিলেন, "ডুপ্লিকেটিং কাগজ এবং খামের স্টক রয়েছে। দেখুন যদি সেল করতে পারেন। আদকবাবু যখন এর মধ্যে রয়েছেন তখন আপনাকে অবিশ্বাস করবো না।"

রাস্তায় বেরিয়ে সোমনাথ একশ' রিম ডুপ্লিকেটিং কাগজ এবং লাখখানেক খাম বারবার চোখের সামনে দেখতে লাগলো। একলক্ষ খাম কোথায় বেচবে সে ভেবেই পেলো না। সোমনাথের মাথায় নানা অদ্ভুত চিন্তা আসছে। একলক্ষ খাম মানে একলাখ চিঠি। সে কি সোজা ব্যাপার!

লালবাজারের সামনে বি কে সাহার প্রখ্যাত চায়ের দোকানের পাশে রেস্তরাঁয় বসে এক কাপ চা খেতে-খেতে সোমনাথ হিসেব করতে লাগলো: নিজের সঙ্কোচ কাটিয়ে তপতীকে যদি প্রতিদিন একখানা চিঠি লেখে তাহলেও বছরে মাত্র ৩৬৫ খানা খাম লাগবে। দশ বছর ধরে অবিশ্রান্ত চিঠি লেখা চালিয়ে গেলেও মাত্র ৩৬৫০ খানা খাম খরচ হবে। অল্‌রাইট—তপতীকেও যদি সোমনাথ কিছু খাম পাঠিয়ে দেয় এবং সেও যদি রোজ একখানা করে চিঠি লেখে তাহলে সামনের দশ বছরে আরও ৩৬৫০ খানা খাম কাজে লাগবে। অর্থাৎ সর্বসাকুল্যে সাত হাজার তিনশ' খাম। অঙ্কটা নেশার মতো সোমনাথের মাথার ওপর চেপে বসছে। একশ' বছরেও তাহলে একলাখ খাম খরচ হচ্ছে না—লাগছে মাত্র তিয়াত্তর হাজার খাম।

আরও এক চুমুক চা খেলো সোমনাথ। না, হিসেব ঠিক হচ্ছে না—কোথায় যেন ভুল থেকে যাচ্ছে। একশ' বছরে অন্তত পঁচিশটা লিপ ইয়ার পড়বে—তার অর্থ, বাড়তি পঁচিশ দিন, হুইচ মিনস আরও পঞ্চাশখানা চিঠি।

হিসাবের ভারে মাথাটা যখন বেশ গরম হয়ে উঠেছে তখন হঠাৎ বাইরের দিকে নজর পড়লো সোমনাথের! একজন ছোকরা কোটপ্যাণ্ট পরে লালবাজার পুলিশ হেডকোয়ার্টারের গেট দিয়ে বেরিয়ে আসছে। কলেজবান্ধবী শ্রীময়ীর নববিবাহিত হাজবেণ্ড।

ভদ্রলোক বি কে সাহার দোকানের কাছে দাঁড় করানো একটা গাড়ির সামনে দাঁড়াতেই সোমনাথ দোকান থেকে বেরিয়ে এলো। "মিস্টার চ্যাটার্জি না? চিনতে পারছেন?"

অশোক চ্যাটার্জি গাড়ির মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছিলো। সোমনাথের গলা শুনেই থমকে দাঁড়ালো। সোমনাথের দিকে মুখ ফিরিয়ে হাসিমুখে অশোক চ্যাটার্জি বললো, "খুব চিনতে পারছি। আপনিই তো মিস্টার ব্যানার্জি? গড়িয়াহাটের মোড়ে সেদিন শ্রীময়ী আলাপ করিয়ে দিলো।"

লালবাজারের সামনে গাড়ি দাঁড়াতে দেয় না। তাই অশোক চ্যাটার্জি এবার সোমনাথকে গাড়ির মধ্যে তুলে নিলো।

মিশন রোয়ের ওপরেই ওদের অফিস। ওখানকার ভাল একটা পোস্টে রয়েছে অশোক চ্যাটার্জি। ভাল পোস্টে না থাকলে শ্রীময়ীর মতো চালু মেয়ে কেন অকালে টাক পড়া শ্যামবর্ণের এই নাদুস-নুদুস ছোকরাকে বিয়ে করতে যাবে? কলেজ জীবনে শ্রীময়ী যার সঙ্গে ঘুরে বেড়াতো সেই সমর ছিল সত্যি সুদর্শন। তপতীর কাছে শুনেছিল, শ্রীময়ী বলতো ছেলেরা সুদর্শন না হলে তার কথা বলতে ইচ্ছে করে না। আপেলের মতো টুকটুকে ফর্সা, স্মার্ট, লম্বা ছেলে ছাড়া শ্রীময়ী কিছুতেই বিয়ে করবে না। সিনেমার হিরোর মতো চেহারা ছিল সমরের, কিন্তু সে এ-জি-বেঙ্গলের লোয়ার ডিভিসন কেরানি হয়েছে।

অশোক চ্যাটার্জির গাড়িতে বসে শ্রীময়ীর ভূতপূর্ব বন্ধুদের কথা সোমনাথের ভাবা উচিত হচ্ছে না। সে বললো, "সেদিন আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে খুব ভাল লাগলো।"

গাড়ি চালাতে-চালাতে অশোক বললো, "একদিন বাড়িতে আসতে হবে। শ্রীময়ী খুব খুশী হবে। কিন্তু একলা এলে হবে না—গিন্নিকে আনা চাই।"

হেসে ফেললো সোমনাথ। অশোক অপ্রস্তুত হলো। বোকা-বোকা হেসে বললো, "ওই পাট এখনও চোকানো হয়নি বুঝি?"

সোমনাথ এবার জিজ্ঞেস করলো, "আপনাদের অফিসে স্টেশনারি পারচেজ করেন কে?"

"আমি করি না। তবে যিনি করেন, তিনি আমার বিশেষ ফ্রেণ্ড।" অশোক বললো।

"ওঁর সঙ্গে একটু আলাপ করিয়ে দেবেন? পার্টটাইম বিজনেস করছি। বিজনেস ছাড়া বাঙালীদের মুক্তি নেই বুঝতেই তো পারছেন, মিস্টার চ্যাটার্জি।"

"সে কথা বলে!" অশোক উৎসাহ দিলো।

ছেলেটি সত্যিই ভাল। সোজা সোমনাথকে নিয়ে গেলো মিস্টার গাঙ্গুলীর কাছে। বললো, "আমার বিশেষ পরিচিত। যদি সম্ভব হয়, একটু সাহায্য করবেন।"

ভাগ্য ভাল। মিস্টার গাঙ্গুলী কাগজের নমুনা দেখলেন। পঁচিশ রিম এখনই দরকার। রেট জানতে চাইলেন। মল্লিকবাবুর ছাপানো প্যাড বার করে সোমনাথ একটা কোটেশন ওখানেই লিখে দিলো।

মিস্টার গাঙ্গুলী কর্মচারীকে ডেকে বললেন, "দেখুন তো গতবার আমরা কী দামে কাগজ কিনেছিলাম।" ভদ্রলোক একটা ফাইল এনে মিস্টার গাঙ্গুলীর সামনে ধরলেন। দামটা গোপনে দেখে নিয়ে গাঙ্গুলী বললেন, "আপনার রেট ভালই আছে। আমরা নগদ টাকায় কিনে নেবো।"

খামের ব্যাপারে একটু সময় লাগবে। নমুনা এবং কোটেশন রেখে যেতে বললেন। স্টকের অবস্থা যাচাই করতে হবে।

বেলা পাঁচটার মধ্যে ব্যবসা খতম। সব হাঙ্গামা চুকিয়ে খরচখরচা বাদ দিয়ে কড়কড়ে তিনখানা দশ টাকার নোট হাজির হয়েছে সোমনাথ উদ্যোগ-এর মালিক সোমনাথ চ্যাটার্জির পকেটে। জীবনে প্রথম রোজগার। প্রথম প্রেমের মতোই সে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। কলকাতা শহরের বিবর্ণ রূপ মুছে গিয়ে হঠাৎ সমস্ত শরীরটা সোমনাথের চোখের সামনে ঝকঝক করছে। ব্যবসায় যে রস আছে, তা সোমনাথ এবার বুঝতে পারছে। উত্তেজনা চাপতে না পেরে মানিব্যাগ বার করে সোমনাথ টাকাটা আবার গুণলো।

অফিসে ফিরে এসে বিশুবাবুর খোঁজ করলো সোমনাথ। তিনি নেই—কোনো এক কাজে কলকাতার বাইরে গেছেন। আদকবাবু আসতেই মিষ্টি আনতে দিচ্ছিলো সোমনাথ। হাঁ-হাঁ করে উঠলেন আদকবাবু। "এই জন্যে বাঙালীর বিজনেস হয় না। এই তো আপনার প্রথম নিজস্ব ক্যাপিটাল হলো। এখনই খেয়ে উড়িয়ে দিলে চলবে কেন? আগে হাজার দশেক টাকা হোক—তারপর আপনার কাছ থেকে জোর করে মিষ্টি খাবো।"

সোমনাথ খুশী মনে রয়েছে। বললো, "দেখুন না! যদি খামের কোটেশনটা লেগে যায়, তাহলে আমাকে পায় কে।"

ব্রিজ জয়সোয়ালের টাকাও যে সে মিটিয়ে দিয়েছে, তা সোমনাথ এবার আদকবাবুকে জানিয়ে দিলো। "উনি কী বললেন?" আদকবাবু জানতে চাইলেন।

"খুব খুশী হলেন। কীভাবে কোথায় বিক্রি করলাম সব বললুম ওঁকে।"

"অ্যাঁ!" আঁতকে উঠলেন আদকবাবু। "করলেন কি মশায়। আপনার পার্টির নাম ব্রিজবাবুকে বলে দিলেন?"

তাতে মহাভারতের কী অশুচি হয়েছে সোমনাথ বুঝতে পারলো না। আদকবাবু বেশ বিরক্তভাবে বললেন, "আপনি বড় ফ্যামিলির ছেলে, বিজনেস

করতে এসেছেন, আর আমি গরীব মানুষ খাতা লিখে খাই—আমার মুখে সব কথা মানায় না। তবু বলছি, এ-লাইনে কখনও নিজের তাসটি অন্য কাউকে দেখাবেন না। কাকে সাপ্লাই করছেন, তা ভুলেও কাউকে বলবেন না। যেখানে ঘোরাঘুরি করছি আমরা—এটা বাজারও বটে, জঙ্গলও বটে।”

ইতিমধ্যে তিরিশ টাকা রোজগার হয়েছে শুনে বেজায় খুশী হয়েছেন কমলা বউদি। লুকিয়ে বউদিকে খাওয়াতে চেয়েছিল সোমনাথ। বউদি রাজী হলেন না। খুব ধরাধরি করতে বউদি বললেন, “তার বদলে গাড়িটা বার করে আমাকে কবীর রোডে মামার বাড়িতে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে এসো।” দাদা সেল্‌ফ ড্রাইভ করেন। গাড়িটা মাঝে-মাঝে স্টার্ট দিয়ে চালু রাখার কথা বউদিকে লিখেছেন। সোমনাথের অসুবিধে নেই। গাড়ি চালানোটা বউদি ও সোমনাথ দুজনে একসঙ্গে শুরু করেছিল। কমলা বউদি দু দিন চালিয়ে আর সাহস পাননি। কিন্তু সোমনাথ ড্রাইভিং লাইসেন্স করিয়ে ফেলেছিল সেই বি-এ পড়ার সময়েই।

বউদিকে সেদিন মামার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে একঘণ্টা পরে আবার ফিরিয়ে আনলো সোমনাথ। পথে লেকের ধারে গাড়ি থামিয়েছিল। সোমনাথ জোর করে বউদিকে কোকাকোলা খাওয়ালো—কোনো আপত্তি শুনলো না। দেওরের প্রথম উপার্জনের পয়সায় কোকাকোলা খেতে কমলা বউদির খুব আনন্দ হচ্ছিলো। ওঁর ইচ্ছে, বাবার জন্যেও একটু মিষ্টি কেনা হোক। সোমনাথ কিন্তু এই অবস্থায় বাড়িতে কিছুই জানাতে চায় না। বউদিও সব ভেবে জোর করলেন না। বিজনেস লাইনে শেষপর্যন্ত যদি সোমনাথ হেরে যায়, এবং সবাই যদি তা জানতে পারে, তাহলে বেচারার আত্মবিশ্বাস চিরদিনের মতো নষ্ট হয়ে যাবে। ওর আত্মসম্মানে আঘাত লাগুক এমন কিছু করতে কমলা বউদি রাজী নন।

তবে শেষপর্যন্ত একটা রফা হলো। সোমনাথের পয়সায় বাবার জন্যে একশ' গ্রাম ছানা কেনা হবে, কিন্তু কে পয়সা দিয়েছে তা বাবাকে বলা হবে না। এই ব্যবস্থায় সোমনাথের আপত্তি নেই।

জোড়ে-জোড়ে তরুণ-তরুণীদের লেকের ধারে ঘুরে বেড়াতে দেখে, কমলা বউদির একটু রসিকতা করতে ইচ্ছে হলো দেওরের সঙ্গে। কমলা বউদির খুব ইচ্ছে কম বয়সেই সোমনাথের বিয়ে দেন। কিন্তু বিয়ের প্রসঙ্গ তুলতে সাহস হলো না। যা দিনকাল, ছেলেদের কপালে বিধাতাপুরুষ কী লিখে রেখেছেন কে জানে?

পাইপের মধ্য দিয়ে কোকাকোলা টানতে-টানতে কমলা বউদি বললেন, "আমার মন বলছে ব্যবসাতে তোমার খুব নাম হবে।"

"আপনার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক বউদি।" সোমনাথ আন্তরিকভাবে বললো।

বউদি বললেন, "আচ্ছা ঠাকুরপো, তুমি যদি বিরাট বিজনেসম্যান হও কী করবে?"

মাথা চুলকে সোমনাথ বললো, "আপনাকে কোম্পানির চেয়ারম্যান করবো। আর বেচারা সুকুমারকে একটা বড় পোস্ট দেবো। সুকুমার তদ্বির করে আমাকে একটা ইণ্টারভিউ পাইয়ে দিয়েছিল। আমি ওর জন্যে কিছুই করতে পারিনি।"

কমলা বউদি বললেন, "শুনেছি ওদের বড্ড অভাব। ওর সঙ্গে দেখা হলে বোলো, চাকরির অ্যাপ্লিকেশনের জন্য টাকাকড়ি লাগলে যেন আমাকে বলে। তোমার দাদার কাছ থেকে মাসে তিরিশ টাকা করে হাতখরচা আদায় করছি।"

আদকবাবুর কথা যে মিথ্যে নয়, তা তিনদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলো সোমনাথ। অশোক চ্যাটার্জির অফিস থেকে খামের অর্ডারটা পাবে এ সম্বন্ধে সে প্রায় নিশ্চিত ছিল। কিন্তু মিস্টার গাঙ্গুলী গম্ভীরভাবে দুঃখ প্রকাশ করলেন। বললেন, "হলো না। আপনার দামটা অনেক বেশি।"

মুখ শুকনো করে যখন সোমনাথ বেরিয়ে আসছিল, তখন মিস্টার গাঙ্গুলীর ডিপার্টমেণ্টের সেই ক্লার্কের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। শিক্ষিত বেকারকে হতাশ হয়ে ফিরে যেতে দেখে ভদ্রলোকের বোধহয় একটু মায়া হলো। তিনি বলেই ফেললেন, "জয়সোয়াল কোম্পানির কাছে খাম কিনে বুঝি সাপ্লাই করছেন? ওরাই তো আপনার থেকে সস্তা কোটেশন দিয়ে গেলো। বললো, সোজা ওদের কাছ থেকে নিলে আমাদের লাভ।"

সোমনাথ তাজ্জব। ব্রিজবাবুকে জিজ্ঞেস করতে তিনি আকাশ থেকে পড়লেন! ব্যাপারটা মোটেই স্বীকার করলেন না। বরং বললেন, "বিজনেসে আমরা সবাই ভাই-ভাই। আমি কি করে আপনার পেছনে ছুরি লাগাবো?"

কুণ্ডুবাবু বলে এক কর্মচারি চুপচাপ ওদের কথাবার্তা শুনছিলেন। ব্রিজবাবু চলে যেতেই ফিসফিস করে বললেন, "উনিই তো লোক পাঠিয়েছেন। কেন পাঠাবেন না? এইটাই তো বিজনেসের নিয়ম। আপনি যদি ব্রিজবাবুর থেকে কম দামে অন্য কোথাও খাম পেতেন—ছাড়তেন?"

সব শুনে আদকবাবু বললেন, "এ তো আমি জানতাম। আপনি যদি জয়সোয়ালকে উচিত শিক্ষা দিতে চান তাহলে ঐ মিস্টার গাঙ্গুলীকে ম্যানেজ করুন। ব্রিজবাবুর কাছে যদি প্রমাণ করতে পারেন আপনি না-থাকলে ঐ কোম্পানি থেকে কিছুতেই অর্ডার আসবে না—তাহলে উনি আবার আপনার

জুতোর সুখতলা হয়ে থাকবেন!"

"ওঁর অপমান হবে না?" সোমনাথ জিজ্ঞেস করে।

"দূর মশায়! মান থাকলে তবে তো অপমান হবে? এটা তো বাজার, ল্যাং দেওয়া-নেওয়া চলবে জেনেই তো এরা মার্কেটে এসেছে।"

বেশ রাগ হচ্ছে সোমনাথের। ব্রিজবাবুকে যোগ্য শিক্ষা দেবার একটা প্রচণ্ড লোভ হচ্ছে। কিন্তু আদকবাবু যে মতলব দিচ্ছেন তা সোমনাথ পারবে না। মিস্টার গাঙ্গুলী কেন তার কথা শুনবেন? তাছাড়া কম দামে যেখানে মাল পাওয়া যায় সেখান থেকে কেনবার জন্যেই তো কোম্পানি মিস্টার গাঙ্গুলীকে রেখেছেন।

আদকবাবু ওসব বুঝলেন না। বললেন, "এ-লাইনে অনেকদিন হলো। পারচেজ অফিসারের কত গল্প কানে আসে। ওঁরা ইচ্ছে করলে যা খুশী তাই করতে পারেন।"

বাড়িতে ফিরে বিছানায় আধশোয়া অবস্থায় ব্রিজবাবুকে হারিয়ে দেবার ব্যাপারটা সোমনাথের মাথায় ঘুরছে। বউদিকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে লাভ হলো না। সোমনাথ জানতে চেয়েছিল, প্রতিহিংসা জিনিসটা কেমন? বউদি যথারীতি মায়ের কথা তুললেন। মা বলতেন, কুকুর তোমাকে কামড়াতে এলে তুমি কুকুরকে তাড়িয়ে দেবে। কিন্তু তুমি কুকুরকে কামড়াতে পারো না।

তবু সোমনাথের মনটা শান্ত হচ্ছে না।

দেওর ব্যবসা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন দেখে কমলা বউদি ভরসা পেলেন।

সোমনাথ পরের দিন অশোক চ্যাটার্জির অফিস পর্যন্ত গিয়েছিল। ভাবলো একবার শ্রীময়ীকে ফোনে ধরবে কিনা। নববিবাহিতা বধূ কোনো অনুরোধ করলে অশোক চ্যাটার্জি তা ফেলতে পারবে না। কিন্তু ইচ্ছে করলো না সোমনাথের। যেখানে সন্ধ্যা হয় সেইখানেই বাঘের ভয়। অফিসের দরজার গোড়ায় অশোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। বরটি ভালই ম্যানেজ করেছে শ্রীময়ী। মনটি বেশ উদার। সোমনাথের সঙ্গে নমস্কার বিনিময় হলো।

অশোক চ্যাটার্জি আজও সৌজন্য প্রকাশ করলো—ব্যবসার খোঁজখবর নিলো। কিছু অর্ডার পেয়েছে শুনে খুশী হলো—কিন্তু সোমনাথ খামের কথাটা তুলতে পারলো না।

আদকবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন, "জয়সোয়ালকে একটু শিক্ষা দিলেন?"

সোমনাথ পরাজয় স্বীকার করলো। বললো, "মিস্টার গাঙ্গুলীর কাছে ছোট হতে পারলাম না।"

আদকবাবু বললেন, "এ-লাইনে যদি কিছু করতে চান পারচেজ অফিসার-দের সঙ্গে ভাব করুন।"

চার নম্বর টেবিলে উমানাথ যোশী বেশ মনমরা হয়ে বসে আছে। ছোকরা কোনো লাইনেই তেমন সুবিধে করতে পারছে না। রাঠী নামে এক ভদ্রলোকের কোম্পানিতে সে কাজ করতো। মন কষাকষি হওয়ায় চাকরি ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা শুরু করেছে। কিন্তু হাতে তেমন কাজকম্ম নেই।

যোশী যে-লাইনে কাজ-কারবার করে সেই একই লাইনে ব্যবসা করছেন দু নম্বর টেবিলের সুধাকর শর্মা। অথচ সুধাকরবাবুর নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই। একজন পার্টটাইম টাইপিস্ট রেখেছেন। কিন্তু সে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। সুধাকরবাবু একটা সারাক্ষণের টাইপিস্ট রাখবার কথা ভাবছেন। অনেক টেলিফোন আসে সুধাকরবাবুর নামে। ফকির সেনাপতি বার-বার হাঁক দেয় —সায়েব আপনার টেলিফোন।

সুধাকর শর্মার সাফল্যের রহস্যটা বুঝতে পারে না সোমনাথ। যোশীর কাজ-কম্ম নেই তেমন—তাই সোমনাথের সঙ্গে মাঝে-মাঝে গল্প করে। যোশী বলে, "শর্মাজী জাদু জানেন। পারচেজ অফিসারকে মন্তর দিয়ে বশ করে ফেলেন!"

শর্মাজীর কাজ করেন না আদকবাবু। উনি বলেন, "পারচেজ অফিসার যদি গোখরো সাপ হয়—শর্মাজী হচ্ছেন সাপুড়ে। যতই ফণা তুলুক, অফিসারকে ঠিক বশ করে শর্মাজী নিজের ঝাঁপিতে পুরে ফেলবেন!"

কিসের যে ব্যবসা করেন না সুধাকরজী তা সোমনাথ বুঝতে পারে না। ঝোলাগুড় থেকে আরম্ভ করে, সাবান, টয়লেট, পেপার, কাঁচের গেলাস সব কিছুই সাপ্লাই করেন।

যোশী বলে, "সুধাকরজীর হলো কোন্নগরের এক কারখানা। সেখানে সাড়ে-আটশ' পিস সাবান প্রতি মাসে সাপ্লাই করতেন ভদ্রলোক। ওঁর গিন্নির সঙ্গে ওখানকার ম্যানেজারবাবুর দূর সম্পর্কের আত্মীয়তা আছে। আগে প্রত্যেক ওয়ার্কারকে হাত ধোবার জন্যে প্রতি মাসে একখানা সাবান দেওয়া হতো। এরপর সুধাকরজী নাকি ইউনিয়নের কোনো পাণ্ডাকে পাকড়াও করেন। ওরা প্রতিমাসে দুখানা সাবান দাবি করলো—কোম্পানি দিতে বাধ্য হয়েছে। সুধাকরজী মাসে সতেরোশ' পিস সাবান সাপ্লাই করতে আরম্ভ করলেন। তারপর কীভাবে অন্য অনেককে ম্যানেজ করেছেন। সুধাকরজীর কাজ এতো বেড়েছে যে নিজের আলাদা আপিসের কথা ভাবছেন।"

সোমনাথ মাঝে-মাঝে স্বপ্ন দেখছে সেও সুধাকর শর্মার মতো কাজকর্ম

বাড়িয়ে চলেছে। কিন্তু কী যে মন্তর সুধাকরবাবু জানেন—সে বুঝতেই পারে না। টো-টো করে সেও সারাদিন অফিসে-অফিসে ঘুরছে, কিন্তু সুবিধে করতে পারছে না।

সুধাকর শর্মা কোনো প্রশ্নের উত্তরই দেন না। শুধু ফিক করে হাসেন। আর সন্ধ্যা হলেই অফিস থেকে বেরিয়ে পড়েন। ফকির সেনাপতি বলে, "শর্মাজী মাঝে-মাঝে অনেক রাতে ফিরে আসেন। তখন নাকি একটু বেসামাল অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায় তাঁকে।" সেনাপতি বিরক্ত হতে পারে না। কারণ সুধাকর শর্মা তাকে আলাদা করে প্রতি মাসে পঁচিশ টাকা দেন। অবশ্য সেনাপতিকে তার বদলে একশ' টাকার ভাউচার সই করতে হয়। কিন্তু সেনাপতির তাতে আপত্তি নেই। কিছু টাকা তো মিলছে।

সুধাকর শর্মার জামাকাপড় বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বুশ শার্ট এবং টেরিলিন প্যাণ্ট পরেন। অফিসের আলমারিতে একটা কোট এবং টাইও আছে। বড় কোনো পার্টির সঙ্গে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট থাকলে অনেক সময় কোট চড়িয়ে নেন। সেনাপতি একটা ব্রাশ দিয়ে সুধাকরের কোট ঝেড়ে দেয়।

পাশের ঘরে কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে সোমনাথের। এদের দু-একজনের নিজস্ব গোডাউন আছে। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার নিয়ে এরা অনেক জিনিস গুদামে রেখে দেয়। একেবারে পরের ঘাড়ে বন্দুক রেখে ব্যবসার স্তর এরা পেরিয়ে এসেছে। কলকাতা ছাড়াও, উড়িষ্যা এবং আসামের দূর-দূর প্রান্তে এদের বেচাকেনা চলে।

ঐ ঘরে টিমটিম করে হীরালাল সাহা বলে এক বাঙালী ভদ্রলোক জ্বলছেন। হীরালাল সাহা রেল আপিসে কাজ করতেন। একবার সাইড বিজনেস হিসেবে কিছু পুরানো রেলওয়ে স্লিপার নিলাম ডাকে কিনেছিলেন। তাতে পাঁচ হাজার টাকা লাভ করেছিলেন। সেই সময় শ্যামবাজারে একখানা পুরানো বাড়ি ভাঙা হচ্ছিলো। ওই বাড়ির ইঁট কাঠ জানালা দরজা সব কিনেছিলেন হীরালাল সাহা। অফিসের সহকর্মীরা পিছনে লাগলো, হীরালালবাবু চাকরি ছেড়ে দিলেন।

হীরালালবাবু বলেন, "গডেস মঙ্গলচণ্ডীর কাইণ্ডনেসে করে খাচ্ছি। জানেন মিস্টার ব্যানার্জি, বাঙালীদের সবচেয়ে বড় শত্রু হলো বাঙালীরা। আমি দেখুন চাকরিও করছিলাম, বিজনেস থেকেও টু-পাইস আনছিলাম—তা আমার

বাঙালী বন্ধুদের সহ্য হলো না। আর এই বিজনেস পাড়ায় দেখুন—গুজরাত গুজরাতীকে, সিন্ধি সিন্ধিকে দেখছে। মাড়োয়ারীদের তো কথাই নেই। যে-আপিসে মাড়োয়ারী আছে সেখানে পারচেজ বলুন, বিক্রির এজেন্সি বলুন, জাতভাইদের জামাই আদর।"

হীরালালবাবু খবরাখবর রাখেন। বললেন, "আপনি তো জয়সোয়ালদের জিনিস বেচতে গিয়ে ধাক্কা খেয়েছেন? আপনাকে দুটো পয়সা দিতে ওদের গায়ে লাগলো। অথচ আমি জানি নিজের গাঁয়ের তিন-চারটে ছোঁড়াকে ওরা ছ'মাসের ধারে মাল দিচ্ছে।"

হীরালালবাবুর সময়টা এখন ভাল যাচ্ছে। বললেন, "বউবাজারের কাছে গডেস মঙ্গলচণ্ডী আছেন। ওঁকে মাঝে-মাঝে নিজের দুঃখ জানিয়ে আসবেন—মা কোনো কষ্টই রাখবেন না। মায়ের করুণায় পর-পর দুখানা সায়েব বাড়ির কড়ি বর্গা টালি কিনলুম। দুমাসের মধ্যে টু-পাইস এসেছে, কেন মিথ্যে বলবো।"

হীরালাবাবু বললেন, "সারাদিন এখন মশাই টো-টো করে রাস্তায় ঘুরি। একখানা ভাঙবার মতো বাড়ির সন্ধান পেলেই বেশ কিছু হয়ে যাবে। এমন কিছু হাঙ্গামা নেই। ব্যবস্থা পাকা করে খবরের কাগজে একখানা বিজ্ঞাপন দিই—'সায়েব বাড়ি ভাঙ্গা হইতেছে। অতি মূল্যবান কাঠকাঠরা ও ভিনিসিয়ান টালি বিক্রয়। অমুক ঠিকানায় খোঁজ করুন।' একখানা বোর্ডও করিয়ে রেখেছি। তাতেও লেখা থাকে—'সেল! সেল! সেল! সায়েব বাড়ি ভাঙা হইতেছে। ভিতরে খোঁজ করুন।' আমার একটা হিন্দুস্থানী দারোয়ান আছে। সে ভাঙা বাড়িতেই বসে থাকে—ওইখানেই ইঁট কাঠ দরজা জানালা, মায় সায়েবদের ব্যবহার করা পুরানো কমোড পর্যন্ত বিক্রি হয়ে যায়।"

হীরালালবাবু বললেন, "সায়েব বাড়ির কোনো খোঁজখবর থাকলে বলবেন। আপনাকে 'স্যুইটেবল' কমিশন দেবো।"

ভাঙা বাড়ির কথায় সোমনাথ বললো, "দাঁড়ান একটু ভেবে দেখি!"

গতকাল তপতীদের বাড়িতে যাবে কিনা ভাবছিল সোমনাথ। হাঁটতে-হাঁটতে এলগিন রোডের ওপর একটা পুরানো বাড়ির দিকে সোমনাথের নজর পড়েছিল। সেখানে বোধহয় নতুন কোনো ফ্ল্যাটবাড়ি উঠবে—কারণ কুলিরা লরি থেকে নতুন একটা সাইনবোর্ড নামাচ্ছিল। সোমনাথ ঠিকানাটা হীরালালবাবুকে দিয়ে দিলো।

"দেখো মা চণ্ডী," বলে হীরালালবাবু তখনই ছুটলেন। সারাদিন আর দেখা নেই।

দুদিন পরে সকালে হীরালালবাবুর খোঁজ পাওয়া গেলো। ভীষণ খুশী মনে

হচ্ছে তাঁকে। সোমনাথের পিঠে হাত দিয়ে বললেন, "গডেস চণ্ডী দয়া না করলে এ-সুযোগ আসতো না, মিস্টার ব্যানার্জি। ঠিক দেখেছেন—একেবারে সায়েব বাড়ি। পা থেকে মাথা পর্যন্ত বর্মা টিকে সাজানো। আজকেই বায়না করে এলাম।"

হীরালালবাবু বললেন, "আপনি শ'দেড়েক টাকা রাখুন। যদি তেমনি প্রফিট করতে পারি আরও দু'শ টাকা দেবো।"

সোমনাথ টাকাটা নিতে চাচ্ছিলো না। কিন্তু হীরালালবাবু নাছোড়বান্দা। বললেন, "খবর দেওয়াটাও বিজনেস তো মশাই। গডেস মণ্ডলচণ্ডী কী ভাববেন, যদি আপনাকে আপনার প্রাপ্য না দিই? আরও খবরটবর রাখবেন। তবে জেনুইন সায়েব বাড়ি হওয়া চাই। বাঙালী বাড়ি ভেঙে সুখ নেই মশাই—জল ঢেলে-ঢেলে বাড়ির কিছু রাখে না।"

জেনুইন সায়েব বাড়ি কাকে বলে জানবার লোভ হলো সোমনাথের।

হীরালালবাবু বললেন, "সায়েবদের জন্যে যেসব বাড়ি তৈরি হয়েছিল।" এবার দাঁত বার করে হাসলেন তিনি। বললেন, "সায়েব বাড়ি কলকাতায় একখানাও থাকবে না। আমরা সব ভেঙে বেচে ফেলবো। জমির দাম যে অনেক বেড়ে গেছে। একখানা সায়েব বাড়িতে বড় জোর দুজন সায়েব ভাড়া থাকতো। তার বদলে সেই জায়গায় পঁচিশ-তিরিশটা ফ্ল্যাট তৈরি হবে—অনেক ভাড়া উঠবে।"

হীরালালবাবু বললেন, "তাহলে নজর রাখতে ভুলবেন না, মশাই। এই এলগিন রোড ধরেই আমি গতমাসে দুবার ঘুরেছি—অথচ এই বাড়িটা হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছিলো।"

টাকাটা পকেটে পুরে এই দুপুরবেলায় কলেজের সেই শ্যামলী মেয়েটার কথা সোমনাথের মনে পড়ে যাচ্ছে। ব্যবসার সময়ে অন্য কারুর কথা এখানে কেউ ভাবে না। কিন্তু সোমনাথ সত্যিই কি শেষপর্যন্ত এদের একজন হতে পারবে? আশা-নিরাশার মধ্যে দোল খাচ্ছে সে। বিকেলে মিটিং আছে মিস্টার মাওজীর সঙ্গে। তার আগে অফুরন্ত সময়।

অফিসের টেলিফোনটা এই সময় বেজে উঠলো। সেনাপতি তার নিজস্ব কায়দায় ফোন ধরলো। তারপর সোমনাথকে অবাক করে দিলো, "বাবু, আপনার ফোন।" সোমনাথকে কে ফোন করতে পারে?

ফোনের ওপাশে তপতী রয়েছে সোমনাথ ভাবতেও পারেনি।

কলেজ স্ট্রীট থেকে ফোন করছে তপতী। আজ হঠাৎ রিসার্চের কাজ

থেকে ছুটি পাওয়া গেছে।

তপতীকে যে এখনই আসতে বলা উচিত তা সোমনাথ বুঝতে পারছে। তপতী নিশ্চয় কিছু বলতে চায়, না-হলে সে কেন ফোন করবে?

ফোনে সোমনাথ বললো, "যদি সময় থাকে, চলে আসতে পারো।"

খুঁজে-খুঁজে তপতী আধঘণ্টার মধ্যে কানোরিয়া কোর্টের বাহাত্তর নম্বর ঘরে হাজির হলো। সোমনাথ অন্য কোথাও তাকে আসতে বলতে পারতো। অন্তত মেট্রো সিনেমার তলায় দাঁড়ালে ওর অনেক সুবিধে হতো। কিন্তু ইচ্ছে করেই সোমনাথ এখানকার কথা বলেছিল। তপতীকে ঠকিয়ে লাভ নেই। সে নিজের চোখে সোমনাথের অবস্থা দেখুক।

দূর থেকে তপতীকে কাছে আসতে দেখে সোমনাথের বুকটা অনেকদিন পরে দুলে উঠলো।

তপতীর ডানহাতে বেশ কয়েকখানা বই। একটা ছাপানো-মিলের শাড়ি পরেছে তপতী। সঙ্গে সাদা ব্লাউজ। ওর শ্যামলিমার সঙ্গে হঠাৎ যেন অন্য কোনো ঔজ্জ্বল্য মিশে এই ক'দিনে তপতীকে অসামান্যা করে তুলেছে। ওর মাথার সামনের চুলগুলো তেমনি অবাধ্যভাবে কপালের ওপর এসে পড়েছে। আজ তপতীকে সত্যিই বিদুষী সুন্দরী মনে হচ্ছে।

তপতীর চোখে চশমা ছিল না আগে। একটা কালো ফ্রেমের আধুনিক ডিজাইনের চশমা পরেছে সে। চশমাটা সত্যি ওর মুখের ভাব পাল্টে দিয়েছে। ওকে অনেক গম্ভীর মনে হচ্ছে, ওর যে বয়স হচ্ছে, ও যে আর কলেজের ছোট মেয়ে নেই, তা এবার বোঝা যাচ্ছে।

সোমনাথ বোধহয় একটু বেশিক্ষণই তপতীর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। ঘরে সেনাপতি ছাড়া কেউ নেই। তপতী নিজেও বোধহয় এই পরিবেশে অস্বস্তি বোধ করছে।

সোমনাথ এবার স্তব্ধতা ভাঙলো। গাঢ়স্বরে বললো, "তোমাকে চিনতেই পারছিলাম না। কবে চশমা নিলে?"

তপতী ওর দিকে কয়েক মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে রইলো। তারপর পুরানো দিনের মতো সহজভাবে বললো, "দু মাস হয়ে গেলো। ভীষণ মাথা ধরছিল। ডাক্তার দেখাতেই বললেন, বেশ পাওয়ার হয়েছে।"

"খুব পড়াশোনা করছো বুঝি?" সোমনাথ সস্নেহে জিজ্ঞেস করে।

"যা কমপিটিশন, না পড়ে উপায় কি ?" তপতীর কথার মধ্যে এমন একটা কিশোরী মেয়ের বিস্ময় আছে যা সোমনাথকে মুগ্ধ করে। বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে অনেক মেয়ের জীবন থেকে বিস্ময় চলে যায়। তপতী এখনও এই ঐশ্বর্য হারায়নি।

সোমনাথ এবং তপতীর মধ্যে এখন অনেক দূরত্ব। তবু এই মুহূর্তে সেই অপ্রিয় সত্যকে স্বীকার করতে পারছে না সোমনাথ। সে ভাবলো এখনও তারা দুজনে কো-এডুকেশন কলেজের ছাত্রছাত্রী। সোমনাথ উষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে তপতীকে আর-একবার নিরীক্ষণ করলো—ওর টিকলো নাক, টানা-টানা চোখ, দীর্ঘ গ্রীবা। তারপর কোনোরকমে বললো, "চশমায় তোমাকে সুন্দর মানিয়েছে তপতী।"

তপতী অন্য অনেক মেয়ের মতো ন্যাকা নয়। মিষ্টি হেসে বিনা প্রতিবাদে অভিনন্দন গ্রহণ করলো। সোমনাথের দিকে তাকালো তপতী। চোখের পাতা কয়েকবার দ্রুত বন্ধ করে নিজের আনন্দ প্রকাশ করলো এবং বললো, "থ্যাংকস্।" তারপর হাতের কলমের মুখটা খুলতে এবং বন্ধ করতে-করতে তপতী বললো, "ফ্রেম করবার সময় আমার ভয় হচ্ছিলো তোমার আবার পছন্দ হবে তো।"

তাহলে তপতী আজও সোমনাথের পছন্দ-অপছন্দের ওপর গুরুত্ব দেয়—নিজের চশমা কেনার সময়েও সোমনাথের কথা মনে পড়ে।

"তোমার জন্যে একটু চা আনাই তপতী ?" সোমনাথ জিজ্ঞেস করলো।

তপতী একটু অস্বস্তি বোধ করলো। বললো, "কী দরকার ?"

"এ-পাড়ায় আমরা কী-রকম চা খাই, দেখবে না?" সোমনাথ জিজ্ঞেস করলো।

তপতী সঙ্গে-সঙ্গে রাজী হয়ে গেলো।

•

চা শেষ করে সোমনাথ বললো, "চলো, বেরিয়ে পড়ি।"

"বারে! তোমার কাজের অসুবিধা হবে না?" তপতী জিজ্ঞেস করে। ওর মনটা বড় খোলা। বাংলার বাইরে ছোটবেলা কাটিয়েছে বলে, কলকাতার অনেক নীচতা ও সংকীর্ণতা ওকে স্পর্শ করতে পারেনি।

গম্ভীর সোমনাথ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, "কাজ থাকলে তো অসুবিধা? আপাতত আমার কোনো কাজ নেই।"

তপতীর একটা সুন্দর স্বভাব আছে, কখনও গায়ে পড়ে কোনো জিনিসের ভিতর ঢুকতে যায় না। অহেতুক কৌতূহল দেখায় না। যা জানতে পায়

তাতেই সন্তুষ্ট থাকে। ওর মানসিক স্বাস্থ্য যে এদেশের অসংখ্য মেয়ের আদর্শ হতে পারে তা সোমনাথ ভালভাবেই জানে। তপতী বললো, "তাহলে চলো।"

এসপ্ল্যানেড থেকে বাসে চড়ে ওরা গঙ্গার ধারে চাঁদপাল ঘাটের সামনে নেমে পড়লো।

"অতগুলো বই তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে—আমাকে কিছুক্ষণ ভার বইতে দাও," সোমনাথ ছু-একখানা বই নেবার জন্যে তপতীর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো।

বইগুলো আরো জোর করে আঁকড়ে ধরলো তপতী। গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে সে হেসে ফেললো। কিন্তু হাসি চাপা দিয়ে তপতী বললো, "তোমার সঙ্গে আজ ঝগড়া করতে এসেছি সোম।"

এইরকম একটা কিছু আশংকা করেছিল সোমনাথ। তবু সাহস সঞ্চয় করে বললো, "বইটা হাতে দিয়েও ঝগড়া করা যায় তপতী।"

তপতী বললো, "ভীষণ ঝগড়া করতে হবে যে!" (ওর মেঘলা মুখের আড়ালে আবার হাসির রৌদ্র উঁকি মারছে।)

স্ট্যাণ্ড রোড ধরে ওরা ছুজন মন্থর গতিতে দক্ষিণ দিকে হাঁটছে। এই ছুপুরে এখানে তেমন ভিড় থাকে না। মাঝে-মাঝে দূরে কলেজের খাতা-পত্র হাতে ছু-একটি ছাত্র-ছাত্রীর জোড় দেখা যাচ্ছে। রাস্তার ওপারে ইডেন গার্ডেন। পশ্চিমে ধীর প্রবাহিণী গঙ্গার দিকে ওরা ছুজনেই মাঝে-মাঝে তাকাচ্ছে।

তপতী এবার নিস্তব্ধতা ভাঙলো। জিজ্ঞেস করলো, "তোমার খোঁজখবর নেই কেন?"

সোমনাথ কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। সে কোনো উত্তর না-দিয়েই হাঁটতে লাগলো।

তপতী বললো, "যে খবর চায় সে যদি খবর না পায় তাহলে তার মনের অবস্থা কেমন হয়?"

"খুব কষ্ট হয়। তাই না?" সোমনাথ বেশ অস্বস্তি বোধ করছে।

"তুমি তো কবি। তুমিই উত্তর দাও।" তপতী সরলভাবে দায়িত্বটা সোমনাথের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলো।

কবি! পৃথিবীতে একমাত্র তপতীই এখনও তাকে কবি বলে মনে রেখেছে। কবিতার সঙ্গে বেকার সোমনাথের এখন কোনো সম্পর্ক নেই।

আজকের এই জনবিরল নদীতীরে দাঁড়িয়ে, হারিয়ে যাওয়া অতীতের অনেক কথা সোমনাথের মনে পড়ে যাচ্ছে।

হাওয়ায় অবাধ্য চুলগুলো সামলে নিয়ে সোমনাথ বললো, "অনেকদিন আগে প্রথম যখন এখানে এসেছিলাম, সেদিনকার কথা মনে আছে তোমার?"

হাসলো তপতী। বললো, "তারিখটা ছিল ১লা আষাঢ়।"

"তারিখটা তোমার মনে আছে তপতী!" অবাক হয়ে গেলো সোমনাথ।

"ইতিহাসের ছাত্রী। পুরানো সব কথা মনে না রাখলে পাস করবো কী করে?" সহজভাবেই উত্তর দিলো তপতী।

তপতীর মুখের দিকে তাকালো সোমনাথ। ওর জন্যে ভীষণ মায়া হচ্ছে সোমনাথের। একবার ইচ্ছে হলো, ওর নরম হাতদুটো ধরে সোমনাথ বলে, "তপতী, ভালবেসে তুমি আমাকে ধন্য করেছো। কিন্তু তোমার নির্বাচনের জন্যে সত্যি আমার দুঃখ হয়। একজন সহপাঠী হিসেবে আই জেনুইনলি ফিল স্যরি ফর ইউ।"

কিন্তু তপতীকে কিছু বলতে পারছে না সোমনাথ। মেয়ে হয়েও ওর আত্মবিশ্বাস আছে। তপতী নরম, কিন্তু লতা গাছের মতো পরনির্ভর নয়।

অনেকগুলো চেনা মুখ মনে পড়ছে। সোমনাথ বললো, "পুরানো দিন-গুলোর কথা ভাবতে বেশ ভাল লাগছে তপতী।"

নদীর বেপরোয়া হাওয়ার অশোভন উৎপীড়ন থেকে নিজের শাড়ি সামলে নিয়ে তপতী বললো, "ইতিহাসের ছাত্রী, আমরা তো দিনরাতই অতীত নিয়ে পড়ে আছি—তাই মাঝে-মাঝে ভবিষ্যতের দিকে উঁকি মারতে লোভ হয়।"

সোমনাথ ভাবলো একবার বলে, "তাতো মনে হচ্ছে না তপতী। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তোমার এক বিন্দু মায়া মমতা থাকলে বেকার সোমনাথ ব্যানার্জির সঙ্গে তুমি এইভাবে ঘুরে বেড়াতে না।"

"দীপঙ্করকে মনে আছে তোমার?" সোমনাথ জিজ্ঞেস করলো তপতীকে।

"খুব মনে আছে। ভীষণ চ্যাংড়া ছিল।" তপতী উত্তর দিলো।

"শুনলাম, আই-এ-এস পেয়েছে। আলিপুরের এ-ডি-এম হয়ে আসছে।" সোমনাথ খবর দিলো।

তপতী কোনো আগ্রহ দেখালো না। সোমনাথের মনে পড়লো, এই দীপঙ্কর কলেজে তপতীর সুনজরে আসবার জন্যে কত চেষ্টা করেছে—ফাস্ট ইয়ারে। কিন্তু তপতী একেবারেই পাত্তা দেয়নি দীপঙ্করকে। পড়াশোনায় ভাল বলে দীপঙ্করের একটু দম্ভ ছিল। তপতী এই ধরনের ছেলেদের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেনি। দীপঙ্কর শেষপর্যন্ত লম্বা চিঠি লিখেছিল তপতীকে। সেই দীর্ঘ চিঠি তপতীকে আরও বিরক্ত করেছিল। উত্তর না দিয়ে চিঠিটা নিজে হাতে দীপঙ্করকে ফিরিয়ে দিয়েছিল তপতী।

তপতী, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যদি তোমার একটুও মমতা থাকতো তাহলে আজ দীপঙ্কর রায়ের ওয়াইফ হতে পারতে, সোমনাথ মনে-মনে বললো।

কলেজ থেকে পালিয়ে সেই যেদিন ওরা প্রথম এই নদীর ধারে এলো, সেদিনটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সোমনাথ। শ্রীময়ী, সমর, তপতী—জন্মদিনে ওদের সামান্য খাওয়াবে ঠিক করেছিল সোমনাথ।

কমলা বউদির কাছ থেকে সেদিন সকালেই তিরিশ টাকা নগদ জন্মদিনের উপহার পেয়েছিল সোমনাথ।

সোমনাথের জীবনে তখন কত রঙীন স্বপ্ন। নিত্য নতুন অনুপ্রেরণায় কবি. সোমনাথ তখন অজস্র কবিতা লিখে চলেছে। সেই সব সৃষ্টির তখন দুজন নিয়মিত পাঠিকা—কমলা বউদি ও তপতী। তপতী সবে তখন মীরাট থেকে এসে ওদের কলেজে ভর্তি হয়েছে। ইংরিজী মিডিয়ামে পড়েছে এতোদিন। ভাল বাংলা জানে না বলে ভীষণ লজ্জা। বাংলা সাহিত্য এবং বাংলার লেখক সম্বন্ধে তার বিরাট শ্রদ্ধা। সোমনাথের জন-অরণ্য তার খুব ভাল লেগেছিল।

কবির সঙ্গে তার পরিচয় সেই থেকে ক্রমশ নিবিড় হয়েছে। তপতীর জন্যে এবার সোমনাথ সুদীর্ঘ এক কবিতা লিখেছিল। নাম—আঁধার পেরিয়ে। উচ্ছ্বসিত তপতী বলেছিল, "কলম কেনার টাকাটা আমার উসুল হয়ে গেলো। জন-অরণ্য কবিতায় আপনি মানুষকে ভালবাসতে পারেননি, এবার মানুষের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পেরেছেন।"

"সমালোচনা কিছু থাকলে বলবেন," সোমনাথ অনুরোধ করেছিল।

খুব খুশী হয়েছিল তপতী। আঙুলের নখ কামড়ে বলেছিল, "আমার ঘাড়ে মস্ত দায়িত্ব চাপিয়ে দিচ্ছেন আপনি।" একটু ভেবে তপতী বলেছিল, "সবসময় গুরুগম্ভীর হবেন না। কবিদের তো হাসতে মানা নেই।"

তপতীর সমালোচনা অনুযায়ী সোমনাথ লিখেছিল হাল্কা মেজাজের কবিতা 'বনলতা সেনের বয়-ফ্রেণ্ডের প্রতি।' সেই কবিতা পড়ে কমলা বউদি খুব হেসেছিলেন। বলেছিলেন, "এ-যেন নতুন ধরনের কবিতা দেখছি। কারও বয়-ফ্রেণ্ড্ হবার চেষ্টা করছো নাকি, সোম?" সোমনাথ মুখ টিপে হেসে উত্তরটা এড়িয়ে গিয়েছিল। কবিতা পড়ে তপতী বলেছিল, "যদি কোনোদিন বই প্রকাশিত হয় লিখে দিতে হবে 'তপতী রায়ের পরামর্শ অনুযায়ী লিখিত।' না-হলে, অ্যাডভাইস ফি দিতে হবে।"

তপতীর কি এসব মনে আছে? সোমনাথের জানতে ইচ্ছে করে।

নদীর ধারে হাওয়ার দৌরাত্ম্য যেন বাড়ছে। সোমনাথের হাতে বইপত্তরের বোঝাটা দিয়ে তপতী আবার আঁচল সামলে নিলো। তারপর নিজেই জিজ্ঞেস করলো, "প্রথম যেদিন তোমার সঙ্গে এখানে এসেছিলাম, সেদিন কি জায়গাটা আরও সবুজ ছিল?"

"তখন আমাদের মন সবুজ ছিল," সোমনাথ শান্তভাবে বললো।

তপতী বললো, "তুমি তখনও খুব চাপা ছিলে। মনের ভিতর তোমার কী চিন্তা রয়েছে তা অন্য কাউকে বুঝতে দিতে না। সেদিন কলেজে যাবার পথে বাস স্ট্যাণ্ডেই তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল। আমার সঙ্গে শ্রীময়ী ছিল। তুমি বললে, আপনাদের দুজনকে আজ খাওয়াবো, মাঝে-মাঝে ঘুষ না দিলে কবিতা পড়ার লোক পাওয়া যাবে না।

"আমার মতো শ্রীময়ীও খুব ফরওয়ার্ড ছিল। মুখে কোনো কথা আটকাতো না। তোমাকে সঙ্গে-সঙ্গে বললো, 'খাওয়াবেনই যখন, তখন নদীর ধারে চলুন। জায়গাটা গ্র্যাণ্ড শুনেছি।' তুমি রাজী হয়ে গেলে। হেসে বললে, তিনজনে যাত্রা নিষেধ। সুতরাং চতুর্থ ব্যক্তিকে আমরা দুজনে যেন মনোনয়ন করি। আমি ভেবেছিলাম, ললিতাকে আমাদের সঙ্গে যেতে বলবো। কিন্তু ফচকে শ্রীময়ী বললো, 'প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে।' আমি বাংলা জানতাম না। প্রথমে বুঝতে পারিনি যে শ্রীময়ী বলতে চাইছে, ললিতাকে দলে নিলে ছেলে এবং মেয়ের প্রপোরশন নষ্ট হয়ে যাবে।

"শ্রীময়ী আমাকে গোপনে জিজ্ঞেস করলো, 'তোর নমিনি কে?' আমি হেসে বলেছিলুম, তিনিই তো খাওয়াচ্ছেন! শ্রীময়ীর ইচ্ছে দেখলাম, সমরকে সঙ্গে নেয়। সুতরাং তুমি ওকেই নেমন্তন্ন করলে।"

সোমনাথ হেসে বললো, "সমরকে নির্বাচনের পিছনে সেদিন যে তোমাদের এতো চিন্তা ছিল তা আমি জানতাম না। তবে সমর ছোকরা যে অত চালু তা আন্দাজ করিনি।"

অতীত রোমন্থন করে সোমনাথ বললো, "তোমার মনে আছে তপতী, সেদিন আমরা যখন এখানে এসে পৌঁছলাম তখন দুপুর বারোটা। পনেরো মিনিট এক সঙ্গে হৈ-হুল্লোড় করবার পরে সমর হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকালো। তারপর বললো, 'নদীর ধারে রেস্তরাঁয় আমরা পৌনে একটার আগে যাচ্ছি না। সুতরাং কিছুক্ষণের জন্যে বিচ্ছেদ। যত মত তত পথ। আমাদের সামনে দুটো চয়েস—হয় ইডেন গার্ডেন এবং না হয় নদীর ধার।' শ্রীময়ী একটা সিকি দিয়ে হেড-টেল করলো। ওরা চলে গেলো ইডেন গার্ডেনের ভেতর—আমরা দুজন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম নদীর ধারে।"

"তুমি বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলে সেদিন, সোমনাথ।" তপতী মনে করিয়ে দিলো।

"ঘাবড়াবো না? তোমার জন্যেই চিন্তা হলো। তুমি যদি ভাবো, আমরা দুই পুরুষ বন্ধু একটা সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র অনুযায়ী তোমাদের আলাদা করে দিলুম।"

সুদর্শনা তপতী ওর নতুন চশমার মধ্য দিয়ে সোমনাথের দিকে স্নিগ্ধ প্রশান্ত দৃষ্টিপাত করলো। বললো, "কবিরা যে ষড়যন্ত্রী হয় না তা আমার চিরদিনই বিশ্বাস ছিল, সোমনাথ।"

"তপতী, সেদিন তোমাকে খু-উ-ব ভাল লেগেছিল। বাদল দিনের প্রথম কদম ফুলের মতো!"

"তুমি কিন্তু বড় সরল ছিলে, সোমনাথ। শ্রীময়ী ও সমর রাস্তার ওপারে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া মাত্র বেশ নার্ভাস হয়ে পড়েছিলে। তারপর বলেছিলে, 'আপনি যদি চান, আমি এখন ওদের ডেকে নিয়ে আসছি!' আমি বাধা না দিলে, হয়তো তুমি ওদের খোঁজ করতে যেতে। আমি পশ্চিমে মানুষ। মীরাটের রাস্তায় সাইকেল চালিয়েছি। জিমনাসিয়ামে যুযুৎসু শিখেছি। ছেলেদের অত ভয় পাই না। বললাম, ওদের ডিসটার্ব করবেন কেন শুধু-শুধু? তুমি তখনও নার্ভাসনেস কাটাতে পারোনি। উত্তেজনার মাথায় গোপন খবরটা প্রকাশ করে ফেললে। বললে, 'আজ আমার জন্মদিন। বউদি তিরিশটা টাকা দিয়ে বললেন, যেমনভাবে খুশী খরচ করতে।' "

সোমনাথ মৃদু হাসলো। বললো, "এরপর তুমি কিন্তু আমাকে বেশ ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে তপতী। গম্ভীরভাবে তুমি জিজ্ঞেস করলে, 'সোমনাথবাবু, জন্মদিনে পাওয়া টাকাটা অনেকভাবেই তো খরচ করতে পারতেন। কিন্তু আমাদের ডাকলেন কেন?' "

সেদিনের কথা ভেবে এতোদিন পরেও তপতী মুচকি হাসলো। বললো, "তোমার মুখের অবস্থা দেখে তখন আমার মায়া হচ্ছিলো। তুমি ঘাবড়ে গিয়ে বললে, 'আপনি জন-অরণ্য কবিতাটা পছন্দ করে নিজের কাছে রেখে দিলেন। আমার পরের কবিতাগুলোকে কষ্ট করে পড়লেন। তাই কৃতজ্ঞতার ঋণ স্বীকার করতে ইচ্ছে হলো।' "

সোমনাথ অবিন্যস্ত চুলগুলোকে শাসন করতে-করতে তপতীর কথায় কৌতুক বোধ করলো। "তুমি যে আমার অবস্থা দেখে মনে-মনে হাসছো, তা কিন্তু তখন বুঝতে দাওনি। বেশ সহজ হয়ে বলেছিলে, 'কৃতজ্ঞতা পাঠিকার দিক থেকেই সোমনাথবাবু। একটা পুরো অপ্রকাশিত কবিতা আমাকে দিয়ে দিলেন!' তারপর তুমি রাগ দেখিয়েছিলে, তপতী। বলেছিলে, 'আপনার জন্মদিনে আমাকে এইভাবে বিপদে ফেললেন কেন? কিছু উপহার নিয়ে আসবার সুযোগ দিলেন না!' "

তপতী বললো, "তোমার অসহায় অবস্থাটা তখন বেশ হয়েছিল। আমার মায়া হচ্ছিলো, যখন তুমি বললে, 'জন্মদিনের খবরটা শুধু আপনাকেই দেবো

ঠিক করে রেখেছিলাম। শ্রীময়ী ও সমর যেন না জানতে পারে।"

সোমনাথ একটুও ভোলেনি। তপতীকে বললো, "তুমি রাজী হয়ে গেলে, আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। তুমি যখন বললে, 'জন্মদিনে অভিনন্দন জানাতে হয়, সোমবাবু! আপনি অনেক বড় হোন—অনেক নাম করুন। এবং মেনি হ্যাপি রিটারন্স্ অফ দি ডে,' জানো তপতী, সেই মুহূর্তে তোমাকে হঠাৎ ভীষণ ভাল লেগেছিল। একবার ভাবলুম, মনের এই আনন্দের কথা তোমাকে বলি। কিন্তু সাহস হলো না।"

তপতী চুপ করে রইলো। তারপর গম্ভীরভাবে বললো, "তোমার এই স্বভাবটাই তো আমাকে ভাবিয়ে তোলে সোম। তোমার আনন্দ, তোমার দুঃখ—কোনো কিছুতেই ভাগ বসাতে দাও না আমাকে।"

সোমনাথ কোনো উত্তর না-দিয়ে চুপচাপ হাঁটতে লাগলো। দূরে সেই পরিচিত রেস্তরাঁটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ওখানকার দোতলায় বসেই একদিন ওরা অকস্মাৎ পরস্পরকে আবিষ্কার করেছিল।

সোমনাথ বললো, "মনে আছে তোমার? আমরা পশ্চিমদিকে কোণের টেবিলটা দখল করেছিলাম।"

সোমনাথ নিজের মনেই বললো, "বিরাট কাঁচের জানালার ভিতর দিয়ে গঙ্গার জল দেখা যাচ্ছিলো। আমি অস্ফুটভাবে উচ্চারণ করলাম, পতিত উদ্ধারিণী গঙ্গে। তুমি মুখ ফুটে কিছুই বললে না। শুধু অবাক হয়ে একবার আমার দিকে তাকালে। আমিও গঙ্গার শোভা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তোমার দিকে তাকিয়ে রইলাম। হঠাৎ মনে হলো, চোখের আলোয় দেখা হলো, এই প্রথম আমরা নিজেদের চিনলাম।"

তপতী গম্ভীরভাবে বললো, "তুমি তাহলে মনে রেখেছো? আমি ভাবছিলাম···" এবারে চুপ করে গেলো তপতী।

"কী ভাবছিলে? বলো না তপতী।" সোমনাথ অনুরোধ করলো।

অভিমানিনী তপতী বলেই ফেললো, "আমি ভাবছিলাম—অতীতকে তুমি ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিয়েছো।"

সোমনাথ নির্বাক হয়ে রইলো। সে কী বলবে কিছুই ঠিক করে উঠতে পারছে না।

স্নেহময়ী তপতী খুব মিষ্টি স্বরে জিজ্ঞাসা করলো, "রাগ করলে?"

"না, তপতী। রাগ করবো কেন?" সোমনাথ নার্ভাস হয়ে উঠছে। "জানো তপতী," সোমনাথ আবার কিছু বলবার চেষ্টা করলো।

"বলো," তপতী করুণভাবে অনুরোধ করলো।

"জীবনটাকে কিছুতেই গুছোতে পারলাম না।" সোমনাথ অকপটে স্বীকার করলো। তপতীর কাছে এসব বলতে তার লজ্জা লাগছে। কিন্তু আজ কিছুই সে চেপে রাখবে না। "তুমি, বাবা, বউদি, দাদারা সবাই অধীর আগ্রহে আমার দিকে তাকিয়ে আছো—কিন্তু আমি নিজের পায়ে দাঁড়াতেই পারছি না। তোমাদের সবাইকে আমি নিরাশ করছি। কোথাও নিশ্চয় আমার একটা সিরিয়াস দোষ আছে।"

তপতী এ-বিষয়ে মোটেই বিব্রত নয়। বললো, "তুমি বড্ড বেশি ভাবো সোম। অবশ্য তোমার মধ্যে কবিতা রয়েছে, তুমি ভাববেই তো! অনেকে একদম ভাবে না—না নিজের সম্বন্ধে না অপরের সম্বন্ধে।"

"তারা বেশ সুখে থাকে। তাই না?" সোমনাথ জিজ্ঞেস করলো।

"তা হয়তো থাকে—কিন্তু তাদের আমার মোটেই ভাল লাগে না। দীপঙ্করের কথা বলেছিলে তুমি। ছেলেটা ঐ ধরনের। আই-এ-এস হতে পারে, কিন্তু নিজেকে নিয়েই সবসময় ব্যস্ত।"

সোমনাথ চুপচাপ রইলো। তারপর দূরে একটা নৌকার দিকে তাকিয়ে বললো, "তোমার মনে আছে? শ্রীময়ী এবং সমর আমাদের কী বিপদে ফেলেছিল? পৌনে একটার সময় রেস্তরাঁয় ফেরবার কথা—আমরা দুজনে হাঁ করে বসে আছি, ওরা এলো দেড়টার সময়। বকুনি দিতে ফিক করে হেসে সমর বললো, 'ঘড়িতে গোলমাল ছিল।' শ্রীময়ীর মুখচোখেও কোনো বিরক্তির ভাব দেখা গেলো না।"

তপতী নিজের ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে। এখন সোয়া একটা। তপতী বললো, "একটা কথা বলবো? রাগ করবে না?"

"আগে শুনি কথাটা," সোমনাথ উত্তর দিলো।

"তোমাকে লাঞ্চে নেমন্তন্ন করছি।" তপতী বেশ ভয়ে-ভয়ে বললো।

সোমনাথ আপত্তি করলো না। কিন্তু ওর মুখ কালো হয়ে উঠলো।

পশ্চিম দিকের সেই পরিচিত সীটটায় বসলো ওরা। কলেজের সেই পুরানো সোমনাথ কোথায় হারিয়ে গেছে। যে-সোমনাথ আজ তপতীর সামনে বসে রয়েছে সে প্রাণহীন নিষ্প্রভ। ঝকঝকে সুন্দর কবিতার ভাষায় যে কথা বলতে পারতো, সে এখন চুপচাপ বসে থাকে। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে মুখ খোলে না। অথচ একে কেন্দ্র করেই তপতীর সব স্বপ্ন গড়ে উঠেছে।

সোমনাথ এই মুহূর্তে প্রেমের মধ্যেও অর্থের বিষ দেখতে পাচ্ছে। এখানে এই গঙ্গার তীরে প্রিয় বান্ধবীকে নিয়ে বার-বার আসবে এমন স্বপ্ন সোমনাথ অবশ্য দেখেছিল। কিন্তু তাই বলে তপতী খরচা দেবার প্রস্তাব করবে এটা অকল্পনীয়।

তপতী বুঝতে পারছে হঠাৎ কোথাও ছন্দপতন হয়েছে। সে যা সহজভাবে নিয়েছে, সোমনাথ তা পারছে না।

"রাগ করলে?" তপতী জিজ্ঞেস করলো।

সোমনাথ প্রশ্নটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলো। বললো, "না।"

সোমনাথ ভাবছে ১লা আষাঢ়ের সেই প্রথম আবিষ্কারের পর এই নদী দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে। ভাটার টানে সোমনাথ ক্রমশ পিছিয়ে পড়েছে আর তপতী জোয়ারের স্রোতে ক্রমশ এগিয়ে চলেছে। সেই সেদিন যখন প্রথম দেখা হলো তখন দুজনেই কলেজের প্রথম বছরের ছাত্রছাত্রী। সুদর্শন সোমনাথ সচ্ছল পরিবারের ভদ্র সন্তান। উপরন্তু সে কবি—সাধারণ মেয়ের সাধারণ দুঃখ থেকে জন-অরণ্যের মতো কবিতা লিখে ফেলতে পারে। আর তপতী সাধারণ একটা সুশ্রী শ্যামলী মেয়ে। স্বভাবে মধুর, কিন্তু এই বাংলায় নতুন। ভাল করে বাংলা উচ্চারণ করতে পারে না—কবিতা লেখা তো দূরের কথা। সোমনাথকে শ্রদ্ধা করতে পেরেছিল বলেই তো তপতী নিজের হৃদয়কে অমনভাবে দিয়েছিল।

কিন্তু তারপর? তপতী পড়াশোনায় ভাল করেছে। ছাত্রী হিসাবে নাম করেছে। আর সোমনাথ অর্ডিনারি থেকে গেছে। তপতী অনেক নম্বর পেয়েছে, সোমনাথ কোনোরকমে ফেলের ফাঁড়া কাটিয়েছে। তপতী সুন্দর ইংরিজী লিখতে পারে, বলতে পারে আরও ভাল। সোমনাথ ইংরিজীর কোনো ব্যাপারেই তেমন সুবিধে করতে পারে না। সোমনাথ পাস কোর্সের বি-এ, তপতীর অনার্সে ভাল ফল পেতে কোনো অসুবিধে হয়নি। এরপর প্রিয় বান্ধবীর সঙ্গে সোমনাথ আর তাল রাখতে পারেনি। তপতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। প্রথম শ্রেণীর এম-এ ডিগ্রিটা নিতান্ত সহজভাবেই সে ভ্যানিটি ব্যাগে পুরে ফেলেছে। সোমনাথ এই আড়াই বছর ধরে ডজন-ডজন চাকরির আবেদন করেছে এবং সর্বত্র ব্যর্থ হয়েছে। এখন তপতী রায় রিসার্চ স্কলার। সোমনাথের কবি হবার স্বপ্ন কোনকালে শুকিয়ে ঝরে পড়েছে। তার এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ কার্ডের নম্বর দু লক্ষ দশ হাজার সতেরো।

এসব তপতীর যে অজ্ঞাত তা নয়। কিন্তু কোনো এক ১লা আষাঢ়ে সে যাকে আপন করে নিয়েছিল, হৃদয়ের স্বীকৃতি দিয়েছিল, তাকে সে আজও অস্বীকার করেনি। সোমনাথের জীবনের পরবর্তী ঘটনামালার সঙ্গে তপতীর ভালবাসার যেন কোনো সম্পর্ক নেই। তপতী এর মধ্যে আরও প্রস্ফুটিতা হয়েছে। ভারী সুন্দর দেখতে হয়েছে তপতী—ফার্স্ট ইয়ারে বরং এতোটা মনোহারিণী ছিল না সে।

সোমনাথ ভাবলো যৌবনের প্রথম প্রহরে অনেকে অনেক রকম আকর্ষণে

মুগ্ধ হয় – ক্ষণিকের জন্য অযোগ্য কাউকে মন দিয়েও ফেলে। কিন্তু বুদ্ধিমতীরা সেইটাই শেষ কথা বলে মেনে নেবার নির্বুদ্ধিতা দেখায় না। সমরের সঙ্গে শ্রীময়ী তো কত ঘুরে বেড়িয়েছে। ইডেনে নির্জন প্যাগোডার ধারে ১লা আষাঢ়েই তো ওরা দুজনে ইচ্ছে করে দেড় ঘণ্টা বসেছিল। চুম্বনেও আপত্তি করেনি শ্রীময়ী। তারপর সুপুরুষ সমরের হাত ধরে শ্রীময়ী তো কত দিন লেকের ধারে, বোটানিক্‌সে এবং ব্যাণ্ডেল চার্চের প্রাঙ্গণে ঘুরে বেড়িয়েছে। কিন্তু যেমনি সমর পড়ায় পিছিয়ে পড়তে লাগলো, যেমনি বোঝা গেলো ওর ভবিষ্যৎ নেই, অমনি শ্রীময়ী ব্রেক কষেছে, আর বোকামি করেনি।

সোমনাথ ভাবলো, ভালই করেছে শ্রীময়ী। নিজের মতামতের পুনর্বিবেচনার অধিকার প্রত্যেক মানুষের আছে। না-হলে, শ্রীময়ী আজ কষ্ট পেতো – সিঁথির লাল রঙের জোরে অফিসার অশোক চ্যাটার্জির নতুন ফিয়াট গাড়িটায় অমন সুখে বসে থাকতে পারতো না।

শুধু শ্রীময়ী কেন? কলেজের কত মেয়ে তো ক্লাসের কত ছেলের সঙ্গে ভাব করেছে, একসঙ্গে সিনেমা থিয়েটার দেখেছে, অন্ধকারে অধৈর্য বন্ধুদের একটু-আধটু দৈহিক প্রশ্রয় দিয়েছে। অরবিন্দর মতো যেসব ছেলে চাকরি পেয়েছে, তারা বান্ধবীদের গলায় মালা পরাতে পেরেছে। বাকি সব সঙ্গিনী কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। যার জীবনসঙ্গিনী হবার অভিলাষ ছিল তাকেই এখন পথে দেখলে মেয়েরা চিনতে পারে না। বেকারদের সঙ্গে প্রেম করবার মতো বিলাসিতা মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের নেই। তাদের আর্থিক নিরাপত্তা চাই। নিজের বোন থাকলেও সোমনাথ তাই খুঁজতো।

"তুমি ভীষণ রেগে গেছ, মনে হচ্ছে। একটাও কথা বলছো না," আবার অভিযোগ করলো তপতী।

ছোট ছেলের মতো হাসলো সোমনাথ। ওর হাসিটা তপতীর খুব ভাল লাগে। সে বলেই ফেললো, "তোমার হাসিটা ঠিক একরকম আছে, সোম। খুব কম লোক এমনভাবে হাসতে পারে।"

"হাসি দিয়ে মানুষকে বিচার করা আজকের যুগে নিরাপদ নয়, তপতী," সোমনাথ হাসি চাপবার চেষ্টা করলো।

"যারা মানুষ ভাল নয়, তারা এমন হাসতে পারে না।" সোমনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে সপ্রতিভভাবে তপতী উত্তর দিলো। এই সহজ নির্মল হাসি দেখে বহু সহপাঠীর ভিড়ের মধ্যে সোমনাথকে তপতী খুঁজে পেয়েছিল।

খাবারের অর্ডার দিয়েছে তপতী। সোমনাথ কী খেতে ভালবাসে সে জানে।

খেতে-খেতে সোমনাথ বললো, "খুব ঝগড়া করবে বলেছিলে যে?"

হেসে ফেললো তপতী। "করবোই তো। কিন্তু খাওয়ার সময় ছেলেদের সঙ্গে ঝগড়া করতে নেই।"

"পারমিশন দিচ্ছি," সোমনাথ বললো।

এবার তপতী বললো, "সোম, তুমি আমাকে এমনভাবে দূরে সরিয়ে রাখছো কেন?" অনেক কষ্ট করে তপতী যে কথাগুলো বলছে তা সোমনাথের বুঝতে বাকী রইলো না।

মুহূর্তের জন্যে স্তম্ভিত হয়ে রইলো সোমনাথ। তারপর মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, "আমি যেসবের যোগ্য নই তুমি অকাতরে তাই আমাকে দিয়েছো, তপতী। কিন্তু আমি অমানুষ নই। তোমার ক্ষতি করতে পারবো না।"

শান্ত তপতী গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করলো, "কারও সঙ্গে কথা বললে, চিঠি লিখলে, দেখা করলে, বুঝি তার ক্ষতি করা হয়?"

"আমাদের এই দেশে মেয়েদের ক্ষেত্রে হয় তপতী। তোমার কোনো ভাল করতে পারিনি, তোমার যোগ্য করে নিজেকে তৈরিও করতে পারিনি —কিন্তু তোমার ভবিষ্যৎটা নষ্ট-করবো না," সোমনাথের গলা বোধহয় একটু কেঁপে উঠলো।

তপতী কিন্তু সহজভাবে সোমনাথের দিকে তাকালো। তারপর প্রশ্ন করলো, "মেয়েরা যে ছেলেদের সমান, এটা তুমি স্বীকার করো সোম?"

"ওরে বাবা! অবশ্যই করি। সংবিধানসম্মত অধিকার, স্বীকার না করে উপায় আছে? সামনেই হাইকোর্ট।" দূরে কলকাতা হাইকোর্টের চুড়োটা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে।

তপতী বললো, "তাহলে আমাকে নাবালিকা ভাবছো কেন? তুমি তো আমার কাছে কিছুই চেপে রাখোনি।"

"আমার নিজের কনসেন্স তো চেপে রাখতে পারি না, তপতী। আমার সম্মান নেই, চাকরি নেই—তোমার সব আছে।"

তপতী জিজ্ঞেস করলো, "তাহলে আমার নিজের কোনো অধিকার নেই? আমার কাকে পছন্দ করা উচিত তা আমি ঠিক করতে পারবো না? চাকরি ছাড়া পুরুষ মানুষের অন্য কিছুই মেয়েরা ভালবাসতে পারবে না? বিদেশে তো এমন হয় না। ইংলণ্ড আমেরিকায় তো কত মেয়ে চাকরি করে স্বামীকে পড়ায়—নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করে।"

গম্ভীর হয়ে উঠলো সোমনাথ। বললো, "তুমি এবং আমি বিদেশে জন্মালে বেশ হতো তপতী।"

তপতীর মনোবলের অভাব নেই। বললো, "যেখানেই জন্মাই—যা মন চায়

তা করবোই।"

চুপ করে রইলো সোমনাথ। সে ভাবছে, বিদেশে জন্মালে, কোনো সমস্যাই থাকতো না—সেখানে কেউ এমনভাবে বেকার বসে থাকে না।

"কী ভাবছো?" তপতী জিজ্ঞেস করলো।

বিষণ্ন অথচ শান্ত সোমনাথ বললো, "তুমি দিচ্ছো বলেই যদি আমি গ্রহণ করি তাহলে কেউ আমাকে ক্ষমা করবে না, তপতী। ভাববে জেনেশুনে এই বেকার-বাউণ্ডুলে একটা শিক্ষিতা সুন্দরী সরল মেয়ের সর্বনাশ করেছে। জানো তপতী, আড়াই বছর দোরে-দোরে চাকরি ভিক্ষে করে দুনিয়ার কাছে ছোট হয়ে গেছি—কিন্তু এখনও নিজের কাছে ছোট হইনি। নিজের কাছে ছোট হতে আমার ভীষণ ভয় লাগে।"

তপতী কিছু না-বলেই ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। মেয়েরা অনেক বড়-বড় ব্যাপারে কত সহজে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে—ছেলেরা পারে না, তাদের মধ্যে কত দ্বিধা এবং দ্বন্দ্ব থেকে যায়।

সোমনাথ বললো, "তুমি এবং কমলা বউদি হয়তো বিশ্বাস করবে না—কিন্তু আজকাল মাঝে-মাঝে ভয় হয়, শেষ পর্যন্ত আমি নিজের কাছে যেন ছোট না হয়ে যাই।"

বেয়ারা বিল দিয়ে গেলো। সোমনাথ বিলটা নিতে গেলে, তপতী অকস্মাৎ ওর হাতটা চেপে ধরলো। এই প্রথম তপতীর উষ্ণ অঙ্গের কোমল স্পর্শ পেলো সোমনাথ। ঘন সান্নিধ্যের এক অনাস্বাদিত শিহরণ মুহূর্তের জন্য অনুভব করেও পরমুহূর্তে সে হাত ছাড়িয়ে নিলো। সোমনাথের মনে হলো নিজের কাছে সে এবার সত্যিই ছোট হয়ে যাচ্ছে।

তপতী গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করলো, "তোমাকে এখানে নিয়ে এলো কে?"

সোমনাথ বললো, "সব জিনিসের একটা নিয়ম আছে, তপতী। ছেলেদের ছোট করতে নেই।"

তপতী বললো, "প্লিজ সোমনাথ। আমার কথা শোনো। আজ প্রথম ইউ-জি-সি স্কলারশিপের আড়াইশ' টাকা পেলাম। আমার অনেকদিনের ইচ্ছে ছিল প্রথম মাসের টাকা পেয়ে তোমার কাছে আসবো।"

তপতী এবার কোনো কথা শুনলো না। বিলের টাকাটা মিটিয়ে সে বেরিয়ে এলো।

বাস স্টপের দিকে হাঁটতে-হাঁটতে সোমনাথ বললো, "তুমি বিশ্বাস করলে না। আমার কাছে টাকা ছিল। আজ হঠাৎ দেড়শ' টাকা রোজগার হয়ে গেলো।"

তপতী বললো, "এই তো শুরু। আমি জানি, বিজনেসে তুমি অনেক

টাকা রোজগার করবে। এবং তখন...”

কথাটা শেষ করছে না তপতী। ইতিমধ্যে তপতীর বাস এসে গেছে—সে ভবানীপুরে যাবে। সোমনাথ ফিরে যাবে অফিসে।

বাসে তপতীকে তুলতে-তুলতেই সোমনাথ জিজ্ঞেস করলো, “তখন?”

“তখন কোনো কথাই শুনবো না—সারাজীবন তোমার অন্ন খাবো।”

তপতীর শেষ কথাগুলো অসংখ্য বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে এক অনির্বচনীয় সুরের ঝঙ্কারে সোমনাথের কানে এখনও বাজছে। সোমনাথকে নিজের পায়ে দাঁড়াতেই হবে। সংসারের পরগাছা হয়ে সোমনাথ কিছুতেই আর সময়ের অপচয় করবে না।
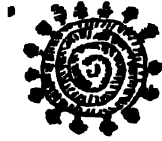
বিকেলবেলায় মিস্টার মাওজীর সঙ্গে সোমনাথের দেখা করার কথা আছে। মাওজীর নানারকম কেমিক্যালের ব্যবসা করেন। আদকবাবুই এদের খবর দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, “ভীষণ ভদ্দরলোক, বোম্বাই মুসলমান এঁরা। আপনার ব্রীজবাবুর মতো শুধু নিজের আত্মীয়কুটুম্ব এবং গাঁয়ের লোকদের কোলে ঝোল টানে না। মুখুজ্যে, চাটুজ্যে, হাজরা, দাস, বোসদের সঙ্গেও এঁরা সম্পর্ক রাখে—লাভের সবটাই দেশে পাঠাবার জন্যে এঁরা উঁচিয়ে বসে নেই।”

মাওজীদের সঙ্গে এর মধ্যে কয়েকবার দেখা করে এসেছে সোমনাথ। ওঁরা একেবারে বিদায় দেননি। সোমনাথকে একটু বাজিয়ে দেখেছেন। দু-একটা অফিস থেকে খবরাখবর আনতে বলেছেন। সোমনাথ যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। দু-একটা ভাল খবরও এনেছে।

মিস্টার মাওজী আজ জিজ্ঞেস করলেন, “কাজকর্ম কেমন হচ্ছে, মিস্টার বনার্জি?”

এ-পাড়ার অভিজ্ঞতা থেকে সোমনাথ জেনেছে, কখনও বলতে নেই যে কিছুই হচ্ছে না। তাতে পার্টির ভরসা কমে যায়, ভাবে লোকটার দ্বারা কিছু হবে না। তাই ব্যবসায়িক কায়দায় সোমনাথ বলে, “আপনাদের শুভেচ্ছায় চলে যাচ্ছে।”

মাওজী জিজ্ঞেস করলেন, “এখন কোন লাইনে কাজ করছেন?”

কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না সোমনাথ। কোথায় সায়েব বাড়ি ভাঙা হচ্ছে, এই খোঁজখবর করছে বললে মিস্টার মাওজী নিশ্চয় ইম্প্রেস্‌ড হবেন না। হঠাৎ খাম এবং কাগজের কথা মনে পড়ে গেলো। বললো, “পেপার, স্টেশনারি এই

সব অফিস সাপ্লাইয়ের দিকে জোর দিচ্ছি।"

মাওজী বললেন, "ওসব লাইনে তো বেজায় ভিড়। ওখানে খুব সুবিধে হবে কী?"

"অফিস-টফিসে হায়ার লেভেলে কিছু জানা-শোনা আছে, কোনোরকমে চালিয়ে দিচ্ছি।" সোমনাথ বেশ সুন্দর অভিনয় করলো। মাওজী যদি জানতে পারেন—গত ক'মাসে সে সর্বসমেত তিরিশ এবং দেড়শ' টাকা রোজগার করেছে!

"কাজ বাড়িয়ে যান," মিস্টার মাওজী বললেন। "বিজনেস এমন জিনিস যে দাঁড়িয়ে থাকাটাই মৃত্যু। সব সময় এগিয়ে যেতে হবে।"

কী ধরনের উত্তর দেওয়া উচিত সোমনাথ বুঝতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত বললো, "বুঝতেই পারছেন—ক্যাপিটালের অভাব। টাকা না-হলে ব্যবসা হয় না। সরকারী ব্যাঙ্কগুলো বলছে পয়সা আমরা দেবো। কিন্তু কেবল নাম-কা ওয়াস্তে। ওদের কাছে টাকা নিয়ে তো ক্যাপিটেল বাড়ানো যায় না।"

এমন সময় মাওজীদের আর এক ভাই ঘরে ঢুকলেন। সিনিয়র মিস্টার মাওজী এবার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। জুনিয়র মাওজী সোমনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনাকে তো দেখেছি মনে হচ্ছে।"

"কোথায় বলুন তো?" স্ট্র্যাণ্ড রোডের রেস্তরাঁয় লোকটা এতক্ষণ বসেছিল না তো? সোমনাথের একটু চিন্তা হলো।

মাওজী বললেন, "এবার মনে পড়েছে। লেকের ধারে। একটা অ্যামবাসাডার গাড়ি চালাচ্ছিলেন আপনি। সঙ্গে এক ভদ্রমহিলা ছিলেন। আপনারা কোকাকোলা খেলেন। আমরাও ওই দোকানে কোক খাচ্ছিলাম।"

সিনিয়র মাওজী ধরে নিলেন সোমনাথের গাড়ি আছে। তিনি বললেন, "যা বলছিলুম, মিস্টার বনার্জি। নজরটা উঁচু করুন। আপনার গাড়ি রয়েছে জানাশোনা কোম্পানি রয়েছে অনেক—আপনি বড়-বড় কাজ ধরবার চেষ্টা করুন। টাকার জন্যে ভাববেন না। টাকার কোনো দরকার নেই। আপনি শুধু অর্ডার বুক করবেন। কোম্পানি সোজা মাল পাঠিয়ে দেবে—আপনি কমিশন পেয়ে যাবেন।"

মিস্টার মাওজী যে কী বলছেন সোমনাথ বুঝতে পারছে না।

মাওজী বললেন, "আমাদের কয়েকজন আত্মীয় বোম্বাইতে একটা কেমিক্যাল ফ্যাকটরি খুলেছে। কয়েকটা প্রোডাক্ট আমরা নিজেরাই বাজারে চালাচ্ছি। আপনি একটু বসুন—আমার কাজিন বোম্বাই থেকে এসেছে, এখনই দেখা হয়ে যাবে।"

মিস্টার মাগুজীর কাজিন একটু পরেই এলেন। সব শুনে বললেন, "আপনাকে একটা সুযোগ দিতে পারি আমি। আমাদের নতুন মাল কয়েকটা জায়গায় চালু করবার চেষ্টা করে দেখুন। আপনার কোনো আর্থিক দায়িত্ব নেই। সোজা এখানে অর্ডার পাঠিয়ে দেবেন। তারপর যদি ভাল কাজ দেখাতে পারেন—আপনার ফিউচার ব্রাইট। আমরা আপনাকে এজেন্সি দিয়ে দেবো। কমিশন পাবেন।"

বেশ উত্তেজনা বোধ করছে সোমনাথ। আদকবাবু বললেন, "দেখুন যদি আপনার কিছু হয়। ও-ঘরে মিস্টার সিংঘী তো বোম্বাই-এর ভাল একটা কোম্পানির এজেন্সি রেখেছেন। ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে মাসে বারোশ' টাকা রোজগার করছেন।"

সুতরাং বলা যায় না—হয়তো এবার সত্যিই সোমনাথ ব্যানার্জির ভাগ্য খুলবে।

বউদি এদিকে অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। বলছেন, "বাবাকে আর চেপে রেখে লাভ কী?"

সোমনাথ বললো, "দাঁড়ান, আগে একটু আশার আলো দেখি। এখনও পর্যন্ত তো আপনার দেওয়া পয়সাতেই টিফিন সারছি।"

সোমনাথ ঠিক করেছিল কাউকে বলবে না। কিন্তু বউদির কাছে চাপতে পারলো না সোমনাথ। "বউদি, যা দেখছি, বড় জায়গায় বড় টোপ ফেলতে হয়। নোংরা জামা-কাপড় পরে বাসে-ট্রামে ঝুলে পারচেজ অফিসারদের কাছে গেলে কাজ হয় না। দু-একদিন যদি গাড়িটা বার করবার দরকার হয়?"

"এতো বলবার কী আছে?" বউদি ভেবে পান না। "তা ছাড়া তোমার দাদা এখানে নেই। মাঝে-মাঝে গাড়িটা বার করলে বরং ভালই হবে। তুমি আমার কাছে পেট্রলের দাম নিয়ে নেবে।"

তেলের দাম দরকার হবে না। এখনও নগদ দেড়শ' টাকা পকেটে রয়েছে। মাছের তেলেই মাছ ভাজবে সোমনাথ।

কিন্তু সোমনাথের ভাগ্যটা নিতান্তই পোড়া। নতুন কেমিক্যালসের নমুনা এবং চিঠিপত্তর নিয়ে কাছাকাছি চার-পাঁচ জায়গায় দেখা করল সোমনাথ। সবাই টেলিফোন নম্বর পর্যন্ত লিখে নিলো। সোমনাথ প্রতিদিন সেনাপতির কাছে জানতে চায় কোনো ফোন এসেছিল কিনা। সেনাপতি বলে, "কোথায় আপনার ফোন?"

ফোন আসে অনেক। কিন্তু সবই সুধাকর শর্মার। সুধাকর শর্মা কাজের চাপে হিমসিম খেয়ে যান।

অত কাজের মধ্যেও বিকেলের দিকে যার সঙ্গে টেলিফোনে সুধাকরবাবু কথা বলেন তাঁর নাম নটবর মিত্তির।

কয়েকবার নটবরবাবুকে দেখেছে সোমনাথ। সুধাকর শর্মা ওঁকে সঙ্গে নিয়ে আড়ালে চলে যান। দুজনে কী সব গোপন কথাবার্তা হয়।

এই বন্ধুহীন জগতে এখন আদকবাবুই একমাত্র সোমনাথের ভরসা। বিশুবাবু যে কোথায় উধাও হয়েছেন কেউ জানে না। সেনাপতির ধারণা, তিনি এক ফ্রেণ্ডের সঙ্গে বিজনেস-কাম-প্লেজার ট্রিপে বেরিয়েছেন—গাড়িতে বিহার এবং উড়িষ্যা ঘুরবেন। বিশুবাবু থাকলে দু-একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা যেতো।

আদকবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কী ভাবছেন অত, মিস্টার ব্যানার্জি।"

সোমনাথ বললো, "আপনি যদি না হাসেন, তাহলে একটা প্রশ্ন করি।"

"বলুন।" আদকবাবু সম্মতি দিলেন।

"আচ্ছা, একই ঘরে এতোগুলো লোক হাত গুটিয়ে চুপচাপ বসে আছে, অথচ সুধাকরবাবুর এতো কাজ কী করে হয়?"

হাসলেন আদকবাবু। তারপর বললেন, "কেন মিছে কথা বলবো: শ্রম। এই দুনিয়াতে কপালটা বিধাতাপুরুষ দেন—কিন্তু শ্রম পুরুষ মানুষের নিজস্ব।"

সেই সময় যে নটবরবাবু ওখানে এসে পড়েছেন কেউ লক্ষ্য করেনি। নটবরবাবুর সঙ্গে আদকবাবুর পরিচয় আছে। নটবরবাবুর গোলগাল চেহারা। বুশ শার্টের তলায় পাঁচ নম্বর ফুটবলের মতো একটি ভুঁড়ি রয়েছে। মাথার মধ্যিখানে তিন ইঞ্চি ব্যাসের গোল টাক পড়েছে। ওখানকার ক্ষতিপূরণ হয়েছে অন্যত্র। দুই কানে বেশ কিছু বাড়তি চুল ভদ্রলোকের।

নটবরবাবু হুঙ্কার ছাড়লেন, "কী বললেন? ডাহা ভুল। ওসব ওয়ান্স-আপন-এ-টাইমের কথা বলে কেন এই ইয়ং ম্যানের টুয়েলভ-ও-ক্লক বাজাচ্ছেন? 'শ্রম' দিয়ে যদি কিছু হতো তাহলে কুলি এবং রিকশাওয়ালারাই কলকাতার সবচেয়ে বড়লোক হতো।"

সোমনাথ অবাক হয়ে ওঁর মুখের দিকে তাকালো। নটবর বললেন, "বিজনেসের একমাত্র কথা হলো পি-আর।"

"সেটা আবার কী জিনিস?" আদকবাবু বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

নটবর একগাল হেসে বললেন, "পাবলিক রিলেশন অর্থাৎ জনসংযোগ।"

সোমনাথ এখনও বোকার মতো তাকিয়ে আছে। নটবরবাবু বললেন, "এখনও বুঝতে পারলেন না? যেসব ক্ষমতাবান লোক আপনার কাছে মাল

কিনবেন তাঁদের সঙ্গে আপনার সংযোগটা কী রকম তার ওপর নির্ভর করছে।"

সোমনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে অধৈর্য নটবর বললেন, "এখনও বুঝতে পারছেন না? অন্য জাতের ছেলেরা তো পেট থেকে পড়বার আগেই এই সব জেনে ফেলে।"

সুধাকরজী এখনও আসেননি। ওঁর টেবিলের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে নটবর মিত্তির বললেন, "এই শর্মাজীকেই দেখুন না কেন। মাল খারাপ, ওজন কম, দাম বেশি। তবু শর্মাজী পটাপট অর্ডার পাচ্ছেন ওই জনসংযোগের জোরে। আর আপনি ঐ সব কোম্পানিতেই কম দামে ভাল মাল অফার করুন। এক আউন্স কেমিক্যাল বিক্রি করতে পারবেন না। যদিও বা বিক্রি করতে পারেন, পেমেণ্ট কিছুতেই পাবেন না। আট মাস ন' মাস পরে পয়সার অভাবে আপনি ব্যবসা ডকে তুলে কাঁদতে-কাঁদতে বাড়ি ফিরে যাবেন। অথচ ঠিক মতো জনসংযোগ করুন······"

কথায় বাধা পড়লো। সুধাকরজী এসে পড়লেন। নটবর মিত্তির বললেন, "ওঁর সঙ্গে জরুরী কথাবার্তা আছে। যদি এ-সব ব্যাপার শিখতে চান – আসবেন এই গরীবের কাছে।" এই বলে নিজের একখানা ভিজিটিং কার্ড সোমনাথের হাতে গুঁজে দিয়ে নটবর মিটার সামনের টেবিলে চলে গেলেন। দু মিনিটের মধ্যে ওঁরা দুজনে আবার বেরিয়ে পড়লেন।

আদকবাবু এতোক্ষণ চুপ করে ছিলেন। এবার বিরক্তভাবে বললেন, "লোকটা যেন কেমন ধরনের! সুধাকরবাবুর সঙ্গে গলায়-গলায়। আমার কিন্তু মোটেই ভাল লাগে না ওঁকে।"

কয়েক দিন পরে নটবর মিত্তিরের সঙ্গে রবীন্দ্র সরণির ওপরেই দেখা হয়ে গেলো সোমনাথের। "ও মিস্টার ব্যানার্জি, শুনুন শুনুন," নটবর মিত্তির সোমনাথকে ডাকলেন।

সোমনাথ নমস্কার করলো নটবরকে। মিস্টার মিটার জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন হচ্ছে বিজনেস?"

সোমনাথ কিছু চেপে রাখলো না। বললো, "কয়েকটা কাপড়ের কল এবং কাগজের কলে পারচেজ অফিসারদের সঙ্গে নিয়মিত দেখা করছি। ভাল দু-একটা কেমিক্যালস আছে।"

"কিছু হচ্ছে?" মিস্টার মিটার একগাল হেসে জিজ্ঞেস করলেন।

"চেষ্টা করছি।" সোমনাথ বললো।

এবার হা-হা করে হেসে উঠলেন নটবর মিটার। "ওই চেষ্টাই করে যাবেন। আর আপনার নাকের ডগায় অর্ডার নিয়ে যাবে সুধাকর কোম্পানি!"

পকেট থেকে কৌটো বার করে নস্যি নিলেন নটবর মিটার। "আপনি সন অফ দি সয়েল তাই বলছি। না-হলে আমার কী? আপনি হোল লাইফ ধরে ভেরেণ্ডা ফ্রাই করুন না, আমার কিছু এসে যাবে না। শুনুন মশাই, সোজা কথা --বড়-বড় কোম্পানিরা আপনার কাছে মাল কিনবে না। তারা নামকরা কোম্পানির ঘর থেকে ডাইরেক্ট মাল নেবে। বিলিতী কোম্পানির কেমিক্যাল ছেড়ে তারা আপনার ওই মাওজী কোম্পানির মাল টাচ করবে না। ঠিক কিনা?"

সোমনাথকে একমত হতে হলো। নটবর মিটার বললেন, "তাহলে আপনাকে যেতে হবে মাঝারি এবং ছোট-ছোট কোম্পানিতে। ঠিক কিনা?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ," সোমনাথ বললো।

নটবর মিটার মিটমিট করে হেসে বললেন, "ছোট-খাট কোম্পানিগুলো সব এখন ইণ্ডিয়ানদের হাতে। গেঁড়াকলের স্থবিধের জন্যে মালিকরা নিজেদের ভাইপো-ভাগ্নে এবং গাঁয়ের লোকেদের এনে পারচেজ অফিসে বসিয়ে দিয়েছে। তারা মালিকদের স্থবিধে দেখছে এবং সেই সঙ্গে নিজেদের স্থবিধেও করছে।"

সোমনাথ চুপ করে আছে। নটবর মিটার বললেন, "স্থতরাং আপনাকে বশীকরণ মন্তরটা আগে জানতে হবে, যেমন জানেন স্থধাকরজী। আর না-জানলে আমাদের মতো পাবলিক রিলেশন কনসালটেণ্টদের কাছ থেকে শিখে নিতে হবে।"

নটবর মিটার বললেন, "ট্যাক্সি পাচ্ছি না বলেই আপনার এইভাবে সময় নষ্ট করতে পারছি। না-হলে, অ্যাজ এ জনসংযোগ উপদেষ্টা আমি ভীষণ ব্যস্ত। অর্ডার সাপ্লাই লাইনে যারা পাকা লোক তারা জানে নটবর মিটারের দাম।"

নটবর মিটার আবার নস্যি নিলেন। বললেন, "যাকগে ওসব বাজে কথা—নিজের প্রশংসা নিজের মুখে মানায় না। আপনি পারচেজ দেবতাদের সন্তুষ্ট করবার মন্তর শিখুন। স্থধাকরবাবু একটা স্থন্দর কথা বলেন—যতক্ষণ না অফিসারের সঙ্গে ক্যাশের ব্যবস্থা হলো ততক্ষণ দুশ্চিন্তা থেকে যায়। যেমনি বুঝলাম, মাল খায়, টাকা নেয়, আর ভাবনা থাকে না। ঘরটা আমার পাকা-পাকি হবার চান্স রইলো। নিজের স্বার্থেই অফিসার আমার স্বার্থটা দেখবেন।"

সোমনাথের এসব কথা মোটেই ভাল লাগছে না। সে বললো, "নিজেকে ছোট করে কী লাভ, মিস্টার মিটার?"

আঁতকে উঠলেন নটবর মিটার। "ওরে বাবা! এ যে ফিজিক্সের কথা তুলে ফেললেন। স্যরি, ফিজিক্স নয়—ফিলজফি। এখানে মশাই, কেউ ফিলজফি করতে আসে না—টু-পাইস কামাতে আসে। তা ছাড়া আপনি নিজেকে ছোট করবেন কেন? প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই তো দেবতা আছেন—গ্রেট বিবেকানন্দ

সোয়ামী বলে গেছেন। মনে করুন, আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণের সেবা করছেন, হোক না সে পারচেজ অফিসার।"

নটবর মিত্তির ঘড়ির দিকে তাকালেন। বললেন, "না মশাই, ট্যাক্সি পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না। আমি ট্রামে উঠে পড়বো এবার। তবে শুনে রাখুন—জাত সেল্‌সম্যানের কাছে প্রত্যেক খদ্দের একটা চ্যালেঞ্জ! পৃথিবীতে এমন লোক জন্মায়নি যার দুর্বলতা নেই। বাইরে থেকে মনে হবে দুর্ভেদ্য দুর্গ, কিন্তু খোঁজ করলে দেখা যাবে কোথাও একটা দরজা খোলা আছে। আমার নেশা হলো, মানুষের এই ভেজানো দরজা খুঁজে বার করা। খুউব ভাল লাগে! আপনি মশাই, ফিলজফি-টফি ভুলুন—মন দিয়ে জনসংযোগ করুন।"

সোমনাথ গম্ভীর হয়ে হাঁটতে লাগলো। চিৎপুর রোড থেকে বেরিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে ডালহৌসি স্কোয়ারে এসে হঠাৎ হীরালাল সাহার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। ভদ্রলোক হাঁ করে রাইটার্স বিল্ডিংসের দিকে তাকিয়ে আছেন। ওঁর চোখে যে ছোটছেলের লোভ রয়েছে তা সোমনাথও বুঝতে পারছে। ধরা পড়ে গিয়ে হীরালালবাবু লজ্জা পেলেন। মুখে হাসি ফোটাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে বললেন, "আপনাকে সত্যি বলছি, এই ভাঙা বাড়ির বিজনেস করে আমার অভ্যেস খারাপ হয়ে গেছে। কোনো পুরানো বাড়ি দেখলেই হিসেব করতে ইচ্ছে হয় ভাঙলে কত কাঠ, কত লোহা, কত পাথর পাওয়া যাবে। কখন কোটেশন দিতে হয় কিছুই ঠিক নেই তো।"

"তা বলে আপনি এই রাইটার্স বিল্ডিংস-এর দিকে তাকাবেন?" সোমনাথ জিজ্ঞেস করে।

হীরালালবাবু রেগে উঠলেন। "কেন? অন্যায়টা কী মশাই? চিরকাল তো আর এ-বাড়ি থাকবে না। একদিন না একদিন ভাঙতে হবেই।" হীরালালবাবু বললেন, "সায়েব বাড়ি বলেই আমার আগ্রহ। ইণ্ডিয়ান আমলে রাইটার্স বিল্ডিং তৈরি হলে আমি সময় নষ্ট করতুম না। স্বাধীনতার পরে যেসব দেশলাই বাক্সের মতো নতুন বাড়ি হয়েছে আমি তো সেদিকে তাকিয়েও দেখি না। জানেন মিস্টার ব্যানার্জি, ভবিষ্যতে যাঁরা আমাদের এই বাড়-ভাঙা লাইনে আসবে তারা একেবারে পথে বসবে। হাল আমলের বাড়িগুলোতে কিস্যু নেই। সায়েব বাড়িগুলো খতম হলেই কলকাতা খতম হয়ে গেলো।"

হীরালালবাবু তারপর বললেন, "এলগিন রোডের বাড়িটায় হাজার দুয়েক টাকা ঢালবেন নাকি? চার-পাঁচ দিনের মধ্যে লাভ পেয়ে যাবেন। আমার কিছু টাকা কমতি পড়েছে। ভাবলুম—কেন পাগড়ি পরা গুড়ের নাগরী-গুলোর কাছে হাত পাতি। আপনি লোকাল লোক রয়েছেন।"

কমলা বউদি একবারও প্রশ্ন করলেন না। ব্যাঙ্কের চেকবইটা বার করে সোমনাথের হাতে দিলেন। বললেন, "তুমি যখন ব্যবসায় ঢালছো, আমি ভেবে দেখবার কে?"

ব্যাঙ্ক থেকে তুলে টাকাটা হীরালালবাবুর হাতে দিয়েছে সোমনাথ। উনি সঙ্গে-সঙ্গে রসিদ লিখে দিলেন। বললেন, "আমার মনে হয় অন্তত হাজার টাকা লাভ পেয়ে যাবেন। চারদিনের জন্যে দু হাজার টাকা লাগিয়ে হাজার টাকা পকেটে এলে মন্দ কী? কোনো বিজনেসে এমন প্রফিট পাবেন না।"

সোমনাথের মনে হচ্ছে এবার মেঘ কাটছে। নটবরবাবুর কথাগুলো থেকেও সে কিছু শেখবার চেষ্টা করেছে। অসৎ পথে যাবে না সোমনাথ। কিন্তু মানুষের বিশ্বাস উৎপাদনের চেষ্টা করতে হবে—না-হলে সত্যিই তাঁরা কেন অর্ডার দেবেন?

সোমনাথের সাহসও বেড়ে যাচ্ছে। ক'দিন আগেই এক কাপড়ের মিলে গিয়েছিল। ওখানকার মিস্টার সেনগুপ্ত বললেন, "আপনার কোম্পানির দুটো স্যাম্পল টেস্টিং-এ পাঠিয়েছি—এখনও রিপোর্ট আসেনি। তবে মশাই—বড়-বড় কোম্পানির একই জিনিস রয়েছে, মালও ভেসে যাচ্ছে। আবার আপনারা একই লাইনে ঢুকতে গেলেন কেন?"

অন্যসময় হলে সোমনাথ মাথা নিচু করে চলে আসতো। কিন্তু এখন বললো, "বড়-বড়রা তো সব সময়েই থাকবেন, স্যর। বম্বেতে অত বিরাট-বিরাট কাপড়ের কল থাকা সত্ত্বেও আপনারা তো একদিন সাহস করে এখানে কল বসিয়েছিলেন—এবং এতো নাম করেছেন।"

"বাঃ বেশ ভাল বলেছেন! কথাটা আমার মাথাতেই আসেনি। সত্যি তো, কোথায় আর খোলা মাঠ পড়ে রয়েছে? রুই কাতলা থাকা সত্ত্বেও চুনোপুঁটিরা সাহস করে ঢুকে পড়ছে—এবং যোগ্যতা দেখিয়ে আমাদের কোম্পানির মতো বড় হচ্ছে।" মিস্টার সেনগুপ্ত বেশ খুশী হলেন।

সোমনাথকে তিনি বসতে দিলেন। তারপর বললেন, "আপনি ইয়ং বেঙ্গলী—আপনাকে সোজা বলছি—আমাকে ধরে কিছু হবে না। আমার ডিরেকটর মিস্টার গোয়েঙ্কার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো।"

সোমনাথ বললো, "গোয়েঙ্কাজী মস্ত লোক, উনি কি আমার মতো চুনোপুঁটিকে পাত্তা দেবেন?"

সেনগুপ্ত বললেন, "উনি নিজে মস্ত লোক নন—ওঁর শ্বশুর মিস্টার কেজরিওয়াল মস্ত লোক। ওঁদেরই মিল—গোয়েঙ্কাজীকে বছর কয়েক হলো বড় পোস্টে বসিয়ে দিয়েছেন। আপনি চেষ্টা করুন—আপনার জিনিসটা আমাদের মিলে অনেক প্রয়োজন হয়। তাছাড়া কেজরিওয়ালদের আর একটা মিলের মালপত্র গোয়েঙ্কাজী কেনেন।"

গোয়েঙ্কা লোকটি সুদর্শন। এয়ারকুলার লাগানো ঘরে পাতলা আদ্দির পাঞ্জাবি ও ধুতি পরে তিনি বসে আছেন। পাকা মর্তমান কলার মতো গায়ের রং, টিয়াপাখির মতো টিকলো নাক। ভদ্রলোকের দেহে বাড়তি মেদ নেই—বরং একটু রোগার দিকেই। বয়স বছর চল্লিশ।

ওঁর সঙ্গে সোমনাথের দেখা হয়ে গেলো। ঘরের একদিকে একটা কালো রোগা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে-টাইপিস্ট নিজের কাজ করছে। সোমনাথ বললো, "আপনার অমূল্য সময় নষ্ট করবো না, স্যর। শুধু রেসপেক্ট জানাতে এসেছি।"

টেলিফোনে সেনগুপ্তের কাছে বিষয়টা শুনেছেন গোয়েঙ্কাজী! গালের পান সামলাতে-সামলাতে বললেন, "মালের রিপোর্ট কী রকম হয় দেখা যাক।"

কেমিক্যালসের ধারেই গেলো না সোমনাথ। বললো, "ওসব আপনার হাতে রইলো, মিস্টার গোয়েঙ্কা। আপনার এতো নাম শুনেছি।"

"কোথায় আমার নাম শুনলেন?" বেশ খুশী হয়ে গোয়েঙ্কা প্রশ্ন করলেন। দামী ফরাসী সেন্টের গন্ধে ঘরটা ভুরভুর করছে।

সোমনাথ বেশ অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো। তারপর কোনোরকমে বললো, "আপনার নাম কে না জানে? ভাল জিনিসের কদর দেন আপনি—অজানা কোম্পানির নতুন মাল বলে ছুঁড়ে ফেলে দেন না। তাই তো কলকাতা থেকে ছুটে আসতে সাহস পেয়েছি।"

গোয়েঙ্কাজীর দিকে দামী সিগারেট এগিয়ে দিলো সোমনাথ। উনি একটা সিগারেট তুলে নিলেন। পানের ঢিবিটা বাঁ দিক থেকে গালের ডান দিকে ট্রান্সফার করলেন। তারপর বললেন, "কলকাতা থেকে দূরত্বটাই আমাদের মুশকিল।"

"এমন কি আর দূর, মিস্টার গোয়েঙ্কা? ফরেনে চল্লিশ মাইল কিছু নয়!" সোমনাথ এতোক্ষণে একটা আলোচনার বিষয় পেয়েছে।

"কিন্তু রাস্তার যা-অবস্থা। এইটুকু পথ যেতেই সমস্ত দিন নষ্ট হয়ে যাবে," মিস্টার গোয়েঙ্কা বললেন।

"অথচ মিউনিসিপ্যালিটি এবং গভরমেণ্ট রাস্তা মেরামতের জন্যে আপনাদের

কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করছে।" সোমনাথ বললো।

"সে-সব টাকা যে কোথায় যায়? গোড্ এলোন নোজ্।" সোমনাথের সহানুভূতিতে মিস্টার গোয়েঙ্কা যে সন্তুষ্ট হয়েছেন তা ওঁর কথার ভঙ্গীতেই বোঝা যাচ্ছে।

সুযোগ বুঝে সোমনাথ এবার কড়া ডোজে গোয়েঙ্কাজীর প্রশংসা করলো। বললো, "এরকম সাজানো-গোছানো অফিস কিন্তু কলকাতাতেও বেশি নেই। এই অফিসের সর্বত্র আপনার সুরুচির পরিচয় ছড়িয়ে রয়েছে।"

গোয়েঙ্কাজী প্রশংসায় নরম হয়েছেন মনে হলো। তবে প্রথম দর্শনেই সোমনাথকে তিনি যে পুরোপুরি বিশ্বাস করছেন না, তাও আন্দাজ করতে সোমনাথের কষ্ট হলো না। সোমনাথ আর এগলো না। শুধু জিজ্ঞেস করলো, "একা-একা গাড়িতে কলকাতা ফিরছি—এখান থেকে কেউ যাবেন নাকি?"

গোয়েঙ্কাজী প্রথমে ইতস্তত করলেন। বাড়িতে গিন্নির সঙ্গে ফোনে কথা বললেন। তারপর নিবেদন করলেন, "আমার ওয়াইফের পিসীমার এক ঝি এখানে পড়ে রয়েছে। বেচারা একলা যেতে পারবে না। আমারও নিয়ে যাবার সময় হচ্ছে না। যদি একটু চিত্তরঞ্জন অ্যাভিন্যুতে শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছে দেন।"

খুব উৎসাহের সঙ্গে রাজী হয়ে গেলো সোমনাথ। সুপুষ্ট স্তনের অধিকারিণী অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান যুবতীর আফিসিক ভদ্রতাবোধ একটু কম। চিঠি ছাপানো বন্ধ রেখে, আলপিন দিয়ে নখের ময়লা পরিষ্কার করতে-করতে মেয়েটি ওদের কথাবার্তা শুনছিল। সে এবার উৎসাহিত হয়ে উঠলো। তার কলকাতা যাবার প্রয়োজন। মৃদু হেসে মিস্টার গোয়েঙ্কা রাজী হয়ে গেলেন।

গাড়ি চালিয়ে ফিরতে-ফিরতে সোমনাথের মনে হলো সে যেন থিয়েটারের রাজা সেজেছে। একটা সামান্য কেরানির চাকরি পেলে যে বর্তে যায়, পেটের দায়ে সে কেমন অন্যের গাড়ি নিয়ে থার্ড পার্টিকে লিফট দিচ্ছে। পিছনে গোয়েঙ্কাজীর শ্বশুরবাড়ির বুড়ি ঝি বসে আছেন। সোমনাথের পক্ষে তিনিই অসামান্যা—কারণ গোয়েঙ্কার সঙ্গে পরিচয়ের যোগসূত্র।

সোমনাথের পাশে বসেছে মিস জুডিথ জেকব। মহিলার দেহ থেকে সস্তা দেশী সেন্টের উগ্র গন্ধ ভকভক করে ভেসে আসছে। মুক্তোর মতো ঝকঝকে দাঁতগুলো বার করে মিস জেকব বললো, "তুমি তো খুব স্টেডি ড্রাইভ করো।" সোমনাথ রাস্তার দিকে মনোযোগ রেখে মিটমিট করে হাসলো। মিস জেকব বললো, "তোমার জন্যে আমার ফিঁয়াসের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।" হুড়-হুড় করে ব্যক্তিগত অনেক খবরাখবর দিয়ে যাচ্ছে মিস জেকব। ফিঁয়াসে কোন এক কোম্পানিতে উই মারার কাজ করে। তার ফ্ল্যাটের বাড়তি চাবি মিস

জেকবের কাছে আছে। যখন খুশী সে ভাবী স্বামীর ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকতে পারে, কোনো অসুবিধে নেই। আরও কী সব বলতে যাচ্ছিলো মিস জেকব, কিন্তু সোমনাথের আগ্রহ নেই সেসব শোনবার।

গাড়ি চালাতে-চালাতে সোমনাথ অন্য কথা ভাবছিল। নটবরবাবুর মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠছে। নটবরবাবু মানুষকে মোটেই বিশ্বাস করেন না।

নটবর বলেছিলেন, "সব মানুষের কোনো-না-কোনো দুর্বলতা আছে। টাকা এবং মদে নাইনটি নাইন পার্সেন্ট বিজনেস ম্যানেজ হয়ে যায়। কিন্তু একবার মশাই ভীষণ বিপদে পড়ে গিয়েছিলাম। ওই সুধাকর শর্মাই কেসটা দিলো। বললো, 'দাদা, ভীষণ শক্ত ঠাঁই, কিছুতেই সুবিধে করতে পারছি না। বেটাচ্ছেলে নরম না-হলে, একদম মারা যাবো। গভরমেণ্টকে কিছু খারাপ মাল সাপ্লাই করেছি—শালা ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির যদি রিজেক্ট্ করে দেয় একেবারে ফিনিশ হয়ে যাবো।' প্রথমেই সুধাকরকে একটু বকুনি লাগিয়ে বলেছিলাম, তোমার অভ্যেসটা পাল্টাও—মাঝে-মাঝে অন্তত থার্ড ক্লাস মাল সাপ্লাই বন্ধ করো। সুধাকর বললো, 'এসব কী আজগুবী কথা বলছেন নটবরদা? লর্ড ক্লাইভের আমল থেকে আজ পর্যন্ত কে কবে গোরমেণ্টকে জেনুইন মাল সাপ্লাই করেছে?' সুধাকর কিছুতেই শুনলো না, জোর করে কেসটা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলো। গভরমেণ্টের লোকটাকে আমি বাজিয়ে দেখলাম—ব্যাটা সত্যি ঘুষ নেয় না, পরের গাড়িতে চড়ে না, মদ ছোঁয় না। কিন্তু আমিও নটবর মিত্তির! তখনও আশা ছাড়লাম না। তিন-চারদিন ধরে বিভিন্ন সোর্স থেকে খোঁজখবর নিয়ে শুনলাম, লোকটা এক ম্যাড্রাসী মহাপুরুষ বাবার ভক্ত। আর পায় কে? আমিও বিরাট ভক্ত বনে গেলুম। বললুম, আপনি বিরাট ভক্ত—আর আমি কীটাণুকীট, সবে ভক্তিমার্গে পা বাড়িয়েছি। আপনাকে আলো দেখাতে হবে। দেড়শ' টাকা দিয়ে ম্যাড্রাসী বাবার একখানা স্পেশাল রঙীন ফটো যোগাড় করে পার্ক স্ট্রীটের সেমুলড থেকে দামী ফ্রেমে বাঁধিয়ে ভক্ত-বাবাজীর বাড়ি দিয়ে এলুম। মন্ত্রের মতো কাজ হয়ে গেলো। ভদ্রলোক বুঝতেই পারলেন না, ওঁর হাতে আমি তামাক খেয়ে গেলুম।"

কিন্তু নটবর মিত্তির হবে না সোমনাথ। নিজের কাছে সে ছোট হতে পারবে না।

তবে ভদ্রতা করতে পারে সোমনাথ। কলকাতায় ফিরে এসে গোয়েঙ্কাজীর বাড়িতে সোমনাথ একটা ফোন করে দিলো।

কয়েকদিন পরে গোয়েঙ্কাজীর সঙ্গে দেখা হলো। ধন্যবাদ জানিয়ে

গোয়েঙ্কাজী বললেন, "ঝিকে পৌঁছে দিয়েছেন এই যথেষ্ট—আবার কষ্ট করে ট্রাঙ্ককলে জানাবার কী প্রয়োজন ছিল?"

সোমনাথ বললো, "ভাবলাম, ভাবীজী দুশ্চিন্তা করবেন।"

গোয়েঙ্কাজীর ঘরে ফিরিঙ্গী টাইপিস্টকে দেখতে পাচ্ছে না সোমনাথ। গোয়েঙ্কাজী খবর দিলেন, "চাকরি ছেড়ে পালিয়েছে।" তারপর ফিক করে হেসে বললেন, "গাড়িতে আপনি কিছু করেছিলেন নাকি, সেদিন? সেই যে আপনার সঙ্গে কলকাতায় গেলো, তার পরের দিনই রেজিগনেশন।"

নোংরা কথায় কান লাল হয়ে উঠেছিল সোমনাথের। দাদার থেকেও বয়সে বড় লোকটা। গোয়েঙ্কাজী বললেন, "আরে ভয় পাচ্ছেন কেন? এমনি রসিকতা করলাম। আমাদের মিল কলকাতা থেকে এতো দূর যে ভাল লেডি-টাইপিস্ট আসতেই চায় না।"

চুপ করে রইলো সোমনাথ। গোয়েঙ্কাজী বললেন, "আপনি তো অনেক বড়-বড় অফিসে ঘোরেন। আজকাল নাকি গাউন-পরা মেমসায়েব রাখা আর ফ্যাশন নয়? বড়-বড় কোম্পানিরা নাকি এখন শাড়ি-পরা সেক্রেটারী রাখছে?"

হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। এসব খবর তো সোমনাথ রাখে না। বললো, "সে-রকম তো কিছু শুনিনি। দু রকম মহিলাই তো অফিসে কাজ করেন।"

গোয়েঙ্কাজী হেসে বললেন, "আপনি তাহলে অফিসে গিয়ে কোনো স্টাডি করেন না। গাউন-পরা মেমসায়েবদের ডিমাণ্ড খুব বেড়ে গেছে। আপনাদের লাইনে এক ভদ্রলোকের কাছে আমি খবরটা পেয়েছি, নাম মিঃ নটবর মিটার।"

"চেনেন ওঁকে?" সোমনাথ জিজ্ঞেস করলো। পরিচিত একটা নাম শুনে সোমনাথ কিছুটা ভরসা পাচ্ছে।

"মিস্টার মিটার দু-একবার আমার এখানে এসেছিলেন—ওঁর এক বন্ধুর কাজে। ভারি আমুদে মানুষ। একেবারে সুপার সেল্সম্যান।"

সোমনাথ ওসব কথায় আগ্রহ দেখালো না। বরং টাকার কথা তুললো। বললো, "আপনার ওপর তো ইনকাম ট্যাক্সের ভীষণ চাপ।"

এই ব্যাপারে সহানুভূতি পেয়ে খুশী হলেন গোয়েঙ্কা। বললেন, "গভরমেণ্ট ডাকাতি করছে—টাকায় সত্তর পয়সা কেটে নিলে, কাজকর্মে মানুষের কোনো উৎসাহ থাকতে পারে?"

সোমনাথ বললো, "লোকের ধারণা বড়-বড় পোস্টে আপনারা খুব সুখে আছেন। অথচ মোটেই তা নয়!"

এরপর গোয়েঙ্কাজী হয়তো কিছু টাকার কথা তুলতেন। কিন্তু সোমনাথকে এখনও বিশ্বাস করতে পারছেন না। হাজার হোক সামান্য চেনা।

গোয়েঙ্কার ওপর সোমনাথ বিরক্ত হয়েছে। কিন্তু ব্যবসায়ে ভদ্রতা রেখে চলতেই হবে। মিস্টার মাওজী বলেছেন, বড় পার্টি হলে, একটু-আধটু এনটারটেন করবেন। সোমনাথ তাই গোয়েঙ্কাকে বললো, "কলকাতায় এলে দয়া করে একটা ফোন করে দেবেন। যদি সুযোগ দেন কোথাও লাঞ্চে যাওয়া যাবে।"

এবার বেশ বকুনি খেলো সোমনাথ। কারণ গোয়েঙ্কা মুখের ওপর জানিয়ে দিলেন তিনি মাছ মাংস খান না—ড্রিঙ্কও ভালবাসেন না। সুতরাং তাকে নেমন্তন্ন করে লাভ নেই। বরং অসুবিধে।

বিদায় দেবার আগে গোয়েঙ্কাজী বললেন, "যদি জানা-শোনা ভাল কোনো লেডি সেক্রেটারী থাকে রেকমেণ্ড করবেন। শাড়ি-পরা বেঙ্গলী সেক্রেটারী রাখতেও আমাদের কোনো আপত্তি নেই।"

সোমনাথের বেশ্র অস্বস্তি লাগলো। চাকরি না-পেয়ে যে-জগতের মধ্যে সোমনাথ ঢুকতে চেষ্টা করছে সে-সম্পর্কে বাঙালীদের কোনো জ্ঞান নেই। বিজনেস সম্পর্কে এতদিন একটা অস্পষ্ট ধোঁয়াটে ধারণা ছিল সোমনাথের। বিজনেস এমন জিনিস যা বাঙালীরা পারে না—কারণ তাদের ধৈর্য নেই। সোমনাথ এখন বুঝেছে, হাজার রকমের বিজনেস আছে। কিন্তু যে-বিজনেসের জগতে সে পা ফেলবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে, তার মধ্যে দীর্ঘদিনের নোংরা ষড়যন্ত্র রয়েছে। বিজনেসের অনেক রহস্যই বংশানুক্রমিকভাবে গোপন রাখা হয়—একান্ত আপনজন ছাড়া কেউ জানতে পারে না।

নটবর মিত্রকে সোমনাথ এবং আদকবাবু যতই অপছন্দ করুক ভদ্রলোক অন্তত ভিতরের অনেক খবর ফাঁস করে দিয়েছেন—যা সারা জীবন বাহাত্তর নম্বর ঘরের এগারো নম্বর টেবিলে বসে থাকলেও সোমনাথ জানতে পারতো না।

মিস্টার গোয়েঙ্কার ব্যাপারেও নটবরবাবু বোধহয় কিছু সাহায্য করতে পারেন।

গলার টাইটা কয়েক ইঞ্চি ঢিলে করে নটবর মিত্তির নিজের অফিসে বসেছিলেন।

সোমনাথকে দেখেই একগাল হেসে নটবর মিত্তির বললেন, "আসুন মিস্টার ব্যানার্জি। মুখ দেখেই বুঝতে পারছি কিছু হচ্ছে না। কতকগুলো হরিয়ানী পাঞ্জাবী রাজস্থানী সিন্ধি ডাকাত বিজনেসের নাম করে সোনার বাংলাকে

লুটেপুটে খেলে। আমরা তো শুধু আঙুল চুষে-চুষেই দিন কাটিয়ে দিলাম।"

সোমনাথ জিজ্ঞেস করলো, "আপনি মিস্টার গোয়েঙ্কাকে চেনেন?"

"বিজনেসে রয়েছি, এই কলকাতায় অন্তত দেড়শ' গোয়েঙ্কাকে চিনি। আপনি কাঁর কথা বলছেন?"

সোমনাথ পরিচয় দিলো। নটবর একগাল হেসে বললেন, "মহাত্মা মিলস্-এর সুদর্শন গোয়েঙ্কার কথা বলছেন? লালু জামাইবাবুর মতো চেহারা তো?"

হো-হো করে হাসলেন নটবর মিত্তির। "আপনি বুঝি ওখানেও মাল বেচবার চেষ্টা করছেন?"

"কেন পার্টি খারাপ নাকি?" নটবর মিত্রের কথার ধরনে সোমনাথ চিন্তায় পড়ে গেল।

"পার্টি খারাপ হতে যাবে কোন দুঃখে? তবে বড় শক্ত ঘাঁটি!" টাই-এর ফাঁসটা আরও আলগা করে নটবর মিত্তির বললেন, "আমার এক পার্টি ওখানে ফেঁসে গিয়েছিল। কিছুতেই সুবিধে করতে পারে না। শেষ পর্যন্ত পাঁচশ' টাকা ফুরনে আমাকে পাঠালো। আমি অনেক কষ্ট করে দু-তিনবার ট্রাই নিয়ে একদিন ড্রিংকসের টেবিলে গোয়েঙ্কাকে ফেললাম। তবে কাজ হাসিল হলো।"

"তবে যে উনি বললেন, মদ-টদে আগ্রহ নেই ওঁর!" সোমনাথ একটু আশ্চর্য হলো।

"আপনি অচেনা-অজানা লোক, তাছাড়া আপনাকে কী বলবে? যা দিনকাল পড়েছে, যাকে-তাকে বলা যায় না—আমার বিনা পয়সায় মাল খেতে ভাল লাগে। আপনি সত্যিই হাসালেন সোমনাথবাবু।"

নটবরবাবু সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে বললেন, "এ-লাইনে আমার চোখ ডাক্তার বি সি রায়ের মতো। পার্টির হাঁচি শুনলে বলতে পারি মনে কী রোগ হয়েছে। আপনার ঐ গোয়েঙ্কাকেও বুঝে নিয়েছি। এক ডোজ ওষুধেই বনের হাতি পোষ মেনেছে! মিস্টার গোয়েঙ্কা এখন আমার ফ্রেণ্ডের মতো হয়ে গেছেন।"

"তাই তো বললেন, মিস্টার গোয়েঙ্কা। আপনার খুব প্রশংসা করলেন।" সোমনাথ জানালো।

বেশ সন্তুষ্ট হলেন নটবর মিটার। গর্বের সঙ্গে বললেন, "অথচ দেখুন, মোটে তিপ্পান্ন টাকা মালের বিল হয়েছিল। আপনাদের বাড়ির মিস্টার মেহতা তো হিন্দুস্থান হোটেলে নিয়ে গিয়ে ওই গোয়েঙ্কার পিছনে সাড়ে তিনশ' টাকার ফরেন হুইস্কি ঢেলেছিল—কিন্তু পারলো কিছু করতে?"

চুপ করে রইলো সোমনাথ। নটবর বললেন, "অত ঘাবড়াচ্ছেন কেন.

মশাই? সেল করতে গেলেই কিছু ট্যাক্সো গুণতে হয়—এসব খরচকে সেলস ট্যাক্স মনে করে এ লাইনের লোকেরা।"

সোমনাথের ব্যবসা সম্পর্কে নটবর মিটার এবার আরও কিছু প্রশ্ন করলেন। তারপর বললেন, "খুব দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি—আপনার কেসটা খুব শক্ত। কিছু কাঁচা টাকা ঢেলে আপনি গোয়েঙ্কাকে মাল গছাতে পারবেন না। কারণটা অ-আ-ক-খর মতো সিম্পল। ওই যে অপথালমিক হোয়াইটনার এবং একটা কেমিক্যাল আপনি বেচতে চাইছেন তার জন্যে আমারই এক জানা-শোনা পার্টির কাছ থেকে গত তিন বছর ধরে গোয়েঙ্কা একশ' টাকায় তিন টাকা করে নমস্কারী পেয়ে আসছে। আপনি নিজেই তো আড়াই পারসেণ্টের বেশি কমিশন পাবেন না। তাহলে নিজের পকেট থেকে আরও আধ পারসেণ্ট দিতে হয়। মাওজীর হাতে-পায়ে ধরে আপনি সমান রেট দিলেও ফল হবে না। কোন দুঃখে গোয়েঙ্কা নিজের দেশওয়ালী ভাই ছেড়ে আপনার কাছে আসবে?"

উঠতে যাচ্ছিলো সোমনাথ। নটবর বললেন, "আপনি একেবারে হতাশ হবেন না। বাবারও বাবা আছে—হাইকোর্টের ওপরে যেমন রয়েছে সুপ্রীম কোর্ট। গোয়েঙ্কাকে অন্যপথে নরম করতে হবে। আমি তো কাল সকালেই অন্য একটা কাজে গোয়েঙ্কার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। দেখি আপনার জন্যে কোনো পথ বার করতে পারি কিনা।"

সোমনাথ বললো, "মনে হলো, আপনার ওপর ভদ্রলোকের খুব বিশ্বাস আছে। যদি আমার সম্বন্ধে একটু বলে দেন। আমি যে বিশ্বাসযোগ্য লোক সেটাও যদি উনি জানেন।"

নটবর একগাল হেসে বললেন, "অত ছটফট করছেন কেন? বসুন। চা খান। যখন এ-লাইনে প্রথম এলেন তখন বর্ষার পুঁইডগার মতো তাজা কচি মুখখানি ছিল। এই ক'দিনেই শুকিয়ে গেল কেন?"

সোমনাথ বললো, "কিছুতেই কিছু লাগাতে পারছি না, নটবরদা। মিস্টার মাওজী একটা সুযোগ দিলেন—সেটাও যদি হাতছাড়া হয়ে যায়।"

নটবর মিটার লোকটার অন্তর আছে। সোমনাথের কথা শুনে জ্বলে উঠলেন। বললেন, "আপনি কিছুই ভাববেন না। আমার উপর বিশ্বাস করে ছেড়ে দিন, মহাত্মা মিলের গোয়েঙ্কাকে আমি কব্জা করে দিচ্ছি। আপনার কোনো চিন্তার কারণ নেই—আপনার কাছ থেকে আমি এই কেসে কোনো চার্জ করবো না।"

নটবর মিত্তির কী করতে কী করে ফেলবেন কেউ জানে না। তবু সোমনাথ আপত্তি করলো না। তার মধ্যে হতাশা আসছে। মনে হচ্ছে এসপার-ওসপার একটা কিছু হয়ে যাক।

পরের দিন বিকেলে ফোনে সোমনাথকে ডেকে পাঠালেন নটবর মিত্তির।

বেজায় খুশী মনে হচ্ছে ভদ্রলোককে। নিজের টাকে হাত বুলিয়ে নটবর বললেন, "আপনার কপাল বোধহয় খুললো মিস্টার ব্যানার্জি। গোয়েঙ্কাকে যা-বলবার বলে এসেছি।"

ভীষণ উৎসাহিত বোধ করছে সোমনাথ। প্রথমেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানালো নটবরবাবুকে।

নটবরবাবু দার্শনিকভাবে বললেন, "শুধু টাকাতেই সব কাজ হাসিল হয় না, মিস্টার ব্যানার্জি। আমাদের এই লাইনে টাকার ওপরেও জিনিস রয়েছে! সুপ্রীম কোর্টের পরেও যেমন আছে রাষ্ট্রপতির কাছে মার্সি পিটিশন।"

এবার সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন নটবর মিটার। বললেন, "গোয়েঙ্কা সম্পর্কে একটু বাইরে খোঁজখবর নিলুম। ফরেনে একেই বলে ফিল্ড রিসার্চ। গোপন অনুসন্ধানের খবর অনুযায়ী গোয়েঙ্কার নাড়ি টিপতেই সুড়সুড় করে সব খবর বেরিয়ে এলো। ইউ উইল বি গ্ল্যাড টু নো গোয়েঙ্কার মনে অনেক দুঃখু আছে। পয়সার লোভে কেজরিওয়ালের খোঁড়া মেয়ে বিয়ে করেছে। অমন কার্তিকের মতো চেহারা, কিন্তু শরীরের অনেক সাধ-আহ্লাদ পূরণ হয় না।"

কান লাল হয়ে উঠছে সোমনাথের। নটবরবাবু তা লক্ষ্য করলেন না। তিনি বলে চললেন, "কমবয়সী মেয়েদের ওপর খু-উব লোভ আছে। কিন্তু ভীষণ ভয়ও আছে। আমিও চান্স বুঝে টোপ ফেলে দিয়েছি আপনার নামে। চালাক লোক তো—আন্দাজ সব বুঝে নিয়েছে। বলেছি, যেদিন কলকাতায় আসবেন, শুধু দয়া করে ফোনটা তুলে ব্যানার্জিকে জানিয়ে দেবেন। আর সন্ধেটা ফ্রি রাখবেন।"

নটবর মিত্তির আশা করেছিলেন, সোমনাথ এই দুরূহ কাজের জন্য তাকে ধন্যবাদ দেবে। তিনি বলতে গেলেন, "অনেক সস্তায় কাজ হয়ে যাবে আপনার। সব ব্যবস্থা করে দেবো আমি—আপনার কোনো চিন্তা থাকবে না।"

প্রায় আর্তনাদ করে উঠলো সোমনাথ। "এ আপনি কী করলেন, মিস্টার মিটার? এসব কথা আপনাকে কে বলতে বললো? ভদ্রলোকের ছেলে ব্যবসায় নেমেছি।"

নটবরবাবু মোটেই উত্তেজিত হলেন না। শান্তভাবে সোমনাথকে বললেন, "এ-লাইনে কে ভদ্রলোকের ছেলে নয়, বলুন? আমি, শ্রীধরজী, মিস্টার গোয়েঙ্কা

সবাই ভদ্দরলোক। ভদ্দরলোকের ছেলেরাই তো এদেশের পলিটিকস্, গভরমেণ্ট এবং বিজনেস চালাচ্ছে। শুনুন মশাই, আমি যে প্রপোজাল গোয়েঙ্কার কাছে দিয়ে এসেছি তার মধ্যে একটু অভদ্রতা নেই—যস্মিন্ দেশে যদাচার, কাছা খুলে নদী পার।"

"অসম্ভব," দাঁতে দাঁত চেপে সোমনাথ বললো। অন্য কেউ হলে এতক্ষণ লোকটার থ্যাবড়া নাকে এক ঘুষি বসিয়ে দিতো সোমনাথ।

নিজেকে বহু কষ্টে শান্ত করে সোমনাথ বললো, "এসব নোংরামির মধ্যে আমাদের বংশে কেউ কখনও থাকেনি। আপনি লোকটাকে এখনই বারণ করে দিন।"

মুখের হাসি বজায় রেখে নটবরবাবু বললেন, "লাও বাবা! যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর! যাকগে। বলা যখন হয়ে গেছে, তখন চারা নেই। গোয়েঙ্কা যেদিন আপনাকে ফোন করে জানাবেন আসছেন, টেলিফোনে সোজাসুজি বলে দেবেন—আপনি ব্যস্ত আছেন, সন্ধেবেলায় কোনোরকম কো-অপারেশন করতে পারবেন না। তাহলে গোয়েঙ্কাজী বুঝে নেবেন।"

সোমনাথ আর এক মুহূর্তও দেরি না করে নটবরবাবুর অফিস থেকে বেরিয়ে এলো। রাগে তার সর্বশরীর জ্বলছে।

কিন্তু যার কোনো মুরোদ নেই, তার শরীর জ্বললে দুনিয়ার কী এসে যায়? যে সাপের বিষ নেই, তার কুলোপানা চক্করে কে ভয় পাবে—মা বলতেন। কোন দিকে যায় সোমনাথ? ইচ্ছে করছে, কোথা থেকে যদি একটা এটম বোমা পাওয়া যেতো মন্দ হতো না—চার্নক সায়েবের এই জারজ সৃষ্টির ওপর বোমাটা ফেলে দিতো সোমনাথ। চিরদিনের মতো সমস্যার সমাধান হতো। কিন্তু শক্তি কোথায়? এটম বোমা তো দূরের কথা, কলকাতার রাস্তায় দাঁড়িয়ে দু-একটা হারামজাদার গালে থাপ্পড় মারবার মতো সাহসও ঈশ্বর দেননি সোমনাথকে।

মনের ঠিক এমন অবস্থার সময় সেনাপতি ডাকলো, "বাবু আপনার ফোন।"

"হ্যালো আমি তপতী বলছি।"

তপতী আর ফোন করবার সময় পেলো না? সোমনাথের গম্ভীর গলা শোনা গেল, "বলো।"

"একটু আগেও তোমাকে ফোন করেছিলাম—শুনলাম, তুমি কোন এক মিস্টার নটবর মিত্রের অফিসে গিয়েছো।"

"অনেক কাজ-কর্ম থাকে, তপতী।" ওর প্রশ্নটা সোমনাথ এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলো।

তপতী বললো, "কই সেদিনের পর তুমি তো আমার খোঁজ করলে না?"

কী বলবে সোমনাথ? শেষ পর্যন্ত উত্তর দিলো, "তপতী, কয়েকজন ভদ্রলোকের সঙ্গে মিটিং চলছে—ওঁরা বসে রয়েছেন। পরে একদিন দেখা করা যাবে।"

"কাল আমি থাকছি না। শ্রীরামপুরে যাচ্ছি। অলমোস্ট যেতে বাধ্য হচ্ছি। পরশু তোমার ওখানে যাবো। দেখা হলে, সব বলবো। বেশ সিরিয়াস।"

ফোন নামিয়ে রাখলো সোমনাথ। ইংরাজী ও বাংলা তারিখ মেশানো ক্যালেণ্ডারটা দেওয়ালে সামনেই ঝুলছে। পরশু ১৬ই জুন। অর্থাৎ ১লা আষাঢ়।

জন্মদিনটা আনন্দের কেন, এই প্রশ্ন সোমনাথের আগে প্রায়ই মনে হতো! জন্মগ্রহণ করে শিশু তো কাঁদে—তার সমস্ত জীবনের দুঃখ ও যন্ত্রণার সেই তো শুরু। তবু সবাই বলে জন্মদিনে আনন্দ করতে হয়। অনেকদিন আগে মাকে এই প্রশ্ন করেছিল সোমনাথ। "জন্মদিনে আমি তো তোমায় অনেক কষ্ট দিয়েছিলাম, তবু তুমি ১লা আষাঢ়ে আনন্দ করো কেন?"

মা বলেছিলেন, "তুই চুপ কর। অন্যদিন হলে তোকে বকতাম।" জন্মদিনে মা কাউকে বকতেন না। বরং পায়েস রাঁধতেন!

তারপর এই বাড়িতে ১লা আষাঢ়ের অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে। জন্মদিনেই একদিন মৃত্যুর ঘন অন্ধকার নেমে এসেছিল যোধপুর পার্কের বাড়িতে। ১লা আষাঢ় এখন শুধু সোমনাথের জন্মদিন নয়, মায়ের মৃত্যুদিবসও বটে।

আজ যে সোমনাথের জন্মদিন তা কে আর মনে রাখবে? ভোরবেলায় বিছানায় শুয়ে-শুয়েই ভাবছিল সোমনাথ। কবে কোনকালে উজ্জয়িনীর প্রিয় কবি আপন খেয়ালে আষাঢ়স্য প্রথম দিবসকে কাব্যের মালা পরিয়ে অবিস্মরণীয় করেছিলেন। তারই রেশ তুলে বহু শতাব্দী পরে আজ ঘরে-ঘরে বিরহ-মিলনের রাগিণী বেজে উঠবে। একটু পরে রেডিওতে মহাকবি ও তাঁর সৃষ্ট অমর চরিত্রের উদ্দেশে সংগীতাঞ্জলি শুরু হবে। কিন্তু কে মনে রাখবে, বেকার ব্যর্থ কবি সোমনাথ ব্যানার্জি ওই একই দিনে পৃথিবীর আলো দেখেছিল? ছন্দের মন্ত্র পড়ে প্রেম-প্রীতি-ভালবাসাকে সেও অমরত্ব দিতে চেয়েছিল।

জন্মোৎসবের আগের দিন থেকেই কত লোকের বাড়িতে অভিনন্দনের পালা শুরু হয়ে যায়। ফুল আসে, ফোন আসে, রঙীন টেলিগ্রাম পৌঁছে দিয়ে যায় ডাকঘরের পিওন। কিন্তু সোমনাথের ভাগ্যে এসেছে দুঃসংবাদের ইঙ্গিত। হীরালাল সাহা যে দু হাজার টাকা নিয়েছিল লাভ সমেত কালকেই তা ফেরত দেবার কথা ছিল। বউদিকে সোমনাথ একটা ইঙ্গিতও দিয়ে রেখেছিল—১লা

আষাঢ় তার একটা প্রীতি উপহার পাবার সম্ভাবনা আছে। সোমনাথ এবার কোনো প্রতিবাদই শুনবে না। কমলা বউদি বলেছিলেন, "বেশ। যদি সুখবর সত্যিই কিছু থাকে—নেবো তোমার উপহার। তোমার দাদাকেও শিক্ষা দেওয়া হবে—ভাবছেন, উনি ছাড়া আমাকে কেউ উপহার দেবার নেই।" কিন্তু গতরাত্রে হীরালালকে কিছুতেই খুঁজে পায়নি সোমনাথ। তিন বার অফিসে গিয়েও দেখা হলো না।

ভোরবেলায় বুলবুল একবার কী কাজে ঘরে ঢুকলো। সে কিন্তু কিছুই বললো না। সোমনাথের আজ যে জন্মদিন তা মেজদার বালিকাবধূটি খবরও রাখে না। মেজদা যে সামনের সেপ্টেম্বরে অফিসের কাজে বিলেত যেতে পারে, সেই খবরটাই বুলবুল শুনিয়ে গেল। বললে, "আমি ছাড়ছি না। যে করে হোক আমিও ম্যানেজ করবো বিলেত যাওয়াটা।"

সোমনাথ বললো, "চেষ্টা চালিয়ে যাও—প্রতিদিন দু ঘণ্টা ধরে ঘ্যানঘ্যান করে দাদার লাইফ মিজারেব্‌ল করো।"

বিছানায় উঠে বসে ভীষণ দুর্বল মনে হচ্ছে সোমনাথের। এই বাড়ির সে কেউ নয়। যেন কিছুদিনের অতিথি হয়ে সে যোধপুর পার্কে এসেছিল। নির্ধারিত সময়ের পরও অতিথি বিদায় নিচ্ছে না। এই ঘর, এই খাট বিছানা, এই টেবিল, এই ফুলকাটা চায়ের কাপ—এসবের কোনো কিছুতেই তার অধিকার নেই। ভদ্রতা করে গৃহস্বামী এখনও অতিথি আপ্যায়ন করছেন। সবাইকে সন্দেহ করছে সোমনাথ। ভয় হচ্ছে, কমলা বউদিও বোধহয় এবার ক্লান্ত হয়ে পড়বেন।

দরজা খুলে সোমনাথ বাড়ির বাইরে বারান্দায় দাঁড়াতে যাচ্ছিলো। এমন সময় রোগা পাকানো চেহারার এক বুড়ো ভদ্রলোককে পুরানো অস্টিন গাড়ি থেকে নামতে দেখা গেল। দ্বৈপায়নবাবুর খোঁজ করলেন ভদ্রলোক। বাবার সঙ্গে আলাপের জন্যে ওপরে উঠে যাবার আগে ভদ্রলোক আড়চোখে সোমনাথকে বেশ খুঁটিয়ে দেখে নিলেন।

ভদ্রলোক গত এক সপ্তাহের মধ্যে দু-তিনবার এলেন। বাবার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কীসব কথাবার্তা বলেন।

বুলবুল মেজদার অফিস-টিফিনের জন্যে স্যাণ্ডউইচ তৈরি করছিল। সোমনাথ জিজ্ঞেস করলো, "লোকটা কে?"

স্যাণ্ডউইচগুলো অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলে মুড়তে-মুড়তে বুলবুল ঠোঁট উল্টোলো। ওর মাথায় যে কোনো দুষ্টুমি আছে তা সোমনাথ সন্দেহ করলো।

সোমনাথ বললো, "ঠোঁট উল্টোচ্ছ যে?"

আরও একপ্রস্থ ঠোঁট উল্টে বুলবুল বললো, "বারে! আমার ঠোঁট আমি

উল্টোতে পারবো না?"

সোমনাথের এসব ভাল লাগছে না। বুলবুল বললো, "অধৈর্য হচ্ছো কেন? সময় মতো সব জানতে পারবে।"

সোমনাথ যে আরও রেগে উঠবে বুলবুল তা ভাবতে পারেনি। বেশ বিরক্ত হয়ে বুলবুল এবার খবরটা ফাঁস করে দিলো। "অর্ধেক রাজত্ব যাতে পাও তার জন্যে বাবা কথাবার্তা চালাচ্ছেন, সেই সঙ্গে···বুঝতেই পারছো।" এই বলে বুলবুল রাগে গনগন করতে-করতে নিজের শোবার ঘরে ঢুকে পড়লো।

রোগা বুড়ো ভদ্রলোক আধঘণ্টা পরে বিদায় নিলেন। তারপরেই ওপরে বড় বউমার ডাক পড়লো। মিনিট দশেক ধরে বাবার সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের আলোচনা করে কমলা বউদি একতলায় নেমে এলেন। মেজদার সঙ্গে আড়ালে তাঁর কী সব কথাবার্তা হলো। বউদি আবার ওপরে উঠে গেলেন।

সোমনাথ বাথরুমে ঢুকতে গিয়ে মেজদা ও বুলবুলের দাম্পত্য আলোচনা শুনতে পেলো। বুলবুল ফোঁস-ফোঁস করতে-করতে বলছে, "তুমি কিন্তু এসবের মধ্যে একদম থাকবে না। বাবার যা ইচ্ছে করুন। ছেলে তো আর কচি খোকাটি নেই।"

স্নানের শাওয়ারের তলায় দাঁড়িয়ে সোমনাথ নিজেকে শান্ত করবার চেষ্টা করছে। অনেকগুলো ১লা আষাঢ়ের সঙ্গে সোমনাথের তো পরিচয় হয়েছে—কিন্তু কোনো ১লা আষাঢ়কেই আজকের মতো নিরর্থক মনে হয়নি সোমনাথের। সোমনাথ এবার ছেলেমানুষী করে ফেললো। জলের ধারার মধ্যে চোখ খুলে হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করে বসলো, "আমি কী দোষ করেছি? তোমরা বলো। আমি তো কোনো অপরাধ করিনি—আমি শুধু একটা চাকরি যোগাড় করতে পারিনি।"

কিন্তু এসব প্রশ্ন সোমনাথ কাকে জিজ্ঞেস করছে? সোমনাথ তো এখন নাবালক নেই। এ-ধরনের প্রশ্ন করবার অধিকার তো একমাত্র বাচ্চা ছেলেদের থাকে। এর উত্তর কার কাছ থেকে সে প্রত্যাশা করে? ওপরের বারান্দায় মৃতদার দুর্বল যে-বৃদ্ধটি বসে আছেন, তিনি উত্তর দেবেন? না আকাশের ওধার থেকে কোনো এক ইন্দ্রজালে মা কিছুক্ষণের জন্যে ফিরে এসে সোমনাথের সমস্যা সমাধান করবেন? কেউ তো এসব প্রশ্ন শুনবেও না। উত্তর দেবার দায়িত্ব তাঁর নয় জেনেও, বেচারা কমলা বউদি কেবল সোমনাথের হাত চেপে ধরবেন এবং ওর তপ্ত কপালে ঠাণ্ডা হাত বুলিয়ে দেবেন।

সোমনাথ বাথরুম থেকে বেরোতেই কমলা বউদি খবর দিলেন, "বাবা তোমায় ডাকছেন।"

বাবা ঠিক যেভাবে ইজিচেয়ারের পূর্বদিকে মুখ করে ব্যালকনিতে বসে

থাকেন সেইভাবেই বসেছিলেন। কোনোরকম গৌরচান্দ্রকা না-করেই তিনি বললেন, "তোমার নিজের পায়ে দাঁড়াবার একটা সুযোগ এসেছে। নগেনবাবু এসেছিলেন—ভদ্রলোকের অবস্থা ভাল। নিজের একটা সিমেণ্টের দোকান আছে, ওঁর ছেলে নেই—তিনটি মেয়ে। তোমাকেই দোকানটা দেবেন—যদি ছোট মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ হয়।"

বাবার সামনে কথা বলার, বিশেষ করে প্রতিবাদের অভ্যাস, এ-বাড়ির কারুর নেই। তবু সোমনাথ বললো, "নিজের পায়ে দাঁড়ানো হলো কই?"

বাবা এবার মুখ তুলে অবাধ্য পুত্রের চোখের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, "ওদের ফ্যামিলি ভাল। আমাদের পাল্টি ঘর। মেয়ের বাঁ হাতে সামান্য ফিজিক্যাল ডিফেক্ট আছে। দেখতে খারাপ নয়। সুলক্ষণা। ক্লাশ সেভেন পর্যন্ত পড়েছে। আমি ভেবে দেখলাম, তোমার সমস্যা এতেই সমাধান হবে। বউমার কাছে মেয়ের ছবি আছে, তুমি দেখতে পারো।"

কোনো উত্তর না-দিয়েই সোমনাথ নেমে এলো। বুলবুল জিজ্ঞেস করলো, "ছবিটা দেখবে?"

এক বকুনি লাগালো সোমনাথ। "তোমাকে পাকামো করতে হবে না।"

ছেলের মতিগতি যে সুবিধে নয়, বাবা বোধহয় আন্দাজ করতে পেরেছেন। তাই আবার বড় বউমাকে ডেকে পরামর্শ করলেন।

এই ধরনের প্রস্তাবে দ্বৈপায়ন যে সন্তুষ্ট নন, তা কমলা জানে। প্রথমে বাবার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু কোনোদিকে কোনো আশার আলো না-দেখতে পেয়ে নিরুপায় দ্বৈপায়ন মনস্থির করেছেন। এদেশে সোমনাথের যে চাকরি হবে না তা অনেক চেষ্টার পর এবার দ্বৈপায়ন বুঝতে পেরেছেন।

বড় বউমা ফিরে এসে সোমনাথকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গেলেন। তারপর সস্নেহে দেবরকে বললেন, "রাজী হয়ে যাও ঠাকুরপো—বাবার যখন এত ইচ্ছে।"

"এর থেকে অপমানের আমি কিছু ভাবতে পারছি না, বউদি।" সোমনাথের সামনে কমলা ছাড়া অন্য কেউ থাকলে সে এতক্ষণ রাগে ফেটে পড়তো।

বউদির মুখে একটুও উদ্বেগের চিহ্ন নেই। দেবরের পিঠে হাত দিয়ে বললেন, "কিছু মনে কোরো না ভাই—বাবার ধারণা, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার এইটাই তোমার শেষ সুযোগ।"

সোমনাথ বউদির চোখের দিকে তাকালো না। মুখ ফিরিয়ে নিলো। বউদি বললো, "কে আর জানতে পারছে, কেন তোমার এখানে বিয়ে হচ্ছে।" এরপর বাবা যা বলতে বলেছেন, কমলা বউদি তা মুখে আনতে পারলেন না। বাবা হুকুম করেছেন, "ওকে জানিয়ে দিও, এরকম সুযোগ রোজ আসে না। এবং

কথার বাধ্য না হলে এরপর এ-বাড়ির কেউ আর তার জন্যে দায়ী থাকবে না।"

এ-কথা না-শুনলেও বাবা যে বউদির মাধ্যমে চরমপত্র পাঠিয়েছেন তা সোমনাথ আন্দাজ করতে পারলো। বউদির হাত ধরে সোমনাথ বললো, "তুমি অন্তত আমাকে নিজের কাছে ছোট হতে বোলো না।"

কমলা বউদি বেচারা উভয় সঙ্কটে পড়লেন। পাত্রীর ছবিখানা তার হাতে রয়েছে। বাবার নির্দেশ, সোমের সঙ্গে আজই এসপার-ওসপার করতে হবে।

কমলা বউদি আবার ওপরে ছুটলেন বাবাকে সামলাবার জন্যে। বললেন, "হাজার হোক বিয়ে বলে কথা। দু-একদিন ভেবে দেখুক সোম।"

বাবা সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। বললেন, "যেসব পাত্রের চাকরি-বাকরি আছে তাদের মুখে এসব কথা মানায়, বউমা। নগেনবাবুর হাতে আরও দুটো সম্বন্ধ ঝুলছে। আমাদের ফ্যামিলি সম্বন্ধে এত শুনেছেন বলেই ওঁর একটু বেশি আগ্রহ।"

বেচারা কমলা বউদি! সংসারের সবাইকে সুখে রাখবার জন্যে কীভাবে নিজের আনন্দটুকু নষ্ট করছেন।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে জামা-প্যান্ট পরে, ব্যাগটা নিয়ে তৈরি হয়েছে সোমনাথ। মেজদা অনেক আগেই বেরিয়ে পড়েছেন। কমলা বউদি এবার সোমনাথের ঘরে ঢুকে পড়লেন। কী মিষ্টি হাসি কমলা বউদির।

সোমনাথের দিকে তাকিয়ে কমলা বউদি সস্নেহে বললেন, "আমার ওপর রাগ করলে, খোকন?"

সোমনাথ অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিলো। তারপর মনে-মনে বললো, "পাপিষ্ঠ না-হলে তো তোমার ওপর রাগ করতে পারবো না, বউদি।"

বউদি এবার ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। "আড়ি করতে নেই, ভাব করো—আজ তোমার জন্মদিন। মনে আছে, মা তোমাকে কী বলতেন? জন্মদিনে সবাইকে ভালবাসতে হয়, কারুর ক্ষতি করতে নেই, নিজে খু-উব ভাল হতে হয়, সবার মুখে হাসি ফোটাতে হয়।" সোমনাথ পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

বউদি এবার আঁচলের আড়াল থেকে একটা ঘড়ির বাক্স বার করলেন। একটা দামী সুইস রিস্টওয়াচ দেবরের হাতে পরিয়ে দিলেন কমলা বউদি। "অমর যখন সুইজারল্যাণ্ড থেকে এলো তোমার জন্যে আনিয়েছিলাম—জন্মদিনে দেবো বলে কাউকে জানাইনি।" বউদির ছোট ভায়ের নাম অমর।

সোমনাথের চোখে জল আসছে। সে একবার বলতে গেল, "কেন দিচ্ছো? এসব আমাকে মানায় না।" কিন্তু বউদির অসীম স্নেহভরা চোখের দিকে

তাকিয়ে সে কিছুই বলতে পারলো না। সোমনাথের বলতে ইচ্ছে করলো, "আগের জন্মে তুমি আমার কে ছিলে গো?" কিন্তু সোমনাথের গলা দিয়ে স্বর বেরুলো না।

কমলা বউদি বোধহয় অন্তর্যামী। মুহূর্তে সব বুঝে গেলেন। বললেন, "তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে, খোকন।"

যোধপুর পার্ক বাস স্ট্যাণ্ডের কাছে সোমনাথের সঙ্গে এক ভদ্রলোকের দেখা হয়ে গেল। ভদ্রলোক নিজেই পরিচয় দিলেন, "সোমনাথ না? তোমার বন্ধু সুকুমারের বাবা আমি। বদ্ধ পাগল হয়ে গেছে সুকুমার। দিনরাত জেনারেল নলেজের কোশ্চেন বলে যাচ্ছে। বোনদের মারধোর করেছে দু-একদিন। দড়ি দিয়ে হাত-পা বেঁধে রাখতে হয়েছিল ক'দিন। মাথায় ইলেকট্রিক শক দিতে বলছে—কিন্তু এক-একবার ষোলো টাকা খরচ।

"লুম্বিনী পার্ক হাসপাতালে কাউকে চেনো নাকি? ওখানে ফ্রি ছাখে শুনেছি!" সুকুমারের বাবা বীরেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন। ভদ্রলোক রিটায়ার করেছেন। স্ত্রীর গুরুতর অসুখ—ওঁর আবার ফিটের রোগ আছে। মেয়েরাই সংসার চালাচ্ছে। মেজ মেয়ে একটা ছোটখাট কাজ পেয়েছে। না-হলে কী যে হতো।

"আমি খোঁজ করে দেখবো," এই বলে সোমনাথ গোলপার্কের দিকে হাঁটতে আরম্ভ করলো। বাস স্ট্যাণ্ডে দাঁড়াতে ভাল লাগলো না।

তাহলে পৃথিবীটা ভালই চলছে! শিল্প, সাহিত্য, সংগীত ও সংস্কৃতির কেন্দ্রমণি সুসভ্য এই নগর কলকাতার চলমান জনস্রোতের দিকে তাকিয়ে আছে সোমনাথ। অভিজাত দক্ষিণ কলকাতার নতুন তৈরি উন্নাসিক প্রাসাদগুলো ভোরের সোনালী আলোয় ঝলমল করছে। চাকরি-চাকরি করে একটা নিরপরাধ সুস্থ ছেলে পাগল হয়ে গেল—এই সুসভ্য সমাজতান্ত্রিক সমাজে তার জন্যে কারও মনে কোনো দুঃখ নেই, কোনো চিন্তা নেই, কোনো লজ্জা নেই।

চোখের কোণে বোধহয় জল আসছিল সোমনাথের। নিষ্ঠুরভাবে নিজেকে সংযত করলো সোমনাথ। "আমাকে ক্ষমা কর, সুকুমার। আমি তোর জন্যে চোখের জল পর্যন্ত ফেলতে পারছি না। আমি নিজেকে বাঁচাবার জন্যে প্রাণপণে সাঁতার কাটছি। আমার ভয় হচ্ছে, তোর মতো আমিও বোধহয় ক্রমশ ডুবে যাচ্ছি।"

কে বলে সোমনাথের মনোবল নেই? সব মানসিক দুর্বলতাকে সে কেমন নির্মমভাবে মন থেকে সরিয়ে দিয়ে ব্যবসার কথা ভাবছে।

হীরালাল সাহার কাছ থেকে লাভের টাকা আদায় করতে যাওয়ার পথে একটা কাপড়ের দোকান সোমনাথের নজরে পড়লো। জন্মদিনে বউদিকে সে কিছু দেবে বলে ঠিক করে রেখেছে। ওখান থেকে একটা তাঁতের শাড়ি কিনলো সোমনাথ। হীরালালবাবুর আগেকার দেড়শ' টাকা পকেটে-পকেটেই ঘুরছে। কী ভেবে আর একটা শাড়ি কিনলো সোমনাথ। বুলবুল হয়তো এত কমদামী শাড়ি পরবেই না। লুকিয়ে বাপের বাড়ির ঝিকে দিয়ে দেবে। কিন্তু বড় বউদির যা স্বভাব, ওঁকে একলা দিলে নেবেনই না।

কাপড়ের দুটো প্যাকেট হাতে নিয়ে হীরালালবাবুর অফিসে যেতেই দুঃসংবাদ পেলো সোমনাথ। হীরালাল সাহা তাকে ডুবিয়েছেন। দু হাজার টাকা বোধহয় জলে গেল। কাতরভাবে সোমনাথ বললো, "হীরালালবাবু, আপনার অনেক টাকা আছে। কিন্তু ঐ দু হাজার টাকাই আমার যথাসর্বস্ব।"

হীরালালবাবু কোনো পাত্তাই দিলেন না। দেঁতো হাসিতে মুখ ভরিয়ে বললেন, "বিজনেসে যখন নেমেছেন, তখন ঝুঁকি তো নিতেই হবে। আমি তো মশাই আপনাকে ঠকাচ্ছি না। এলগিন রোডের বাড়িটা নিয়ে যে এমন ফাঁপরে পড়ে যাবো, কে জানতো? লরি নিয়ে ভাঙতে গিয়ে পরশুদিন শুনলাম কারা বাড়ি ভাঙা বন্ধ রাখবার জন্যে আদালতে ইনজাংশন দিয়েছে।"

কপালে হাত দিয়ে বসে রইলো সোমনাথ। হীরালালবাবু বললেন, "সামান্য দু হাজার টাকার জন্যে আপনি যে বিধবাদের থেকেও ভেঙে পড়লেন। ইনজাংশন চিরকাল থাকবে না, বাড়িও ভাঙা হবে এবং টাকাও পাবেন। তবে সময় লাগবে।"

"কত সময়?" সোমনাথ করুণভাবে জিজ্ঞেস করলো।

সে-খবর হীরালালবাবুও রাখেন না। "আদালতের ব্যাপার তো! দুটো-তিনটে বছর কিছুই নয়।"

নিজের অফিসে এসে মুহ্যমান সোমনাথ পাথরের মতো বসে রইলো। জন্মদিনের শুরুটা ভালই হয়েছে! বউদির কাছে কী করে মুখ দেখাবে সে?

শান্তভাবে একটু বসে থাকবারও উপায় নেই। মিস্টার মাওজী ফোনে ডাকছেন। এখনই যেতে বললেন।

বউদির দেওয়া নতুন হাত-ঘড়িটার দিকে তাকালো সোমনাথ। হঠাৎ মনে পড়লো তপতীর আসবার সময় হয়েছে। সেনাপতিকে ডেকে বললো, এক, দিদিমণি আসতে পারেন। তাকে যেন সেনাপতি বসতে বলে। জরুরী কাজে সোমনাথ বেরিয়ে যাচ্ছে।

সিঁড়ির মুখেই কিন্তু দিদিমণির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তপতী বললো, "বাসে বড্ড ভিড়। দেরী হয়ে গেল।"

সোমনাথ কিছুই বললো না। সময়ের বাজারেও বোধহয় আগুন লেগেছে —যার যত সময় দরকার সে তত সময় পাচ্ছে না।

তপতীর বোধহয় একটু বসবার ইচ্ছে। কিন্তু সোমনাথের সময় কই? মিস্টার মাওজী তার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

তপতী তো জন্মদিনে তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে না। আজ যে ১লা আষাঢ় তা কি ওর মনে নেই?

এই ক'দিনে তপতী যেন শুকিয়ে অর্ধেক হয়ে গেছে। চোখের কোলে কালো দাগ পড়েছে তপতীর। মোটা ফ্রেমের চশমাও সে-দাগ ঢাকতে পারছে না। তপতী একটা অতি সাধারণ সাদা শাড়ি পরেছে। ফিকে নীল রঙের ব্লাউজটাও ভালভাবে ইস্তিরি করা নয়। তপতী বেচারা হাঁপাচ্ছে। প্রায় কাঁদ-কাঁদ হয়ে সে এবার সোমনাথকে বললো, "তুমি আমার কথা ভাবো না।"

কী হলো তপতীর? একটা সমর্থ ছেলের সামনে একটা কমবয়সী মেয়েকে এমন অসহায়ভাবে কাঁদতে দেখলে, রাস্তার লোকেরা কী ভাববে?

তপতী কাতরভাবে বললো, "তুমি চিঠি লেখো না, খবর নাও না, আমার সঙ্গে দেখাও করো না। অফিসটাইমে একটা মেয়ের পক্ষে এই চিৎপুর রোডে আসা যে কী কষ্টের। লোকগুলো সব জন্তু হয়ে গেছে। ভিড়ের মধ্যে বাসের দরজার কাছে মেয়েদের চেপে ধরবার জন্য যা করে।"

চুপ করে আছে সোমনাথ। তপতী ওর মুখের দিকে তাকিয়ে করুণভাবে জিজ্ঞেস করলো, "কই? তুমি তো রাগ করছো না? আমার শাড়ির আঁচল ছিঁড়ে দিয়েছে। আর একটু হলে গাড়ি চাপা পড়তাম।"

সোমনাথের মুখ লাল হয়ে উঠলো। দাঁতে দাঁত চেপে বললো, "কলকাতা শহরটা জঙ্গলের অধম হয়ে যাচ্ছে তপতী'। বিশেষ করে এই অঞ্চলটায় কিছু গরিলা আছে।"

তপতী স্তব্ধ হয়ে ওর মুখের দিকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে রইলো। তারপর বললো, "ঘড়ি দেখছো কেন? তোমার সঙ্গে যে অনেক কথা আছে।"

"যে-লোকটার কাছে আমি বিজনেস পেতে পারি সে আমার জন্যে অপেক্ষা

করছে, তপতী।"

তপতী বললো, "তাহলে তোমাকে আটকে রাখা যাবে না। শোনো, বাড়িতে ভীষণ বিয়ের জন্যে চাপ দিচ্ছে। আমার জন্যে পরের দুটো বোন অযথা কষ্ট পাচ্ছে—ওদের বিয়ের সময় হয়ে গেছে।"

যে-লোকের চাকরি নেই, রোজগার নেই, নিজস্ব আশ্রয় নেই—তাকে এসব কথা বলে অপমান করে কী লাভ? সোমনাথ বললো, "বিয়ে করে ফেলো তপতী।"

"তুমি এখনও আমাকে এইভাবে কষ্ট দিতে চাও?" তপতী কাতরভাবে বললো। "বাড়িতে তুমুল ঝগড়া হয়েছে। রাগ করে শ্রীরামপুরে মাসির বাড়ি চলে গিয়েছিলাম। সোম, আমাদের ব্যাপারটা পাকা করে ফেলা ভাল। চলো, আমরা বিয়েটা রেজিস্ট্রি করে ফেলি। বাড়ির লোকরা তখন চাপ দিয়েও আমার কিছু করতে পারবে না। প্রতিদিনের এই অশান্তি আমার আর ভাল লাগে না।"

সোমনাথের হ্যাঁ বলবার ক্ষমতা নেই। 'আজ এই জন্মদিনে, লক্ষ-লক্ষ মানুষের সামনে, হে ঈশ্বর, পরাশ্রিত বেকার সোমনাথকে কেন এমনভাবে অপদস্থ করছো? আমাকে শাস্তি দিতে চাও দাও, কিন্তু একটা নিষ্কলঙ্ক মেয়ের প্রথম পবিত্র প্রেমকে কেন এমনভাবে অপমান করছো, হে ঈশ্বর?'

কিন্তু কার কাছে প্রার্থনা করছে সোমনাথ? কোথায় ঈশ্বর?

সোমনাথের মুখের দিকে অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে তপতী। গাঢ় স্বরে সে অনুরোধ করলো, "কই? কিছু বলো।"

কোথাও যদি সামান্য একটু আশার আলো দেখতে পেতো সোমনাথ, তাহলে এখনই তপতীকে এই অসহ্য অপমান থেকে মুক্তি দিতো। আর তো চুপ করে থাকা চলে না। সোমনাথ কাতরভাবে বললো, "আমায় কিছু সময় ভিক্ষে দিতে পারো তপতী?"

"তুমি আমার অবস্থাটা বুঝতে পারছো, সোম?" কাঁদ-কাঁদ গলায় তপতী বললো, "বাবা মা ভাই বোন কেউ আমার দলে নেই। এখন তুমি পিছিয়ে গেলে আমার আর কী রইলো?"

যার চাকরি নেই, রোজগার নেই, তাকে এই সমাজে যে মানুষ বলা চলে না—সে যে নির্ভরের অযোগ্য—এই সামান্য কথাটুকু বুদ্ধিমতী তপতী কেন বুঝতে পারছে না?

তপতী বললো, "আমি তো তোমার কাছে কিছুই চাইছি না। শুধু আমাকে নিয়ে একবার রেজিস্ট্রি অফিসে চলো।"

"তপতী, স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্বটা পুরুষমানুষের—হাজার-হাজার বছর ধরে এই নিয়ম চলে আসছে।" সোমনাথ কথা শেষ করতে পারলো না।

তপতী কিন্তু অবিচল। সে বললো, "ওসব আমি কিছুই বুঝতে চাই না, আগামীকাল আমি আবার আসবো।"

মিস্টার মাওজীর অফিস থেকে ফিরে সোমনাথ বাহাত্তর নম্বর ঘরে এগারো নম্বর সীটে মাথা নীচু করে বসে আছে। আজ এই ১লা আষাঢ়েই তার জীবনের সবগুলো অধ্যায়ের একই সঙ্গে বিয়োগান্ত পরিণতি হতে চলেছে। বাবা নোটিশ দিয়েছেন, হীরালালবাবু ডুবিয়েছেন, তপতী আর সময় দিতে অক্ষম। বাকি ছিলেন মিস্টার মাওজী। তিনি বললেন, দ্রুত কাজ না-দিলে আর সময় নষ্ট করতে পারবেন না। কেমিক্যাল বেচবার জন্যে মিলগুলোতে তিনি নতুন লোক পাঠাবেন। মিস্টার মাওজীর কাছেও সময় ভিক্ষা করেছে সোমনাথ। বলেছে অন্তত এক সপ্তাহ অপেক্ষা করবার জন্যে।

অতএব সাঙ্গ হলো খেলা। চাকরি হবে না। ব্যবসার নামে সামান্য যা পুঁজি ছিল তা জলাঞ্জলি দিয়ে অবসরপ্রাপ্ত ডবলু বি সি এস দ্বৈপায়ন ব্যানার্জির কনিষ্ঠপুত্র সোমনাথ ব্যানার্জি কোথায় যাবে এবার?

ক্রিং ক্রিং। সেনাপতি ছিল না। সোমনাথ নিজে গিয়েই ফোন ধরলো।

"হ্যালো, হ্যালো মিস্টার ব্যানার্জি?" মহাত্মা মিলস্-এর সুদর্শন গোয়েঙ্কা ফোন করছেন। "মিস্টার ব্যানার্জি, সেদিন আপনার ফ্রেণ্ড নটবর মিটার সব বলেছেন। মেনি থ্যাংকস। হাতে একটু সময় পেয়েছি। আজ কলকাতায় যাচ্ছি। গ্রেট ইণ্ডিয়ান হোটেলে সন্ধেবেলাটা আপনার জন্যে ফ্রি রাখবো হ্যালো, হ্যালো…কিন্তু হোলনাইট নয়।"

সোমনাথের হাতটা কাঁপছে, গোয়েঙ্কাকে যা বলবে ঠিক করে রেখেছিল তা বলবার আগেই গোয়েঙ্কা বললেন, "তখন আপনার কেস নিয়েও কথা হবে—কুছু গুড নিউজ থাকিতে পারে।"

সোমনাথ যা বলতে চেয়েছিল তা বলবার আগেই লাইন কেটে গেল। সোমনাথ দু-তিনবার টেলিফোন ট্যাপ করে রিসিভারটা যথাস্থানে রেখে মাথায় হাত দিয়ে বসলো।

সোমনাথ এখন আর বাধা দেবে না। সময়ের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে

দেবে। গোয়েঙ্কাকে ট্রাঙ্ককল করে বলবে না—সে ব্যস্ত আছে এবং নটবর মিটার যেসব কথা বলেছেন তার জন্যে সোমনাথ দায়ী নয়।

সোমনাথের আর কোনো উপায় নেই। এখন নটবরবাবুকে ধরতে পারলে হয়। ভদ্রলোক যদি আবার কলকাতার বাইরে গিয়ে থাকেন তাহলে কেলেঙ্কারি।

দ্রুত কাজ করতে হবে সোমনাথকে। সেনাপতি লুকিয়ে-লুকিয়ে বন্ধকীর কাজ করে। নতুন সোনার ঘড়িটা জমা রেখে সেনাপতি শ'পাঁচেক টাকা ধার দেবে না?

সেনাপতি এক কথায় রাজী হয়ে গেল। বললো, "পাঁচ-ছ'শ যা ইচ্ছে নিন বাবু।"

"তাহলে ছ'শই দাও। হঠাৎ একটা পার্টি কলকাতার বাইরে থেকে আসছে। কত খরচ হবে জানি না।" সোমনাথ বললো।

সেনাপতি বললো, "আপনাকে তো ধার দিতে ভাবনা নেই। আপনি মদও খান না, মেয়েমানুষের কাছেও যান না। বোসবাবু সন্ধেবেলায় টাকা চাইলে আমার চিন্তা হয়। ব্যবসায় না লাগিয়ে উনি সব টাকা হোটেলে রেখে আসেন।"

গোয়েঙ্কার প্রত্যাশিত ফোন এসেছে এবং সোমনাথের মত পাল্টেছে শুনে নটবর মিত্র বেশ খুশী হলেন। হ্যাণ্ডসেক করে বললেন, "এই তো চাই! সত্যি কথা বলতে কি, যে-পুজোর যে মন্তর!"

নাকে এক টিপ নস্যি গুঁজে নটবরবাবু বললেন, "মেয়েমানুষকে ব্যবসার কাজে লাগাতে বাঙালীদের যত আপত্তি—কিন্তু জাপানের দিকে তাকিয়ে দেখুন। বড়-বড় বিজনেস ট্রানজাকশন গীসা বাড়িতে বসেই হয়ে যাচ্ছে। মেয়েমানুষ-খরচার রসিদ পর্যন্ত অফিসে জমা দিয়ে জাপানীরা টাকা নিচ্ছে—দেখুন তার ফলটা। পৃথিবীতে আজ খ্যাদা জাপানীদের একটিও শত্রু নেই!"

সোমনাথ মাথা নিচু করে রইলো।

নটবর বললেন, "অত দূরেই বা যাবার দরকার কী? বাঙালী মেয়েদের ব্যবসায় লাগিয়ে কত শেঠজী এই কলকাতা শহরে লাল হয়ে যাচ্ছে।"

সোমনাথ নিজের স্নায়ুগুলো শান্ত করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

গোয়েঙ্কা যে আজই কলকাতায় আসছেন নটবরবাবু বুঝতে পারেননি। খবরটা শুনেই তিনি লাফিয়ে উঠলেন। বললেন, "যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধে হয়! গোয়েঙ্কা আর দিন পেলো না? আজকে আমি যে ভীষণ ব্যস্ত। এক বড় পার্টিকে মেয়েমানুষ দিয়ে খুশী করাতে হবে। অথচ এখনও কিছুই

ব্যবস্থা করা হয়নি। বেরুবো-বেরুবো করছি, এমন সময় আপনি হাজির হলেন।"

ঘড়ির দিকে তাকালেন নটবরবাবু। বললেন, "আপনার তো চুনোপুঁটি কেস। এই পার্টি আমার এক বন্ধুকে দু মাসে ছেষট্টি হাজার টাকা পাইয়ে দিয়েছে। অনেক রিকোয়েস্টের পর পার্টি বন্ধুর নেমন্তন্ন নিয়েছে—আর আমার বন্ধুটি আপনারই মতন। ব্যবসা করছে, টাকা কামাচ্ছে, কিন্তু এসব লাইনের কোনো খোঁজই রাখে না। আমার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে বসে আছে! সকাল থেকে তিনবার ফোন করেছে—দাদা খরচের জন্যে ভাববেন না। লোকটি বড় উপকারী বন্ধু। কোনোরকম বিপদ, কষ্ট বা ক্ষতি না হয় যেন ভদ্রলোকের। আমি বললুম. সেদিকে নিশ্চিন্ত থেকো। এ-লাইনে একবার যখন নটবর মিত্তিরের কাছে এসেছো, তখন নাকে মাস্টার্ড অয়েল গুঁজে ঘুমিয়ে থাকো। নটবর মিত্তির ইজ নটবর মিত্তির।"

সোমনাথের কথা হারিয়ে যাচ্ছে। সে শুধু শুনেই চলেছে। নটবরবাবু মাথা চুলকে দুঃখ করলেন, "দুটো কেস একসঙ্গে পড়ে গেল। তবে আপনি চিন্তা করবেন না। গোয়েঙ্কা যে আপনার কাছেও জীবনমরণের ব্যাপার, তা বুঝতে পারছি। আপনার একটা ব্যবস্থা করে দিতেই হবে। তবে ভাই আমার সঙ্গে ঘুরতে হবে—কারণ দুটো কেস একই সঙ্গে তো। একটার পুরো দায়িত্ব ঘাড়ে চেপে রয়েছে। বন্ধুও এখানে নেই—পার্টিকে আনতে গাড়ি নিয়ে কলকাতার বাইরে চলে গেছে!"

ঘড়ির দিকে তাকালেন নটবর। তারপর হেসে জিজ্ঞেস করলেন, "মুখটুখ শুকিয়ে যাচ্ছে কেন? ভাবছেন, নটবর মিত্তির অনেক খরচ করিয়ে দেবে? আপনার কেসে তা হবে না। ওই আপনার বাহাত্তর নম্বর ঘরের শ্রীধর শর্মা, ওর কাছ থেকে প্রতি কেসে কান মলে দেড় হাজার দু হাজার টাকা আদায় করি। কিন্তু আপনার কেসে মা কালীর দিব্যি বলছি একটি পয়সা লাভ করবো না।"

আবার ঘড়ির দিকে তাকালেন নটবর মিত্তির। বললেন, "গোয়েঙ্কা উঠছে কোথায়? না, আপনাকেই জায়গার ব্যবস্থা করতে বলেছে?"

গ্রেট ইণ্ডিয়ান হোটেল শুনে খুশী হলেন নটবর মিটার। "একটুখানি সুবিধা হলো। আমার বন্ধুর পার্টিকেও ওখানে নিয়ে যাবো ভাবছিলাম।"

নটবরবাবু দশ মিনিট সময় চাইলেন। বললেন, "ঠিক দশ মিনিট পরে পোদ্দার কোর্টের সামনে আপনি অপেক্ষা করুন—আমি চলে আসবো।"

রবীন্দ্র সরণি ও নতুন সি-আই-টি রোডের মোড়ে একটা বিবর্ণ হতশ্রী

ল্যাম্প পোস্টের কাছে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে সোমনাথ ব্যানার্জি।

রিকশা. ঠেলাগাড়ি, বাস, লরি, টেম্পোর ভিড়ে ট্রাফিকের জট পাকিয়েছে। এরই মধ্যে একটা সেকেলে ট্রামের বৃদ্ধ ড্রাইভার বাগবাজার যাবার উৎকণ্ঠায় টং টং করে ঘণ্টা বাজাচ্ছে। সোমনাথের মনে হলো, একটা প্রাগৈতিহাসিক গিরগিটি কেমনভাবে কালের সতর্ক প্রহরীকে ফাঁকি দিয়ে কলকাতায় এই জন-অরণ্য দেখতে এসে আটকে পড়েছে। বৃদ্ধ গিরগিটি মৃত্যুযন্ত্রণায় মাঝে-মাঝে কাতরভাবে আর্তনাদ করছে। মায়া হচ্ছে সোমনাথের। পৃথিবীতে এতো প্রশস্ত রাজপথ থাকতে কোন ভাগ্যদোষে বেচারা এই জ্যাম-জমাট রবীন্দ্র সরণিতে এসে আটকে পড়লো? আগেকার দিন হলে, সোমনাথ সত্যিই একটা কবিতা লিখে ফেলতো। নাম দিতো জন-অরণ্যে প্রাগৈতিহাসিক গিরগিটি।

আজ যে ১লা আষাঢ় তা আবার সোমনাথের মনে পড়লো। আকাশের দিকে তাকালো সোমনাথ। না, ১লা আষাঢ়ের সেই বহু প্রত্যাশিত মেঘদূতের কোনো ইঙ্গিত নেই আকাশে। বিরাট এই শহরটা মরুভূমি হয়ে গেছে! এখানে আর বৃষ্টি হবে না। বৃষ্টি হলে সোমনাথের কিন্তু খুব আনন্দ হতো। এখানে দাঁড়িয়ে সে ভিজতো। আষাঢ়ের প্রবল বর্ষণে যদি সব কিছু কালগর্ভে তলিয়ে যেতো, তাহলে আরও ভাল হতো।

রবীন্দ্র সরণি ধরে কত লোক দ্রুত বেগে হাঁটছে। দু-একজন পথচারী সোমনাথের দিকে একবার তাকিয়েও গেলো। এরা কি জানে তরুণ সোমনাথ ব্যানার্জি কেন রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে? কোথায় সে যাচ্ছে?

এইখানে দাঁড়িয়েই তো এক অন্তহীন অতীত পরিক্রমা করে এলো সোমনাথ। তার জীবনের প্রতিটি ঘটনা সোমনাথ এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। ঘড়ির দিকে তাকালো সোমনাথ। নটবর মিত্র দেরি করছেন। নির্ধারিত দশ মিনিট হয়ে গেছে।

দূর থেকে এবার হাঁপাতে-হাঁপাতে নটবরবাবুকে আসতে দেখা গেলো। বললেন, "কী ব্যাপার বলুন তো? আজ ১লা আষাঢ় বলে অনেকের মনেই রোমান্স জাগছে নাকি? অফিস থেকে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় আপনার বন্ধু শ্রীধরজীর ফোন। ওঁর এক পার্টির জন্যে একটু ব্যবস্থা করতে চান। আমি স্রেফ বলে দিলাম আজ আমার পক্ষে আর কোনো কেস নেওয়া সম্ভব নয়। খুব যদি আটকে পড়ো, নিজে রিপন স্ট্রীটে মিস সাইমনের কাছে যাও।

"চলুন চলুন মশাই, আগে গ্রেট ইণ্ডিয়ান হোটেলটা সেরে আসি।" নটবরবাবু নিজের ঢলঢলে প্যান্ট কোমর পর্যন্ত তুলে সোমনাথকে তাড়া লাগালেন।

গ্রেট ইণ্ডিয়ান হোটেলে নিজের পার্টির জন্যে স্পেশাল কামরা রিজার্ভ

করলেন মিস্টার মিটার। ওঁর সঙ্গে হোটেল রিসেপশনের লোকদের বেশ চেনা মনে হলো।

"আপনার বুকিং কে করবে?" নটবর মিত্র এবার সোমনাথকে জিজ্ঞেস করলেন।

সোমনাথ তো তা জানে না। এবারে নটবরবাবু মৃদু বকুনি লাগালেন। "ডোবাবেন মশাই? গোড়ার জিনিসগুলো খোঁজ নেবেন তো? গোয়েঙ্কা হোটেল বুকিং করেছেন কিনা—না আপনাকে করতে হবে? দেখি একবার খোঁজ নিয়ে।"

খবর নিয়ে জানা গেলো মিস্টার গোয়েঙ্কার নামে একুশ নম্বর কামরা আজ সকালেই বুক করা হয়েছে। হাঁপ ছাড়লেন নটবর। "বাঁচা গেলো—আজকাল হুট করলেই গ্রেট ইণ্ডিয়ানে বুকিং পাওয়া যায় না।"

হোটেল থেকে সোমনাথ বেরিয়ে আসছিল। নটবরবাবু আবার বকুনি লাগালেন। "বিজনেসে যদি টিকে থাকতে চান—জনসংযোগটা ভালভাবে শিখুন। আমাদের এসব কেউ বলে দেয়নি—ঠেকে-ঠেকে, ধাক্কা খেতে-খেতে টোয়েন্টি ইয়ারস ধরে শিখতে হয়েছে। এখানে বসে গোয়েঙ্কাজীর নামে একটা মিষ্টি চিঠি লিখুন। লিখুন—ওয়েলকাম টু ক্যালকাটা। সব ব্যবস্থা পাকা। আপনি সন্ধে সাতটার সময় আসছেন।"

মন্ত্রমুগ্ধের মতো সোমনাথ চিঠি লিখে ফেললো। নটবর মিত্তির বললেন, "খামের উপর গোয়েঙ্কার নাম লিখুন—বাঁদিকের ওপরে লিখুন, টু অ্যাওয়েট অ্যারাইভাল।"

নস্যি নিলেন নটবর মিটার। জিজ্ঞেস করলেন, "এসব করলুম কেন বলুন তো? আপনার পার্টি বুঝবে মিস্টার ব্যানার্জির ম্যানেজমেন্ট খুব ভাল। হোটেলে পা দিয়েই চিঠি পেলে গোয়েঙ্কার আর কোনো উদ্বেগ থাকবে না—উটকো পার্টি এসে সস্তা কোনো লোভ দেখিয়ে ভাঙিয়ে নিতে পারবে না।"

তারপর বললেন, "দিন দশ টাকা। হচ্ছে যখন, সব কিছু ভালভাবে হোক।"

রিসেপশনিস্ট মিস্টার জেকবকে নটবর বললেন, "মিস্টার গোয়েঙ্কা আসা মাত্র একুশ নম্বর ঘরে কিছু ফ্লাওয়ার পাঠিয়ে দেবেন ব্রাদার। ফুলের সঙ্গে মিস্টার ব্যানার্জির এই কার্ড দিয়ে দেবেন।"

আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে নটবর মিটার বললেন, "প্রাথমিক কাজ সব হয়ে গেলো। রিটায়ার করে, লোকাল ছেলেদের ট্রেনিং-এর জন্যে একটা ইস্কুল খুলবো ভাবছি, মিস্টার ব্যানার্জি। বাঙালীদের সব গুণ আছে, শুধু এই

জনসংযোগটা জানে না বলে কমপিটিশনে পিছিয়ে যাচ্ছে।"

"নাউ!" মিস্টার নটবর টাকে হাত রাখলেন। "এবার স্পেশিফিকেশন। আমার বন্ধুর পার্টি যা স্পেশিফিকেশন দিয়েছে, তাতে আমি তো মাথায় হাত দিয়ে বসে আছি। গোয়েঙ্কাজীর পছন্দ কী বলুন?"

এবার সত্যিই বিরক্ত হলেন নটবর মিটার। "না মশাই, আপনার দ্বারা কিছু হবে না। বিজনেস লাইন ছেড়ে দিন। একজন সম্মানিত অতিথিকে আপ্যায়ন করবেন, অথচ তাঁর পছন্দ-অপছন্দ জেনে নিলেন না? যে লোক কাটলেট ভালবাসে তাকে কমলালেবু দিলে সে কি পছন্দ করবে? এখন ভদ্রলোককে কোথায় পাই। ফোন করেও তো ধরা যাবে না।"

দুরূহ সমস্যার সমাধান নটবর মিটার নিজেই করলেন। বললেন, "কথাবার্তা যতটুকু শুনেছি, তাতে মনে হয় ভদ্রলোকের গাউনে রুচি নেই—শাড়ির দিকেই ঝোঁক। জাতের কথা আমি মোটেই ভাবছি না। এই একটা ব্যাপারে নিজের জাতের ওপর টান নেই গোয়েঙ্কাজীদের। পছন্দসই বেঙ্গলী গার্ল পেলে খুব খুশী হবেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো হাল্কা না ভারি? খুব ডিফিকাল্ট কোশ্চেন! এই পয়েন্টে বোকামি করেই তো শ্রীধরজী সেবার ফিফটি থাউজেণ্ড রুপিজের অর্ডার হারালেন। পারচেজ অফিসার একটু সেকেলেপন্থী—স্বাস্থ্যবতী মেয়ে-মানুষ পছন্দ করে। উনি সেসব না বুঝে, নিয়ে গেলেন আধুনিকা রত্না সাহাকে—একেবারে গাঁজার ছিলিমের মতো রোগা চেহারা, ফরাসী সাহেবরা যা প্রেফার করে। রত্নার বত্রিশ সাইজের জামার দিকে একবার নজর দিয়েই পার্টি বেঁকে বসলো—বললো, ছেলে না মেয়ে বুঝতে পারছি না, এখন খুব ব্যস্ত আছি, হঠাৎ একটা মিটিং পড়ে গেছে, পরে দেখা হবে। গেলো অর্ডারটা! মাঝখান থেকে রত্না সাহাকেও টাকা গুনতে হলো শ্রীধরজীর। আবার শাঁসালো মেয়েমানুষে প্রচণ্ড অরুচি এমন পার্টিও যথেষ্ট দেখেছি। তারা কঞ্চির মতো সঙ্গিনী চায়।"

সোমনাথের মাথা ধরে গেলো। ঘাড়ের কাছটা দপদপ করছে। চিন্তিত বিরক্ত নটবর বললেন, "ভেবে আর কী হবে? চলুন এনটালির দিকে। রিস্ক্ নেওয়া যাক। মলিনা গাঙ্গুলীর চেহারা মাঝামাঝি। রোগাও না মোটাও না। আপার বডিটা একটু হেভি, কিন্তু খুব টাইট—গোয়েঙ্কার অপছন্দ হবে না।"

গাড়ি চলছে। ধর্মতলা ও চৌরঙ্গীর মুখে দূর থেকে সোমনাথ যাকে দেখতে পেলো তাতে তার মুখ কালো হয়ে উঠলো। অনেকগুলো বই হাতে তপতী বাসের জন্যে অপেক্ষা করছে—নিশ্চয় কনস্যুলেট লাইব্রেরি থেকে বই নিয়েছে। তপতী বোধহয় সোমনাথকে লক্ষ্য করেছে—না-হলে অমনভাবে

গাড়িটার দিকে তাকিয়ে আছ কেন?

সোমনাথ দ্রুত উল্টোদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলো। ব্যাপারটা নটবর মিত্তির দেখলেন এবং রসিকতা করলেন, "কী মিস্টার ব্যানার্জি? মেয়েমানুষেরা কি বাঘ? অমনভাবে ঘামছেন কেন? বাস স্ট্যাণ্ডের এক মহিলা আপনার দিকে যেভাবে তাকালেন! এককালে আমাদেরও সময় ছিল! এখন এই চাপাটির মতো টাক পড়ায় কেউ আর ফিরে তাকায় না।"

ইউরোপীয়ান অ্যাসাইলাম লেনের কাছে হলুদ রংয়ের একতলা বাড়ির সামনে গাড়ি থামাতে বললেন নটবর মিত্র। নিচু গলায় সোমনাথকে বললেন, "আপনি গাড়িতেই বসুন। একেবারে ভদ্রলোকের পাড়া। কারুর সন্দেহ হলেই মুশকিল। মিসেস গাঙ্গুলীও জেনুইন ফুল গেরস্ত। স্বামী কর্পোরেশনে ক্লার্ক—একটু মদ খাবার অভ্যাস আছে, তাই মাইনের টাকায় চালাতে পারেন না।"

সোমনাথ গাড়িতে বসে রইলো। মিস্টার মিটার দরজার কলিং বেল টিপলেন এবং ভিতরে ঢুকে গেলেন। একটু পরে হাসি মুখে বেরিয়ে এসে সোমনাথকে বললেন, "চলুন। মিসেস গাঙ্গুলীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই!" নটবর এবার ফিসফিস করলেন, "একেবারে টাইট নারকুলে বাঁধাকপির মতো বুক—গোয়েঙ্কার খুব পছন্দ হবে।"

নটবরের পিছন-পিছন সোমনাথ ঘরের মধ্যে ঢুকলো। পরিপাটি পরিচ্ছন্ন বসবার ঘর। সফ্‌ট-লেদার মোড়া নরম সোফাসেটে সোমনাথ বসলো। ঘরের এককোণে কিছু বাংলা এবং ইংরিজী বই। দেওয়ালে দু-তিনজন শ্রদ্ধেয় মনীষীর ছবি। এক কোণে একটা টাইমপিস ঘড়ি। এবং তার পাশেই নিকেল-করা সুদৃশ্য ফোল্ডিং ফ্রেমে মিসেস গাঙ্গুলী ও আর-এক ভদ্রলোকের ছবি। নিশ্চয় মিস্টার গাঙ্গুলী হবেন।

মিসেস গাঙ্গুলীর বয়স একত্রিশ-বত্রিশের বেশি নয়। বেশ লম্বা এবং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা। মুখটি বেশ সরল—গৃহবধূর মতোই। কোথাও পাপের ছায়া নেই। মহিলা বোধহয় সবে ঘুম থেকে উঠেছেন। কারণ চোখদুটোতে এখনও দিবা-নিদ্রার রেশ রয়েছে। হাল্কা নীলরংয়ের ফুল ভয়েল শাড়ি পরেছেন মিসেস গাঙ্গুলী—সেই সঙ্গে চোলি টাইপের টাইট সাদা সংক্ষিপ্ত ব্লাউজ, ফলে বুকের অনেকখানি দৃশ্যমান।

ভদ্রমহিলা আড়চোখে সোমনাথের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন।

সোমনাথ চোখ নামিয়ে নিলো। নটবর বললেন, "ইনিই আমার বন্ধু মিস্টার ব্যানার্জি। বুঝতেই পারছেন।"

মিসেস গাঙ্গুলী হাত দুটো তুলে এমনভাবে আলতো করে নমস্কার করলেন যে আন্দাজ করা যায় বালিকা বয়সে তিনি নাচের চর্চা করতেন।

"এবার একটা টেলিফোন নিন, মিসেস গাঙ্গুলী। টেলিফোন ছাড়া আপনাকে আর মানায় না।" অভিযোগ করলেন নটবরবাবু।

ফিক করে হাসলেন মিসেস গাঙ্গুলী। ডান কাঁধে ব্রা-এর যে স্ট্র্যাপ উঁকি মারছিল, সেটা ব্লাউজের মধ্যে ঠেলে দিতে-দিতে ভদ্রমহিলা বললেন, "ওঁর ইচ্ছে নয়। বলেন, ফোন হলেই তোমাকে সব সময় জ্বালাবে। আজেবাজে লোকের তো অভাব নেই।"

নটবরবাবু বিনয়ের সঙ্গে বললেন, "আজেবাজে লোকের সঙ্গে আপনার কাজ কোথায়? আমি তো জানি, একদম হাইয়েস্ট লেভেলে খুব জানা-শোনা পার্টি ছাড়া আপনাকে পাওয়াই যায় না।"

খুশী হলেন মিসেস গাঙ্গুলী। দেহ দুলিয়ে বললেন, "মুড়ি-মিছরির তফাত যারা বোঝে তারা আমার কাছে আসে। আপনি তো জানেন, শুধু মুচমুচে গতর থাকলেই এ-লাইনে কাজ হয় না। আজকালকার মানুষের কত উদ্বেগ, মাথায় তাঁদের কত দুশ্চিন্তা। এইসব মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলে দুশ্চিন্তা ভুলিয়ে দেওয়া, আদর আপ্যায়ন করে দু দণ্ডের শান্তি দেওয়া, একটু প্রশ্রয় দিয়ে খেলায় নামানো কি সোজা কাজ! পেটে একটু বিদ্যে না-থাকলে, এসব লাইনে নাম করা যায় না।"

"তা তো বটেই!" মিসেস গাঙ্গুলীর সঙ্গে নটবর একমত হলেন।

ঠোঁট উল্টে মিসেস গাঙ্গুলী বললেন, "আজকাল আনাড়ি যেসব মেয়ে আসছে, তারা পুরুষমানুষের মনের খিদের কথাই জানে না। তারা কী করে ভিতরের খবর বার করবে? টাকা খরচ করে যে বিজনেসম্যান গেস্ট পাঠালেন, তাঁর কোনো লাভ হয় না।"

নটবর মিত্তির বললেন, "তা তো বটেই।"

ফিক করে হাসলেন মিসেস গাঙ্গুলী। তারপর নটবরকে আক্রমণ করলেন। বললেন, "আপনার তো কোনো পাত্তাই নেই।"

"কাজকর্ম তেমন কই? শরীরটাও ভাল যাচ্ছে না।" নটবর বেশ বিব্রত হয়ে পড়লেন।

বিশ্বাস করলেন না মিসেস গাঙ্গুলী। মুখে হাত চাপা দিয়ে ছোট্ট হাই তুললেন, তারপর আবার ফিক করে হেসে বললেন, "আমি ভাবলুম মিসেস

বিশ্বাসকে সব কাজকর্ম দিচ্ছেন। আমাকে ভুলেই গেলেন।"

"তা কখনো সম্ভব?" নটবরবাবু সুন্দর অভিনয় করলেন। "আমাদের বরং আপনাকে কাজ দিতে সঙ্কোচ হয়—আপনি ক্রমশ যে লেভেলে উঠে যাচ্ছেন। খোদ মিস্টার বাজোরিয়ার প্যানেলে ঢুকেছেন আপনি, সে খবর পেয়েছি আমি। আমাদের যেসব পার্টি তাদের বেশির ভাগ মুড়ি কিনতে চায়। আজ যেমনি শুনলাম এই বন্ধুটির মিছরি দরকার, সঙ্গে-সঙ্গে আপনার কাছে পাকড়াও করে আনলুম। একবার ভাবলুম চিঠি লিখে দিই।"

"না-দিয়ে ভালই করেছেন।" লাল পাথর-বসানো কানের দুল নাড়িয়ে মিসেস গাঙ্গুলী বললেন, "অজানা-অচেনা লোকের সঙ্গে আমি কথা পর্যন্ত বলি না। যা-আজকাল অবস্থা হয়েছে! আপনার মিসেস বিশ্বাস গোপনে পুলিশে খবর দিয়ে আমাদের জানা-শোনা একটা মেয়েকে ধরিয়ে দিয়েছেন। অজন্তা মিত্র খুব ভাল কাজকর্ম করছিল। মিসেস বিশ্বাসের সহ্য হলো না। এতো হিংসের কী আছে বাবা? না-হয় তোমার দুজন রেগুলার খদ্দের অজন্তার কাছে যাচ্ছিলো। কই, আমি তো হিংসে করি না মিসেস বিশ্বাসকে। আমার একটা সায়েব খদ্দেরকে উনি তো কব্জা করেছেন।"

নটবর মিত্তির তাড়াতাড়ি কথা শেষ করতে চান। তাই বললেন, "তাহলে আমার এই বন্ধুর?"

"কবে?" হাই তুলে মুখের সামনে তিনবার টুসকি দিলেন মিসেস গাঙ্গুলী।

আজকেই শুনে মিসেস গাঙ্গুলী বিশেষ উৎসাহিত বোধ করলেন না। বললেন, "এ যে ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে হয়ে গেলো, মিত্তির মশাই। আজ একটু বিশ্রাম নেবো ভাবছিলাম। পর পর ক'দিন বড় বেশি খাটাখাটনি চলেছে।"

"আজকের দিনটা চালিয়ে দিন।" অনুরোধ করলেন নটবর মিত্তির। "কাছাকাছি ব্যাপার।"

বুকের আঁচল সামলাতে-সামলাতে মিসেস গাঙ্গুলী বললেন, "বেশি রাতের কাজকম্ম আজকাল নিই না, নটবরবাবু। উনি বিরক্ত হন।"

এবার খুশী হলেন নটবরবাবু। "রাতের ব্যাপার হলে আপনাকে বলতামই না। পার্টি নিজেই দশটার মধ্যে ফাঁকা হয়ে যাবে।"

এবার টাকার অঙ্কটা জানতে চাইলেন নটবরবাবু।

"বসবেন কে?" সুগঠিত দেহটি পাতলা কাপড় দিয়ে ঢাকতে-ঢাকতে প্রশ্ন করলেন মিসেস গাঙ্গুলী।

"খুবই ফার্স্ট ক্লাস ভদ্রলোক—আমাদের ছোট ভাই-এর মতো। মিস্টার গোয়েঙ্কা।"

মুখ বেঁকালেন মিসেস গাঙ্গুলী। "লোকগুলো বড় পাজী হয়।"

"যা ভাবছেন—তা মোটেই নয়। কার্তিকের মতো চেহারা। অতি অমায়িক ভদ্রলোক।"

মিসেস গাঙ্গুলী বললেন, "গেস্ট হাউস বা বাড়ি হলে দুশো টাকা। এখান থেকে নিয়ে যেতে হবে এবং পৌঁছে দিতে হবে। হোটেল হলে কিন্তু তিরিশ টাকা বেশি লাগবে, আগে থেকে বলে রাখছি।"

"আপনার সব কথা মেনে নিচ্ছি, মিসেস গাঙ্গুলী। আপনি তো জানেন আমি দরদাম পছন্দ করি না। কিন্তু ওই হোটেলের জন্য রেট বাড়িয়ে দেওয়াটা কেমন যেন লাগছে।"

রেগে উঠলেন মিসেস গাঙ্গুলী। ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, "হোটেলে আমাদের বাড়তি খরচ আছে, নটবরবাবু। অকট্রয় দিতে হয়। একদিনের কাজ তো নয়—দারোয়ান থেকে আরম্ভ করে ম্যানেজারবাবু পর্যন্ত হোটেলের সবাইকে সন্তুষ্ট করতে তিরিশ টাকা লেগে যায়। ওরা আমাদের মুখ চিনে গেছে —বিনা কাজে কোনো গেস্টের সঙ্গে দেখা করতে গেলেও বিশ্বাস করে না। আজ যদি টাকা দিয়ে সন্তুষ্ট না করি, তাহলে আগামীকাল হোটেলে ঢুকতেই দেবে না। ঢুকতে দিলেও, ঘরে গিয়ে হাঙ্গামা বাধাবে। আগে থেকে বলে রাখা ভাল—না-হলে অনেকে ভাবে, তালে পেয়ে তিরিশটা টাকা ঠকাচ্ছি।"

ঘড়ির দিকে তাকালেন মিসেস গাঙ্গুলী। জিজ্ঞেস করলেন, "একটু চা, খাবেন?"

সোমনাথ রাজী হলো না। নটবরবাবু বললেন, "আরেকদিন হবে। শুধু চা কেন লুচি মাংস খেয়ে যাবো। মিস্টার গাঙ্গুলীকে বলবেন, পছন্দ মতো বাজার করে রাখতে।"

ফিক করে হাসলেন মিসেস গাঙ্গুলী। তারপর বললেন, "তাহলে ঘণ্টাখানেক পরে আসুন। আমি তৈরি হয়ে নিই।"

সোমনাথকে সঙ্গে নিয়ে নটবর মিত্র সার্কুলার রোডে এসে দাঁড়ালেন। নটবর মিত্র এবার বিদায় নিতে চান। সোমনাথকে বললেন, "আপনার সমস্যা তো সমাধান হয়ে গেলো! ঘণ্টাখানেক পরে এসে মিসেস গাঙ্গুলীকে নিয়ে সোজা গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে চলে যাবেন।"

কিন্তু সোমনাথের ইচ্ছে নটবর যেন চলে না যান। সোমনাথের অনুরোধ ঠেলতে পারলেন না নটবরবাবু। বললেন, "আমার যে অনেক কাজ! এক নম্বর পার্টির এখনও ব্যবস্থা হলো না।"

সোমনাথ ভেবেছিল কোনো চায়ের দোকানে বসে একটা ঘণ্টা কাটিয়ে

দেবে। কিন্তু নটবরবাবু বললেন, "কোথায় বসে থাকবেন? চলুন, আমার সঙ্গে ঘুরে আসবেন।"

নটবরবাবুর সত্যিই দুশ্চিন্তা! বিরক্তভাবে বললেন, "এ-লাইনে বাঙালী মেয়েদের এতো সুনাম—আজকাল এক্সপোর্ট পর্যন্ত হচ্ছে! অথচ আমার ফ্রেণ্ডের পার্টি অদ্ভুত এক বায়না ধরেছে। পাঞ্জাবী, গুজরাতী, সিন্ধি মেয়ে পর্যন্ত সাপ্লাই করেছি—কিন্তু উনি চান বড়বাজারী মেয়ে। কোথায় পাবো বলুন তো? এ-লাইনে সাপ্লাই নেই। অনেক কষ্টে একজন ফ্রেণ্ডের কাছে উষা জৈন বলে একটা মেয়ের খবর পেয়েছি। সায়েবপাড়ায় থাকে। যাই একবার দেখে আসি।"

রডন স্ট্রীটে গাড়ি থামলো। নটবরবাবু নাকে নস্যি গুঁজে বললেন, "চলুন না? আপনারও জানা-শোনা হয়ে থাকবে।"

সোমনাথ রাজী হলো না। তার মাথা ধরেছে। কপালটা টিপে ধরে সে গাড়ির মধ্যে চুপচাপ বসে রইলো।

বেশ কিছুক্ষণ পরে নটবরবাবু উষা জৈনের কাছ থেকে ফিরে এলেন। বিরক্তভাবে বললেন, "ভীষণ ডঁাট মশাই! স্নান করছিলো, আধঘণ্টা বসিয়ে রাখলো। আমি ভাবলুম, না জানি কি ডানাকাটা পরী হবেন! সাজুগুজু করে যখন অ্যাপিয়ারেন্স দিলেন তখন দেখলুম, মোস্ট অর্ডিনারি। গায়ের রংটা ফর্সা, কিন্তু কেমন যেন টলটলে ঢলঢলে চেহারা—কোনো বাঁধুনি নেই। মিনিমাম ছত্রিশ বছর বয়স হবে, অথচ আমাকে বললে কিনা সবে পঁচিশে পড়েছে।" নিজের টাকে নটবরবাবু একবার হাত বুলিয়ে নিলেন। "ঐ গতর নিয়েই ধরাকে সরা জ্ঞান করছে! মিস্টার রামসহায় মোরে ওঁর এক বন্ধুর সঙ্গে শেয়ারে জয়পুর থেকে এই মেয়েকে আট মাস আগে কলকাতায় আনিয়েছিলেন। খরচাপাতি আধাআধি বখরা হচ্ছিলো। বন্ধুর ব্লাড-প্রেসার বাড়ায়, ভদ্রলোককে দুষ্টুমি কমাতে হয়েছে। তাই এখন মেয়েটা কিছু-কিছু প্রাইভেট প্র্যাকটিস করছে। স্বয়ং মিস্টার মোরে টেলিফোনে আমাকে ইনট্রোডিউস করে দিয়েছেন, বলেছেন আমার বুজম ফ্রেণ্ড। তবু উষা জৈন সাতশ' টাকার কমে রাজী হলো না। বললো, বম্বেতে নাকি এখন হাজার টাকা রেট। তা মশাই, লঙ্কাতে সোনার দাম চড়া আমার কী বলুন তো? অন্য সময় হলে কোন শালা রাজী হতো—নেহাত ঐ উষা জৈন নামটার জন্যে! আমার কোনো চয়েস নেই। লোকাল মেয়ে হলে ছুঁড়ী একশ' টাকা পেতো না।"

মিসেস গাঙ্গুলী রেডি হয়েই বসে আছেন। এক ঘণ্টা ধরে সমস্ত দেহে ভদ্রমহিলা যথেষ্ট চুনকাম করেছেন। নাক, চোখ, কপাল, ঠোঁট, কাঁধ, গ্রীবা থেকে আরম্ভ করে হাতের নখ, এমন কি পায়ের পাতায় প্রসাধনের সযত্ন প্রলেপ নজরে আসছে। নটবর মিত্তির রসিকতা করলেন, "আপনাকে চেনাই যাচ্ছে না—দুগ্‌গা ঠাকুর মনে হচ্ছে।"

বেশ খুশী হলেন মিসেস গাঙ্গুলী। বললেন, "গোয়েঙ্কা তো তাই এরকম সাজলাম। ওরা একটু ঝলমলে জামাকাপড় পছন্দ করে, চড়া রুজ ওদের খুব ভাল লাগে। কিন্তু লিপষ্টিক সম্বন্ধে ওদের খুব ভয়—পাঞ্জাবিতে বা গেঞ্জিতে লাগলে অনেক লিপষ্টিকের রং উঠতেই চায় না। বাড়িতে বউ-এর কাছে ধরা পড়ে যাবার রিস্‌ক্ থাকে।"

মিসেস গাঙ্গুলী এবার সিগারেট ধরালেন। সামান্য একটু ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "কাস্টমারের সামনে আমি কিন্তু স্মোক করি না। তাই এখন একটা খেয়ে নিচ্ছি।"

"একটা কেন, দশটা সিগারেট খেতে পারেন আপনি—হাতে যথেষ্ট সময় আছে," নটবর মিত্র বললেন।

সিগারেটে আর একটা টান দিয়ে, কমনীয় অথচ অটুট দেহখানি ঈষৎ দুলিয়ে মিসেস গাঙ্গুলী বললেন, "দুশো টাকায় আর চলে না মিত্তির মশাই। জিনিসপত্রের দাম যেরকম বাড়ছে, একবার সাজগোজেই উনিশ-কুড়ি টাকা খরচ হয়ে যায়। এই কাপড় কাচতেই পাঁচ টাকা নিয়ে নেবে—আমি আবার যে কাপড় পরে একবার কাজে বেরিয়েছি তা দুবার পরতে পারি না, ঘেন্না করে। তাছাড়া দামী ল্যাভেণ্ডার পাউডার এবং স্যাচেট সেণ্ট আমি ব্যাগের মধ্যে নিয়ে যাই। এক-একজন কাস্টমারের গায়ে যা ঘামের গন্ধ! আধ কৌটো পাউডার মাখাবার পরেও দুর্গন্ধে বমি ঠেলে আসে।"

"আপনার কাজের দাম কী আর টাকায় দেওয়া যায়?" বিনয়ে বিগলিত নটবর উত্তর দিলেন। "হাই-লেভেলের লোকদের আপনার মতো আপ্যায়ন করতে কে পারবে?"

"তা আপনাদের আশীর্বাদে অনেক বাঘ সিংহকে বশ করে পায়ের কাছে লুটোপুটি খাইয়েছি!" বেশ গর্বের সঙ্গেই উত্তর দিলেন মিসেস গাঙ্গুলী। "পোষ মানাতে না-পারলে আপনারাই বা পয়সা ঢালবেন কেন? একটা কিছু উদ্দেশ্য আছে বলেই তো পার্টির বিছানায় আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন।"

"আপনি তো সবই বোঝেন মিসেস গাঙ্গুলী। বিলেত-আমেরিকা হলে আপনার মতো স্পেশালিস্ট লাখ-লাখ টাকা রোজগার করতেন," বললেন নটবর মিত্র।

নাকের ডগায় পাউডার ঘষতে-ঘষতে মিসেস গাঙ্গুলী বললেন, "গোয়েঙ্কার কাছ থেকে কোনো খবর-টবর বার করবার থাকলে এখনই বলে দিন। তাহলে ভাল করে মদ-টদ খাওয়াবো।"

হেঁ-হেঁ করে হাসলেন নটবর। "কোনোরকম বিজনেস নেই। স্রেফ সৌজন্যের জন্যে আপ্যায়ন। মিস্টার গোয়েঙ্কা পুরোপুরি স্যাটিসফ্যাকশন পেলেই আমরা খুশী।"

"ফলেন পরিচিয়তে! পনেরো দিনের মধ্যে আমাকে আবার নিয়ে যাবার জন্যে গোয়েঙ্কা যদি আপনাদের ব্যতিব্যস্ত না করে তাহলে আমার নামে কুকুর রাখবেন," এই বলে মিসেস মলিনা গাঙ্গুলী সোফা ছেড়ে উঠলেন।

এবার বিরাট এক কাঁচের গেলাসে ডাবের জল খেলেন মিসেস গাঙ্গুলী। বললেন, "আপনাদের দিতে পারলাম না—ঠিক দুটো ডাব ছিল। এটা আমাদের লাইনে ওষুধের মতো। শরীর বাঁচাবার জন্যে কাজে বেরোবার ঠিক আগেই খেতে হয়।"

বেরোবার মুখেই কিন্তু গণ্ডগোল হলো। মিসেস গাঙ্গুলীর স্বামী ফিরলেন। অফিস থেকে বেরিয়ে পথে কোথাও মদ খেয়ে এসেছেন। মুখে ভকভক করে গন্ধ ছাড়ছে।

"তুমি কোথায় যাচ্ছ?" বেশ বিরক্তভাবে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক। মিসেস গাঙ্গুলীর হাসি কোথায় মিলিয়ে গেলো। বললেন, "কাজে। খুব তাড়াতাড়ি ফিরবো।"

ভদ্রলোক নেশার ঝোঁকে বললেন, "তোমাকে এতো ধকল সইতে আমি দেবো না, মলিনা। পর পর তিনদিন বেরোতে হয়েছে তোমাকে। আগামীকাল আবার মিস্টার আগরওয়ালা তোমাকে নিতে আসবেন।"

মিসেস গাঙ্গুলী স্বামীকে সামলাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ভদ্রলোক রেগে উঠলেন। "শালারা ভেবেছে কী? পয়সা দেয় বলে, তোমার ওপর যা খুশী অত্যাচার করবে? কালকে তোমায় রাত দেড়টার সময় ফেরত পাঠিয়েছে। আমি তোমার স্বামী—আমি হুকুম করছি, আজ তোমাকে বিশ্রাম নিতে হবে।"

বিব্রত মিসেস গাঙ্গুলী মত্ত স্বামীকে আবার বোঝাবার চেষ্টা করলেন। বললেন, "এঁদের কথা দিয়েছি—এঁরা অসুবিধেয় পড়ে যাবেন।"

রক্তচক্ষু মিস্টার গাঙ্গুলী একবার সোমনাথ ও আরেকবার নটবরবাবুর দিকে তাকালেন। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে স্ত্রীকে বললেন, "আমি তো ফরেন হুইস্কি ছেড়ে দিশী খাচ্ছি মলিনা। অত টাকা তোমায় রোজগার করতে হবে না।"

অপারগ মিসেস গাঙ্গুলী অত্যন্ত লজ্জার সঙ্গে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এলেন। ক্ষমা চেয়ে বললেন, "আমাকে ভুল বুঝবেন না। ওর মাথায় যখন ভূত চেপেছে তখন ছাড়বে না। এখন যদি আপনাদের সঙ্গে বেরোই—বাড়ি ফিরে দেখবো সব ভেঙ্গে-চুরে ফেলেছে। কী হাঙ্গামা বলুন তো—এসব রটে গেলে আমার যে কী সর্বনাশ হবে ভেবে ছ্যাখে না।"

সোমনাথ স্তম্ভিত। জেনে-শুনে স্বামী এইভাবে বউকে ব্যবসায় নামিয়েছে! 'আর সোমনাথ তুমি কোথায় যাচ্ছ?' কোনো এক অতিদূর অন্ধকার গুহা থেকে আরেকজন সোমনাথ কাতরভাবে চিৎকার করছে।

কিন্তু সোমনাথ তো এই ডাকে বিচলিত হবে না। যে-সোমনাথ ভাল থাকতে চেয়েছিল তাকে তো সমাজের কেউ বেঁচে থাকতে দেয়নি। সোমনাথ এখন অরণ্যের আইনই মেনে চলবে।

নটবর মিত্রের অভিজ্ঞ মাথায় এখন নানা চিন্তা। টাকের ঘাম মুছে বললেন, "এই জন্যে বাঙালীদের কিছু হয় না। হতভাগা গাঙ্গুলীটা বাড়ি ফিরবার আর সময় পেলো না! কত পত্নীপ্রেম দেখলেন না? তোমার রেস্ট দরকার! তোমায় যেতো দেবো না! আর কি রকম সতী সাধ্বী স্ত্রী! স্বামীদেবতার আদেশ অমান্য করলেন না!"

সোমনাথের চিন্তা, কাজের শুরুতেই বাধা পড়লো। এবার কী হবে?

নটবর নিজেই বললেন, "চলুন-চলুন। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে মাথা চুলকোলে কাজ হবে না। সময় হাতে নেই। মিস্টার গোয়েঙ্কার কাছে আপনার মানসম্মান রাখতেই হবে!"

উড স্ট্রীটে এলেন নটবর মিত্র।

একটা নতুন বিরাট উঁচু ফ্ল্যাটবাড়ির অটোমেটিক লিফটে উঠে বোতাম টিপে দিলেন নটবরবাবু। "দেখি মিসেস চক্রবর্তীকে। আপনি আবার যা সরল, যেন বলে বসবেন না অন্য জায়গায় সাপ্লাই না-পেয়ে এখানে এসেছি।" সোমনাথকে সাবধান করে দিলেন নটবরবাবু।

পাঁচতলায় দক্ষিণ দিকের ফ্ল্যাটে অনেকক্ষণ বেল টেপার পর মিসেস চক্রবর্তীর দরজা খুললো। একটা ম্যাড্রাসি চাকর ফ্যালফ্যাল করে কিছুক্ষণ অতিথির দিকে তাকিয়ে রইলো, তারপর কোনোকিছু না-বলে ভিতরে চলে গেলো। নটবরবাবু নিজের মনেই বললেন, "মিসেস চক্রবর্তীর ফ্ল্যাট যেন ঝিমিয়ে পড়েছে।"

এবার প্রৌঢ়া কিন্তু সুদর্শনা মিসেস চক্রবর্তী ঘোমটা দিয়ে দরজার কাছে এলেন। নটবরবাবুকে দেখেই চিনতে পারলেন। মুখ শুকনো করে মিসেস চক্রবর্তী বললেন, "আপনি শোনেননি? আমার কপাল ভেঙেছে। মেয়েগুলোকে আচমকা পুলিশে ধরে নিয়ে গেলো।"

আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করলেন নটবরবাবু।

মিসেস চক্রবর্তী বললেন, "আর জায়গা পেলো না। পুলিশের এক অফিসার রিটায়ার করে পাশের ফ্ল্যাটটা কিনলো। ওই লোকটাই সর্বনাশ করিয়েছে মনে হয়। এতোগুলো মেয়ে ভদ্রভাবে করে খাচ্ছিলো।"

গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করলেন নটবর মিত্র। কাঁদ-কাঁদ অবস্থায় মিসেস চক্রবর্তী বললেন, "বাঙালী পুলিশ বাঙালীর রক্ত খাচ্ছে। ভদ্র পরিবেশে সাত-আটটি মেয়ে আমার এই ফ্ল্যাটে প্রোভাইডেড হচ্ছিলো! কয়েকটি কলেজের স্টুডেন্টকেও চান্স দিচ্ছিলাম—হপ্তায় দু-তিন দিন দুপুরবেলায় কয়েকঘণ্টা সৎভাবে খেটে মেয়েগুলো ভাল পয়সা তুলছিল। কিন্তু কপালে সহ্য হলো না!"

"গভরমেন্ট, পুলিশ এদের কথা যত কম বলা যায় তত ভাল," নটবরবাবু সান্ত্বনা দিলেন মিসেস চক্রবর্তীকে।

একটু থেমে মিসেস চক্রবর্তী বললেন, "নতুন একটা ফ্ল্যাটের খুব চেষ্টা করছি, মিত্তির মশাই। কলকাতায় বাড়ি ভাড়ার যা অবস্থা। সায়েবপাড়ায় মাসে দেড় হাজারের কম কেউ কথা বলছে না। আমি মেরে কেটে আটশ' পর্যন্ত দিতে পারি।"

নটবরবাবুকেও ফ্ল্যাট দেখবার জন্য অনুরোধ করলেন মিসেস চক্রবর্তী। বিদায় দেবার আগে বললেন, "আবার একটু গুছিয়ে বসি—তখন কিন্তু পায়ের ধুলো পড়া চাই।"

যথেষ্ট হয়েছে। জন্মদিনে আমার জন্যে কী অভিজ্ঞতা লিখে রেখেছিলে, হে বিধাতা? সোমনাথ এবার ফিরে যেতে চায়। কিন্তু নটবর মিত্তির এখন ডেসপারেট। তাঁর ধারণা সোমনাথের কাছে তিনি ছোট হয়ে যাচ্ছেন। পার্ক স্ট্রীটের দিকে যেতে-যেতে নটবর বললেন, "কলকাতা শহরে আপনাদের আশীর্বাদে মেয়েমানুষের অভাব নেই। মিস সাইমনের ওখানে গেলে এখনই

এক ডজন মেয়ে দেখিয়ে দেবে। কিন্তু ওই সব যা-তা জিনিস তো জানা-শোনা পার্টির পাতে দেওয়া যায় না। তবে আমি ছাড়ছি না—আমার নাম নটবর মিত্তির। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে।"

মিসেস বিশ্বাসের ফ্ল্যাটের কাছে হাজির হলেন নটবরবাবু। রুমা এবং ঝুমা নিজের দুই মেয়েকে মিসেস বিশ্বাস ব্যবসায় নামিয়েছেন শুনে সোমনাথ আর অবিশ্বাস করছে না।

মিসেস বিশ্বাসের ফ্ল্যাটে যাবার জন্য সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে নটবরবাবু বললেন, "মেয়েমানুষ সম্পর্কে সেন্টিমেন্ট-ফেন্ট বাংলা নভেল নাটকেই পড়বেন। আসলে ফিল্ডে কিছুই দেখতে পাবেন না। টাকা দিয়ে মায়ের কাছ থেকে মেয়েকে, ভায়ের কাছ থেকে বোনকে, স্বামীর কাছ থেকে বউকে, বাপের কাছ থেকে বেটীকে কতবার নিয়ে এসেছি—টাকার অ্যামাউণ্ট ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে গার্জেনদের একটুও উদ্বিগ্ন হতে দেখেনি। লাস্ট দশ বছরে বাঙালীরা অনেক প্রাক্‌টিক্যাল হয়ে উঠেছে—জাতটার পক্ষে এটাই একমাত্র আশার কথা।"

নটবর মিত্তির অমায়িক হাসিতে মুখ ভরিয়ে মিসেস বিশ্বাসকে জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন আছেন? অনেকদিন আসতে পারিনি। ক্যালকাটার বাইরে যেতে হয়েছিল।"

"পাঁচজনের আশীর্বাদে" যে ভালই চলে যাচ্ছে তা মিসেস বিশ্বাস জানিয়ে দিলেন। বললেন, "পুরানো ফ্ল্যাট নতুন করে সাজাতে প্রায় টেন থাউজেণ্ড খরচা হয়ে গেলো।"

"এর থেকে নতুন কোনো ফ্ল্যাট ভাড়া নিলে অনেক সস্তা হতো। কিন্তু এই ঠিকানাটা দিল্লী, বম্বে, ম্যাড্রাসের অনেক ভাল-ভাল পার্টির জানা হয়ে গেছে। কলকাতায় ট্যুরে এলেই তাঁরা এখানে চলে আসেন। ঠিকানা পাল্টালেই গোড়ার দিকে বিজনেস কমে যাবে।"

ঝকঝকে তকতকে হল্‌ঘরটার দিকে তাকিয়ে খুশী হলেন নটবরবাবু। "এ যে একেবারে ইন্দ্রপুরী বানিয়ে তুলেছেন!" নটবর মিত্তির প্রশংসা করলেন। "চারটে-পাঁচটা ছোট-ছোট চেম্বার করেছেন, মনে হচ্ছে।"

"জায়গা তো আর বাড়ছে না, কিন্তু মাঝে-মাঝে অতিথি বেড়ে যায়। তাই এরই মধ্যে সাজিয়ে-গুজিয়ে বসতে হলো।" ঠোঁট উল্টিয়ে মিসেস বিশ্বাস বললেন, "যা জিনিসের দাম! কিন্তু প্রত্যেক চেম্বারে ডানলপিলোর তোশক

দিলুম। নামকরা সব লোক সারাদিনের খাটুনির পর পায়ের ধুলো দেন, ওঁদের যাতে কোনো কষ্ট না হয় তা দেখা আমার কর্তব্য। ভগবান যদি মুখ তোলেন, সামনের মাসে দু'খানা চেম্বারে এয়ারকুলার বসাবো।"

"কাকে খোঁজ করছেন ? রুমুকে না ঝুমুকে ?" মিসেস বিশ্বাস জিজ্ঞেস করলেন। তারপর শান্তভাবে বললেন, "ঝুমু কাস্টমারের সঙ্গে রয়েছে। একটু বসুন না, মিনিট পনেরোর মধ্যে ফ্রি হয়ে যাবে।"

নটবর মিত্তির ঘড়ির দিকে তাকালেন। মিসেস বিশ্বাস একগাল হেসে বললেন, "ঝুমু আপনার ওপর খুব সন্তুষ্ট। সেবার এই গ্রেট ইণ্ডিয়ান হোটেলে জাপানী গেস্ট দিলেন—ভারি চমৎকার লোক। ঝুমুকে একটা ডিজিট্যাল টাইমপিস উপহার দিয়েছে—এখানে পাওয়া যায় না। ঝুমুটাও চালাক। ছোট ভাই আছে, এই বলে সায়েবের কাছ থেকে একটা দামী ফাউনটেন পেনও নিয়ে এসেছে। অথচ জাপানী সায়েব পুরো দাম দিয়েছে—একটি পয়সাও কাটেনি।"

"মেয়ে আপনার হীরের টুকরো—সায়েবকে সন্তুষ্ট করেছে, তাই পেয়েছে," নটবরবাবু বললেন।

মিসেস বিশ্বাস মুখ বেঁকালেন। "সন্তুষ্ট তো অনেককেই করে। কিন্তু হাত তুলে কেউ তো দিতে চায় না। রুমুর অবস্থা দেখুন না।"

"আপনার বড় মেয়ে তো ? কী হলো তার ?" নটবরবাবু উদ্বেগ প্রকাশ করলেন।

"বলবেন না। আপনাদের মিস্টার কেদিয়া—পয়লা নম্বর শয়তান একটা। রুমুকে হংকং-এ বেড়াতে নিয়ে যাবার লোভ দেখালেন। এখানে বেশ কয়েকবার এসেছেন। রুমু এবং ঝুমু দুজনের সঙ্গেই ঘণ্টাখানেক করে সময় কাটিয়ে গেছেন। তারপর রুমুর সঙ্গে ভাব বাড়লো! একবার ন'টার শোতে রুমুকে সিনেমা দেখিয়ে এনেছেন। আমাকে দেখলেই গলে যেতেন। ওঁর মাথায় যে এতো দুষ্টুমি কী করে বুঝবো ? ভদ্রলোক আমাকে বললেন, 'বিজনেসের কাজে হংকং যাচ্ছি। রুমুকে দু হপ্তার জন্য ছেড়ে দিন। মেয়ের রোজগারও হবে ফরেন ঘোরাও হবে।' হাজার টাকায় রফা হলো। ওখানকার সব খরচা—প্লেন ভাড়া, হোটেল ভাড়া উনি দেবেন। আমি তো বোকা—রুমুটা আমার থেকেও বোকা। হতভাগাটার শয়তানী বেচারা বুঝতে পারেনি। বিদেশে যাবার লোভে কচি মেয়েটা লাফালাফি করতে লাগলো। কাজকর্ম বন্ধ রেখে পাসপোর্টের জন্য ছোটাছুটি আরম্ভ করলো। কেন মিথ্যে বলবো, কেদিয়ার ট্রাভেল এজেন্ট পাসপোর্টের ব্যাপারে সাহায্য করেছিল।

আমি ভাবলাম, আহা, জানাশোনা ছেলের সঙ্গে বিদেশ ভ্রমণের একটা সুযোগ যখন এসেছে, তখন মেয়েটা সাধ-আহ্লাদ মিটিয়ে আসুক। ক'দিন আমার কাজ কর্মের ক্ষতি হয় হোক।"

"হাজার হোক মায়ের প্রাণ তো।" নিজের টাকে হাত বুলিয়ে নটবরবাবু ফোড়ন দিলেন।

নাটকীয় কায়দায় সজল চোখে মিসেস বিশ্বাস এবার বললেন, "মেয়েটাকে আমার চোখের সামনে থেকে নিয়ে গিয়ে যা অত্যাচার করেছে না—বেচারার কিছু অবশিষ্ট রাখেনি।"

"কেদিয়া একটা নামকরা শয়তান," নটবরবাবু খবর দিলেন।

"শয়তান বলে শয়তান! মেয়ের মুখে যদি সব কথা শোনেন আপনার চোখে জল এসে যাবে। আমাকে বুঝিয়ে গেলো, কেদিয়ার সঙ্গে-সঙ্গে থাকবে। আমি কোথায় ভাবলাম, দুজনে স্বামী-স্ত্রীর মতো ঘুরে বেড়াবে। তা না, হোটেলে তুলে—বন্ধু-বান্ধব ইয়ার জুটিয়ে সে এক সর্বনাশা অবস্থা! মোটা-মোটা টাকা নিজের পকেটে পুরে অসহায়-মেয়েটাকে আধঘণ্টা অন্তর ভাড়া খাটিয়েছে। মেয়েটা পালিয়ে আসবার পথ পায় না। ভাগ্যে রিটার্ন টিকিট কাটা ছিল।"

একটু থেমে মিসেস বিশ্বাস বললেন, "আপনি শুনে অবাক হবেন, নিজের রোজগার থেকে রুমুকে একটা পয়সাও ঠেকায়নি। উল্টে বলেছে তুমি তো ফুরনে এসেছো!"

"রুমু কোথায়?" নটবর মিটার জিজ্ঞেস করলেন।

"ডাক্তারের কাছে গেছে। চেহারা দেখলে আপনি চিনতে পারবেন না। আমার কী ক্ষতি বুঝুন। এই অবস্থায় কাজে লাগিয়ে মেয়েটাকে তো মেরে ফেলতে পারি না। ভাগ্যে একটা বদলি সিস্কি মেয়ে পেয়ে গেলাম। লীলা সামতানী—সকালবেলায় একটা ইস্কুলে পড়ায়। এখন পাশের ঘরে মাস্টমারের সঙ্গে রয়েছে।"

মিসেস বিশ্বাসের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে লীলা চেম্বার থেকে বেরিয়ে এলো। পিছনে আঠারো-উনিশ বছরের এক ছোকরা। নিশ্চয় ছাত্র, কারণ হাতে কলেজের বই রয়েছে! মিশনারি কলেজের নামলেখা একটা খাতাও দেখা যাচ্ছে। লীলা বললো, "মিস্টার পোদ্দার আর একটা ডেট চাইছেন।" ব্যাগ থেকে ডাইরি বার করে, চোখে চশমা লাগিয়ে মিসেস বিশ্বাস বললেন, "ইট ইজ এ প্লেজার। কবে আসবেন বলুন?" তারিখ ও সময় ঠিক করে মিসেস বিশ্বাস ডাইরিতে লিখে রাখলেন। বললেন, "ঠিক সময়ে আসবেন কিন্তু

ভাই – দেরি করলে আমাদের প্রোগ্রাম আপসেট হয়ে যায়।”

পোদ্দার চলে যেতেই মিসেস বিশ্বাস আবার ডাইরি দেখলেন। তারপর বললেন, “লীলা, তুমি একটু কফি খেয়ে বিশ্রাম নাও। আবদুলকে বলো, তোমার ঘরে বিছানার চাদর এবং তোয়ালে পাল্টে দিতে। মিনিট পঁচিশের মধ্যে মিস্টার নাগরাজন আসবেন। উনি আবার দেরি করতে পারবেন না। এখান থেকে সোজা এয়ারপোর্ট চলে যাবেন।”

লীলা ভিতরে চলে যেতেই মিসেস বিশ্বাস বললেন, “টাকা নিই বটে – কিন্তু সার্ভিসও দিই। প্রত্যেক কাস্টমারের জন্যে আমার এখানে ফ্রেশ বেডশিট এবং তোয়ালের ব্যবস্থা। অ্যাটাচড্ বাথরুমে নতুন সাবান। প্রত্যেক ঘরে ট্যালকাম পাউডার, লোশন, অডিকোলন, ডেটল। যত খুশী কফি খাও – একটি পয়সা দিতে হবে না।”

নটবর মিত্রকে ঘড়ির দিকে তাকাতে দেখে মিসেস বিশ্বাস বললেন, “ঝুমুটার এখনও হলো না? দাঁড়ান, ফুটো দিয়ে দেখে আসি। মেয়েটার ঐ দোষ। খদ্দেরকে ঝটপট খুশী করে তাড়াতাড়ি বাড়ি পাঠিয়ে দিতে পারে না। ভাবছে, সবাই জাপানী সায়েব। বেশি সময় আদর পেলে, খুশী হয়ে ওকে মুক্তোর মালা দিয়ে যাবে! এসব ব্যাপারে লীলা চালাক। নতুন লাইনে এলেও কায়দাটা শিখে নিয়েছে। পোদ্দার একঘণ্টা থাকবে বলে এসেছিল, কিন্তু কুড়ি মিনিটের মধ্যে সন্তুষ্ট হয়ে চলে গেলো। অথচ লীলার অনেক আগে ঝুমু খদ্দের নিয়ে দরজা বন্ধ করেছে।”

ফুটো দিয়ে মেয়ের লেটেস্ট অবস্থা দেখে হেলেদুলে ফিরে এলেন মিসেস বিশ্বাস। বললেন, “আর দেরি হবে না। টোকা দিয়ে এসেছি।” তারপর বললেন, “আপনাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে ঝুমুর চেহারাটি বেশ হয়েছে। যে ছ্যাখে সেই সন্তুষ্ট হয়। টোকিও থেকে আপনার জাপানী সায়েব তো আবার বন্ধু পাঠিয়েছিলেন। হোটেলে মালপত্র রেখে সায়েব নিজে খোঁজখবর করে এখানে এসেছিলেন। ভাল ছবি তোলেন। খুব ইচ্ছে ছিল জামা-কাপড় খুলিয়ে ঝুমুর একটা রঙীন ছবি তোলেন। পাঁচশ’ টাকা ফী দিতে চাইলেন। আমি রাজী হলাম না।”

নটবর এবার সুযোগ নিলেন। বললেন, “আমার এই ফ্রেণ্ডের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতাম ঝুমুর। ওকে ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে একটু গ্রেট ইণ্ডিয়ানে নিয়ে যেতে চাই।”

মুখ বেঁকালেন মিসেস বিশ্বাস। তারপর সোমনাথকে বললেন, “হোটেলে কেন বাছা? আমার এখানেই বসো না। মিস্টার জয়সোয়াল চলে গেলেই

ঝুমু ফ্রি হয়ে যাবে। আমার চেম্বারভাড়া হোটেলের অর্ধেক।"

হাঁ-হাঁ করে উঠলেন নটবরবাবু। "উনি নন, ওঁর এক পার্টি।"

মিসেস বিশ্বাস বললেন, "তাঁকেও নিয়ে আসুন এখানে। আমার লোকজন কম। মেয়েদের বাইরে পাঠালে বড্ড সময় নষ্ট হয়। তাছাড়া এখন কাজের চাপ খুব, মিস্টার মিত্তির! হোল নাইট বুকিং-এর জন্যে হাতে-পায়ে ধরছে।"

অনেক অনুরোধ করলেন নটবরবাবু। কিন্তু মিসেস বিশ্বাস রাজী হলেন না। বললেন, "ঝুমু তো রইলো। আপনার সায়েবকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এখানে নিয়ে আসুন। ঝুমুকে স্পেশাল আদর যত্ন করতে বলে দেবো। দেখবেন আপনার সায়েব কীরকম সন্তুষ্ট হন। ওদের দুজনকে কাজে বসিয়ে দিয়ে আমরা তিনজন চা খেতে-খেতে গল্প করবো।"

রাস্তায় বেরিয়ে সোমনাথ দেখলো নটবর মিটার দুটো হাতেই ঘুষি পাকাচ্ছেন। সোমনাথের কাছে ছোট হয়ে গিয়েছেন মনে করছেন। অথচ সোমনাথ সেরকম ভাবছেই না। সামনের পানের দোকান থেকে সোমনাথ দুটো অ্যাসপ্রো কিনে খেয়ে ফেললো। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সে মনকে তৈরি করে ফেলেছে। কিন্তু দেহটা কথা শুনছে না। একটু বমি করলে শরীরটা বোধহয় শান্ত হতো।

নটবরবাবু বললেন, "আপনার কপালটাই পোড়া। নটবর মিত্তির যা চাইছে, তা দিতে পারছে না আপনাকে। আর দেশটারই বা হলো কি! মেয়েমানুষের ডিমাণ্ড হুড়হুড় করে বেড়ে যাচ্ছে। ছ'মাস আগে এই মিসেস বিশ্বাস দুপুরবেলায় মেয়ে নিয়ে আমার অফিসে দেখা করেছেন—পার্টির জন্যে হাতে ধরেছেন। কতবার বলেছেন, শুধু তো খদ্দের আনছেন। একদিন নিজে রুমু কিংবা ঝুমুর সঙ্গে বসুন—কোনো খরচখরচা লাগবে না। কিন্তু মশাই, নটবর মিত্তির এসব থেকে একশ' গজ দূরে থাকে। নিজে যেন এসবের মধ্যে ঢুকে পড়বেন না—তাহলে কিন্তু সর্বনাশ হবে ওই বিশু বোসের মতন।"

কোনো কথা শুনলেন না নটবর। সোমনাথকে নিয়ে পার্ক স্ট্রীটের কোয়ালিটিতে বসে কফি খেলেন। ওখান থেকে বেরিয়েই অলিম্পিয়া বার-এর সামনে বুড়ো চরণদাসের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো।

"চরণ না?" নটবর জিজ্ঞেস করলেন।

"আজ্ঞে, হ্যাঁ হুজুর," বহুদিন পরে নটবরকে দেখে খুশী হয়েছেন চরণদাস।

"তোমার বোর্ডিং-এ না পুলিশ হামলা হয়েছিল?" নটবর অনেক কিছু খবর রাখেন।

"শুধু পুলিশ হামলা! আমাকে আসামীর কাঠগড়ায় তুলেছিল।" চরণ দুঃখ

করলো। "কোনোরকমে ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে এসেছি।"

চরণের বয়স হবে পঞ্চাশের বেশি। শুকনো দড়ি পাকানো চেহারা। কিন্তু দেখলেই বোঝা যায় নিরীহ প্রকৃতির মানুষ। সোমনাথকে নটবর বললেন, "চরণ এখানকার এক বোর্ডিং-এ বেয়ারা ছিল—মেয়ে সাপ্লাই করে টু-পাইস কামাতো।"

"এখন কী করছো চরণ?" নটবর মিত্তির জিজ্ঞেস করলেন।

"আগেকার দিন আর নেই হুজুর। এখন টুকটাক অর্ডার সাপ্লাই করছি। আমাদের ম্যানেজারবাবু করমচন্দানী জেল থেকে বেরিয়ে একটা ইস্কুল করেছেন। টেলিফোন অপ্রেটিং শেখবার নাম করে কিছু মেয়ে আসে—খুব জানাশোনা পার্টিরা খবর পেয়েছেন, কোনোরকমে চলে যায়।"

নটবর জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা চরণ, চাহিদার তুলনায় মেয়ের সাপ্লাই কি কমে গিয়েছে?"

"মোটেই না, হুজুর। গেরস্ত ঘর থেকে আজকাল অজস্র মেয়ে আসছে। কিন্তু তাদের আমরা জায়গা দিতে পারি না। এসব পাড়ায় জায়গার বড় অভাব।"

নটবর মিত্তির হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। বললেন, "চরণ, তুমি তো আমার বহুদিনের বন্ধু। এখনই একটি ভাল মেয়ে দিতে পারো?"

চরণ বললো, "কেন পারবো না হুজুর? এখনই চলুন, তিনটে মেয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি।"

"একেবারে টপ ক্লাস হওয়া চাই। রাস্তার জিনিস তুলে নেবার জন্যে তোমার সাহায্য চাইছি না," নটবর বললেন।

চরণদাস এবার ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝলো। বললো, "তাহলে হুজুর, একটু অপেক্ষা করতে হবে। মিনিট পনেরো পরেই একটি ভাল বাঙালী মেয়ে আসবে। তবে মেয়েটি খুব দূরে যেতে ভয় পায়। গেরস্ত ঘরের মেয়ে তো, লুকিয়ে আসে।"

"রাখো রাখো—সবাই গেরস্ত," ব্যঙ্গ করলেন নটবর।

চরণদাস উত্তর দিলো, "এই ভর সন্ধেবেলায় আপনাকে মিথ্যে বলবো না, হুজুর।"

"চরণদাস, ভেট হিসেবে দেবার মতো জিনিস তো?" নটবর মিত্তির খোলাখুলি জিজ্ঞেস করলেন।

"একদম নির্ভয়ে নিয়ে যেতে পারেন। রাঙতায় মুড়ে বড়দিনের ডালিতে সাজিয়ে দেবার মতো মেয়ে, স্তর।" চরণদাস বেশ জোরের সঙ্গে বললো।

চরণদাসের ঘাড়ে সোমনাথকে চাপিয়ে নটবর এবার পালালেন। বললেন,

"ঊষা জৈনকে এখন না তুললেই নয়। মাগীর যা দেমাক, হয়তো দেরি করলে অর্ডার ক্যানসেল করে দেবে—সঙ্গে আসবেই না। আপনি ভাববেন না সোমনাথবাবু, বার বার তিনবার। এবার সব ঠিক হয়ে যাবে।"

সোমনাথকে নিশ্চল পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে থাকতে দেখে নটবর বললেন, "ভয় কী? একটু পরেই তো গ্রেট ইণ্ডিয়ানে দেখা হচ্ছে। তেমন দরকার হলে আমি নিজে গোয়েঙ্কার সঙ্গে আপনার হয়ে কথা বলবো।"

"বাই-বাই," করে নটবর মিত্তির বেরিয়ে গেলেন। আর দাঁতে দাঁত চেপে সোমনাথ এবার চরণদাসের সঙ্গে রাসেল স্ট্রীট ধরে উত্তর দিকে হাঁটতে লাগলো। দুটো অ্যাসপ্রো ট্যাবলেটেও শরীরের যন্ত্রণা কমেনি—কিন্তু অনেক চেষ্টায় মনকে পুরোপুরি নিজের তাঁবেতে এনেছে সোমনাথ।

কী আশ্চর্য! দ্বৈপায়ন ব্যানার্জির ভদ্র সভ্য সুশিক্ষিত ছোটছেলে এই অন্ধকারে মেয়েমানুষের জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—অথচ তার কনসেন্স তাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে না। সোমনাথ এখন বেপরোয়া। জলে যখন নেমেছেই, তখন এর চূড়ান্ত না দেখে আজ সে ফিরবে না। জন-অরণ্যে সে অনেকবার হেরেছে—কিন্তু শেষ রাউণ্ডে সে জিতবেই।

অন্ধকারের অবগুণ্ঠন নেমে এসেছে নগর কলকাতার ওপর। রাত্রি গভীর নয়—কিন্তু সোমনাথের মনে হচ্ছে গহন অরণ্যের ধার দিয়ে যেতে-যেতে হঠাৎ সূর্য অস্ত গিয়ে সর্বত্র এক বিপজ্জনক অন্ধকার নেমে এসেছে। চরণদাস বললো, "নটবরবাবু এ-লাইনের নাম করা লোক। ওঁকে ঠকিয়ে অর্ডার সাপ্লাই বিজনেসে আমি টিকতে পারবো না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনাকে খারাপ জিনিস দেবো না কিছুতেই।"

এই বৃদ্ধকে কে বোঝাবে, মানুষ কখনও খারাপ হয় না, সোমনাথ নিজের মনে বললো। চরণদাস তার সহযাত্রীর মনের খবর রাখলো না। বললো, "গভরমেণ্টের কী অন্যায় দেখুন তো? চাকরি দিতে পারবি না অথচ বোর্ডিং-এ আট-দশটি মেয়ে এবং আমরা তিন-চারজন করে খাচ্ছিলাম তা সহ্য হলো না।"

চরণদাস বলে চললো, "বন্ধ করতে তো পারলে না, বাবা। শুধু কচি-কচি মেয়েগুলোকে কষ্ট দেওয়া। জানেন, কতদূর থেকে সব আসে—গড়িয়া, নাকতলা, টালিগঞ্জ, বৈষ্ণবঘাটা। আর একদল আসে বারাসাত, দত্তপুকুর, হাবড়া এবং গোবরডাঙ্গা থেকে। বোর্ডিং-এ অনেক বসার জায়গা ছিল। মেয়েগুলোর কষ্ট হতো না। এখন এই টেলিফোন ইস্কুলে কয়েকখানা ভাঙা চেয়ার ছাড়া কিছুই নেই। কখন পার্টি এসে তুলে নিয়ে যাবে এই আশায় মেয়েগুলোকে তীর্থকাকের মতো বসে থাকতে হয়।"

চরণদাসের বকা স্বভাব। নীরব শ্রোতা পেয়ে সে বলে যাচ্ছে, "যেসব মেয়ের চক্ষুলজ্জা নেই, তারা নাচের ইস্কুলে চলে যাচ্ছে। বলরুম নাচ শেখানো হয় বলে ওরা বিজ্ঞাপন দেয়—অনেক উটকো লোক আসে, কিছু চাপা থাকে না। আমাদের টেলিফোন ইস্কুলে সুবিধে—এখনও তেমন কেউ জানে না, ভদ্রঘরের মেয়েদের পক্ষে বাড়িতে বলতেও ভাল। সাতদিন 'অপ্রেটর ট্রেনিং'-এর পরই ডেলি রোজ-এর ক্যাজুয়েল চাকরি। বাপ-মা খুব চেপে ধরলে আমাদের মেয়েরা বলে, বদলী অপ্রেটরদের বিকেল তিনটে-দশটার চাকরিটাই সহজে পাওয়া যায়। কারণ এ-সময়ে অফিসের মাস-মাইনের মেয়েরা কাজ করতে চায় না। বাপেরা অনেক সময় আমাদের এখানে ফোন করে। আমরা বলি, লিভ ভেকান্সিতে কাজ করতে-করতেই আপনার মেয়ে হঠাৎ 'পার্মেণ্ট' চাকার পেয়ে যাবে।"

চরণদাস এবার একটা পুরানো বাড়িতে ঢুকে পড়লো। দুটো মেয়ে টেলিফোন ইস্কুলে এখনও বসে আছে। একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান—বোধহয় দেহে কিছু নিগ্রো রক্ত আছে। উগ্র এবং অসভ্য বেশবাস করেছে মেয়েটি। আরেক জন সিন্ধি—হাল ফ্যাশানের লুঙ্গী পরেছে। সোমনাথকে দেখে দুজন মেয়েই চাপা উত্তেজনায় দুবার মুখ বাড়িয়ে দেখে গেলো। চরণদাস বললো, "আপনি মিত্তির সায়েবের লোক—এসব জিনিস আপনাকে দেওয়া চলবে না। এরা ভারি অসভ্য—একেবারে বাজারের বেশ্যা। একটু বসুন—আপনার জিনিস এখনই এসে পড়বে।"

ফিক করে হাসলো চরণদাস। "আপনি ভাবছেন, তিনটে থেকে ডিউটি অথচ এখনও আসেনি কেন?"

চরণদাস নিজেই উত্তর দিলো, "একেবারে নতুন—দিন কয়েক হলো লাইনে জয়েন করেছে। গেরস্ত চাকরির জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে-ঘুরে, কিছু না পেয়ে এ-লাইনে এসেছে। বিকেলের দিকে তো আমাদের খদ্দেরের কাজের চাপ থাকে না। আমাকে বলে গেছে একবার হাসপাতালে যাবে কীসের খোঁজ করতে।"

চরণদাস বললো, "খুব ভাল মেয়েমানুষ পাবেন স্যর। যিনি ভেট নেবেন, দেখবেন তিনি কীরকম খুশী হন। অনেকদিন তো এ-লাইনে হয়ে গেলো। ছোটবেলা থেকে দেখছি, এ-লাইনে নতুন জিনিসের খুব কদর। আমাদের বোর্ডিং-এ গেরস্ত ঘর থেকে আনকোরা মেয়ে এলেই খদ্দেরের মধ্যে হৈ-হৈ পড়ে যেতো। এক-একবার দেখেছি, লাইন পড়ে যেতো। এক খদ্দের ঢুকেছে—আরও দুজন খদ্দের সোফায় বসে সিগ্রেট টানছে। নতুন রিফিউজি মেয়েগুলো পাঁচমিনিট বিশ্রাম নেবার সময় পেতো না।" একটা বিড়ি ধরালো চরণদাস।

বললো, "আপনাকে যে-মেয়ে দেবো একেবারে ফ্রেশ জিনিস। ভয় পর্যন্ত ভাঙেনি। সাড়ে ন'টার পর এক মিনিটও বসবে না। আমাকে আবার বালিগঞ্জের মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসতে হয়। আমার বাড়ি অবশ্য একই রাস্তায় পড়ে—দুটো একটা টাকাও পাওয়া যায়।"

মেয়েটি আসতেই চরণদাস সব ব্যবস্থা করে দিলো। বললো, "পাঁচটা মিনিট সময় দিন, স্যর। একটু ড্রেস করে নিক। আমাদের এখানে সব ব্যবস্থা আছে।"

পাঁচমিনিটের মধ্যেই মেয়েটি তৈরি হয়ে নিলো। চরণদাস এবার সোমনাথকে জিজ্ঞেস করলো, "শাড়ির রংটা পছন্দ হয়েছে তো—না-হলে বলুন। আমাদের এখানে স্পেশাল শাড়ি আছে—খদ্দেরের পছন্দ অনুযায়ী অনেক সময় মেয়েরা জামা-কাপড় পাল্টে নেয়!"

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সোমনাথ দেখলো আর একটুও সময় নেই। মেয়েটিকে গাড়িতে তুলে দিয়ে চরণদাস এবার সোমনাথকে লম্বা সেলাম দিলো। সোমনাথ পকেট থেকে দশটা টাকা বার করে চরণদাসের হাতে দিলো। বেজায় খুশী চরণদাস। বললো, "আপনারা যাচ্ছেন কোথায়?"

"গ্রেট ইণ্ডিয়ান হোটেলে," সোমনাথ উত্তর দিলো। নিজের শান্ত কণ্ঠস্বরে সোমনাথ নিজেই অবাক হয়ে গেলো। এই অবস্থাতেও তার গলা কেঁপে উঠলো না। মেয়েটাকে গাড়ির মধ্যে তুলে নিতে একটুও লজ্জা হলো না। 'কেন লজ্জা হবে?' রক্তচক্ষু এক সোমনাথ আর-এক শান্ত সুসভ্য সোমনাথকে জিজ্ঞেস করলো। 'তিন বছর যখন তিলে-তিলে যন্ত্রণা সহ্য করেছি, তখন তো কেউ একবারও খবর করেনি, আমার কী হবে? আমি কেমন আছি?'

মেয়েটি একেবারে নতুন। এখনও গ্রেট ইণ্ডিয়ান হোটেল চেনে না। জিজ্ঞেস করলো, "অনেক দূরে নাকি?"

মেয়েটিকে বেশ ভীতু মনে হচ্ছে সোমনাথের। এদেশের লাখ-লাখ বোকা ছেলে-মেয়ের মতোই সদাশঙ্কিত হয়ে আছে। নিজের নাম বললো, "শিউলি দাস। আপনার কাছে একটা অনুরোধ আছে," শিউলির গলায় কাতর অনুনয়। "দয়া করে বেশি দেরি করবেন না। দশটার মধ্যে বাড়ি না-ফিরলে আমার মা অজ্ঞান হয়ে যাবেন।"

জনবিরল মেয়ো রোড ধরে গাড়িতে যেতে-যেতে শিউলি জিজ্ঞেস করলো, "আপনার নাম?" শিউলি যখন নিজের নাম জানিয়েছে, তখন সোমনাথের নাম জানবার অধিকার তার নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সোমনাথ কেমন ইতস্তত বোধ করছে—জীবনে এই প্রথম নিজের পরিচয়টা লজ্জার উদ্রেক করছে। প্রশ্নটার পুরো উত্তর দিলো না সে। গম্ভীরভাবে বললো, "ব্যানার্জি।" মেয়েটা সত্যিই

আনকোরা, কারণ ব্যানার্জির আগে কী আছে জানতে চাইলো না। চাইলেও অবশ্য সোমনাথ প্রস্তুত হয়েছিল—একটা মিথ্যে উত্তর দিতো।

চিন্তাজালে জড়িয়ে পড়েছে সোমনাথ। যে-নগরীকে একদা গহন অরণ্য মনে হয়েছিল সেই অরণ্যের নিরীহ সদাসন্ত্রস্ত মেষশাবক সোমনাথ সহসা শক্তিমান সিংহশিশুতে রূপান্তরিত হয়েছে। নিরীহ এক হরিণীকে কেমন অবলীলাক্রমে সে চরম সর্বনাশের জন্য নিয়ে চলেছে।

গ্রেট ইণ্ডিয়ান হোটেলের অভিজ্ঞ দারোয়ানজীও শিউলিকে দেখে কিছু সন্দেহ করলেন না। দারোয়ানজীর দোষ কী? এই প্রথম দেখছেন শিউলিকে।

গোয়েঙ্কাজীর ঘরে টোকা পড়তেই তিনি নিজে দরজা খুলে দিলেন। সোমনাথের জন্যে তিনি অপেক্ষা করছেন।

আজ একটু স্পেশাল সাজগোজ করেছেন গোয়েঙ্কাজী। সাদা গরদের দামী পাঞ্জাবি পরেছেন তিনি। ধুতিটি জামাইবাবুদের মতো চুনোট করা। গায়ে বিলিতী সেন্টের গন্ধ ভুরভুর করছে। পানের পিচে ঠোঁট দুটো লাল হয়ে আছে। মুখের তেল চকচক ভাবটা নেই—এখানে এসে বোধহয় আর এক দফা স্নান সেরে নিয়েছেন।

আড়চোখে শিউলিকে দেখলেন গোয়েঙ্কা। সাদরে বসতে দিলেন দুজনকে।

নটবরবাবু বারবার বলে দিয়েছিলেন, "গোয়েঙ্কাকে বোলো, ওঁর স্পেসিফিকেশন জানা না থাকায়, আমাদের বিদ্যেবুদ্ধি মতো মেয়েমানুষ চয়েস করেছি। একটু কেয়ারফুলি গোয়েঙ্কাকে স্টাডি কোরো। যদি বোঝো জিনিস তেমন পছন্দ হয়নি, তাহলে সঙ্গে-সঙ্গে বোলো, এর পরের বারে আপনি যেমনটি চাইবেন ঠিক তেমনটি এনে রাখবো।"

এসব প্রশ্ন উঠলো না। কারণ গোয়েঙ্কাজীর হাবভাবেই বোঝা যাচ্ছে সঙ্গিনীকে তাঁর বেশ পছন্দ হয়েছে।

সোমনাথের সমস্ত শরীর অকস্মাৎ মিশরের মমির মতো শক্ত হয়ে আসছে। তার চোয়াল খুলতে চাইছে না। নটবরবাবু বার-বার বলেছিলেন, "জিজ্ঞেস করবে, কলকাতায় আসবার পথে গোয়েঙ্কাজীর কোনো কষ্ট হয়েছিল কিনা?"

গোয়েঙ্কাজী বললেন, "আমি এসেই আপনার চিঠি পেলাম। কষ্ট করে আবার ঘরে ফুল পাঠাতে গেলেন কেন?"

'তোমাকে জুতো মারা উচিত ছিল,' এই বলতে পারলেই ভিতরের

সোমনাথ শান্তি পেতো। কিন্তু সোমনাথের মর্মটা কিছুই বললো না।

গোয়েঙ্কাজী স্যুইট নিয়েছেন। সামনে ছোট একটু বসবার জায়গা। ভিতরে বেডরুমটা উঁকি মারছে।

মানুষের চোখও যে জিভের মতো হয় তা সোমনাথ এই প্রথম দেখলো। শিউলির দিকে তাকাচ্ছেন গোয়েঙ্কা আর চোখের জিভ দিয়ে ওর দেহটা চেটে খাচ্ছেন।

শিউলি মাথা নিচু করে সোফায় বসেছিল। লম্বা বেণীর ডগাটা শিউলি যে বার-বার নিজের আঙুলে জড়াচ্ছে গোয়েঙ্কা তাও লক্ষ্য করলেন। সঙ্গিনীকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে গোয়েঙ্কা জিজ্ঞেস করলেন, সে কিছু খাবে কিনা। শিউলি না বললো। ভদ্রতার খাতিরে গোয়েঙ্কাজী এবার সোমনাথকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কী খাবেন বলুন?" সোমনাথ না বলায় ভদ্রলোক যেন আশ্বস্ত হলেন।

শিউলির দেহটা একবার চেটে খেয়ে গোয়েঙ্কা বললেন, "বসুন না, মিস্টার ব্যানার্জি। শিউলির সঙ্গে দুজনে গল্প করি।" নটবরবাবুর উপদেশ সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেলো। "খবরদার ওই কাজটি করবেন না। যার জন্যে ভেট নিয়ে গেছেন, মেয়েমানুষটি সেই সময়ের জন্যে তার একার, এই কথাটি কখনও ভুলবেন না। মেয়েমানুষের সঙ্গে যা কিছু রস-রসিকতা পার্টি করুক। শাস্ত্রে বলেছে, পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।"

ঘড়ির দিকে তাকালো সোমনাথ। অধৈর্য গোয়েঙ্কাজী এবার সঙ্গিনীকে বেড রুমে যেতে অনুরোধ করলেন।

নিজের কালো হাতব্যাগটা তুলে নিয়ে শিউলি পাশের ঘরে যেতেই সোমনাথ উঠে দাঁড়ালো। গোয়েঙ্কাজী খুশী মেজাজে সোমনাথের কাঁধে হাত দিলেন।

গোয়েঙ্কাজী অসংখ্য ধন্যবাদ জানালেন সোমনাথকে। বললেন, "অনেক কথা আছে। এখনই বাড়ি চলে যাবেন না যেন।"

সোমনাথ জানিয়ে দিলো সে একটু ঘুরে আসছে। গোয়েঙ্কা নির্লজ্জভাবে বললেন, "আপনি ঘণ্টা দেড়েক পরে ফিরে এসে নিচে লাউঞ্জে অপেক্ষা করবেন। আমি আপনাকে ফোনে ডেকে নেবো।"

এই দেড় ঘণ্টা পাগলের মতো এসপ্ল্যানেডের পথে-পথে ঘুরছে সোমনাথ ভিতরের পুরানো সোমনাথ তাকে জ্বালাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু সোমনাথ এক ঝটকায় তাকে দূর করে দিয়েছে।

অন্ধকারে অনেকক্ষণ ঘুরে-ঘুরে এখন আশ্চর্য এক অনুভূতি আসছে। নিজেকে আর সিংহশিশু মনে হচ্ছে না। হঠাৎ ক্লান্ত এক গরিলার মতো মনে হচ্ছে সোমনাথের। বৃদ্ধ গরিলার ধীর পদক্ষেপে সোমনাথ এবার দি গ্রেট ইণ্ডিয়ান হোটেলে ফিরে এলো। এবং নিরীহ এক গরিলার মতোই লাউঞ্জের নরম সীটে বসে পড়লো।

দেড় ঘণ্টা থেকে মাত্র দশ মিনিট সময় বেশি নিলেন গোয়েঙ্কা। এক ঘণ্টা চল্লিশ মিনিটের মাথায় ফোনে সোমনাথকে ডাকলেন। গোয়েঙ্কাজীর গলায় গভীর প্রশান্তি ঝরে পড়ছে। "হ্যালো মিস্টার ব্যানার্জি, উই হ্যাভ ফিনিশড্।"

ফিনিশড্! তার মানে তো সোমনাথ এখন ওপরে গোয়েঙ্কাজীর ঘরে চলে যেতে পারে। নষ্ট করবার মতো সময় এখন নয়। অথচ ঠিক এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে ভিতরের পুরানো সোমনাথ আবার নড়ে-চড়ে ওঠবার চেষ্টা করলো। গরিলা সোমনাথকে সে জিজ্ঞেস করছে, 'ফিনিশ কথাটার মানে কী?' ওই সোমনাথ ফিসফিস করে বলছে, 'ফিনিশড্ মানে তো শেষ হয়ে যাওয়া। গোয়েঙ্কাজী শেষ হয়ে যেতে পারেন, কিন্তু উই হ্যাভ ফিনিশড্ বলবার তিনি কে? ওঁর সঙ্গে তাহলে আর কে কে শেষ হলো?' 'আঃ!' ওই সোমনাথের ওপর ভীষণ বিরক্ত হলো সোমনাথ। 'তোমাকে হাতে-পায়ে দড়ি বেঁধে পাগল সুকুমারের মতো রেখে দিয়েছি—তাতেও শান্তি দিচ্ছো না।'

ওই সোমনাথটার স্পর্ধা কম নয়—আবার কিছু বলতে যাচ্ছিলো। কিন্তু ওসব বাজে বকুনি শোনবার সময় কোথায় সোমনাথের? মিস্টার গোয়েঙ্কার সঙ্গে বিজনেস সংক্রান্ত জরুরী কথাগুলো এখনই সেরে ফেলতে হবে। 'পড়োনি? স্ট্রাইক দ্য আয়রন হোয়েন ইট ইজ হট। গোয়েঙ্কা এখন ফারনেশ থেকে বেরুনো লাল লোহার মতো নরম হয়ে আছে, দেরি করা চলবে না।'

একটু দ্রুতবেগেই সোমনাথ যাচ্ছিলো। কিন্তু লিফটের সামনে নটবর মিত্র তাকে পাকড়াও করলেন। বেশ খুশীর সঙ্গে বললেন, "কোথায় গিয়েছিলেন মশাই? আমি তো আপনাকে খুঁজে-খুঁজে হয়রান! গোয়েঙ্কার ঘরও বন্ধ—'ডোণ্ট ডিস্টার্ব' বোর্ড ঝোলানো—আমি জ্বালাতন করতে সাহস পেলাম না।"

সোমনাথ হাঁপাতে-হাঁপাতে বললো, "গড়ের মাঠে ঘুরছিলাম।"

"বেশ মশাই! আপনি গড়ের মাঠে হাওয়া খাচ্ছেন। আমিতো উষা জৈনকে মিস্টার স্থনীল ধরের ঘরে চালান করে দিয়ে দেড় ঘণ্টা বার-এ বসে আছি। না-বসে পারলাম না মশাই। মিস্টার ধর বিরাট গভরমেণ্ট ইনজিনিয়ার। একেবারে কাঠ-বাঙাল। বিকেল থেকে মালে চুর হয়ে আছেন। ভদ্রলোক আমার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করলেন। নেশার ঘোরে বললেন, 'মেয়েমানুষের গায়ে কখনও হাত দিইনি। আজ প্রথম ক্যারেকটার নষ্ট করবো। থ্যাংক ইউ ফর ইওর সিলেকশন!' আমি ভাবলাম উষা জৈনকে পেয়ে খুব খুশী হয়েছেন। কিন্তু মিস্টার ধর যা শোনালেন, তাতে একটা শর্ট স্টোরি হয়ে গেলো। মিস্টার ধর বললেন, 'গুড়ের নাগরীগুলো আমাদের এই সোনার দেশকে শুষে-শুষে সর্বনাশ করে দিয়েছে, টাকার দেমাক দেখিয়ে বেটারা ভূতের নৃত্য করছে। আমাদের অসহায় ইনোসেণ্ট মেয়েগুলোকে পর্যন্ত আস্ত রাখছে না। তাই আজ আমি প্রতিশোধ নেবো।'

"শুনে তো মশাই আমার হাসি যায় না! হাসি চাপা দেবার জন্যে বাধ্য হয়ে আমাকে একটা ড্রিঙ্ক নিয়ে বার-এ বসতে হলো।"

নটবর মিত্তির বললেন, "যান আপনি গোয়েঙ্কার কাছে। বিজনেসের কথাবার্তা এই তালে সেরে ফেলুন। আমি পাঁচ মিনিট পরেই আপনাদের ঘরে গিয়ে মেয়েটাকে দেখে আসছি—গোয়েঙ্কাকে যদি সন্তুষ্ট করে থাকে তাহলে ফিউচারে আমার কাছ থেকে কাজকর্ম পাবে।"

টোকা পড়তেই গোয়েঙ্কাজী দরজা খুলে দিলেন। কেমন মনোহর প্রশান্ত সৌম্য মুখে তিনি সোমনাথকে ভিতরে আসতে বললেন। শিউলিকে দেখা যাচ্ছে না। সে কোথায় গেলো? এখনও ভিতরের ঘরে শুয়ে আছে নাকি?

সোমনাথের আন্দাজ ঠিক হয়নি। শিউলি বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো। সমুদ্রের আলোড়নের মতো ফ্লাশের আওয়াজ ভেসে আসছে। শিউলি কারো দিকে তাকাচ্ছে না। সে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। বেচারাকে ক্লান্ত বিধ্বস্ত মনে হচ্ছে।

কী আশ্চর্য! এই ঘরে শিউলি ছাড়া অন্য কারও চোখে-মুখে লজ্জার আভাস নেই। গোয়েঙ্কাজী শান্তভাবে একটা সিগারেট টানছেন। সোমনাথ মাথা উঁচু করে বসে আছে। যত লজ্জা শুধু শিউলি দাসেরই। তার প্রাপ্য টাকা অনেক আগেই চুকিয়ে দিয়েছে সোমনাথ। নিজের ভ্যানিটি ব্যাগ নিয়ে মাথা নিচু করে আর একটিও কথা না বলে সন্ত্রস্ত হরিণীর মতো শিউলি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

গোয়েঙ্কা এবার একটু কপট ব্যস্ততা দেখালেন। শিউলির যা প্রাপ্য তা

অনেক আগেই চুকিয়ে দেওয়া হয়েছে এই বলে সোমনাথ তাঁকে আশ্বস্ত করলো।

সন্তুষ্ট গোয়েঙ্কা বললেন, "শিউলি ইজ ভেরি গুড। কিন্তু, লাইক অল বেঙ্গলী, নিজের ব্যবসায় থাকতে চায় না। বিছানাতে শুয়েও বলছে, একটা ছেলের চাকরি করে দিন।"

আজ কল্পতরু হয়েছেন মিস্টার গোয়েঙ্কা। সোমনাথের সঙ্গে করমর্দন করলেন। বললেন, "আপনার অর্ডারের চিঠি আমি টাইপ করে এনেছি। আপনি রেগুলার প্রতি মাসে কেমিক্যাল সাপ্লাই করে যান। দু নম্বর মিলের কাজটাও আপনাকে দেবার চেষ্টা করবো। আর দেরি নয়। আমার শ্বশুরবাড়িতে এখন আবার ডিনারের নেমন্তন্ন রয়েছে," এই বলে মিস্টার গোয়েঙ্কা নিজের জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করলেন।

প্রচণ্ড এক উল্লাস অনুভব করছে সোমনাথ। গোয়েঙ্কার লেখা চিঠিখানা সে আবার স্পর্শ করলো। সোমনাথ ব্যানার্জি তাহলে অবশেষে জিতেছে। সোমনাথ এখন প্রতিষ্ঠিত।

গোয়েঙ্কার ঘর থেকে বেরিয়ে সোমনাথ থমকে দাঁড়ালো। আবার চিঠিখানা স্পর্শ করলো।

করিডরেই নটবরবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। হুঙ্কার দিয়ে নটবর বললেন, "আজকেই চিঠি পেয়ে গেলেন? গোয়েঙ্কা তাহলে আপনাকে বিজনেসে দাঁড় করিয়ে দিলো। কংগ্রাচ্যুলেশন, আমি ঠিক আন্দাজ করেছিলাম, ব্যাটা চিঠি তৈরি করে নিয়ে আসবে।"

সোমনাথের ধন্যবাদের জন্যে অপেক্ষা করলেন না নটবরবাবু। বললেন, "পরে কথা হবে। মিসেস বিশ্বাসের দেমাক আমি ভাঙতে চাই। মেয়েটাকে একটু দেখে আসি—ঘরে আছে তো?"

এইমাত্র যে শিউলি দাস বেরিয়ে গেলো তা জানালো সোমনাথ।

"এইমাত্র যে-মেয়েটার সঙ্গে করিডরে আমার দেখা হলো? লাল রংয়ের তাঁতের শাড়ি-পরা? চোখে চশমা? হাতে কালো ব্যাগ?"

সোমনাথ বললো, "হ্যাঁ। ওই তো শিউলি দাস।"

"শিউলি দাস কোথায়?" একটু অবাক হলেন নটবর মিত্র। "ওকে তো আমি চিনি। আমাদের যাদবপুরের পাড়ায় থাকে। তাহলে নাম ভাঁড়িয়ে এ-লাইনে এসেছে। এ-লাইনে কোনো মেয়েই অবশ্য ঠিক নাম বলে না। ওর নাম তো কণা।" নটবরবাবু বললেন, "দাস হলো কবে থেকে? ওরা তো মিত্তির। ওর বাবাকে চিনি—সবে রিটায়ার করেছে। আর ভাইটা মশাই ইদানীং ডাহা পাগল হয়ে গেছে—সুকুমার না কী নাম।"

অপ্রত্যাশিত আবিষ্কারের আনন্দে নটবর মিত্তির এখন বিমোহিত। বললেন, "কী আশ্চর্য দেখুন—সারা শহর খুঁজে-খুঁজে শেষ পর্যন্ত যাকে নিয়ে আসা হলো সে পাশের বাড়ির লোক। খুব অভাব চলছিল ওদের, তা ভালই করেছে।"

হঠাৎ ভীষণ ভয় লাগছে সোমনাথের। কাল যখন তপতী তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে তখন সোমনাথের মুখটা যদি গরিলার মতো দেখায়? তপতী তখনও কি ভালবাসতে পারবে? তপতী যেন বলেছিল সোমনাথের নিষ্পাপ মুখের সরল হাসি দেখেই সে হৃদয় দিয়েছিল।

"কণা, কণা, কণা" পাগলের মতো কণাকে ডাকতে-ডাকতে সোমনাথ গ্রেট ইণ্ডিয়ান হোটেলের গাড়ি বারান্দা পর্যন্ত ছুটে এসেছিল। কিন্তু কোথায় সুকুমারের বোন? সে চলে গিয়েছে।

যোধপুর পার্কে নিজেদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে মাতালের মতো টলছে সোমনাথ ব্যানার্জি। হাতে তার দুখানা উপহারের শাড়ি এবং পকেটে সেই চিঠিটা—যা তাকে সমস্ত অর্থনৈতিক অপমান থেকে মুক্তি দিয়েছে। সোমনাথ এখন আর চাকরির ভিখিরি নয়—সে এখন সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। প্রতি মাসে একটা অর্ডার থেকেই হাজার টাকা রোজগার করবে সে। কারুর কাছে আর ভিখিরি থাকতে হবে না সোমনাথকে। তপতীকে জানিয়ে দেবে সে আর কাউকে ভয় করে না।

কমলা বউদিকেই প্রথম খবরটা দিলো সোমনাথ। তারপর শাড়িটা এগিয়ে দিলো। কমলা বউদি বুঝলেন, সোমনাথ আজ বড় একটা কিছু করেছে। "তুমি আজ নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছ তাহলে?" কমলা বউদি গভীর আনন্দের সঙ্গে বললেন।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে বউদি এবার দেওরের দেওয়া প্রথম উপহারের প্যাকেট খুলে ফেললেন। বললেন, "বাঃ!" সোমনাথকে খুশী করার জন্যে বউদি এখনই সেই শাড়ি পরতে গেলেন। বললেন, "এই শাড়ি পরেই জন্মদিনের পায়েস পরিবেশন করবো।"

বউদি পাশের ঘরে যেতে-না-যেতেই সোমনাথ কাতরভাবে ডাকলো, "বউদি!"

"কী হলো তোমার? অমনভাবে চিৎকার করছো কেন?" বউদি ফিরে এসে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

করুণভাবে সোমনাথ বললো, "বউদি ওই কাপড়টা আপনি পরবেন না।"

"কেন? কি হলো?" কমলা কিছুই বুঝতে পারছেন না।

"ওতে অনেক নোংরা বউদি।" আমতা-আমতা করতে লাগলো সোমনাথ। "সকালে যখন কিনেছিলাম তখনও বেশ পরিষ্কার ছিল। এই সন্ধেবেলায় হঠাৎ নোংরা হয়ে গেলো। ওতে অনেকরকম ময়লা আছে বউদি—আপনি পরবেন না!"

দেবরের এমন কথা বলার ভঙ্গী কমলা বউদি কোনোদিন দেখেননি। বললেন, "হাত থেকে নোংরার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল বুঝি।"

সোমনাথ আবার বললো, "আপনাকে তো বারণ করলাম, ঐ কাপড় পরতে।" কমলা অগত্যা কাপড়টা কাচবার জন্যে সরিয়ে রাখলেন।

আরও রাত হয়েছে। অভিজিৎ আসানসোল ফ্যাক্টরিতে গিয়েছে—আজ ফিরবে না। সোমনাথ খেতে আসছে না দেখে বুলবুল ওকে ডাকবার জন্যে ঘরে ঢুকে পড়েছিল। ভেবেছিল, সেই সময় অভিনন্দন জানিয়ে নিজের কাপড়টাও চেয়ে নেবে।

কিন্তু মুখ শুকনো করে সে সোমনাথের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। দিদির কাছে দ্রুত এসে উদ্বেগের সঙ্গে ফিস-ফিস করে সে বললো, "দিদি কী ব্যাপার! বালিশে মুখ গুঁজে, লুকিয়ে-লুকিয়ে সোম ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে।"

কমলার চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো। বললেন, "নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে ওর বোধহয় মায়ের কথা মনে পড়ে গেছে।" বউদি কি যেন ভাবলেন, তারপর বললেন, "ওকে লজ্জা দিও না—ওকে কাঁদতে দাও।"

জন-অরণ্যের নেপথ্য কাহিনী

কোনো গল্প-উপন্যাস পাঠক-পাঠিকাদের ভাল লাগলে লেখকের যেমন আনন্দ, তেমনি নানা অসুবিধে। পথে-ঘাটে, ট্রামে-বাসে, আপিসে-রেস্তর্রাঁয় পরিচিতজনরা এগিয়ে এসে বলেন, তোমার অমুক বইটা পড়লাম—দারুণ হয়েছে। ডাকপিওন অপরিচিতজনদের চিঠির ডালি উপহার দিয়ে যায়; সম্পাদক ও প্রকাশকের দপ্তর থেকে রি-ডাইরেকটেড হয়েও অনেক অভিনন্দন-পত্র আসে। এসব অবশ্যই ভাল লাগে। কিন্তু অসুবিধা শুরু হয় যখন উপন্যাসের মূল কাহিনী সম্পর্কে পাঠকের মনে কৌতূহল জমতে থাকে।

তখন প্রশ্ন ওঠে, অমুক কাহিনীটা কি সত্য? কেউ-কেউ ধরে নেন, নির্জলা সত্যকেই গল্পের নামাবলী পরিয়ে লেখকেরা আধুনিক সাহিত্যের আসরে উপস্থাপন করে থাকেন। আর-একদল বিরক্তভাবে বলে ওঠেন, 'সব ঝুটা হ্যায়—জীবনে এসব কখনই ঘটে না, সস্তা হাততালি এবং জনপ্রিয়তার লোভে বানানো গল্পকে সত্য-সত্য ঢঙে পরিবেশন করে লেখকরা দেশের সর্বনাশ করেছেন।'

জন-অরণ্য উপন্যাস নিয়ে আমাকে এই ধরনের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই উপন্যাসের চলচ্চিত্ররূপ পাঠক ও দর্শকের কৌতূহলে ইন্ধন জুগিয়েছে। দেশের বিভিন্ন মহলে কাহিনীর পক্ষে এবং বিপক্ষে বিতর্কের ঝড় উঠেছে।

প্রত্যেক গল্পের পিছনেই একটা গল্প-লেখার গল্প থাকে এবং জন-অরণ্য লেখার সেই নেপথ্য কাহিনীটা স্বীকারোক্তি হিসেবে আদায় করবার জন্যে অনেকেই আমার উপর চাপ দিয়েছেন। কৌতূহলী পাঠকদের এতোদিন আমি নানা তর্কজালে আবদ্ধ রাখার চেষ্টা করেছি। বলেছি, "থিয়েটারের সাজঘর দেখলে নাটক দেখবার আকর্ষণ নষ্ট হতে পারে।" কিন্তু সে যুক্তি শেষ পর্যন্ত ধোপে টেকেনি।—বিদেশের লেখকরা নাকি গল্প-লেখার সাজঘরের গল্পটাও অনেক সময় উপন্যাসের সঙ্গে-সঙ্গে প্রকাশ করেছেন। বিখ্যাত এক সায়েব-লেখকের নাম করে জনৈকা পাঠিকা জানালেন, "আপনি তো আর মিস্টার অমুকের থেকে কৃতী লেখক নন? তিনি যখন তাঁর অমুক উপন্যাস রচনার ইতিহাসটা বই-আকারে লিখে ফেলেছেন তখন আপনার আপত্তি কোথায়?"

মহিলার কথায় মনে পড়লো, উপন্যাস রচনার জন্য সংগৃহীত কাগজপত্র, নোটবই, প্রথম খসড়া ইত্যাদি সম্পর্কে এখন বিদেশে বেশ ঔৎসুক্য সৃষ্টি হয়েছে। ওয়াশিংটনে পৃথিবীর বৃহত্তম গ্রন্থাগার লাইব্রেরি অফ কংগ্রেসের পাণ্ডুলিপি বিভাগে এই ধরনের ওয়ার্কিং পেপার সযত্নে সংগ্রহ করা হচ্ছে। ১৯৬৭ সালের অক্টোবর মাসে ওই গ্রন্থাগারে আমাকে জেমস মিচনারের 'হাওয়াই' উপন্যাস সংক্রান্ত ওয়ার্কিং পেপারস্-এর একটা বাক্স সগর্বে দেখানো হয়েছিল।

আমার পাঠিকাকে বলেছিলাম, "আমরা এখনও সায়েব হইনি। পড়াশোনা, অনুসন্ধান, গবেষণা, লেখালেখি, কাটাকাটির পরে শেষপর্যন্ত যে বইটা বেরুলো তাই নিয়েই পাঠকদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। তার আগে কী হলো, তা নিয়ে লেখক ছাড়া আর কারুর মাথা-ব্যথার যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।"

পাঠিকা মোটেই একমত হলেন না—সন্দেহজনক দৃষ্টিতে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত নিরীক্ষণ করে বললেন, "লজ্জা পাবার মতো কিছু যদি না করে থাকেন, তাহলে কোনো কিছুই গোপন করবেন না।"

এরপর চুপচাপ থাকা বেশ শক্ত। কাতরভাবে নিবেদন করলাম, "এদেশে মূল উপন্যাসটাই লোকে পড়তে চায় না। উপন্যাসটা কীভাবে লেখা হলো সে-বিষয়ে কার মাথা-ব্যথা বলুন?"

মহিলা সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিলেন, "ওসব ছেলে-ভুলোনো কথায় মেয়ে ভুলোতে পারবেন না। আপনার জন-অরণ্য লেখার গল্পটা আমরা পড়তে চাই।"

অতএব আমার গত্যন্তর নেই। জন-অরণ্য উপন্যাসের গোড়ার কথা থেকেই শুরু করতে হয়।

এই উপন্যাস লেখার প্রথম পরিকল্পনা এসেছিল আমার বেকার জীবনে। সে অনেকদিন আগেকার কথা। বাবা হঠাৎ মারা গিয়ে বিরাট সংসারের বোঝা আমার মাথার ওপর চাপিয়েছেন। একটা চাকরির জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। অথচ আপিস অথবা কারখানায় কাউকে চিনি না—চাকরি কী করে জোগাড় করতে হয় তাও জানি না। এই অবস্থায় নতুন আপিসে গিয়ে লিফটে চড়তে সাহস পেতাম না—আমার ভয় ছিল লিফটে চড়তে হলে পয়সা দিতে হয়। চাকরির সন্ধানে সারাদিন ঘুরে-ঘুরে কলকাতার আপিসপাড়া সম্বন্ধে আমার মনে বিচিত্র এক ছবি আঁকা হয়ে গিয়েছিল। একদিন এক পদস্থ ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে আমাকে বকুনি লাগালেন, "বাঙালীরা কি চাকরি ছাড়া আর কিছু জানবে না? বিজনেস করুন না?"

"কিসের বিজনেস?"

ভদ্রলোক বললেন, "এনিথিং—ফ্রম আলপিন টু এলিফ্যান্ট।"

সেই শুরু। বিজনেসে নেমে পড়বার সিদ্ধান্ত নিলাম। এই সময় পাকে-চক্রে এক মাদ্রাজি ছোকরার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেলো—মিস্টার ঘোষ নামে এক বাঙালী ফাইনানসিয়ারের সহযোগিতায় তিনি ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেট তৈরির ব্যবসা খুলেছেন। আমি ওই কোম্পানির এজেন্ট।

বাস্কেট তৈরির সেই কারখানা এক আজব জায়গায়। তার ঝুড়িগুলো রং হতো মধ্য কলকাতার এক পুরানো বাড়িতে। এই রং করতেন কয়েকজন সিন্ধি এবং অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মহিলা—সন্ধেবেলায় যাঁদের অন্য পেশা ছিল। দেহবিক্রয় করেও দেহধারণ কঠিন হয়ে পড়েছিল বলে এঁরা এই পার্টটাইম কুটিরশিল্পে মনোযোগ দিয়েছিলেন। তখন আমার কম বয়স, কলকাতার অন্ধকার জীবনযাত্রা সম্পর্কে কিছুই জানি না। এই সব স্নেহশীলা মহিলাদের সাক্ষাৎ-সংস্পর্শে এসে অভিজ্ঞতার এক নতুন দিগন্ত আমার চোখের সামনে উন্মোচিত হলো।

অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসায় নেমে আপিসপাড়ার যে-জীবনকে দেখলাম তার কিছুটা 'চৌরঙ্গী'র মুখবন্ধে নিবেদন করেছি। অনেক কোম্পানির কোট-প্যাণ্ট-চশমাপরা ক্রেতা গোপনে বাড়তি কমিশন চাইতেন, হাতে কিছু গুঁজে না দিলে পাঁচ-ছ'টাকার অর্ডারও তাঁরা হাতছাড়া করতেন না। মানুষের এই অরণ্যে পথ হারিয়ে মানুষ সম্বন্ধে যখন আশা ছাড়তে বসেছিলাম তখন ডালহৌসি-পাড়ার সাহেবী আপিসে এক দারোয়ানজীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। দারোয়ানজী সস্নেহে আমার কাছ থেকে কয়েকটা ঝুড়ি কিনলেন, সঙ্গে-সঙ্গে পেমেণ্টের ব্যবস্থা করে দিলেন। আমি ভাবলাম দারোয়ানজীর এই স্পেশাল আগ্রহের স্পেশাল কারণ আছে। বিক্রির টাকাটা হাতে পেয়ে দারোয়ানজীকে কমিশন দিতে গেলে তিনি সঙ্গে-সঙ্গে ফিরিয়ে দিলেন। বললেন, "ছি ছি! ভেবেছো কি? তোমার কাছ থেকে পয়সা নেবার জন্যে এই কাজ করেছি আমি! ঘামে ভেজা তোমার অন্ধকার মুখখানা দেখে আমার কষ্ট হয়েছিল, তাই তোমাকে সাহায্য করেছি।"

দারোয়ানজী সেদিন আমাকে মাটির ভাঁড়ে চা খাইয়েছিলেন। নানা মূল্যবান উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, 'মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ।'

জীবনের এক সঙ্কট-মুহূর্তে ডালহৌসি-পাড়ার অশিক্ষিত দারোয়ান আমাকে বাঁচিয়েছিল—আমি হেরে যেতে-যেতে হারলাম না।

আমার মনের সেই অনুভূতি আজও নিঃশেষ হয়নি—মানুষকে আমি কিছুতেই পুরোপুরি অবিশ্বাস করতে পারি না। কিন্তু ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেট হাতে দোকানে-দোকানে, আপিসে-আপিসে ঘুরে মানুষের নির্লজ্জ নগ্নরূপ দেখেছি।

দু-একটা জায়গায় ঝুড়ি জমা দিয়ে একটা পয়সাও আদায় করতে পারিনি। এক সপ্তাহ পায়ে হেঁটে আপিসপাড়ায় এসে এবং টিফিন না করে আমাকে সেই ক্ষতির খেসারৎ দিতে হয়েছে। ক্যানিং স্ট্রীটের একটা দোকানে ছ'টা ঝুড়ি দিয়েছিলাম—অন্তত তিরিশবার গিয়েও পয়সা অথবা ঝুড়ি কোনোটাই উদ্ধার করতে পারিনি। তবু যে পুরোপুরি হতাশ হইনি, তার কারণ মধ্যদিনে মধ্য-কলকাতার বান্ধবীরা! তাঁরা আমাকে উৎসাহ দিতেন। বলতেন, দেহের ব্যবসাতেও অনেক সময় টাকা মারা যায়। কিন্তু মাঝে-মাঝে এমন সুযোগ আসে যখন সমস্ত লোকসান সুদসমেত উসুল হয়ে যায়।

আমারও সামনে একদিন তেমন সম্ভাবনার ইঙ্গিত ঝলমল করে উঠলো। এক ভদ্রলোক বললেন, তিনি ডিসপোজাল থেকে খুব সস্তাদরে কিছু স্টীল বেলিং হুফ কিনেছেন। দাম বললেন এবং জানালেন, এর ওপর চড়িয়ে আমি যত দামে মাল বিক্রি করতে পারবো সবটাই আমার প্রফিট।

এই সব বেলিং হুফ কাপড়ের কল এবং জুট মিলে লাগে। কয়েকদিন খোঁজ-খবর নিয়ে জানলাম, ঠিক মতো পার্টি জোগাড় করতে পারলে বেশ কয়েক হাজার টাকা লাভের সম্ভাবনা আছে। বিজনেসে বড়লোক হবার স্বপ্নে বিভোর হয়ে অনেক আপিসে ঘুরলাম। কিন্তু কোনো ফল হলো না। শেষে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমার ওপর দয়াপরবশ হয়ে বললেন, "এইভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য হয় না ভাই—বড়-বড় কারখানায় আপনার জানা-শোনা কোনো অফিসার নেই? ওই রকম কারুর মাধ্যমে পারচেজ অফিসারদের নরম করবার চেষ্টা করুন।"

অফিসারকে নরম করবার ব্যাপারটা তখনও বুঝে উঠতে পারিনি। একজন পরিচিত ভদ্রলোকের সাহায্যে এক জুট মিলে কিছুটা এগোলাম। জিনিসের নমুনা দিলাম। দামও যে সস্তা জানিয়ে দিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হলো না। পরিচিত ভদ্রলোক আমার দুঃখে কষ্ট পেয়ে বললেন, "পারচেজ অফিসার মালিকের আত্মীয়—ওরা নিজেদের খেয়াল-খুশী মতো চলে, ওদের সাতখুন মাপ।"

ভদ্রলোকের কাছে যাতায়াত করে জুতোর হাফসোল খইয়ে ফেলেছি, কিন্তু কিছুতেই কিছু করা গেলো না। উনি কেন যে আমাকে অর্ডার দিলেন না তাও অজানা রয়ে গেলো।

শেষ পর্যন্ত ছোটখাট একটা চাকরি জোগাড় হয়ে যাওয়ায় ব্যবসার লাইন ছেড়ে বিজনেসে বড়লোক হবার স্বপ্নটা চিরদিনের মতো বিসর্জন দিয়েছি। এমন সময় একদিন মধ্য-কলকাতার সেই বাড়িতে গিয়েছি, কিছু হিসেব পত্তর বাকি

ছিল। তখন দুপুর তিনটে। রোজী নামে এক খ্রীষ্টান দেহপসারিণীর সঙ্গে আমার খুব আলাপ ছিল। তার ঘরে ঢুকতে গিয়ে হোঁচট খেলাম—আমার পরিচিত পারচেজ অফিসার সেখানে বসেই দু দণ্ডের আনন্দ উপভোগ করছেন। মিনিট দশেকের মধ্যেই ভদ্রলোক বিদায় নিলেন।

পরে শুনেছি, আমাদের কোম্পানির মাদ্রাজি যুবকের বিশিষ্ট অতিথি হিসাবেই ভদ্রলোক রোজীর বিজন কক্ষে এসেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত সেই বেলিং হুক যা আমি বেচতে পারিনি তা তিনি রোজীর দেহসান্নিধ্যে সন্তুষ্ট হয়ে চড়া দরে কিনেছেন। রোজী আমার বোকামিতে বিরক্ত হয়ে বলেছিল, "ইউ আর এ ব্লাডি ফুল। আমাকে আগে বলোনি কেন?"

অস্বস্তিকর এই ঘটনা আমার মনের গভীরে গেঁথে গিয়েছিল। কিন্তু তখন অন্য এক জগতে নতুন-নতুন অভিজ্ঞতার নাটকে দুলতে আরম্ভ করেছি। আমার সামনে নতুন এক পৃথিবীর সিংহদ্বার সহসা উন্মীলিত হয়েছে, যার অন্তঃপুরে বসবাস করছেন বিচিত্র এক বিদেশী—নাম নোয়েল বারওয়েল।

সাহিত্যের নিত্য-নূতন পথে ঘুরতে-ঘুরতে ব্যর্থ বিজনেসম্যান শংকর-এর ছবিটা আমার অজান্তেই অস্পষ্ট হতে আরম্ভ করেছিল। এ-সম্বন্ধে লেখবার ইচ্ছেও তেমনি ছিল না। ইতিমধ্যে বেশ কয়েক বছর কেটে গিয়েছে। কিছু দিন আগে খেয়ালের বশে একলা পথে-পথে ঘুরতে-ঘুরতে লালবাজারের পূর্ব দিকে হাজির হয়েছি। কোনো সময় রবীন্দ্র সরণি ধরে হ্যারিসন রোডের দিকে ছুটতে আরম্ভ করেছিলাম। নতুন সি আই টি রোডের মোড়ে এসে দেখলাম লোকে লোকারণ্য চিৎপুর রোড ট্রাম বাস ট্যাক্সি এবং টেম্পোর জটিল জট পাকিয়েছে। জ্যাম জমাট এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে একটা সেকেলে ধরনের ট্রামগাড়ির বৃদ্ধ ড্রাইভার করুণভাবে ঘণ্টা বাজিয়ে চলেছে। বিরাট এই যন্ত্রদানবকে হঠাৎ প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় গিরগিটির মতো মনে হলো। বেশ কিছুক্ষণ আমি ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম পথের ধারে একটা বিবর্ণ মলিন ল্যাম্পপোস্টের তলায় তেইশ-চব্বিশ বছরের এক ছোকরা দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার হাতে একটা অর্ডার সাপ্লায়ারের ব্যাগ। ভদ্রলোক যে অর্ডার সাপ্লায়ার তা বুঝতে আমার একটুও দেরি হলো না।

তরুণ এই ব্যবসায়ীর বিষণ্ন সরল মুখখানি হঠাৎ কেন জানি না আমাকে অভিভূত করলো। যুবকটি ঘন-ঘন ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে। কার অপেক্ষায় সে এমনভাবে এখানে দাঁড়িয়ে আছে কে জানে? চিৎপুর রোডের স্থবির ট্রাফিক ইতিমধ্যে আবার চলমান হয়েছে এবং একটা ট্যাক্সি হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়ালো। এক অদ্ভুত স্টাইলের মধ্যবয়সী ভদ্রলোক ভারিক্কী চালে পাইপ

টানতে-টানতে ট্যাক্সির মধ্যে থেকে ছোকরার উদ্দেশ্যে বললেন, "মিস্টার ব্যানার্জি।" তরুণ ব্যবসায়ী দ্রুতবেগে ওই ট্যাক্সির মধ্যে উঠে পড়লো।

অতি সাধারণ এক দৃশ্য। কিন্তু হঠাৎ আমার মনে পড়লো আজ ১লা আষাঢ়।

কিন্তু চিৎপুর রোডের মানুষরা কেউ আষাঢ়স্য প্রথম দিবসের খোঁজ রাখে না। অপেক্ষমাণ যুবকের দ্বিধাগ্রস্ত মুখখানা এরপর কিছুদিন ধরে আমার চোখের সামনে সময়ে-অসময়ে ভেসে উঠতো। পরিচয়হীন মিস্টার ব্যানার্জির নিষ্পাপ সরল মুখে আমি যেন বর্ণনাতীত বেদনার মেঘ দেখতে পেলাম। আমার পুরানো দিনের কথা মনে পড়ে গেলো। ভাবলাম, লক্ষ-লক্ষ বেকার যুবকের হতভাগ্য এই দেশে বেকার এবং অর্দ্ধবেকারদের সুখ-দুঃখের খবরাখবর সাহিত্যের বিষয় হয় না কেন? আমি এ বিষয়ে খোঁজ খবর আরম্ভ করলাম।

চাকরির ইণ্টারভিউ সংক্রান্ত বেশ কয়েকটা ম্যাগাজিন লক্ষ-লক্ষ কপি বিক্রি হয়। এই সব ম্যাগাজিনের প্রশ্নোত্তর বিভাগ মন দিয়ে পড়ে আমার চোখ খুলে গেলো। ইণ্টারভিউতে এমন সব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয় যার উত্তর সেইসব প্রতিষ্ঠানের বড় কর্তারাও যে জানেন না তা হলফ করে বলা যায়। এ বিষয়ে আরও কিছু অনুসন্ধান করতে গিয়ে একদিন হতভাগ্য সুকুমারের খবর পেলাম। শুনলাম, চাকরির পরীক্ষায় পাস করবার প্রচেষ্টায় বারবার ব্যর্থ হয়ে ছেলেটি উন্মাদ হয়ে গিয়েছে—পৃথিবীর যতরকম জেনারেল নলেজের প্রশ্ন ও উত্তর তার মুখস্থ। বাস স্ট্যাণ্ডের কাছে দাঁড়িয়ে অপরিচিতজনদের সে এইসব উদ্ভট প্রশ্ন করে এবং উত্তর না পেলে বিরক্ত হয়।

ছোট্ট ব্যবসায়ে বাড়তি কমিশন, ঘুষ এবং ডালির ব্যাপারটা আমার অজানা নয়। কিন্তু সম্প্রতি সেখানে নতুন একটি বিষয়ের অবতারণা হয়েছে। ব্যাপারটা কতখানি বিশ্বাসযোগ্য তা যাচাই করবার জন্যে কয়েকজন সাকসেসফুল ব্যবসায়ীর সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। তাঁরা সুকৌশলে প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেলেন—বললেন, ব্যবসার সব ব্যাপার সাহিত্যের উপাদান হতে পারে না। ঠিক সেই সময় আমার এক পরিচিত তরুণ বন্ধুর সঙ্গে অনেক দিন পরে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলো।

একদিন স্ট্র্যাণ্ড রোডে গঙ্গার ধারে বসে শুনলাম এই যুবকের নানা অভিজ্ঞতার কাহিনী। সে বললো, "যে-কোনোদিন সময় করে আসুন সব দেখিয়ে দেবো।"

নদীর ধারে ডাব বিক্রি হচ্ছিলো। বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলাম, "ডাব খাবে?" বন্ধু হেসে উত্তর দিলো, "আপনার সঙ্গে এমন একজন মহিলার পরিচয় করিয়ে

দেবো যিনি অভিসারে বেরোবার আগে এক গেলাস ডাবের জল খাবেনই।"

এই মহিলাটির ঠিকানা আমার বিশেষ পরিচিত এক ভদ্র গলিতে। স্বামী বৃহৎ এক সংস্থার সামান্য কেরানি। নিজের নেশার খরচ চালাবার জন্যে বউকে দেহ ব্যবসায় নামিয়েছেন। অথচ বাড়িতে স্বামী বিবেকানন্দ এবং সুভাষচন্দ্রের ছবি ঝুলছে। এই মহিলা সত্যিই একদিন জানা-শোনা পার্টির সঙ্গে বেরুতে যাচ্ছেন এমন সময় স্বামী মত্ত অবস্থায় ফিরলেন। সেজেগুজে বউকে বেরুতে দেখে ভদ্রলোক তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। বললেন, "পর পর ক'দিন তোমার ওপর খুব ধকল গিয়েছে। আগামীকালও তোমার অ্যাপয়েন্টমেণ্ট রয়েছে। আজ তোমায় বেরুতে হবে না। অত পয়সায় আমার দরকার নেই।" এঁকে নিয়েই শেষ পর্যন্ত মলিনা গাঙ্গুলীর চরিত্র তৈরি হলো।

সবচেয়ে মজা হয়েছিল জন-অরণ্য উপন্যাস দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পরে। মিসেস গাঙ্গুলী যত্ন করে গল্পটা পড়েছিলেন। পড়া শেষ করেই পরিচিত খদ্দেরের সঙ্গে তিনি হোটেলে গিয়েছিলেন বিখ্যাত এক বেওসাদারের মনোরঞ্জনের জন্যে। সেখানে আরাধ্য ভি-আই-পির শুভাগমনের জন্যে অপেক্ষা করতে-করতে ভদ্রমহিলা বললেন, "শংকর-এর জন-অরণ্য উপন্যাসটা পড়েছেন? মিসেস গাঙ্গুলীর চরিত্রটা ঠিক যেন আমাকে নিয়েই লেখা।"

আমার তরুণ বন্ধুর সাহায্যে নগর কলকাতার এক নতুন দিক আমার চোখের সামনে উদ্ঘাটিত হয়েছিল। এই জগতে পয়সার বিনিময়ে মা তুলে দেয় মেয়েকে, ভাই নিয়ে আসে বোনকে, স্বামী এগিয়ে দেয় স্ত্রীকে। মিসেস বিশ্বাস এবং তাঁর দুই মেয়ের বিজনেসের যে ছবি আঁকা হয়েছে তা মোটেই কল্পনাপ্রসূত নয়। লোভের এই কলুষিত জগতে খদ্দেরের অঙ্কশায়িনী কন্যার আর কতক্ষণ দেরি হবে তা জানবার জন্যে মা নির্দ্বিধায় দরজার ফুটো দিয়ে ওদের দেখে আসেন এবং শান্তভাবে ঘোষণা করেন, "আর দেরি হবে না, টো[illegible]া দিয়ে এসেছি, আপনারা বসুন। আমার এই মেয়েটার ঐ দোষ। কাস্টমারকে ঝটপট খুশী করে তাড়াতাড়ি বাড়ি পাঠিয়ে দিতে পারে না। বড্ড সময় নষ্ট করে।"

অভিজাত সায়েব পাড়ায় মিসেস চক্রবর্তী, মিসেস বিশ্বাসের দুই কন্যা, ঝুমু-ঝুমু, মিসেস গাঙ্গুলী এবং চরণদাসের টেলিফোন 'অপ্রেটিং' ইস্কুলের ছাত্রী ছাড়াও আরও অনেকের দুর্বিষহ অপমান ও লজ্জার কাহিনী এই সময় জানবার সুযোগ পেয়েছিলাম। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন মিসেস সিন্হা। বাইরে পরিচয় ইনসিওরেন্স এজেণ্ট। কিন্তু আসলে মিসেস গাঙ্গুলীর সমব্যবসায়িনী। এই মহিলার জীবন বড়ই দুঃখের,-এঁর কথা কোনো এক সময় লেখার ইচ্ছে আছে।

উপন্যাসের সমস্ত উপাদান বিভিন্ন মহল থেকে তিলে-তিলে সংগ্রহ করে অবশেষে জন-অরণ্য লিখতে বসেছিলাম। সমকালের এই অপ্রিয় কাহিনী সকলের ভাল লাগবে কিনা সে-বিষয়ে মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য একটাই ছিল। আমাদের এই যুগে বাংলার কর্মহীন অসহায় যুবক-যুবতীদের ওপর যে চরম অপমান ও লাঞ্ছনা চলছে উপন্যাসের মাধ্যমে তার একটা নির্ভরযোগ্য চিত্র ভবিষ্যতের বাঙালীদের জন্যে রেখে যাওয়া ; আর সেই সঙ্গে এদেশের ছেলেদের এবং তাদের বাবা-মায়েদের মনে করিয়ে দেওয়া যে বেকার সমস্যা সমাধানের জরুরী চেষ্টা না-হলে আমাদের সমাজ ও ব্যক্তি জীবনের বুনিয়াদ ধ্বসে পড়বে।

উদ্দেশ্য পুরোপুরি সফল হয়েছে এ-কথা অবশ্যই বলা যায় না। কিন্তু অনেকে এই বই পড়ে বিচলিত হয়েছেন। এই ডিসটার্বড মানসিক অবস্থায় কেউ-কেউ অভিযোগ করেছেন, এই উপন্যাসের মধ্যে শুধুই নিরাশা, কোনো আশার আলো দেখানোর চেষ্টা হয়নি। তাঁদের প্রশ্ন : 'জন-অরণ্য পড়ে কার কী উপকার হবে ?' আমার বিনীত উত্তর, দীর্ঘদিনের ঘুম ভাঙানোর জন্যেই তো এই উপন্যাসের সৃষ্টি এবং নিরাশার নিশ্ছিদ্র অন্ধকার থেকেই তো অবশেষে আশার আলো বেরিয়ে আসবে। এই উপন্যাস পড়ে কারও কোনো উপকার হবে কিনা বলা শক্ত, কিন্তু সত্যকে তার স্বরূপে প্রকাশিত হতে দিলে কারোও কোনো ক্ষতি হয় না। এই মুহূর্তে এর থেকে বেশি তো কিছু জানা নেই আমার।

পাণ্ডুলিপিতে এই উপন্যাস পড়ে আমার একান্ত আপনজন বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "বড্ড অপ্রিয় বিষয়ে কাজ করলে। লেখাটা শেষ পর্যন্ত কী হবে কে জানে।"

আমার মনেও যে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল না এমন নয়। তবু একটা সান্ত্বনা ছিল। বাংলার ঘরে-ঘরে অসহায় সুকুমার ও সোমনাথরা তিলে-তিলে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে, এদের সঙ্গে-সঙ্গে অভাগিনী কণারাও সর্বনাশের অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে, সমকালের লেখক হিসেবে এদের সম্বন্ধে স্বদেশবাসীকে অবহিত করবার দায়িত্ব আমি অস্বীকার করিনি। অপ্রিয় ভাষণের ভয়ে সত্য থেকে মুখ সরিয়ে নিইনি।

বিদেশ থেকে বহু চেষ্টায় বিপ্লবী লেখক ফ্যাননের একখানা বই পেয়েছিলাম। সেই বইয়ের মুখবন্ধে ফরাসী মানব সার্ত্রর জ্বালাময়ী ভাষায় লিখেছিলেন, 'হে আমার দেশবাসীগণ, আমি স্বীকার করতে রাজী আছি, তোমরা অনেক কিছুরই খবরাখবর রাখো না। কিন্তু এই বই পড়ার পর তোমরা বলতে

পারবে না, নির্লজ্জ শোষণ এবং অন্যায় অবিচারের সংবাদ তোমাদের জানানো হয়নি। হে আমার দেশবাসীগণ, তোমরা অবহিত হও।' উপন্যাসের প্রথম পাতায় সার্ত্রের মহামূল্যবান সাবধানবাণীটি আবার পড়তে অনুরোধ জানাই।

দেশ পত্রিকায় জন-অরণ্য প্রথম প্রকাশিত হবার দিন আমি একটু দেরিতে বাড়ি ফিরেছিলাম। স্ত্রী বললেন, "তোমার উপন্যাসের প্রথম পাঠক সত্যজিৎ রায় ফোন করেছিলেন। যত রাতেই হোক, তুমি ফিরলেই যোগাযোগ করতে বলেছেন।"

পরের দিন ভোরে শুনলাম দুটি ছেলে বরানগর থেকে দেখা করতে এসেছে। ছেলে দুটি বললো, "আমরা গতকালই আসতাম। গতকাল বহু চেষ্টা করেও রাত আটটার আগে আপনার ঠিকানা জোগাড় করতে পারিনি। আমরা দুই বেকার বন্ধু—অনেকটা আপনার সোমনাথ ও সুকুমারের মতন। আমরা আপনার কাছ থেকে সুধন্যবাবুর জামাই—যিনি কানাডায় থাকেন—তাঁর ঠিকানা নিতে এসেছি। এদেশে তো কিছু হবে না, বিদেশে পালিয়ে গিয়ে দেখি।" জন-অরণ্যের সুধন্যবাবু এবং তাঁর কানাডাবাসী জামাই নিতান্তই কাল্পনিক চরিত্র—কিন্তু ছেলে দুটো আমাকে বিশ্বাস করলো না। ক্ষমা চাইলাম তাদের কাছ থেকে। বিষণ্ণ বদনে বিদায় নেবার আগে তারা সজল চোখে বললো, "জন-অরণ্য উপন্যাসের একটা লাইনও যে বানানো নয় তা বোঝবার মতো বিদ্যে আমাদেরও আছে শংকরবাবু। আপনি সুধন্যবাবুর জামাইয়ের ঠিকানা দেবেন না তাই বলুন।"

সত্যজিৎ রায় জন-অরণ্য চলচ্চিত্রায়িত করবার কথা ভাবছেন জেনে বিগত রাত্রে যতটা আনন্দিত হয়েছিলাম, আজ সকালে ঠিক ততটাই দুঃখ হলো। দেশের লক্ষ-লক্ষ বিপন্ন ছেলেমেয়েদের হৃদয়ে আশার আলোক জ্বালিয়ে দেবার ক্ষমতা আমার নেই ভেবে লজ্জায় মাথা নিচু করে অসহায়ভাবে বসে রইলাম।

"The whole duty of life is implied in the question, how to respire and aspire both at once."

H. D. Thoreau
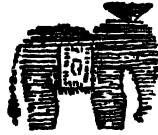
মহাত্মা গান্ধির নিঃসঙ্গ ধাতুমূর্তিকে নীরব সাক্ষী রেখে কলকাতার চৌরঙ্গী রোড যেখানে জওহরলাল নেহেরু রোডের কাঁধে সব দায়দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে নিজেকে দ্বিধাবিভক্ত করেছে, তারই কাছে এই অফিসটা।

ভোরবেলায় গান্ধিদর্শন করে কেউ যদি চৌরঙ্গী রোডের ফুটপাথ দিয়ে এই ছিমছাম আধুনিক ডিজাইনের বাড়িটার সামনে দিয়ে যান তাহলে তিনি দেখবেন, অফিসপাড়াটা পুরোপুরি ঘুম থেকে ওঠবার আগেই জটাধর দাশ একটা ব্রাশোর কৌটো হাতে করে নিবিষ্টমনে দুখানা পিতলের নেমপ্লেট ঘষছে, যার একটা ইংরিজীতে আর একটা বাংলায় লেখা। সুন্দরী মহিলারা স্বামীর সঙ্গে ককটেল পার্টিতে যাবার আগে যেমনভাবে ঘণ্টাখানেক ধরে মুখে চুনকাম করেন, বেয়ারা জটাধর দাশও এখন তেমন নিষ্ঠা ও যত্নের সঙ্গে বাংলা নেমপ্লেটের ওপর পাতলা কাপড় ঘষে চলেছে এবং খোদাই করা কথাগুলো ক্রমশ আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে :

হিন্দুস্থান পিটারস্ লিমিটেড

ভারতে সমিতিভুক্ত

সভ্যগণের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ

জটাধরকে এই যে সাতসকালে নেমপ্লেট পরিষ্কার করতে হচ্ছে, তার কারণ কয়েকজন সায়েব নির্ধারিত সময়ের আগেই অফিসে হাজির হন। বড় সায়েব খাস বিলেতের লোক, তাঁর সময়জ্ঞান তীক্ষ্ণ। ঘড়িতে ন'টা বাজবার সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁর ইমপোর্টেড ইম্পালা গাড়িখানা আলিপুরের দিক থেকে চৌরঙ্গী রোড

ধরে একেবারে ফয়ারের সামনে এসে দাঁড়ায়। ফেরিস সায়েবের বেয়ারা বরকত আলী পাঁচমিনিট আগে ঢুকেই দরজার কাছে হাজির থাকে। মিলিটারি কায়দায় বরকত আলী গাড়ির দরজার কাছে এগিয়ে আসে, নিপুণ হাতে দরজাটা খুলে দেয়। সায়েব কোটটা হাতে করে বেরিয়ে আসেন। বরকত আলী একটা সেলাম ঠোকে, তারপর সায়েব মাথা নিচু করে গেটের ভিতর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যান। বরকত আলী এবার সায়েবের ব্যাগ এবং অন্য মালপত্র নিয়ে পিছন-পিছন চলে যায়। ঘড়ির ছোট কাঁটাটা সঙ্গে-সঙ্গে ন'য়ের ঘরে আর বড় কাঁটা বারোর ঘরে ঢুকে পড়ে। এই হচ্ছে খাঁটি ইংরেজ। মরদ কা বাত্, হাতি কা দাঁত, সিপাই কা ঘোড়া এবং সায়েব কা ঘড়ি।

জটাধরের বাবাও এই অফিসে কাজ করতেন। তিনি বলতেন, "এই ঘড়ি ধরেই ইংরেজরা দুনিয়া শাসন করছে, বুঝলি? অমন-যে অমন জার্মানদের এরা যুদ্ধে ঘায়েল করলে, তাও জেনে রাখবি এই ঘড়ির জোরেই। সায়েবদের কাছে ৯টায় আপিস মানে, ৮টা ৫৯ হয়ে এক মিনিট।"

এখন সে-ইংরেজও নেই, সে-ইণ্ডিয়াও নেই। জটাধর ভাবে, তার বুড়ো বাবা যদি উড়িষ্যার গ্রাম থেকে এখন একবার কলকাতায় এসে হাজির হন তাহলে মাথায় হাত দিয়ে বসবেন। এখন ৯টা মানে সওয়া আটটা থেকে সাড়ে ন'টা পর্যন্ত যে কোনো সময়। মাসে তিনদিন পর্যন্ত লেট মকুব, তাই মুকুন্দবাবু, যদুবাবু, নগেনবাবু এঁরা হিসেব করে মাসে তিনদিন সাড়ে-ন'টায় হাজির হন। রমেশবাবু এই সেদিন পঁচিশ বছর পুরো চাকরি করবার জন্যে ফেরিস সায়েবের কাছ থেকে সোনার ঘড়ি পেলেন। সোনার ঘড়ি পেয়ে কী যে হলো রমেশবাবুর, এখন রোজ দেরিতে আসেন। এ-অফিসে পঁচিশ বছর চাকরি হলে সাতখুন মাপ। রমেশবাবু নাকি দেরিতে আসবার স্পেশাল পারমিশন পেয়ে গেছেন।

দেরিতে যাঁরা আসেন তাঁদের তবু সহ্য হয়; কিন্তু গোলমাল বাধান "ফাস্ট প্যাসেঞ্জাররা"। আটটা বেজে তিন মিনিটে হাজির হন স্যালারি ডিপার্টমেন্টের রামলিঙ্গম সায়েব। রামলিঙ্গম সায়েবের কপালে আঁকা থাকে চন্দনের নানা ইকড়ি-মিকড়ি। মঙ্গলবার শুধু রামলিঙ্গম সায়েব আটটা তিনের বদলে সাড়ে-আটটায় হাজির হন। রামলিঙ্গম সায়েব খুব মাইডিয়ার লোক। মঙ্গলবারে দেরি হওয়ার কারণ, প্রতি সপ্তাহে ঐদিন ভগবান ভেঙ্কটেশকে একশ' একটি রাঙা জবাফুল নিবেদন করতে হয়। ভগবানের প্রসাদী ফুলের এক-আধটা রামলিঙ্গম সায়েব মাঝে-মাঝে জটাধরকে দেন। জটাধর কেন, এ অফিসের কারও কোনো বিপদ-আপদ হলেই, রামলিঙ্গম সায়েব ফুল দিয়ে দেবেন।

বলবেন, "আর ভাবনা কী? স্বয়ং ভেঙ্কটেশের প্রসাদী ফুল রইলো তোমার কাছে, এখন তিনিই রক্ষা করবেন।"

অন্যদিকে ভয়ঙ্কর কৃপণ রামলিঙ্গম সায়েব। পয়সাকড়ি একেবারেই খরচা করেন না, এমন কি গত দশ বছরে একটা টাই পর্যন্ত কেনেননি। সেই এক টাই রোজ গলায় বেঁধে অফিসে আসেন। কিন্তু অত কৃপণ মানুষও নিজের হাতে বাজারের সেরা জবাফুল কেনেন। বড়-বড় রাঙা জবা চাই-ই—সে যত দামই হোক। আর বছরে একদিন রামলিঙ্গম সায়েব ক্যাজুয়েল লিভ নেন—সেদিন ওঁর লাগে এক হাজার একটি ফুল। প্রায় সারাদিনটাই কেটে যায় লর্ড ভেঙ্কটেশকে মন্ত্রপূত ফুল নিবেদন করতে।

মঙ্গলবার ছাড়া অন্য সবদিন আটটা তিন। রামলিঙ্গম সায়েবের জন্য জটাধর অত মাথা ঘামায় না। কিন্তু রামলিঙ্গম সায়েবকে গেটের ধারে দেখতে পেলেই জটাধর বুঝতে পারে, এবার হাত চালানো দরকার, আর বেশি সময় নেই।

আজ জটাধরের সত্যিই দেরি হয়ে গিয়েছে। কারণ, নীল রঙের ফিয়াট গাড়িখানা অফিসের সামনে এসে দাঁড়ালো। এই গাড়ির ড্রাইভার সৃষ্টিধর বেরা জটাধরের ভগ্নীপতি। শালা-ভগ্নীপতিতে বেশ দহরম-মহরম। ছুটি-ছাটার দিনে দুজনে একসঙ্গে গাঁজা-টাঁজাও সেবন হয়। কিন্তু সৃষ্টিধরের গাড়ির পিছনে যিনি বসে থাকেন—তার সম্পর্কে জটাধরের মনে এক মিশ্র অনুভূতি।

পিছনের সীটের লোকটি কাউকে গাড়ির দরজা খুলতে দেন না। ইনি চ্যাটার্জি সাহেব। এস চ্যাটার্জি সাহেব। আহা কতই বা বয়স। চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা। মাথার চুলগুলো শুকনো অথচ কেমন শাসনে রয়েছে। ফেরিস সাহেবের মতো ফর্সা না হলেও চ্যাটার্জি সাহেবকে কালো বলা চলে না। চ্যাটার্জি সাহেবের নাকটাও কেমন ছুঁচলো। মোটা কাঁচের মধ্য দিয়ে চ্যাটার্জি সাহেবের চোগ দুটো কেমন উদাস মনে হয়। যেন এই হিন্দুস্থান পিটারস্ লিমিটেডের অফিসে থেকেও তাঁর দৃষ্টি এখানে নেই।

চ্যাটার্জি সাহেব কারও সাহায্য না নিয়ে, নিজে দরজা খুলে নেমে পড়েন। জটাধর লক্ষ্য করেছে এই নামার মধ্যেও একটা স্টাইল আছে। ব্যাপারটা জটাধর কাউকে বলতে সাহস করেনি, একদিন সৃষ্টিধরের সঙ্গেই আলোচনা করতে হবে। চ্যাটার্জি সাহেব যেভাবে নামেন, ঠিক যেন সিনেমার হিরো। সৃষ্টিধরকে নিয়ে জটাধর একবার বাংলা সিনেমা দেখতে গিয়েছিল, তাতে নায়ক ঠিক ওইভাবে গাড়ি থেকে নেমে পড়ে কোটটা কাঁধ থেকে পিঠের দিকে ঝুলিয়ে দিয়ে বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে ধরে রেখেছিল।

গাড়ি থেকে নেমে পড়ে চ্যাটার্জি সাহেব ডান হাতে নিজের অ্যাটাচি কেসটা

ধরেন। আর বুড়ো আঙুল দিয়ে লাইটার এবং সিগারেটের বাক্সটা চেপে ধরেন। এই যে সিগারেট—রথম্যান না কী নাম—ইণ্ডিয়াতে তৈরিই হয় না। খাস বিলেত থেকে আসে। তবে সিগারেট যদি খেতেই হয় তবে ওইসব সিগারেট খাওয়া উচিত। সাহেব একবার ভুল করে গাড়ির মধ্যে একটা খোলা প্যাকেট ফেলে গিয়েছিলেন। সৃষ্টিধরই গোপনে শ্যালককে একটা স্যাম্পল খাইয়েছিল। ঠিক দুটো সিগারেট ছিল। আহা কি স্বাদ, কি গন্ধ! এখনও মুখে লেগে রয়েছে। জটাধর তারপর পুরো একদিন মুখে বিড়ি তুলতে পারেনি। জটাধরের ইচ্ছে আছে, এবার যখন দেশে যাবে, বোনাসের টাকা থেকে এক প্যাকেট রথম্যান কিনেই ফেলবে—ওই তো পার্ক স্ট্রীটের ফুটপাথে পয়সা ফেললেই পাওয়া যায় সব রকমের বিলিতী সিগ্রেট, বিলিতী রবারের জিনিস, বিলিতী সেন্ট, বিলিতী সাবান।

টুল থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে জটাধর এবার চ্যাটার্জি সায়েবকে সেলাম করলো। বরকত আলী ঠিক যেভাবে বড় সায়েবকে সেলাম করে। মনে-মনে জটাধরের একটু ভয়ও হলো। এখন ইউনিফর্ম পরেনি সে। খাতায় কলমে আটটা থেকে ডিউটি তার। সেলাম শেষ করে আবার টুলে উঠে পড়লো জটাধর। চ্যাটার্জি সায়েব আড়চোখে বাংলা নেমপ্লেটের দুটো কথার ওপর চোখ রাখলেন: 'দায়িত্ব সীমাবদ্ধ'।

অটোমেটিক লিফটের দরজা বন্ধ করে দিয়ে ফ্যানটা চালিয়ে দিলো শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জি। তারপর আলতোভাবে আঙুলের ডগা দিয়ে লিফটের বোতাম টিপে দিলো। এবার শ্যামলেন্দু চকচকে লিফটের দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো। শ্যামলেন্দুর মনে হলো, অনেকদিন পরে ওই অদ্ভুত কথা দুটোর ওপর আবার নজর পড়ে গেল। পৃথিবীতে এত জায়গা থাকতে এই বিলিতী কোম্পানির দোরগোড়ায় খোদাই-করা বাংলা অক্ষরে সীমাবদ্ধ দায়িত্বের উল্লেখ কেন?

আজকে নয়, প্রথম যেদিন হিন্দুস্থান পিটারস্-এর অফিসে ঢুকেছিল শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জি সেদিনও কথাটা নজরে পড়েছিল। তখনও মনের মধ্যে মধ্যে নানা প্রশ্ন উঠেছিল—কারাই বা এই প্রতিষ্ঠানের সভ্য? দায়িত্বই বা কী? এই অনিত্য সংসারে কোন দায়িত্বই বা সীমাহীন? আর দায়িত্ব যে সীমাবদ্ধ তা অমনভাবে ঢাক পিটিয়ে প্রচার করবারই বা প্রয়োজন কী? শ্যামলেন্দু পরে অবশ্য খোঁজখবর নিয়ে জেনেছে, ওটা আইনের প্রয়োজনে লিখতে হয়।

কিন্তু আর ভাববার সময় নেই। কারণ তিনতলায় এসে একটা ঘটাং শব্দ

করে অটোমেটিক লিফট থেমে গিয়েছে। এখন আর মাটিতে নেই শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জি। আজকাল ভারি সুন্দর একটা কথা ওটিস লিফটের বিজ্ঞাপনে প্রায়ই ব্যবহার হচ্ছে। 'এটমসফিয়ার' নয়, 'স্ট্র্যাটসফিয়ার' নয়—স্রেফ 'ওটিসফিয়ার'। গেটটা টেনে খুলে দিয়ে, শ্যামলেন্দু ওটিসফিয়ার থেকে বেরিয়ে হিন্দুস্থান পিটারস্ কোম্পানির পিটারস্ফিয়ারে প্রবেশ করলো।

অফিসের এই ভোরবেলাটুকু ভারি ভাল লাগে শ্যামলেন্দুর। অনিন্দিত কুমারী পরিবেশ। ভার্জিন কথাটা ব্যবহার করলে বোধহয় আরও ভাল হয়। অভিধানে যাই বলুক, ভার্জিন এবং কুমারী ঠিক এক জিনিস নয়। বাঙালী সংসারে কুমারী কথাটার মধ্যে 'আইবুড়ো' ভাবটা প্রবল হয়ে থাকে; আর ভার্জিন হলো পবিত্র, অচ্ছিন্ন, অনাঘ্রাত—যা এখনও কারুর স্পর্শে মলিন অপবিত্র হয়নি, যা এখনও অব্যবহৃত অমর্দিত, যা এখনও দেবতাকে দেওয়া চলে।

হেসে ফেললো শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জি। এইসব কলেজী ছেলেমানুষী হঠাৎ মনের মধ্যে উঁকি মারছে কেন? কলেজের ছাত্র এবং অধ্যাপকরাই তো ভাষার এই সব কূট-কচালি নিয়ে চুল-চেরা বিশ্লেষণ করে। পাত্রাধারে তৈল না তৈলাধারে পাত্র নিয়ে বড়-বড় রেফারেন্স বই ঘাঁটে এমনভাবে যেন তারই ওপর সমস্ত পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। ওদের তুলনায় এই আধুনিক কমারসিয়াল ওয়ার্লডের লোকেরা অনেক সহজ ও সরল। এখানকার মানুষরা অনেক বেশি প্র্যাক্টিক্যাল, মাটির অনেক কাছাকাছি তারা বাস করে। এখানে কোনো ধোঁয়াটে হেঁয়ালির বিলাসিতা চলে না, সব কিছুর আগেই 'উইথ রেফারেন্স টু'র প্রয়োজন হয়। কেবল শেক্সপীয়র এবং সক্রেটিসকে মাথায় তুলে নাচানাচি করলেই সংসার চলবে না। ম্যানেজমেণ্ট বিশেষজ্ঞদের নমস্য পিটম্যান এবং পিটার ড্রুকাররাও পৃথিবীর মানুষদের কম উপকার করেননি।

সমস্ত অফিসটার মধ্য দিয়ে একা খটখট করে হেঁটে হল্-এর দক্ষিণতম প্রান্তে কাঁচের ঘরটার সামনে এসে দাঁড়ালো শ্যামলেন্দু। সেইখানেই ঝকঝকে পিতলের অক্ষরে লেখা এস চ্যাটার্জি। পা দিয়ে দরজাটা ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়তেই আস্তে-আস্তে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। টেবিলের ওপর নিজের ব্যাগটা নামাতে-নামাতে শ্যামলেন্দুর মনে হলো: পৃথিবীর এই নিয়ম। নিজের কেরিয়ারের দরজা খুলতেই যত সাধ্যসাধনা, যত পরিশ্রম। কিন্তু উন্নতির পথ আপনা থেকে অবরুদ্ধ হয়ে যায়, তার জন্যে চেষ্টা করতে হয় না।

শ্যামলেন্দু একবার কাঁধ থেকে জলের ফ্লাস্কটা নামিয়ে রাখলো। এই এক হাঙ্গামা হয়েছে কিছুদিন ধরে। এই অফিসে যতদিন কাজ করছে এখানকার বেয়ারাই জল এনে দিয়েছে। তারপর সেবার যেমনি প্রমোশন পেয়ে ম্যানেজার

হলো শ্যামলেন্দু, অমনি দোলন বললো, "এখন থেকে ব্যাগের সঙ্গে জলের ফ্লাস্কও নিতে হবে।"

প্রথমে প্রবল আপত্তি করেছিল শ্যামলেন্দু। কিণ্ডারগার্টেন ইস্কুলের বাচ্চারা এবং বাতিকগ্রস্ত ফরেন ট্যুরিস্ট ছাড়া কলকাতা-শহরে কে আবার নিজের খাবার জল বয়ে বেড়ায়? কিন্তু শ্যামলেন্দুর ওজর আপত্তি চলেনি। দোলন বলেছে, "তুমি তো চোখ খুলে ছাখো না। এখনও সেই পাটনাইয়া রয়ে গেলে। তোমাদের কোম্পানির ম্যানেজাররা কেউ অফিসের জল খায় না।"

শ্যামলেন্দু স্থির চোখে দোলনের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। দোলন বলেছিল, "এই ব্লু হ্যাভেনের দশতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমি সব লক্ষ্য করি। তোমাদের চিফ অ্যাকাউনটেণ্ট চোপরা, ডেপুটি ফিনানস ম্যানেজার হ্যারিস, টেকনিক্যাল ম্যানেজার হার্টলে, এমনকি সেক্রেটারী সেনগুপ্ত সায়েবও সঙ্গে জলের বোতল নিয়ে যান।"

এরপর আর আপত্তি করতে পারেনি শ্যামলেন্দু। ভাল করে খুঁটিয়ে দেখেছে, জল খাবার ব্যবস্থা থেকেই এই অফিসে কার কি পদমর্যাদা বোঝা যায়। একেবারে নিচু যারা—অর্থাৎ বেয়ারারা কিভাবে জল খায় শ্যামলেন্দু জানে না। কোনো বেয়ারাকে এই এতো বছরের চাকরিতে সে জল খেতে দেখেনি। শুনেছে, ফাইলিং ক্যাবিনেটের পিছন দিকে দুই একটা গেলাস লুকানো থাকে, তাই দিয়ে সবাই প্রয়োজন মতো জল খেয়ে আসে। তারপর বাবুরা। তাঁদের প্রত্যেকের টেবিলে জলের গেলাস আছে—পিছনে একটা লাল রংয়ের নম্বর। এই নম্বর দেখেই বেয়ারারা সকলে গেলাস ধোওয়ার পর বুঝতে পারে কোন গেলাসটা কার টেবিলে রাখতে হবে। সিনিয়র ক্লার্কদের গেলাস আকারে জুনিয়র বাবুদের গেলাসের দেড়া। তারপর লোকাল অ্যাসিসটেণ্ট—কেউ-কেউ যাঁদের ইণ্ডিয়ান অ্যাসিসটেণ্ট বলেন। এঁদের গেলাসগুলো অত বড় নয়, কিন্তু বেশ পাতলা এবং সুদৃশ্য, গায়ে ফুলকাটা এবং সঙ্গে দুটো প্লাস্টিন মিনেকরা ঢাকনা। এঁদের মাথার ওপরে জুনিয়র অফিসার। তাঁদের ঘরে টেবিলের ওপর একটা লাল রংয়ের কৌটো থাকে। তারই মধ্যে জলের গেলাস রাখার ব্যবস্থা—ঢাকনার টোপর তুলে তবে জল খেতে হবে। সিনিয়র অফিসারদের জলের টোপরগুলোর ওপরে সূঁচের কারুকার্য করা। আর ম্যানেজার হলে তো অফিসের জলই চলবে না। সঙ্গে থাকবে ফ্লাস্ক। ডিরেকটরদের আবার দুটো ফ্লাস্ক। একটাতে ঠাণ্ডা জল, আর একটায় কী থাকে ভগবান জানেন। কেউ বলে কফির গরম জল, কেউ বলে হুইস্কি, আবার কেউ বলে স্রেফ খালি থাকে—ডিরেকটর তো, তাই দুটো আনতে হয়।

শ্যামলেন্দু এবার কোটটা হ্যাঙারে ঝুলিয়ে সামনের আলমারিতে ঢুকিয়ে বন্ধ করে দিলো। তার আগে কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে কয়েকটা কাগজের টুকরো বার করে টেবিলে রাখলো।

এবার একটা সিগারেট ধরালো শ্যামলেন্দু—এই রথম্যান সিগারেটের দাম প্রতি মাসেই বাড়ছে। বাড়িতে বাইরের অতিথি না-থাকলে লুকিয়ে-লুকিয়ে অনেক ম্যানেজার আজকাল নাকি দেশী সিগারেট টানছে। মন্দ কী—ইণ্ডিয়া কিং সিগারেট বেশ ভাল জাতের হয়েছে। কিন্তু তা বলে হিন্দুস্থান পিটারস্-এর কোনো ম্যানেজার প্রকাশ্যে দেশী সিগারেট টানতে পারে? মিস্টার সেনগুপ্ত অবশ্য সরল মানুষ। নিজে সিগারেটও খান না। বলেন, "মিস্টার চ্যাটার্জি ভিতরে-ভিতরে আজকাল কি হচ্ছে জানেন না! ইণ্ডিয়া কিং তো দূরের কথা, অনেক ম্যানেজার লুকিয়ে সিজারস্ টানছে। আপনার স্ত্রীকে বলবেন, ব্লু হ্যাভেনের সুইপারকে কায়দা করে জিজ্ঞেস করতে। প্রত্যেক ম্যানেজারের ফ্ল্যাট তো ওরা ঝাঁট দিচ্ছে—ওদের কাছে কিছুই চাপা থাকে না।"

কাগজের ছোট-ছোট গোলপাকানো টুকরোগুলো এবার শ্যামলেন্দু খুলতে লাগলো। দিল্লী অফিসের ম্যানেজারকে একটা বড় চিঠি লিখতে হবে—মাল বিক্রি হচ্ছে, কিন্তু বকেয়া পাওনা বাড়ছে। মাদ্রাজেও ইদানীং আউটস্ট্যানডিং বেড়েছে। এদের প্রত্যেকের অফিসে বড়-বড় করে লিখে দেওয়া দরকার—আজ নগদ কাল ধার। বম্বের ম্যানেজার শিবশৈলমকেও একটা নরম-গরম চিঠি ছাড়তে হবে। কনফারেন্সে তো বড়-বড় কথা বলো, কিন্তু মহারাষ্ট্রের অগ্রগতির সঙ্গে-সঙ্গে তোমার বিক্রি বেড়ে চলছে না কেন? আমেদাবাদের এরিয়া-ম্যানেজার ছোকরাটি বেশ ব্রাইট। গুজরাটের গ্রামাঞ্চলে গ্রীষ্মকালের আগেই কৃষকদের মধ্যে ফ্যান বিক্রির এক অভিনব পরিকল্পনা করেছে। এই সপ্তাহের মধ্যেই পরিকল্পনাটি পাকাপাকি করতে হবে।

আরও কয়েকটা কাগজের টুকরো রয়েছে। পকেটে কাগজের টুকরো রাখার কায়দাটা শ্যামলেন্দু শিখেছে মার্কেটিং ডিরেকটর ডেভিডসনের কাছে। মিস্টার ডেভিডসনের স্মৃতিশক্তি আই-বি-এম-কমপিউটরের মতো। কবে কাকে কী কাজ দিয়েছেন, কাকে কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কাকে কী বাড়তি সাপ্লাই করবেন, সব ছবির মতো মনে রাখেন। কী করে ডেভিডসন মনে রাখেন তা শ্যামলেন্দু কিছুতেই বুঝতে পারতো না। সেবার এরিয়া ম্যানেজারদের এক পার্টিতে ব্যাপারটা জানা গেল। সেলস্-এর সমস্ত লোকগুলো ছিনে জোঁকের মতো মিঃ ডেভিডসনকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। এদের সর্বাগ্রে ছিল প্রিয়বন্ধু কুণ্ডু সান্যাল। ডেভিডসনকে বেশ ভালই কব্জা করেছে কুণ্ডু। আগে সানিয়াল বলে

ডাকতো—এখন ডাকছে রুণু বলে। রুণুও এখন ডেভিডসনকে জন বলছে।

শ্যামলেন্দু আর ওখানে দাঁড়িয়ে সপ্তরথীর ব্যূহ ভেদ করে ডেভিডসনের কাছে পৌঁছবার চেষ্টা করেনি। গ্র্যাণ্ড হোটেলে বাংকোয়েট রুমের এক কোণে দাঁড়িয়েছিল। স্বামীর সলজ্জভাব দেখে দোলন দূর থেকে আড়চোখে তার বিরক্তি প্রকাশ করেছে। চোখের ইশারায় স্বামীকে বলেছে, 'রুণুর পায়ে বল ঠেলে দিয়ে তুমি ওইভাবে হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছো?' কিন্তু শ্যামলেন্দু চোখ ফিরিয়ে নিয়ে মিসেস ডেভিডসনের কাছে হাজির হয়েছিল। কমারসিয়াল ফার্মে বউয়েরা মিনিস্টারদের বউদের মতো শক্তিশালিনী নন। ডিরেকটরের বউকে ভিজিয়ে ড্রাইভার, ক্লার্ক, বড়জোর ইণ্ডিয়ান অ্যাসিসট্যান্টরা কাজ গুছোতে পারে —কিন্তু তার থেকে উঁচু লেভেলে সায়েবরা নিজেরাই ডিসিশন নেন। সেখানে বউদের কথায় তাঁরা ওঠেন না—বসেন না।

মিসেস ডেভিডসনকে শ্যামলেন্দু বলেছিল, "আপনার স্বামীর কর্মদক্ষতা আমার কাছে একটা বিস্ময়। কেমন করে যে সবকিছু মনে রাখেন! ঠিক ন'টায় এসে এমনভাবে আট-দশটা বিষয়ে আলোচনা করেন যে, মনে হয় এইমাত্র সব ফাইলগুলো পড়ে এলেন।"

ডেভিডসন-গৃহিণী হাতে জিন-এর গেলাস ধরে, সিগারেটে একটা টান লাগিয়ে বলেছিলেন, "তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, তুমি আমাকে একটা আইডিয়া দিলে।"

ভ্যাবাচাকা খেয়ে শ্যামলেন্দু জিজ্ঞেস করলো, "মানে?"

ডেভিডসন-গৃহিণী বললেন, "বাড়িতে যখন কোনো আইডিয়া আসে, জন তখনই একটুকরো কাগজে লিখে সেটা দলা পাকিয়ে কোটের বাঁ পকেটে রেখে দেয়। পরে সেগুলো অফিসে গিয়ে নোট করে নেয়। কিন্তু জন বাড়ির কোনো কথা অফিসে মনে রাখে না। এবার বাড়ির ব্যাপারগুলো টুকরো-টুকরো স্লিপে লিখে ওর কোটের ডান পকেটে রেখে দেবো। দেখি কেমন কাজ হয়।"

সেই থেকেই ডেভিডসন-পদ্ধতিটা কাজে লাগিয়েছে শ্যামলেন্দু। সংসারের অন্য মানুষদের মতো ম্যানেজারও দুরকম। কেউ দেখে শেখে, কেউ ঠেকে শেখে। দেখে-দেখে শিখতে পারলেই আরও ওঠা যাবে। শ্যামলেন্দুও কোটের বাঁ পকেটে বাড়িতে যত আইডিয়া আসে তার স্লিপগুলো রেখে দেয়; আর অফিসে বসে বাড়ি সম্বন্ধে কোনো আইডিয়া এলে প্যান্টের ডান পকেটে রেখে দেয়। এখনই মনে পড়লো, ক্যালকাটা ম্যানেজমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সেমিনারে যে প্রবন্ধটা পড়তে হবে, তা আজকেই বাড়িতে ঠিকঠাক করতে হবে। অন্ততঃ প্রধান-প্রধান পয়েন্টগুলো। অফিসে ওসব কাজ করবার সময়

থাকে না। একটা স্লিপ লিখে শ্যামলেন্দু প্যান্টের পকেটে পুরে ফেললো।

এবার ড্রয়ার থেকে কয়েকটা ফাইল বার করে ফেললো শ্যামলেন্দু। নিজের স্ক্রিবলিং প্যাডে কয়েকটা পয়েন্ট লিখে নিলো। মিসেস অ্যাণ্ডারসন এলেই চিঠিগুলো ডিকটেট্ করে ফেলবে।

ঘড়ির দিকে তাকালো শ্যামলেন্দু। মিসেস অ্যাণ্ডারসনকে একটু আগে আসতে বলেছিল আজ। নোটটা যেটা গতকাল ডিকটেশন দিয়েছিল, সেটা ৯টার আগেই রেডি করে ফেলতে চায় শ্যামলেন্দু!

মিসেস অ্যাণ্ডারসন এবার বোধহয় এসে পড়লেন। ওঁর ঘরে আলো জ্বলে উঠলো। এই অফিসের কড়া নিয়ম, ঘরে লোক না-থাকলে আলো জ্বলবে না। মিস্টার ফেরিস নতুন ম্যানেজিং ডিরেকটর হয়েই এই সার্কুলার দিয়েছিলেন—'আগামী দিনের চ্যালেঞ্জের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্যে এবং ভারতবর্ষকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে হিন্দুস্থান পিটারস্ লিমিটেডের সব কর্মীকে সহযোগিতা করতে হবে। খরচ কমাতে হবে। আসুন আমরা সবাই নয়াপয়সার দিকে নজর রাখি, তাহলে টাকারা নিজেদের সামলে নেবে। আমি চাই, আমাদের মিতব্যয়িতা একেবারে গোড়া থেকেই শুরু হোক। কোনো ঘরে যেন অযথা বাতি না জ্বলে।' সার্কুলারটা অবশ্য ফেরিস সায়েব নিজে লেখেন নি। শ্যামলেন্দুকে ডেকে ফেরিস সায়েব বলেছিলেন, "চ্যাটার্জি, সাধারণ লোকের সঙ্গে সহজভাবে কথাবার্তা বলার ফ্লেয়ার আছে তোমার। আমি দেখছি, এই অফিসের 'বাগার'রা ইলেকট্রিসিটির অপচয় করে। তুমি একটা স্যুটেবল সার্কুলার ড্রাফট করো, বাগারদের মনে করিয়ে দাও, প্রত্যেকটা বাতির সঙ্গে একটা করে সুইচ আছে।"

ফেরিস সায়েব পেশায় ইনজিনিয়ার। অনেকদিন কারখানায় কাজ করেছেন। তাই ওঁর মুখ থেকে খিস্তিখেউড় একটু সহজেই বেরিয়ে পড়ে। শ্যামলেন্দুর ড্রাফট পড়ে বলেছিলেন, "গুড্ জব। এইসব ব্লাইটারদের সুইচ নিভোতে বললেও ইণ্ডিয়ার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রেফারেন্স দিতে হবে। আফটার অল, ইণ্ডিয়া তোমাদের দেশ, এসব তোমরাই ভাল বুঝবে!"

ফেরিস সায়েবের সার্কুলারে ছোটবড় সকলেই খুব খুশী হয়েছিল। বাবুরা টিফিন রুমে বলেছিলেন, "বড়সায়েব সত্যি ইণ্ডিয়াকে খুব ভালবাসেন।"

আসলে সব বড় সায়েবই কোনো-না-কোনো একটা স্মরণীয় কাজ করে যেতে চান। আগেকার বড়সায়েব মিস্টার গ্রাহাম নাকি চার্জ নিয়েই হুকুম জারি করেছিলেন—কলঘরের কলগুলো ভাল করে বন্ধ করতে হবে। কিন্তু এমন ভাষায় সে সার্কুলার লেখা হয়েছিল যে পড়ে অফিসের সবাই চটিতং।

প্রায় স্ট্রাইক হয়ে যায় এমন অবস্থা।

মিসেস অ্যাণ্ডারসন এবার ঘরে ঢুকলেন। "গুড মর্নিং, মিঃ চ্যাটার্জি।"

"মর্নিং," চ্যাটার্জি সায়েব উত্তর দিলেন।

"স্যরি মিঃ চ্যাটার্জি, তোমাকে যে কথা দিয়েছিলাম, তা রাখতে পারলাম না, আসতে দেরি হয়ে গেল।"

মিঃ চ্যাটার্জি একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "কালকে যেটা ডিকটেট্ করেছি সেটা এখনই চাই।"

"আমি দশ মিনিটের মধ্যে দিচ্ছি, মিঃ চ্যাটার্জি।"

মিসেস অ্যাণ্ডারসন নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। বিরক্তির রেখা ফুটে উঠলো শ্যামলেন্দুর মুখে। বিয়ের পর থেকেই একেবারে ঢ্যাড়স বনে যাচ্ছে এই মহিলাটি। আগে নাম ছিল মিস উড। তখন ঝড়ের বেগে টাইপ করতো, টেবিল পত্তর ফাইলিং সব সময় আপ-টু-ডেট রাখতো। এখন অফিস আওয়ারের পরে দু মিনিট রাখা যায় না। ওই মিস্টার অ্যাণ্ডারসন না কে পাঁচটা না-বাজতেই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। মাঝে-মাঝে বেশ বিরক্তি ধরে শ্যামলেন্দুর। একদিন গল্পচ্ছলে দোলনকে বলেছে, "ভাবছি ভদ্রলোককে বলবো এতই যদি আঠা, তাহলে বউকে চাকরিতে পাঠানো কেন?"

"আহা! বেচারি এখনও হনিমুনের ঘোরে রয়েছে, কিছু বোলো না। সবাই তো আর তোমার মতো কর্মযোগী নয় যে, বউ বেঁচে রইলো কি মরলো তার খবর করবে না!"

আজ কিন্তু সত্যি রাগ হচ্ছে, কারণ নোটটা সকালেই লাগবে। কিন্তু কিছুই বলা চলবে না। মহিলা আবার এরই মধ্যে সন্তানসম্ভবা হয়ে বসে আছেন। আর এই বাচ্চাটাচ্চার ব্যাপারটা মেয়েদের একটা অ্যানিম্যাল ইনসটিংকট। রাজ-রাজেশ্বরী থেকে আরম্ভ করে, ফিল্মস্টার, মেয়ে-বৈজ্ঞানিক, ডিরেকটরের বউ, লেডি সেক্রেটারী,- মেথরানি সব একরকম ব্যবহার করে— তার সঙ্গে নতুন বাচ্চা-হওয়া মেনি বেড়ালের কোনো পার্থক্য নেই। এই কথাগুলো অবশ্য শ্যামলেন্দুর নিজস্ব নয়। বলছিল রুণু সান্যাল। তখন রুণুর সঙ্গে প্রায়ই আড্ডা জমতো; সুযোগ পেলেই শ্যামলেন্দু দোলনকে নিয়ে হাজির হতো রুণুর বাড়িতে। আর সস্ত্রীক রুণুও আসতো শ্যামলেন্দুর টাউনসেণ্ড রোডের বাসায়। রুণু তখন খুব চোখা-চোখা ডায়ালগ বলতো।

শ্যামলেন্দু একবার বলেও ছিল অনিন্দিতাকে, "আপনার কর্তা যেসব ডায়ালগ ছাড়েন, তার কয়েকটা বার্নার্ড শ'-এর কানে গেলে তিনিও ব্যবহার করে ফেলতেন।"

"তাতে আমার আর কী লাভ হতো? বর্নার্ড শ' আমাকে কোট করেছেন এই কারণে কোম্পানি এক পয়সাও মাইনে বাড়াতো না। মাঝখান থেকে বার্নার্ড শ' রয়ালটি বাবদ আরও দু পয়সা বেশি রোজগার করে বসতেন।" রুণু সান্যাল কফির কাপে চুমুক দিয়ে বলেছিলেন।

না, মিসেস অ্যাণ্ডারসন সন্তানসম্ভবা হলেও, এখনও অকর্মণ্য হয়ে পড়েননি। অল্প সময়ের মধ্যেই নোটটা টাইপ করে নিয়ে এলেন। শ্যামলেন্দু মনে-মনে লজ্জা পেলো—ভদ্রমহিলার ওপর অতটা চটা ঠিক হয়নি। হাজার হোক বেচারা মা হতে চলেছে। শরীরের এই অবস্থায় কে আর শখ করে চাকরি করতে আসে?

নোটটার ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলো শ্যামলেন্দু। তারপর সোজা উঠে পড়ে আলমারি থেকে কোটটা বার করে নিলো। ঘড়িতে ন'টা বেজে পনেরো হয়ে গিয়েছে।

মার্কেটিং ডিরেকটর ডেভিডসন সাহেব কিছুদিন হলো বিলেতে রয়েছেন। তাঁর অধীনে যে দুটো ডিভিসন তার একটা দেখছে শ্যামলেন্দু।

ম্যানেজিং ডিরেকটরের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লো শ্যামলেন্দু! তারপর আলতো দু বার টোকা মেরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলো। একটা দরজা খুললেই এম-ডির দেখা পাওয়া যায় না। প্রথমেই বসে আছেন সেক্রেটারী মিসেস ডিক। মিসেস ডিকের দেহসৌষ্ঠব হিন্দুস্থান পিটারস্-এর সর্বস্তরের বহু আলোচ্য বিষয়। এক ড্রেসে পর পর দু দিন কেউ মিসেস ডিককে অফিসে আসতে দেখেনি। আজকাল মাঝে-মাঝে আবার কি দুর্বুদ্ধি চাপে—একেবারে ফিনফিন ইমপোর্টেড সিফন শাড়ি আর সঙ্গে ম্যাচিং চোলি পরে অফিসে আসেন মহিলা। আবার হয়তো তার পরের দিনই মিনি স্কার্ট। মিনি স্কার্ট পরার নানা জ্বালা—বিশেষ করে টেবিলে যাদের টাইপরাইটার চালাতে হয়। বিলেতের কোন ফ্যাশান ম্যাগাজিন দেখে মিসেস ডিক নিজের টেবিলের আধখানা ঢেকে নিয়েছেন—এর নাম মডেষ্টি বোর্ড!—যাতে আগন্তুকদের সরাসরি দৃষ্টি তাঁর অধমাঙ্গকে বিব্রত না করে।

দম্ভে নাকি মিসেস ডিকের মাটিতে পা পড়ে না; সবার সঙ্গেই খারাপ ব্যবহার করে। কিন্তু শ্যামলেন্দুর সঙ্গে ওঁর বেশ সদ্ভাব। দুজনের মধ্যে একটু-আধটু রসিকতা বিনিময় হয়। শ্যামলেন্দু বলে, "বস্-এর সঙ্গে ঝগড়া করা চলে, কিন্তু মনিবের সেক্রেটারীর সঙ্গে নৈব নৈব চ!"

মিসেস ডিক তির্যক দৃষ্টি হেনে বললেন, "মিস্টার চ্যাটার্জি, আমাকে, 'কিড' কোরো না।" এই কিডিং কথাটা মহিলার প্রায় মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়েছে।

শ্যামলেন্দু বলে, "মিসেস ডিক, পৃথিবীতে দু রকমের মহিলা সেক্রেটারী আছে—গুড সেক্রেটারী অথবা গুড-লুকিং সেক্রেটারী! সমস্ত ক্যালকাটায় একাধারে গুড এবং গুড-লুকিং সেক্রেটারী বলতে একটি মহিলাকেই বোঝায়।"

"আবার কিড করছো!" মিসেস ডিক বেশ খুশী হয়েই অভিযোগ করেন।

শ্যামলেন্দু বলে, "আমার শুধু একটি ভয়! হোম বোর্ডের মেম্বার মিঃ ক্রিফোর্ড ইণ্ডিয়া ট্যুরে আসছেন। তারপর যদি তোমার হোম পোস্টিং হয়ে যায়, তাহলে আমাদের দোষ দিও ন"

"ইংলণ্ড! রক্ষে করো, মিস্টার চ্যাটার্জি। আমি লণ্ডনে কাজ করতে পারবো না। ওখানে সেক্রেটারীর খুব অভাব, চাকরি পাওয়া মোটেই শক্ত নয়। কিন্তু আমি ঠিক করেছি, কানাডা ছাড়া আর কোথাও যাবো না।"

আজ কিন্তু কোনো রসিকতা হলো না। শ্যামলেন্দু দেখলো এম-ডি ঘরের বাইরে লাল আলো জ্বালিয়ে দিয়েছেন। মিসেস ডিক বললেন, "ঘরে কেউ নেই, উনি বোর্ড মিটিংয়ের জন্যে তৈরি হচ্ছেন।"

"এই নোটটা ওঁকে পাঠিয়ে দিও। বোর্ড মিটিংয়ে লাগবে। আমার সঙ্গে গতকাল চারটের সময় আলোচনার পর, এম-ডি নোটটা তৈরি করতে বলেছিলেন।"

"তুমি দেখা করতে চাও? ওঁকে বলবো?" সেক্রেটারী জানতে চায়।

"কিছু দরকার নেই। আমি নিজের সীটে চলে যাচ্ছি, দরকার হলে ডেকে পাঠিও।"

ঘর থেকে বেরিয়ে শ্যামলেন্দু গম্ভীরভাবে আবার করিডর দিয়ে হাঁটতে লাগলো। এই হাঁটার সময় সে কোনোদিকে তাকায় না। হাই অফিসারদের বহু সাধ্যসাধনা করে এই মুদ্রা অভ্যাস করতে হয়। ভিড়ের মধ্যে হাঁটবেন, কিন্তু দৃষ্টি যে কোনদিকে নিবদ্ধ তা কেউ বুঝতে পারবে না। শ্যামলেন্দুর প্রথম হেড ক্লার্ক অবনীবাবু বহুদিন আগে বলেছিলেন, "ব্লাক স্যার, আপনি একটা বাঙালীর ছেলে এই অফিসে এলেন। আমাদের কত আনন্দ। আমরা কেরানি হলেও বাঙালীর উন্নতি দেখলে খুশী হই, মনে ভরসা পাই।" অবনীবাবু আরও বলেছিলেন, "আপনি *born* অফিসার। আপনি স্যর সায়েবদের মতো আদবকায়দা করবেন। এই নিচু থেকে ওঠা পেটি অফিসারদের মতো পেটি ব্যাপারে থাকবেন না। যখন অফিসের ভিতর দিয়ে হেঁটে যাবেন তখন কোনোদিকে তাকাবেন না।"

অবনীবাবুর কথাগুলো শুনে তখন হাসি লেগেছিল শ্যামলেন্দুর। জন্মেই মানুষ কেমন করে অফিসার হতে পারে? ভিড়ের মধ্যে হাঁটবে অথচ কাউকে দেখবে না, তা কেমন করে হয়? কিন্তু এখন আর হাসি আসে না শ্যামলেন্দুর। শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জি এখন হিন্দুস্থান পিটারস্-এর আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেকে পুরোপুরি মানিয়ে নিয়েছে।

নিজের ঘরের মধ্যে এসে বসবার কিছুক্ষণ পরেই শ্যামলেন্দুর ইনটারন্যাল টেলিফোন বেজে উঠলো। কোম্পানির সেক্রেটারী নীলাম্বর সেনগুপ্ত কথা বলছেন। "মিস্টার চ্যাটার্জি ফ্রি আছেন নাকি?"

"আপনার জন্যে সব সময়ই ফ্রি আছি, সেনগুপ্ত সায়েব," শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জি উত্তর দিলো।

খানকয়েক ফাইল হাতে নীলাম্বর সেনগুপ্ত এবার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

"বোর্ড মিটিং আজ কখন আরম্ভ করছেন সেনগুপ্ত সায়েব?" শ্যামলেন্দু জিজ্ঞেস করে।

"সাড়ে-এগারোটায় ঘড়ি ধরে ডিরেকটরদের মিটিং আরম্ভ করবো। তারপর ওখান থেকে সোজা ওঁরা চলে যাবেন সুতানুটি ক্লাবে লাঞ্চ করতে। এইটাই আমাদের ট্রাডিশন। আগে মিটিং, পরে লাঞ্চ, না-হয় পরে মিটিং আগে লাঞ্চ!"

"বসুন সেনগুপ্ত সায়েব, অন্তত এক কাপ কফি খেয়ে যান," শ্যামলেন্দু অনুরোধ জানায়।

"না মশাই, এই কোম্পানি ল' আর ডিরেকটর বোর্ড নিয়ে পাগল হয়ে গেলাম। বিলেতের ডিরেকটররা তো বোঝেন না, এখানে কোম্পানি আইনের কত ফ্যাচাং—পান থেকে চুন খসলেই আজকাল কোম্পানি ল' বোর্ড লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে দেবে। আর তখন তো, বুঝতেই পারছেন, সব ব্যাটাকে ছেড়ে দিয়ে এই বেঁড়ে সেক্রেটারীকে ধরা হবে।"

কি ব্যাপার সেনগুপ্ত সায়েব? ঘন-ঘন বোর্ডের মিটিং ডাকছেন আজকাল!"

"কী আর হবে? ডিরেকটর বোর্ডই তো দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। ওঁদের ডাকতে হয় মাঝে-মাঝে। আর মাঝে-মাঝে মিটিং না হলে বাইরের ডিরেকটররা কিছু ফি পান না।"

কফির কাপে চুমুক দিয়ে সেনগুপ্ত সায়েব বললেন, "মার্কেটিং ডিরেকটর ডেভিডসন সায়েব নেই। আপনি বোধহয় কি একটা নোট দিয়েছেন আজ সকালে এম-ডিকে। এম-ডি বললেন আপনাকে বোর্ড রুমের কাছে অপেক্ষা করতে। যদি কোনোরকম দরকার হয় উনি ডেকে পাঠাবেন আপনাকে।"

বোর্ড মিটিং দেখেনি কখনও শ্যামলেন্দু। ডিরেকটরদের মিটিংয়ে কী আবার জিজ্ঞেস করে বসবে কে জানে।

"ভাবিয়ে তুললেন স্যর।" হেসে বললো শ্যামলেন্দু।

"আপনারা মশাই, ম্যানেজিং ডিরেকটরকে হাতের পুতুল করে রেখেছেন, আপনাদের আবার বোর্ডকে ভয়!" সেনগুপ্ত সায়েব উত্তর দেন।

"না সারাক্ষণের ডিরেকটর যাঁরা—ফিনানস ডিরেকটর মিস্টার গর্ডন, দিল্লীর রেসিডেন্ট ডিরেকটর মিঃ মূর্তি এবং খোদ ম্যানেজিং ডিরেকটর মিস্টার ফেরিসকে তো বুঝি, কাজকর্মও করছি। ভয় বাইরের ডিরেকটরদের নিয়ে। কি কোশ্চেন করে বসবে কে জানে। সেসব প্রশ্নের খোলাখুলি উত্তর দেওয়া ঠিক হবে কি না তাও তো জানি না। এসব প্রবলেম তো মিস্টার ডেভিডসন নিজে সামলান। আপনি একটু আলো দেখান স্যর।"

"আর হাসাবেন না মিস্টার চ্যাটার্জি! আপনি আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিন দেখি? বলুন তো বোর্ড ক'রকমের হয়?"

"আমাকে আবার বিপদে ফেলছেন কেন, সেনগুপ্ত সায়েব? ইণ্ডিয়ান কোম্পানিজ অ্যাক্ট অনুযায়ী বোর্ড তো একরকমই হয়—এবং সেই বোর্ডের ডিরেকটররা শেয়ারহোল্ডারদের সভায় নির্বাচিত হন। আপনিই তো লেখেন মশাই: মিস্টার অমুক চন্দ্র অমুক রোটেশনে অবসর নিলেন; অ্যাণ্ড বিয়িং এলিজিবল অফারস হিমসেলফ ফর রি-ইলেকশন। সোজা বাংলায় যা দাঁড়ায়-পালা অনুযায়ী অবসর নিচ্ছেন, কিন্তু সমর্থ থাকায় আবার ঘর করতে প্রস্তুত!"

সেনগুপ্ত সায়েব বললেন, "শুনুন, আমার প্রশ্নের উত্তর হলো বোর্ড দুরকম। হার্ড বোর্ড এবং সফ্ট্ বোর্ড। ওই যে আমাদের ডিরেকটর এবং ফিনানস ডিরেকটর এঁরাই আসল হার্ড বোর্ড। বাকি সব বুঝতেই পারছেন। একজন কোম্পানির সলিসিটর পাঁচু বড়াল। আর রয়েছেন ক্যামাক স্ট্রীটের স্যর বরেন রায়, ইংরেজ আমলে সবাই যাকে স্যর ব্রায়ান রে বলে জানতো এবং কুমার জগদীশ।"

কফি শেষ করে সেনগুপ্ত সময় নষ্ট করলেন না। ওঁকে বোর্ড মিটিংয়ের কাগজপত্র গোছাতে হবে।

শ্যামলেন্দু নিজেও এবার একটা প্লাস্টিকের ফোল্ডারের মধ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র গুছিয়ে নিলো। তারপর সোজা রওনা দিলো একতলায় ভিজিটরস রুমে।

আগাগোড়া দামী কার্পেটে মোড়া ভিজিটরস রুম। হঠাৎ ঢুকলে মনে হয় যেন কোনো প্রথম শ্রেণীর সিনেমা হল-এ ঢুকলাম। ফেরিস সায়েবের এদিকে

কড়া নজর। উনি বলেন, "প্রেমের মতো, ব্যবসাতেও প্রথম ইমপ্রেশনটা খুবই প্রয়োজনীয়। হিন্দুস্থান পিটারস্‌-এর বাড়িতে পা দিয়েই যেন লোকে বুঝতে পারে তারা যা-তা জায়গায় আসেনি।"

এই ঘরের সাজসজ্জা নিয়েও অনেক পরিকল্পনা হয়েছে। ফেরিস সায়েব সেবার শ্যামলেন্দু ও রুণু দুজনকেই ডেকে পাঠিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "ইয়ংমেন, আমাব ইচ্ছে তোমরা দুজনে এই ওয়েটিং রুম নিয়ে একটু মাথা ঘামাও। প্রয়োজন হলে তোমাদের ওয়াইফদের সঙ্গে কনসাল্ট করো।"

সেই ঘর-সাজাবার গল্পটাই তো বিরাট। কেমন করে দোলন ও মিসেস সান্যালের মধ্যে একটু মতবিরোধও যেন দেখা গিয়েছিল। রুণু কেমন করে কলকাতা এবং বোম্বাইয়ের বাঘা-বাঘা ইনটিরিয়র ডেকরেটরদের সঙ্গে একের পর এক পরামর্শ করেছিল। তারপর বাজেট তৈরি হয়েছিল। একটা ঘরের পক্ষে খরচটা বোধহয় একটু বেশি। এই দু লক্ষ টাকা।

খবরটা কেউ বোধহয় ইউনিয়নের কানে পৌঁছে দিয়েছিল। কিন্তু ফেরিস সায়েব তাতে পিছিয়ে যাননি। ইউনিয়নের লীডাব সুজয় মিত্তিরকে বলেছিলেন, "আপনারা আপনাদের কাজ করুন, আর আমাকে আমার কাজ করতে দিন।"

ফিনানসের লোককে ফেরিস সায়েব বলেছিলেন, "আমি তো ভেবেছিলাম তিন লাখ টাকা লাগবে। তার মানে আমরা এক লক্ষ টাকা বাঁচাচ্ছি। আমাদের কোম্পানি এখন খুব বড় না-হলেও, একদিন বড় হবে। আমাদের বাৎসরিক বিক্রি সামনের বছরেই দশ কোটি টাকা পেরিয়ে যাবে। তাছাড়া মনে বাখবেন আমরা এখন পৃথিবীর নানা দেশে রপ্তানি শুরু করেছি। ফরেনের ক্রেতারা আমাদের অফিসে এলে কী ভাববেন? তাঁদের কীভাবে আমরা ইমপ্রেস করবো? কীভাবে বোঝাবো তাঁরা পৃথিবীর একটা প্রখ্যাত কোম্পানির কাছে জিনিস কিনতে এসেছেন?"

এই বাইরের দেশের লোকদের পয়েন্টটা কিন্তু রুণু সান্যালের মাথায় আসেনি। এটা শ্যামলেন্দুই লিখে দিয়েছিল। সত্যি কথা বলতে কি, খরচা একটু বেশি বলেই শ্যামলেন্দুর মনে হয়েছিল, বিশেষ করে যে-কোম্পানির বছরে বিক্রি মাত্র ছ'-সাত কোটি টাকা। কিন্তু রুণুর বউ নাছোড়বান্দা। স্বামীকে বলেছিল, "এইসব সামান্য ব্যাপারে কখনও 'mean' হবে না, কখনও নিম্ন-মধ্যবিত্তের মতো নজর নিচু করবে না।"

রুণু বলেছিল, "কিন্তু ডার্লিং, ফেরিস সায়েবকে ব্যাপারটা বোঝাতে হবে, একটা জাস্টিফিকেশন তো চাই।"

রুণুর গিন্নি উত্তরটা সঙ্গে-সঙ্গেই দিয়েছিল। "তুমিই তো সেদিন বলেছিলে

ফিনানসিয়াল জাস্টিফিকেশন দেখাতে হলে সম্রাট শাজাহান কোনোদিন তাজমহল তৈরি করতে পারতেন না।"

এ-যুগে রপ্তানি এবং প্রতিরক্ষার কথা তুলতে বজ্রমুষ্টিও আলগা হয়ে যায়। এর জন্যে সাতখুন মাপ। তবে মজা এই, খরচের মতলব দিলো রুণু অথচ রপ্তানির কথাটা তুললো শ্যামলেন্দু। হিন্দুস্থান পিটারস্-এর সমস্ত এক্সপোর্টের দায়িত্ব শ্যামলেন্দুর। রুণু যে-বিভাগের বিক্রি দেখাশোনা করে সেখানে রপ্তানির কোনো সম্ভাবনা আজও নেই।

ভিজিটরস রুমে শ্যামলেন্দুকে দেখে রিসেপশনিস্ট মিস শ্রীলা চক্রবর্তী সুপ্রভাত জানালো, "গুড মর্নিং মিস্টার চ্যাটার্জি।"

অভ্যস্ত কায়দায় গুড মর্নিংটা ফিরিয়ে দিলো শ্যামলেন্দু। শ্রীলার টেবিলে দুটো ফুলদানিতে টাটকা ফুলের গুচ্ছ। রোজ সকালে রকমারি ফুল দিয়ে যায় নিউ মার্কেটের দোকান থেকে। আর এই শ্রীলাও নতুন-নতুন সাজে দেখা দেয় প্রতিদিন। রিসেপশনিস্টের কাজে শাড়িপরা মেয়ে নেওয়ার পরিকল্পনাটা বড় সায়েবের। পার্সোনেল অফিসার তালুকদারকে ডেকে বলে দিয়েছিলেন, কেমন রিসেপশনিস্ট দরকার।

তারপর কয়েক সপ্তাহ ধরে বেচারা তালুকদার নাস্তানাবুদ হয়েছিল। প্রতিদিন গোটা দশ-বারো সুন্দরী মেয়েকে ভদ্রলোক ইনটারভিউ করেছেন এবং রিজেক্ট করেছেন। তালুকদার একদিন দুঃখ করে শ্যামলেন্দুকে বলেছিলেন, "আর তো পারি না, মিঃ চ্যাটার্জি। বুড়ো বয়সে কি ফ্যাসাদে পড়লাম বলুন তো! সায়েব তো কাউকে পছন্দ করছেন না। ক্যাণ্ডিডেটের মুখশ্রী পছন্দ হলে কণ্ঠস্বর পছন্দ হয় না, কণ্ঠস্বর পছন্দ হলে দেহবল্লরী পছন্দ হয় না।"

মৃদু হাসতে-হাসতে শ্যামলেন্দু ওঁর কথা শুনে যাচ্ছিলো। তালুকদার নিজেই এবার বললেন, "সায়েব এক ঢিলে দুই পাখি ধরতে-চাচ্ছেন—দেখতে হবে খাঁটি ইণ্ডিয়ানের মতো, অথচ শুনতে হবে ঠিক মেমসায়েবের মতো। খাঁটি ভারতীয় সুন্দরী না-হয় পাওয়া যায়, কিন্তু যেমনি তার সঙ্গে কনভেণ্ট উচ্চারণ চাইলেন অমনি গোলমাল বাধলো।"

শেষ পর্যন্ত কুমারী শ্রীলা চক্রবর্তীকে পাওয়া গেল। এখন শুধু তালুকদারের চিন্তা মেয়েটা টিকলে হয়। "যা দিনকাল, এই সব মেয়ের বিয়ে হয়ে যেতে বেশিক্ষণ লাগে না। আর বিয়ের পরে বাঙালী মেয়েগুলোর যে কি হয়! একেবারে বাসি পাঁপড়ের মতো মিইয়ে যায়, কোনো কাজে লাগে না। সেদিকে যাই বলুন, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েগুলোকে দেখুন; বিয়ে অথ নো-বিয়ে সব সময় মচমচে, মুড়মুড়ে।"

শ্রীলা চক্রবর্তী এবার শ্যামলেন্দুকে জিজ্ঞেস করলো, "আপনিও কি বোর্ড মিটিংয়ে থাকবেন ?"

"না, আমি বাইরে একটু অপেক্ষা করবো। ডিরেকটররা এসে গিয়েছেন নাকি ?"

"না, এইবার বোধহয় এসে পড়বেন," শ্রীলা ফুলদানির ফুলগুলো গোছাতে-গোছাতে উত্তর দিলো।

সেনগুপ্ত সায়েবও হাজির হলেন এবার খাতাপত্র হাতে। দিল্লীর রেসিডেণ্ট ডিরেকটর মূর্তি সায়েবকেও দেখা গেল। "হ্যালো সেনগুপ্ত, হ্যালো চ্যাটার্জি" বলে মূর্তি সায়েব ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন।

করমর্দনের পর সেনগুপ্ত সায়েব জিজ্ঞেস করলেন, "আজকের ফ্লাইটে এলেন নাকি ?"

"না, না, গতকাল ইভনিং প্লেনে এসেছি। বোর্ড মিটিং বলে কথা, কোনো রকম রিস্ক নেওয়া যায় না।"

দিল্লীর রেসিডেণ্ট ডিরেকটর মিস্টার জগন্নাথ ভেঙ্কটচারি মূর্তি এবার বোর্ড-রুমের মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

"চীজ একটি !" সেনগুপ্ত সায়েব মন্তব্য করলেন।

হিন্দুস্থান পিটারস্ লিমিটেডের সামনে এবার একটা পুরানো বেণ্টলে গাড়ি থামলো। বিরাট গাড়িটার পিছনে এক শীর্ণকায় বৃদ্ধ প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছেন। ড্রাইভার নেমে এসে দরজা খুলে দিয়ে বেশ জোর গলায় ডাকলো, "স্যার !"

লণ্ডনে টেলর করা তিন-পিস স্যুটের মধ্যে যে হাড়-জির-জিরে লোকটি রয়েছেন, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "টমলিন কোম্পানি ?"

ড্রাইভার উত্তর দিলো, "হিন্দুস্থান পিটারস্ কোম্পানি। আপনি তো ওখানেই যেতে বললেন।"

"তাইতো, আমিই তো তোমাকে হিন্দুস্থান পিটারস্-এ যেতে বললাম।"

ফাইল হাতে করে ভদ্রলোক ধীর পদক্ষেপে এবার অফিসের দিকে ঢুকে পড়লেন। শ্রীলা চক্রবর্তী এই ভদ্রলোককে আগে কখনও দেখেনি। ভাবলো: এই সকালে বুড়োটা আবার জ্বালাতন করতে আসছে কাকে ? ঘাড়টা নিচু করে, কোটের হাতটা একটু নেড়ে নিয়ে, ভদ্রলোক শ্রীলার সামনে দাঁড়াতেই সেনগুপ্ত সায়েব ফিস-ফিস করে শ্যামলেন্দুকে বললেন, "স্যর ব্রায়ান এসে গিয়েছেন। কলুটোলার রায় বাড়ির ছেলে বরেন রায়, আই-সি-এস (রিটায়ার্ড)। ইংরেজ আমলের দোর্দণ্ডপ্রতাপ লোক।"

সেনগুপ্ত সায়েব এগিয়ে এসে শ্রদ্ধার সঙ্গে বললেন, "গুড মর্নিং, স্যর ব্রায়ান।

কেমন আছেন?"

"এই যে নীলাম্বর! দেখে কেমন বুঝছো?" উত্তর দিলেন স্যর বরেন রায়।

"দেখে তো আপনাকে নামকরা কোম্পানির চায়ের মতো গার্ডেন-ফ্রেশ মনে হচ্ছে।"

সেনগুপ্তের উত্তর একটা দিল্লীর ঝানু আই-সি-এস বরেন রায়কে বেশ খুশী করলো। তিনি বললেন, "বেশ অ্যাকটিভ আছি—এখনও নিয়মিত গল্‌ফ-ক্লাবে যাচ্ছি, গোবিন্দপুর ক্লাবে ঢু মারছি, বোর্ড মিটিং অ্যাটেণ্ড করছি, যা-খাচ্ছি, তাই হজম হচ্ছে। হোয়াট মোর? তুমি তো হেনরি ফোর্ডের ব্যাপার জানো? অত টাকা, অত প্রতিপত্তি, কিন্তু একখানা ডিম সেদ্ধ খেয়ে হজম করতে পারতেন না। আমি ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগোর অ্যাডভাইস মতো এখনো ব্রেকফাস্টে দুটো কোয়ার্টার-বয়েল মুরগীর ডিম চালিয়ে যাচ্ছি।"

নীলাম্বর সেনগুপ্তের উত্তর তৈরি ছিল। "আপনি হলেন স্যর সেকালের রোলস রয়েস গাড়ির মতো। যত পুরানো হচ্ছেন তত দাম বাড়ছে। একি আর আজকালকার মেড-ইন-ইণ্ডিয়া মোটর গাড়ি!"

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বরেন রায় দেখলেন এখনও একটু সময় আছে। তাই গল্প আরম্ভ করলেন। "ঠিক বলেছো নীলাম্বর। তাছাড়া আমরা ফাইটার, চিরকালই ফাইট করে গেলাম। এখনকার ফাইট আর ইংরেজ আমলের ফাইট তো এক জিনিস ছিল না। এখনকার আই-এ-এসগুলো কী করছে? আমাদের সময় এরাই তো হেড অ্যাসিসটেণ্ট হতো, দু-একটা ছিটকে-ছাটকে বি-সি-এসে ঢুকে পড়তো। এদের হাতে দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে দেশের উন্নতি কী করে আশা করতে পারো?"

"সে তো বটেই," সেনগুপ্ত সায় দিলেন।

স্যর ব্রায়ান রে বললেন, "এখন তো গোটাকয়েক টুপি পরা এম-পি আর এক-আধটা মিনিস্টার সামলাতে আই-এ-এস বাবাজীদের জিভ বেরিয়ে পড়ছে। আমাদের সময় আমরা তো এদের বুড়ো আঙুলের তলায় চেপে রেখেছি, দরকার হলে এদের যেটা যোগ্য জায়গা সেই জেলখানায় পাঠিয়েছি, তারপর বাঘা-বাঘা ইংরেজদের সঙ্গে সমানে পাঞ্জা লড়েছি।"

"সেসব সত্যি গল্পের মতো শোনায়," সেনগুপ্ত এবার স্যর ব্রায়ানকে উৎসাহ দেন।

"তুমি তো জানো, আমরা তখন পাবলিকের কাছে ছিলাম ব্রিটিশের সাপোর্টার; কিন্তু ইংরেজদের কাছে ছিলাম গোঁড়া স্বদেশী। সুযোগ পেয়েছো কি, ইংরেজদের এগেনস্টে কড়া নোট ছাড়ো, এই ছিল আমাদের পলিসি।"

শ্যামলেন্দু ও সেনগুপ্ত দুজনেই স্যর ব্রায়ানের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। সেনগুপ্ত বললেন, "আপনার সঙ্গে সেই সেবার ফিল্ডমার্শাল অকিনলেকের কি একটা ঠোকাঠুকি লেগে গেল!"

বেশ খুশী হলেন কলুটোলার স্যর বরেন রায়। "তোমার দেখছি সব মনে আছে। যুদ্ধ তখনও পুরোদমে চলছে। তারই মধ্যে আমি অকিনলেকের একটা টি-এ বিল তিন দিন দেরি করে দিয়েছিলাম। এমন একখানি নোট ছেড়েছিলাম যে ফিল্ডমার্শাল অকিনলেকের টি-এ নাকচ হয়ে যায় আর কী! সে এক বিরাট গল্প। ভাইসরয় পর্যন্ত ব্যাপারটা গড়িয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ফিনানস সেক্রেটারীর পার্সোনাল রিকোয়েস্টে ওয়ার এফর্টের কথা ভেবে নরম হলুম। অকিনলেকের বিল পাস হলো। একদিন বাড়িতে এসো, হোল এপিসোডটা তোমাকে বলবো। তোমরা তাজ্জব বনে যাবে। আর ইংরেজের গ্রেটনেস দেখো, এই ইনসিডেন্টের পরও আমাকে নাইটহুড দিলে তো!"

স্যর ব্রায়ান রে বললেন, "তোমাদের বোর্ড মিটিং ক'টায় আরম্ভ করছো?"

"ঠিক সাড়ে-এগারটায়।"

"আমি তো জানো ভুল করে টমলিন্স লিমিটেডে চলে যাচ্ছিলাম। তারপর খেয়াল হলো ওদের বোর্ড মিটিং সাড়ে-তিনটের সময়।"

"রিটায়ার করেও যে একটু বিশ্রাম পাবেন তার উপায় নেই," সেনগুপ্ত দুঃখ প্রকাশ করেন।

মাথা নাড়লেন স্যর বরেন রে। বললেন, "তোমাকে কী বলবো নীলাম্বর। প্রায় রোজই বোর্ড মিটিং লেগে রয়েছে। একটা নয়, দুটো নয়, কুড়িটা কোম্পানির ডিরেকটর, বুঝতেই পারছো।"

"তাও ভাগ্যে কোম্পানিজ অ্যাক্টে বলেছে যে, কুড়িটা কোম্পানির বেশি ডিরেকটর হওয়া যাবে না, তাই! না-হলে আরও অনেক কোম্পানি আপনাকে ধরাধরি করতো!"

"ধরাধরি করলে কী হবে? আমি তো আর তোমাদের জন্যে দশভূজা হতে পারবো না!"

স্যর বরেন এবার আপন মনে বিড়বিড় করতে-করতে বোর্ড-রুমের মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

সেনগুপ্ত সাহেব ফিসফিস করে বললেন, "একেবারে আদর্শ ডিরেকটর। বাহাত্তর বছর বয়স। সারাক্ষণ চেয়ারে বসে ঢোলেন, কখনও একটা প্রশ্ন করেন না। তারপর ভোটের কথা উঠলে বলেন, মিস্টার ফেরিসের সঙ্গে আমি একমত। আজকাল অবশ্য একটু শরীর খারাপ হয়েছে—গতবার তো মিটিংয়ের

মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, গলা দিয়ে ঘড়ঘড় করে আওয়াজ বেরুচ্ছিল।”

স্যর বরেন রে-র প্রায় পিছন-পিছন ঢুকলেন কুমার জগদীশ। স্যর বরেনের সঙ্গে ম্যাচ করেই যে ওঁকে বোর্ডে নেওয়া হয়েছে। স্যর বরেন যেমন রোগা, ইনি আকারে তেমনি বিশাল। কুমার জগদীশ অত্যন্ত ফর্মাল মানুষ। সেনগুপ্তকে গ্রীট করে গম্ভীরভাবে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন। সেনগুপ্ত বললেন, “আমাদের বোর্ডের গুরুত্ব যে এঁর জন্যে বেড়েছে একথা সবাইকে স্বীকার করতে হবে। ভদ্রলোকের বাবা ছিলেন রাজা হরিদাস অফ উলুবেড়িয়া। কিন্তু ইনি এতই কৃপণ যে বাবার মৃত্যুর পরে ওয়ার ফাণ্ডে চাঁদা দিয়ে এবং অন্য খরচ-খরচা করে আর রাজা উপাধি নিলেন না। ইংরেজের খাতায় চিরকুমার রয়ে গেলেন। উলুবেড়েতে বেশির ভাগ সময় থাকেন, ওখান থেকেই রেগুলার যাতায়াত করেন।”

বোর্ডের অন্যান্য ডিরেকটরদের এবার মিস্টার ফেরিসের সঙ্গে দেখা গেল। কফি সম্পর্কে মিস চক্রবর্তীকে নির্দেশ দিয়ে, সেনগুপ্ত এবার অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

বোর্ড-রুমটা খালি অবস্থায় অনেকবার দেখেছে শ্যামলেন্দু। কিন্তু বোর্ডের কোনো মিটিং সে দেখেনি। আজ এই ভিজিটরস রুমে বসে হঠাৎ যেন বোর্ড-রুম সম্বন্ধে একটা বিশেষ কৌতূহল জাগছে তার মনে। আফটার অল, যে-পোস্টে সে রয়েছে, তার ঠিক ওপরেই তো কোম্পানির সর্বক্ষণের ডিরেকটররা। আর এই বোর্ডেই তো কোম্পানির ভাগ্য নির্ধারিত হয়। বোর্ডই তো সর্বেসর্বা।

“গুড মর্নিং,” রুণু সান্যালের গলা।

একটা স্বচ্ছ প্লাস্টিক ফোল্ডার হাতে সান্যাল এসে সামনে দাঁড়ালো। রুণু এবার শ্যামলেন্দুর পাশে বসে পড়লো। পকেট থেকে সিগারেট বার করে অ[illegible] করলো। তারপর নিজের সিগারেটটা লাইটারের উপর ঠুকতে-ঠুকতে বল[illegible] “আর বলো কেন, বোর্ডের তলব। সব কাজকর্ম ফেলে ছুটে আসতে হলো। ফেরিস সায়েবের সেক্রেটারী বলে পাঠালেন, কাছাকাছি ওয়েট করো। গতকাল যে-নোটটা দিয়েছো, সে-সম্বন্ধে দরকার হলে কোশ্চেন করতে পারে।”

“আমাকেও তো একই কারণে বসে থাকতে বললো,” শ্যামলেন্দু উত্তর দেয়।

“আর পারা যায় না, ডেভিডসন সায়েব ফিরলে বাঁচি। সেই যে বিলেতে গিয়ে বসে রইলেন।”

এরপর দুজনে আর বেশি কথা হয়নি। দুজনেই চুপচাপ সিগারেট টেনে গিয়েছে। শ্রীলা চক্রবর্তী শুধু একবার ভিতরে কফি পাঠাবার সময় জিজ্ঞেস করে গেল, কফি দেবে কিনা।

সিগারেটের সঙ্গে কফিও শেষ করেছে দুজনে—অর্থাৎ হিন্দুস্থান পিটার্স্ সেল্‌স-এর দুই ডিভিসনের দুই তরুণ প্রধান, শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জি এবং রণবীর সান্যাল।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু ডাক হলো না। সেনগুপ্ত সায়েব একবার বেরিয়ে এসে বলে গেলেন, "বোর্ড আজকে অন্য ব্যাপারে আলোচনা করছেন। ফেরিস সায়েব আপনাদের ধন্যবাদ দিয়েছেন। বলেছেন আপনাদের আর অপেক্ষা করবার দরকার নেই।"

"আঃ বাঁচা গেল।" দুজনেই একসঙ্গে প্রকাশ্যে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো। একটা অপ্রিয় দায়িত্বের বোঝা যেন ঘাড় থেকে নেমে গেল। দুজনে একসঙ্গে এবার লিফটে উঠলো।

প্লাস্টিকের ফোল্ডার আলতোভাবে হাতে ঝুলিয়ে, এগজিকিউটিভ স্টাইলে মার্চ করে দুজন এবার দুজনের কেবিনে ঢুকে পড়লো।

ঘরে ঢুকে শ্যামলেন্দু চেয়ারে বসে রইলো কয়েক মিনিট। মুখে যাই বলুক, একটু হতাশ হয়েছে সে। মনের মধ্যে একটা মধুর প্রত্যাশা জেগেছিল। বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে, মুখোমুখি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মধ্যে একটা সম্মান আছে, একটা নাটকীয়তা আছে, একটা গুরুতর দায়িত্বের স্বীকৃতি আছে। সেই সুযোগটা অল্পের জন্য হাতছাড়া হয়ে গেল।

রুণু সান্যাল তার ঘর থেকে আর্জেন্ট কল বুক করলো, "মাই ফ্ল্যাট প্লিজ।"

"হ্যালো, বিবি? আমি বলছি!"

"বলো, কী হলো? বোর্ড মিটিং শেষ হয়ে গেল?"

"শোনো, ব্যাপারটা তেমন কিছু ইমপর্ট্যান্ট নয়, মনে হচ্ছে। আমি অবশ্য ফেরিস সায়েবের কাছ থেকে খবর পেয়েই তোমাকে জানিয়ে দিয়েছিলাম। এই ফিরলাম। ভাবলাম এখনই বলে দিই, না-হলে তুমি হয়তো চিন্তা করবে।"

"চিন্তার কথাই তো। আমি তো ফেরাজিনির লেডিজ কফি মিটে যেতে পারলাম না! খবরটা শোনা পর্যন্ত টেলিফোনের কাছে বসে আছি। যাই হোক, বাড়িতে এলে সব শুনবো। তবে, এটা একটা সম্মানও বটে। ডেভিডসন সাহেবের অনুপস্থিতিতে তোমাকে ডেকে পাঠালো," সান্যাল-গৃহিণী মন্তব্য করলেন।

রুণু সান্যালের কণ্ঠস্বর এবার বিব্রত শোনালো। "বিবি, আমি ভেবেছিলাম, শুধু আমাকেই ডেকেছে। কিন্তু গিয়ে দেখি শ্যামলেন্দুও বসে আছে। ওকেও ডেকেছিল নিশ্চয়।"

"ডাকুক গে যাক। তুমি চিন্তা কোরো না। যদি তুমি প্রয়োজন মনে

করো, আমি রাঙা মাসিমাকে ফোন করে রাখি। মেসোমশায় তোমাদের বোর্ড মিটিং থেকে ফিরলেই যেন জিজ্ঞেস করে রাখে ব্যাপারটা কী। তারপর তোমায় জানিয়ে দেবো।"

"তুমি স্যর বরেনের কথা বলছো? উনি তাড়াতাড়ি ফিরবেন না। বোর্ডের মিটিংয়ের পর লাঞ্চ আছে নিশ্চয়। তাছাড়া টেলিফোন করাটা ভাল দেখাবে না।"

"বা-রে, আমি আমার মায়ের দিদিকে ফোন করতে পারি না? তোমার বউ হলেও, এটা আমার ফাণ্ডামেণ্টাল রাইট!"

"বিবি, ভেবে দেখি একটু। আফটার অল, ডিরেকটর। আর যা-তা কোম্পানির ডিরেকটর নয়, হিন্দুস্থান পিটারস্-এর ডিরেকটর।"

"তোমাদের কাছে ডিরেকটর। কিন্তু আমাদের কাছে, নতুন মেসোমশায়," বিবি উত্তর দেয়।

"ইয়েস, কিন্তু—।"

"এতে আবার কিন্তু কি?"

"তোমাদের মেসোমশায় হলেন পুরানো আই-সি-এস। এঁরা হলেন স্টীল ফ্রেম। জানো তো? হয়তো ব্যাপারটা পছন্দ নাও করতে পারেন।"

"অল রাইট। তুমি যখন হেজিটেট করছো ডার্লিং, তখন আমি রাঙা মাসিমাকে জাস্ট একটা কার্টসি ফোন করছি। স্রেফ সৌজন্যের জন্যে। অর্ডিনারি, হ্যালো মাসি, কেমন আছো, মেসো কেমন, এটসেটরা, এটসেটরা।"

"সেটা ব্যাড আইডিয়া নয়," রুণু স্বীকার করে।

গৃহিণী বললেন, "আচ্ছা ডার্লিং ড্রাইভারকে বোলো আমার সিগারেটটা একেবারে ফুরিয়ে গিয়েছে। বেশ মুশকিলে পড়ে গেছি। যত তাড়াতাড়ি পারে যেন পাঁচ প্যাকেট বেনসন এ্যাণ্ড হেজেস নিয়ে আসে। এখন রাখছি।"

শ্যামলেন্দু ইতিমধ্যে কিছু চিঠি ডিকটেশন শেষ করে ফেলেছে। কয়েকটা টেলেক্সের জবাবও দিয়েছে।

আজকাল এই নতুন উৎপাত শুরু হয়েছে—টেলেক্স। টেলিগ্রাম তবু ফেলে রাখা চলতো। যারা পাঠাচ্ছে, তারা জানতে পারছে না কখন টেলিগ্রাম হেড অফিসে পৌঁছচ্ছে। এখন প্রতিটা ব্রাঞ্চ অফিসে টেলেক্স মেশিন বসানো হয়েছে। কথায়-কথায় টেলিফোনের মতো ডায়াল ঘুরিয়ে মেসেজ টাইপ করে দিচ্ছে। সঙ্গে-সঙ্গে হেড অফিসের টেলেক্স রুমের মেশিনে তা ছাপা হয়ে যাচ্ছে। মেসেজের শেষে লেখা থাকে—আপনার টেলেক্স উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করছি। ফলে সিদ্ধান্ত না নিয়ে উপায় নেই। অনেক ম্যানেজার

তো চিঠি লেখাই ছেড়ে দিয়েছে—সারাক্ষণই টেলেক্সের ওপরে রয়েছে। এ-সম্বন্ধে একটা সার্কুলার দেওয়া দরকার—এ বছরে টেলেক্সের বিলই কয়েক লাখ টাকা হবে। বিশেষ জরুরী দরকার না হলে যেন এই যন্ত্র ব্যবহার না করা হয়—কারণ ডাক ও তার বিভাগ বিল বাড়িয়ে যাবে।

শ্যামলেন্দুর ফোনটাও এবার বেজে উঠলো।

"চ্যাটার্জি।" শ্যামলেন্দু টেলিফোনে নিজের নাম ঘোষণা করলো।

"আমি বলছি।" গলার স্বর শুনেই 'আমি' কে বুঝে নিতে দেরি হলো না।

দোলন বললো, "আগে একবার ফোন করেছিলাম। মিসেস অ্যাণ্ডারসন বললো, তুমি বোর্ড মিটিং অ্যাটেণ্ড করতে গিয়েছো। কী ব্যাপার? স্পেশাল কিছু নাকি? আগে তো বলোনি?"

"ঠিক ছিল না কিছু দোলন। আজ সকালেই এম-ডি হুকুম করলেন। ডেভিডসন সায়েব নেই তো," শ্যামলেন্দু উত্তর দেয়।

"তাহলে তো ভাল খবর। ডেভিডসন সায়েব না-থাকলে বড় সায়েব তোমাকেই ডাকছেন," অন্য প্রান্ত থেকে দোলনের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

"আমাকে একা ডাকেননি, দোলন। রুণুকেও এম-ডি ডেকেছিলেন," শ্যামলেন্দু নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে দোলনের উৎসাহ-অনলে জল ছিটিয়ে দিলো।

দোলন বললো, "শোনো, একটা সুখবর আছে। একটু আগেই টেলিগ্রাম পেলাম। সুদর্শনা আসছে। কাল সকালের ট্রেনে। স্টেশনে অ্যাটেণ্ড করতে লিখেছে।"

"তাই নাকি? আগে তো চিঠিপত্তর দেয়নি?"

"ওদের রকম-সকমই ওই রকম, জানো তো। কিন্তু খুব আনন্দ হচ্ছে আমার।"

"আনন্দ হবারই তো কথা, দোলন। ক'টা দিন হৈ-হৈ করা যাবে।"
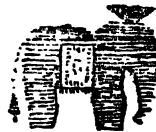
হাওড়া স্টেশনের এই ভোরবেলাটা যে এত সুন্দর তা শ্যামলেন্দুর খেয়াল ছিল না। অনেকদিন রেলওয়ে স্টেশনের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। যাতায়াত এখন যা-কিছু হয় তা দমদম বিমান বন্দর থেকে। হিন্দুস্থান পিটার্স্‌-এর ছোকরা সেলস্‌ম্যান ছাড়া আর কেউই আজকাল ট্রেনে চড়ে না।

সিগারেট টানতে-টানতে শ্যামলেন্দু বললো, "দোলন, তোমার মনে পড়ে

কলেজে আমরা দুজনেই যাযাবরের লেখা 'দৃষ্টিপাত' প্রায় মুখস্থ করে ফেলেছিলাম। তাতে এই রেল-ভারসাস-এরোপ্লেন সম্বন্ধে একটা কথা ছিল : 'বিজ্ঞান দিয়েছে বেগ, কেড়ে নিয়েছে আবেগ'।"

দোলন হেসে ফেললো। "বেশ মনে আছে। তুমিই তো আমার জন্মদিনে বইটা উপহার দিয়েছিলে। পাটনার কোথাও বইটা নিশ্চয়ই পড়ে আছে। সুদর্শনাকে বললে হতো, ও নিয়ে আসতে পারতো। হাজার হোক তোমার দেওয়া প্রথম উপহার।"

"এখন বইটা রিভাইজ করলে, যাযাবর নিশ্চয় লাইনটা সংশোধন করতেন। এখন রেলে চড়া মানে হাজার রকমের দুশ্চিন্তা। টিকিট কাটার দুশ্চিন্তা, হাওড়া ব্রিজে ট্রাফিক জ্যামের দুশ্চিন্তা, কুলির সঙ্গে মারামারির দুশ্চিন্তা। তাছাড়া আছে স্ট্রাইক, তামার তার চুরি, ফিস প্লেট অপসারণ, বাংলা বন্ধ, বিহার বন্ধ, আরও কত কি ! এর মধ্যে কী আবেগ আছে বাবা ! এরোপ্লেন এখনও অতটা খারাপ হয়নি।"

দোলন বললো, "মনে আছে তোমার ? তখন নতুন চাকরিতে ঢুকেছ তুমি। আমি তখন পাটনায়। তোমার দিল্লী যাবার কথা। তুমি ঠিক করলে দিল্লী এক্সপ্রেসে যাবে, যাতে পাটনা স্টেশনে অন্তত কিছুক্ষণ দেখা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তুমি এলে না। আমি লজ্জায় মরে যাই। কাউকে না বলে, সুদর্শনাকে সঙ্গে করে স্টেশনে এসে এত বড় ট্রেনটার এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত ঘুরে বেড়াচ্ছি। কিন্তু কোথায় তুমি ! আমার তখন এমন অভিমান হয়েছিল কী বলবো। চোখে জল এসে গিয়েছিল। সুদর্শনা বলেছিল, 'দিদি তোর চোখে জল এসে গেল কেন ? এই তো দু সপ্তাহ হলো কলকাতা থেকে এসেছিস।' আমি মনে-মনে বলেছিলুম আর একটু বয়স বাড়ুক। বিয়ে হোক, তখন বুঝবি দু সপ্তাহ জিনিসটা কি। একটা চোদ্দ বছরের মেয়ে কি করে বুঝবে, একজনকে খুঁজে না পেয়ে দিদির চোখে জল আসছে কেন ?"

শ্যামলেন্দু হাসলো। "আমার কিন্তু দোষ ছিল না। ডেভিডসন সায়েব বললেন, না, তোমাকে প্লেনে যেতে হবে। রেলে ভাড়া কম, কিন্তু সময় বেশি লাগে। আর সময়ের দামটা আমাদের কাছে অনেক। জেট প্লেনের যুগে অফিসারের সময় ট্রেনে বসে নষ্ট করবার জন্যে নয়।"

"কাগজের রিপোর্ট পড়ে-পড়ে ট্রেনে চড়তে ভয় ধরে গিয়েছে। কিন্তু দোলন, আজকে হাওড়া স্টেশনটা বেশ ভাল লাগছে," শ্যামলেন্দু বললো।

"সেটা স্টেশনের জন্যে, না শ্যালিকার জন্যে ?" দোলন রসিকতা করে।

"শ্যালিকা তো এখনও আবির্ভূতা হননি, দোলন !" শ্যামলেন্দু উত্তর দেয়।

দূরে ডিসট্যাণ্ট সিগন্যালের কাছে এবার ইলেকট্রিক ট্রেনের এঞ্জিনটা দেখা গেল। একেবারে নির্ধারিত সময়েই গাড়িটা আসছে।

ইলেকট্রিক ট্রেনের এঞ্জিন শ্যামলেন্দুর ভাল লাগলো না। কেমন যেন উন্নাসিক। সুন্দরী মহিলার মতো বৈদ্যুতিক ঔদ্ধত্যে ছুটে এসে টুক করে থেমে গেল। অথচ আগেকার বাষ্পীয় এঞ্জিনগুলো কেমন হাঁপাতো—লম্বা দৌড়ের পর ম্যারাথন রানাররা যেমনভাবে হাঁপায়। এবারের বিজনেস উইক কাগজে বিলেতের সবচেয়ে বড় কোম্পানির চেয়ারম্যানের জীবনী বেরিয়েছে। অফিসের বাইরে, তাঁর শখ হলো রেল এঞ্জিন মেরামত করা। নিজের বাড়িতে একটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড বাষ্পীয় লোকোমোটিভ কিনে রেখেছেন। সেইখানেই শনি-রবিবার খুটখাট করেন। তাঁর মতে শিল্প-বিপ্লবের পর থেকে মানুষ আজ পর্যন্ত যত কল তৈরি করেছে, তার মধ্যে সবচেয়ে মনোহারী এবং সবচেয়ে মানবিক হলো এই বাষ্পীয় এঞ্জিন।

হাওড়া স্টেশনটা হঠাৎ যেন ঘুম ভেঙে উঠে পড়লো! নিঃশব্দ ছ'নম্বর প্ল্যাটফরমটা এবার সরব শিশুর কলহাস্যে মুখরিত হয়ে উঠলো।

শ্যামলেন্দু বললে, "দোলন, তুমি কি এক কোণে দাঁড়াবে? আমি সুদর্শনাকে খুঁজে বার করি।"

"উঁহু! আমার বোনকে আমি বুঝি খুঁজে বার করতে পারব না?" গম্ভীর ভাবে দোলন ছেলেমানুষের মতো উত্তর দেয়। তারপর দুজনে একসঙ্গে হেসে ওঠে।

থার্ড ক্লাস স্লিপিং কম্পার্টমেণ্টের দরজার সামনেই সুদর্শনা ভট্টাচার্যকে দেখা গেল। সাধারণ বাঙালী মেয়ের তুলনায় একটু লম্বাই বটে। সুদর্শনার রঙটা দিদির থেকেও হলুদ। আর আছে পশ্চিমী লাবণ্য, যা স্বাস্থ্য থেকে আসে, যাকে কলকাতার মেয়েরা চিরকাল হিংসে করে এসেছে। স্নিগ্ধ লাবণ্যের সঙ্গে বুদ্ধির দীপ্তি ছড়িয়ে রয়েছে সুদর্শনার সমস্ত মুখে। কিন্তু সে দীপ্তি চোখ ধাঁধায় না—ঠিক যেন দুধ সাদা পিটারস্ ল্যাম্প, যা আলো ছড়ায় কিন্তু জ্বালা দেয় না!

দিদি-জামাইবাবুকে দেখে সুদর্শনা হাত নাড়াতে লাগলো। তারপর কুলিদের পাশ কাটিয়ে ট্রেন থেকে নেমে এসে দিদিকে জড়িয়ে ধরলো। "তুই কেমন আছিস দিদি? কতদিন তোর সঙ্গে দেখা হয় না।"

শ্যামলেন্দু এবার কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে শ্যালিকাকে মনে করিয়ে দিলো, "দিদির পাশে শ্যামলদাও দাঁড়িয়ে আছেন। দিদিকে যেভাবে গ্রীটিং জানালে, ঠিক সেইভাবে এবার তাঁকেও অভিনন্দন জানানো উচিত।"

"ইস্! দিদি আর জামাইবাবু এক জিনিস নাকি?" সুদর্শনা প্রথমে মুখ

কুঁচকে এবং পরে মিষ্টি হেসে শ্যামলদার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে।

দিদিও কম যায় না! গম্ভীরভাবে বললে, "দিদির থেকে জামাইবাবু কুমারী মেয়েদের কাছে অনেক আদরের, অনেক মূল্যবান।"

জামাইবাবু বললেন, "দাঁড়াও, আগে লগেজগুলোর খোঁজ করি। না হলে ওগুলো লোপাট হবে।"

"লগেজ বলতে আমার এই চামড়ার ব্যাগটা," সুদর্শনা হেসে দেখিয়ে দিলো। "আর কাঁধে-ঝোলানো এই থলেটা।"

"শান্তিনিকেতনী থলেতে অনেক জিনিস ধরে—কিন্তু ওটা কলকাতায় এখন আর ফ্যাশন নেই," দোলন বলে।

"আমাদের পশ্চিমে, দিদি এই ব্যাগটা এখনও আউট অফ-ফ্যাশন হয়নি," সুদর্শনা উত্তর দেয়।

দিদি ফিস-ফিস করে বললে, "এখানেও হতো না। কিন্তু জানিস…" দিদি একটু থামলো।

"কী জানব?" সুদর্শনা জানতে চায়।

"এখন যেসব মেয়ে পলিটিক্স করে, মিছিলে বেরোয়, আমাদের দাবি মানতে হবে বলে চিৎকার করে, তাদের কাঁধে এই ব্যাগ থাকে। আর এই ব্যাগ ব্যবহার করে আমেরিকান হিপিনীরা। ন্যাচারালি, গেরস্ত মেয়েমহলে এটা এখন দেখলে একটু ঘাবড়ে যেতে হয়!"

কুলির হাতে ব্যাগটা দিয়ে ওরা সকলে ক্যাব রোডের দিকে হাঁটতে আরম্ভ করলে। ওইখানেই শ্যামলেন্দুর গাড়িটা পার্ক করে রেখেছে।

যেতে-যেতে দোলন জিজ্ঞেস করলে, "ট্রেনে তোর কোনো অসুবিধে হয়নি তো?"

"অসুবিধে কি বলছিস দিদি? রাজার হালে ঘুমিয়ে চলে এলাম।"

"ব্যাকরণে ভুল হলো—রানীর হালে বলো।" শ্যামলেন্দু রসিকতা করলে।

"আজকালকার থার্ড ক্লাসগুলো ভালই করেছে, তাই না?" দোলন জিজ্ঞেস করে। থার্ড ক্লাসের ভিতরটা সে প্রায় ভুলেই গিয়েছে। বিয়ের পর একবার-না-দুবার ট্রেনে চড়েছিল—তাও এয়ারকণ্ডিশন ক্লাসে। সত্যি কথা বলতে কি থার্ড ক্লাসের কথা মনে হলেই তার ভয় লাগে।

ক্যাব রোডের ওপরেই শ্যামলেন্দুর গাড়িটা অপেক্ষা করছিল। মালপত্তর পিছনে রেখে শ্যামলেন্দু গাড়ির দরজা খুলে দিলো।

সুদর্শনা বললে, "দাঁড়াও, তোমাদের দুজনকে একটু ভাল করে দেখে নিই।"

"শ্যামলদা, ঠিক মনে হচ্ছে সিনেমা দেখছি। আপনাকে একেবারে

উত্তমকুমার মনে হচ্ছে। চেহারাটা ফিল্মস্টারের মতোই স্মার্ট রেখেছেন। তারপর আবার সাদা শার্ট আর হাফ প্যান্ট পরে স্টেশনে এসেছেন।"

"সেটা অবশ্য সিনেমা স্টারের জন্যে নয়। সকালে গল্‌ফ খেলা ছিল। ভোর পাঁচটায় উঠে প্র্যাকটিশে গিয়েছিলাম। মার্চেন্টস কাপ গল্‌ফ তো এসে গেল। আমাদের স্কোরের ওপরই হিন্দুস্থান পিটারস্ লিমিটেডের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।"

"অতশত বুঝি না, তবে এই খেলোয়াড়ের ড্রেসে শ্যামলদাকে একেবারে ফিল্মস্টার মনে হচ্ছে। গল্পের হিরো যেন কাউকে রিসিভ করার জন্যে হাওড়া স্টেশনে এসেছে।"

সুদর্শনা এবার দিদির দিকে তাকালে। "শ্যামলদা যখন উত্তমকুমার, তখন তুই হলি সুচিত্রা সেন।" দিদিকে একটু খুঁটিয়ে দেখে বললে, "সুচিত্রা সেন কিন্তু একটু মোটা হয়ে গিয়েছে। এই হিরোর সঙ্গে ম্যাচ করতে গেলে আর একটু তন্বী হতে হবে।"

"বিয়ে হোক, তখন বুঝবি। বিয়ে-ওলা মেয়েদের ওপর ভগবানের রাগ আছে। যতই সাবধানে থাকো, যতই কম খাও, ঠিক ওজন বেড়ে যাবে," দোলন হেসে বলে।

"ও-সব বুঝি না দিদি। তুই শুধু মনে রাখবি তোর পুরো নাম দোলনচাঁপা —যে চাঁপা ফুল মৃদু-মন্দ বাতাসে দোলে!"

"সত্যি কি অদ্ভুত একটা নাম আমার ঘাড়ে চেপেছে," দোলন বলে।

"অদ্ভুত নাম! বল, কি মিষ্টি নাম! তাই না শ্যামলদা?" সুদর্শনা এবার জামাইবাবুকে দলে টানবার চেষ্টা করলে।

শ্যামলেন্দু বললে, "মিষ্টি নাম এবং আনকমন নাম।"

"কমন কী করে হবে?" সুদর্শনা বলে। "দিদির নামটা কে দিয়েছিলেন সেটা দেখতে হবে তো! পথের পাঁচালীর লেখক স্বয়ং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। দিদি, তোকে কোলে করে বিভূতিবাবু দাঁড়িয়ে আছেন যে-ছবিটায় সেটা সেদিন অ্যালবামে দেখলাম। অ্যালবামটা সেদিন হঠাৎ খুঁজে পাওয়া গেল। বাবা বললেন, বিভূতিবাবু সেবার পাটনায় এসে আমাদের বাড়িতে উঠেছিলেন। বাবা ওঁকে ধরেছিলেন, তোর একটা নাম দিয়ে দিতে। তুই নাকি মেঝেতে বসে-বসে খুব দোল খাচ্ছিলি। তাই বিভূতিবাবু লিখে দিলেন—দোলনচাঁপা।"

"আঃ টুটুল, তুই গাড়িতে ওঠ," দোলন একটু লজ্জা পেয়ে সুদর্শনাকে ঠেলে দিলো।

"আগে কথাটা শেষ করতে দে। আগে নিজে দোল খেতিস, এখন শ্যামলদাকে দোলা দিচ্ছিস।"

শ্যামলেন্দু বললে, "শুধু দোলা নয়, রেগে গেলে ঝাঁকুনিও দিচ্ছে তোমার দিদি।"

"তাছাড়া উপায় কী? দেখিস না ওষুধের শিশিতে লেখা থাকে, *Shake the bottle before use*—ব্যবহারের আগে ভাল করে ঝাঁকিয়ে নাও।"

দোলনের কথায় হাসির ফোয়ারা উঠলো। দোলন এবার গাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লো। ড্রাইভারের সীটে বসতে-বসতে শ্যামলেন্দু বললে, "ড্রাইভারের পাশে সুদর্শনাকে দিচ্ছ, তারপর যদি মনঃসংযোগের অভাবে ড্রাইভার অ্যাক্সিডেণ্ট করে বসে!"

"আঃ শ্যামলদা! দিদি পাশে না-থাকলে ড্রাইভারের অনুপ্রেরণা আসবে না, সেটাই বলুন।"

"কমারসিয়াল ফার্মের এগজিকিউটিভ। ওদের অনুপ্রেরণার দরকার হয় না—বোতাম টিপে দিলেই যন্ত্রের মতো ওরা চলতে আরম্ভ করে।" দোলন বলে বসলো।

শ্যামলেন্দু কথাটা শুনলো, কিন্তু উত্তর দিলো না।

গাড়ি চলতে শুরু করেছে। টুটুল বললে, "কতদিন পরে তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। দিদি তবু আড়াই বছর আগে একবার পাটনায় গিয়েছিল। আর শ্যামলদা, আপনি তো ডুমুরের ফুল।"

"সত্যি, তোমাদের সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয় না," শ্যামলেন্দু স্বীকার করে।

"ভাবছেন দোষ স্বীকার করে নিলেই শাস্তি মুকুব হবে। মোটেই তা নয়। আমি তো ঠিক করে এসেছিলাম আপনার সঙ্গে কথাই বলবো না।"

"এমন সুন্দরী, শিক্ষিতা, স্বাস্থ্যবতী শ্যালিকা কাছে থেকেও যদি কথা না বলে তাহলে বেঁচে লাভ কী?" স্টিয়ারিং ঘুরোতে-ঘুরোতে শ্যামলেন্দু বলে।

"দিদিটাকে বিয়ে করে সেই যে পাটনা ত্যাগ করলেন, তারপর আর পাটনার কথা মনে পড়ে না, তাই না?" সুদর্শনা আবার মধুর অনুযোগ করে।

"তা ঠিক নয়, টুটুল। পাকে-চক্রে হয়ে ওঠে না। হিন্দুস্থান পিটারস্-এর অফিসে কীভাবে যে দিনগুলো কেটে যাচ্ছে তার হিসেবই থাকে না।"

"দিদি যদি আপনার গলায় মালা না দিয়ে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতো, দেখতাম কেমন পাটনায় না হাজির হতেন।"

"রসিকতা করছি না টুটুল। পাটনায় আমার অফিসের তেমন কাজ পড়ে না। আমাকে দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ এই মেট্রোপলিটান শহরগুলো চষে

বেড়াতে হয়।"

"কেন, পাটনায় কি কেউ হিন্দুস্থান পিটারস্-এর ইলেকট্রিক পাখা কেনে না? আমিই তো একমাস আগে স্কলারশিপের টাকা জমিয়ে একটা পিটারস্ ফ্যান কিনলুম! দোকানদার তো অন্য ফ্যান গছাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু, বাবা জামাই-স্নেহে অন্ধ এবং মা জামাই-গরবে গরবিনী। ওঁরা দুজনে বলে দিয়েছিলেন পিটারস্ ফ্যান ছাড়া যেন অন্য কিছু না কিনি! আমি সত্যি বলছি, এত রেগেছিলুম যে অন্য ফ্যান কিনতুম। নেহাত পিতৃআদেশ, তাই টাকা বেশি দিয়ে আপনার ফ্যান কিনতে হলো।"

"পৃথিবীর কোনো ভাল জিনিসই সস্তায় পাওয়া যায় না, টুটুল।" গাড়ির মোড় ঘোরাতে-ঘোরাতে শ্যালিকার সঙ্গে রসিকতা করলে শ্যামলেন্দু।

"দাম বেশি হলেই জিনিস ভাল হয় না শ্যামলদা। ভ্যালু এবং প্রাইস এক নয়," সুদর্শনা সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দেয়।

মিটমিট করে হেসে শ্যামলেন্দু বললে, "পিটারস্ ফ্যান কাজে সেরা তাই দামেও সেরা হতে বাধা কী? এই কথাই তো আমাদের কর্মচারিদের সব সময় বলছি।"

"রাখুন, রাখুন শ্যামলদা। বিজ্ঞাপনের মোহজাল রচনা করে আপনারা স্বাধীন সমাজের সরল খরিদ্দারদের এক ধরনের দাস করে তুলছেন। সোশ্যালিজমের একটু-আধটু হাওয়া পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়েও পৌঁছে গিয়েছে। ভুলবেন না, আপনার শ্যালিকা দুটো বছর ইকনমিক্স মন দিয়ে পড়ে সবে এম-এ পরীক্ষা দিয়ে পাটনা ত্যাগ করেছে।"

"ওরে বাবা! টুটুল তুমি যে ক্যাপিটালিস্টদের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক কথাবার্তা শুরু করলে, তোমার বক্তব্যটা কী?"

"খুব সোজা! সেরা জিনিসের লোভ দেখিয়ে ব্যবসাদাররা বেশি পয়সা আদায় করছে, অথচ পৃথিবীর আসল সেরা জিনিসগুলো রোদ, হাওয়া, সূর্যের আলো, চাঁদের জ্যোৎস্না এখনও কোনো দাম না-দিয়েই পাওয়া যায়। আর মানুষও এখনো তার সেরা জিনিস বিলিয়ে দেয়, যেমন আপনি আপনার হৃদয়টি আমার দিদি কুমারী দোলনচাঁপা ভট্টাচার্যকে দিয়েছিলেন। শোনেননি রবীন্দ্রনাথের গান—'দেবো তারে যারে বিনামূল্যে দিতে পারি।"

"বিনামূল্যে পিটারস্ ফ্যান দেবার কথা আমরা কখনও ভাবিনি, তবে সহজ কিস্তিতে গ্রামে এবং শহরাঞ্চলে ফ্যান বিক্রি করবার একটা পরিকল্পনা আমরা বিবেচনা করে দেখছি।" শ্যামলেন্দু জবাব দিলো।

দোলন বলে উঠলো, "টুটুল, তুই দেখছি জামাইবাবুকে একটা মস্ত

সার্টিফিকেট দিয়ে দিলি। ভদ্রলোক মোটেই বিনামূল্যে হৃদয়টিকে আমার কাছে বিলিয়ে দেননি। আমার কাছে ওই কিস্তিতে বিক্রি করেছেন—'এখন হাওয়া খাও, পরে দাম দিও' স্কিমে। তখনও বুঝিনি, এমন ঝানু সেল্‌সম্যানের খপ্পরে পড়েছি। এখন দফে-দফে মারছে—সুদ সমেত দাম তুলছে।"

দোলনের সরস মন্তব্যে দুজনেই হেসে উঠলো। টুটুল বললে, "ওঃ দিদি, তুই তো দেখছি বেশ চ্যাটাং-চ্যাটাং কথা শিখেছিস। আগে তো একেবারে তোর মুখ দিয়ে আওয়াজ বেরুতো না। কী করে যে শ্যামলদার সঙ্গে তুই প্রেম করলি তাই তোর বান্ধবীরা বুঝতে পারেনি।"

দোলন এবার কথা ফিরিয়ে ফেললে। বললে, "সেসব ওয়ান্স-আপন-এ টাইমের ব্যাপার। তুই তখন পুঁচকে মেয়েটা। এখন তুই বাড়ির কথা বল। বাবা মা কেমন আছেন?"

"বাবা ভাল আছেন। মাইনে পেলেই ইংরিজি সমালোচনা সাহিত্যের আরও বই কিনে আনছেন। আর মা রেগে উঠছেন। বলছেন, এসব কোথায় রাখবো? বাবার সেদিকে খেয়াল নেই। তাছাড়া মায়ের খবর মন্দ নয়। মাঝে মাঝে তোমাদের চিঠি না পেলে মেজাজ খারাপ করেন। একটু অভিমানও আছে—বিয়ে করে বড় মেয়ে পর হয়ে গিয়েছে। আসে না।"

"কথাটা মিথ্যে নয়। কিন্তু কি করি বল? গত বছর যাওয়া হয়নি, কাশ্মীরে ওঁদের সেল্‌স কনফারেন্স হলো। সেখান থেকে আমরা ছুটিতে গেলাম। এ-বছরের শেষে আবার বিলেত যাবার কথা রয়েছে।"

"তার মানে ছুটি নিয়ে হোমে যাচ্ছ?"

"দূর বোকা। বিলিতি অফিসে সায়েবরা হোমলিভ পান বিলেতে যাবার জন্যে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যত রাগ ইণ্ডিয়ান অফিসারদের ওপর। তাদের হোমলিভ বললে ফরেন এক্সচেঞ্জ আসে না, ওদের ক্ষেত্রে বলতে হয় ওভারসিজ ট্রেনিং অথবা এসাইনমেণ্ট।"

"শ্যামলদা তো এর আগে অফিসের কাজে পাঁচ-ছ'বার ইউরোপ ঘুরে এসেছে। এবার তুই শ্যামলদার সঙ্গে বিলেত যাচ্ছিস, সেইটাই বল না।"

"ঠিকই ধরেছিস।"

"ওঃ হাউ লাকি ইউ আর দিদি। কী কপাল করে তোর সঙ্গে শ্যামলদার দেখা হয়েছিল।"

"বলো তো একটু সুদর্শনা। তোমার দিদি ব্যাপারটা স্বীকার তো করেই না, উল্টে বলে আমার সঙ্গে বিয়ে হয়েই তোমার কপালটা খুললো। তুমি মানুষ হয়ে গেলে।"

সুদর্শনা রসিকতা করে উত্তর দিলো, "বিছানায় শুয়ে-শুয়ে তোমরা দুজনে এ-বিষয়ে ঝগড়া কোরো। আমার নিবেদন : শ্যামলদা, আপনি শুধু বউকে বিলেত নিয়ে যাবেন? আপনার একটি মাত্র শ্যালিকা, সে কী দোষ করলে?"

"কোনো দোষ করেনি। সত্যি কথা বলতে কি শ্যালিকা অরিজিন্যাল গৃহিণী অপেক্ষাও আদরের। সাধে কি কবি লিখেছেন শ্যালিকার উদ্দেশ্যে :

নহ মাতা নহ পিসী নহ শিশু নহ নাবালিকা।
হে অনন্তযৌবনা শ্যালিকা।
ওষ্ঠে যবে আলতা দিয়া ভালে পর খয়েরের টিপ,
চাহিয়া তোমার পানে বুক মোর করে ঢিপ্‌ঢিপ্‌,
মনে হয়, কেন আমি হলাম না দিল্লী বাদশাহ,
অথবা কুলিনপুত্র—গুষ্টিসুদ্ধ করিয়া বিবাহ
জীবন নির্বাহ
করিতাম মহানন্দে কুসুমে কুসুমে
পরিমল চুমে!"

দুই বোনেরই এবার হাসবার পালা। হাসতে-হাসতে সুদর্শনার সুন্দর মুখ আরও লাল হয়ে উঠছে। বললে, উঃ, শ্যামলদা, আপনার পেটে-পেটে এত রস।"

দোলন বললে, "কবিতাটা কবে স্টক করলে? কই আগে তো বলোনি?"

"আঃ! কী করে বলবো? তুমি তো ডানাকাটা পরী সম প্রস্ফুটিত যৌবন শ্যালিকা নও, তুমি যে ওয়াইফ!"

লর্ড সিনহা রোডের নতুন বাড়িটা এবার দেখা যাচ্ছে। দোলন দূর থেকে বাড়িটা টুটুলকে দেখিয়ে দিলো। "ওই আমাদের বাড়ি।"

"ভারি সুন্দর নামটা দিয়েছে—ব্লু হ্যাভেন," সুদর্শনা বললে। "ব্লু হেভেন বললেও কোনো আপত্তি ছিল না—সুনীল স্বর্গ—বেশ মিষ্টি নাম হতো।"

দোলন বললে, "আমরা থাকি দশ তলায়। বছরখানেক হলো বাড়িটা তৈরি হয়েছে, ত্রিশটা ফ্ল্যাট আছে। তার মধ্যে দশটা এদের কোম্পানির।"

দারোয়ানের জিম্মায় গাড়িটা রেখে শ্যামলেন্দু এবার স্ত্রী ও শ্যালিকাকে লিফটে চড়ালো। সুদর্শনা অবাক হয়ে দেখছে সামনের ফোয়ারাটা। খুব ভাল লাগছে। সুদর্শনা বললে, "দিদি, ঠিক যেন আমেরিকা-আমেরিকা মনে হচ্ছে, সিনেমায় আমেরিকাকে এমনি দেখায়।"

"একবার যখন এসেছিস তখন সহজে ছাড়ছি না। সব দেখবি আস্তে আস্তে," দোলন উত্তর দেয়।

সুদর্শনা বললে, "তোমাদের এই অঞ্চলটাও তো কলকাতা—কিন্তু কাগজে কলকাতা বলতে বোঝায় শুধু নোংরা, বোমা আর মিছিল!"

"তুই চুপ কর টুটুল। আজকে ছুটির দিনে আর ওসব কথা মনে করিয়ে দিস না। তোর জামাইবাবু সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত অফিসে এত পরিশ্রম করে যে ছুটির দিনে ওকে কোনো অপ্রিয় কথার মধ্যে ঢুকতে দিই না।"

"শনিবারে আপনাদের বুঝি ছুটি?" সুদর্শনা জিজ্ঞাসা করে।

"অন্যদিন আমরা একঘণ্টা বেশি কাজ করে পুষিয়ে দিই। তার বদলে শনিবার ছুটি। ছোটবেলায় অবশ্য আমরা দেখতাম একমাত্র মেয়ে ইস্কুলেই শনিবারে ক্লাস হতো না," শ্যামলেন্দু স্বীকার করে।

দোলন হাসলো। "মেয়ে ইস্কুল আর কলকাতা বোম্বাইয়ের সমস্ত সায়েব অফিস এক পর্যায়ে পড়ে গিয়েছে, বুঝলি?"

শ্যামলেন্দু এবার লিফটের বোতামটা টিপে দিলো। হু হু করে অটোমেটিক লিফট উপরে উঠে যাচ্ছে।

সুদর্শনার মুখে বিস্ময়ের ছাপ। "এরকম চালকহীন লিফটে আমি কখনও চড়িনি শ্যামলদা।"

"পাটনায় কে আর চড়েছে বলো?" শ্যামলেন্দু আশ্বাস দেয়। "আমারও কয়েক বছর আগে একই অবস্থা ছিল। তুমি বললে বিশ্বাস করবে না, প্রথম যখন হিন্দুস্থান পিটারস্-এর অফিসে ফাইনাল অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য এলাম, তখন লিফটে চড়তে সাহস হচ্ছিলো না। আমার ধারণা ছিল, লিফটে চড়তে হলে আলাদা পয়সা দিতে হয়।"

হেসে ফেললে দোলন। "তুমি আর লোক হাসিও না। তুমি বলতে চাও ন' বছর আগে তুমি এমন হাঁদাগঙ্গারাম ছিলে।"

"ন' বছর আগে কেন, দোলন, এখনও তো হাঁদাগঙ্গারাম রয়েছি," শ্যামলেন্দু উত্তর দেয়।

"আচ্ছা, এই লিফট যদি মাঝপথে খারাপ হয়ে যায়, তাহলে?" টুটুল সরল মনে প্রশ্ন করে।

"তাহলে লিফটের মধ্যেই গল্প-সল্প করে সময় কাটিয়ে দেওয়া যাবে যতক্ষণ না ফায়ার ব্রিগেডের লোকেরা মই নিয়ে আসে।" শ্যামলেন্দু হাসতে-হাসতে উত্তর দিলো।

"কেন বেচারাকে শুধু-শুধু ভয় পাইয়ে দিচ্ছ," দোলন স্বামীকে বকুনি দিলো! তারপর বোনকে আশ্বাস দিলো, "কী আর হবে? কোম্পানির মেকানিক রয়েছে সব সময়—ছুটে এসে ঠিক করে দেবে।"

শ্যামলেন্দু তবু রসিকতা বন্ধ করলে না। বললে, যদি নিউইয়র্কের মতো হঠাৎ বিদ্যুৎ বন্ধ হয়ে যায়? টাইম ম্যাগাজিনে রিপোর্ট পড়োনি? বহুলোক কয়েক ঘণ্টার জন্যে লিফটে আটকে পড়েছিল। বাইরে কী হচ্ছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। টোটাল ডার্কনেস। এমন ঘুটঘুটে অন্ধকার যে অনেকে ভাবলো বোধহয় কাছাকাছি এটম বোমা পড়েছে—কিংবা শেষের সেই ভয়ংকর দিন সমাগত।"

"তারপর?" সুদর্শনা জিজ্ঞেস করে। নিয়মিত টাইম ম্যাগাজিন পড়া ওর অভ্যাস নেই।

"তারপর?" শ্যামলেন্দুর মুখে দুষ্টু হাসি ফুটে উঠলো। "তুমি এখন সাবালিকা হয়েছো, তোমাকে বলা চলে। ঠিক মাস সপ্তাহ হিসেব করে যথাসময়ে দেখা গেল অনেক বেশি বাচ্চা জন্মালো নিউইয়র্কের হাসপাতালগুলোতে। বিখ্যাত বেবি বুম্।"

"যতসব ডার্টি জোক্স তোমার। ওসব আমেরিকানদের একটা পাবলিসিটি স্টাণ্ট! অন্য সব সমস্যা তোলা রইলো, কবে কোথায় হঠাৎ আলো নিভে গিয়েছিল বলে ক'টা বাচ্চা বেশি জন্মালো তাই হিসেব করতে বসলো," দোলন এবার স্বামীকে বকুনি লাগালো।

শ্যামলেন্দু মাথা চুলকে বললে, "বেশ, মন্তব্য প্রত্যাহার করলাম।"

দশতলায় উঠে লিফটও এবার দাঁড়িয়ে গিয়েছে। লিফটের দরজাটা আপনা-আপনি খুলে গেল। ওরা ল্যাণ্ডিং-এ নেমে পড়লো। বাঁদিকের দরজাতেই স্টেনলেস স্টীলের চকচকে ইংরিজী অক্ষরে লেখা রয়েছে—এস চ্যাটার্জি।

ব্যাগ থেকে চাবি বের করে ফ্ল্যাটের দরজা খুলে ফেললে দোলন।

সুদর্শনার ব্যাগটা ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে শ্যামলেন্দু বললে, "এবার আমাকে কিছুক্ষণের জন্যে মাপ করতে হবে। আমি বোঁ করে একবার অফিসটা ঘুরে আসি। কিছু এরিয়ার পড়ে আছে। লাঞ্চের আগেই কাজ সেরে চলে আসবো।"

"এক কাপ কফি খেয়ে যাবে না?" গৃহিণী জিজ্ঞেস করে।

"এখন আর নয়। গল্‌ফ ক্লাবে আমি এবং ফিনানস ডিরেকটর মিস্টার গর্ডন একসঙ্গে কফি খেয়ে নিয়েছি। তাছাড়া মিসেস অ্যাণ্ডারসন আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন। ওঁকে এক ঘণ্টার জন্যে আসতে বলেছি।"

"টানটা কাজের ওপর, না লেডি সেক্রেটারীর ওপর কে জানে," দোলন এবার বোনের কাছে অনুযোগ করে।

"এসব কি শুনছি, শ্যামলদা?" সুদর্শনা চোখ পাকায়।

"জামাইবাবুর অনুপস্থিতিতে দিদির কাছে আরও কত কি শুনবে!" বলে হাসতে-হাসতে শ্যামলেন্দু বিদায় নেয়।

"এই হচ্ছে তোর দিদির বাসা," বোনকে জড়িয়ে ধরে দোলন বললে। "আমাদের এই ফ্ল্যাটে সবসমেত ঢাকা জায়গা আছে ২৭৮০ স্কোয়ার ফুট।"

ড্রইং রুমটা দেখেই তো সুদর্শনা তাজ্জব। "একে তোরা ঘর বলিস দিদি? এ তো হল। এখানে মাইক লাগিয়ে মিটিং করা যায়!"

"তা যায়। যারা এই হলটা দেখে তারাই প্রশংসা করে। ইচ্ছে করলে গানের আসর বসানো যায়।"

গানের নেশা আছে সুদর্শনার। বললে, "কলকাতা হলো গানের কেন্দ্র। বড়-বড় গাইয়েদের নিশ্চয় তোরা বাড়িতে ডাকিস। শ্যামলদা তো রবীন্দ্রসঙ্গীতের খুব ভক্ত ছিল। আর তুই তো সেতার শুনতে পাগল ছিলিস।"

"সেসব অনেকদিন আগেকার কথা রে। ইচ্ছে ছিল বাড়িতে মাঝে-মাঝে গানবাজনার ব্যবস্থা করি। কিন্তু নানা ঝঞ্ঝাটে ওসব হয়ে ওঠে না। তোর জামাইবাবু ব্যস্ত থাকে। তাছাড়া ককটেল পার্টি, ডিনার পার্টি লেগেই রয়েছে। কথা অনেক হবে, তুই যখন এসে পড়েছিস। চল আগে তোকে তোর ঘরটা দেখিয়ে দিই।"

সুদর্শনা ব্যাগটা তুলতে যাচ্ছিলো। দোলন বললে, "তুই রেখে দে। আব্দুলকে ডাকছি।"

"ইউনিভারসিটির ট্যুরে দুবার বেরিয়ে মাল-বওয়া আমার অভ্যাস হয়ে গেছে, দিদি।"

"বাজে বকিস না। ওরাও একটু কাজ করুক। দু-দুটো লোককে কোম্পানি মাস-মাস মাইনে দিচ্ছে কেন?" দোলন উত্তর দেয়।

অগত্যা টুটুলকে খালি হাতেই এগোতে হলো। "দিদি তোদের কার্পেটটা তো অদ্ভুত রকমের। তুলোয় যেন স্প্রিং লাগানো আছে।"

"না রে পার্সিয়ান কার্পেট নয়। তবে জেনুইন মির্জাপুরে তৈরি। দেওয়াল-থেকে-দেওয়াল মাপ নিয়ে স্পেশাল অর্ডার দেওয়া হয়েছিল। আর তলায় ডানলোপিলো আণ্ডারলে পাতা আছে। এটাও কোম্পানি কিনে দিয়েছে।"

"বারে ভারি মজা তো!" সুদর্শনা তার বিস্ময় চেপে রাখতে পারে না।

"জেনুইন পার্সিয়ান বোখারা কার্পেট পায় ডিরেকটররা। সে কার্পেটে পা পড়লে তুই তফাৎটা বুঝতে পারবি," দোলন কোমরে ঝোলানো ঝুমকো-লাগানো চাবির রিং সামলাতে-সামলাতে বলে।

দোলন আবার বলতে আরম্ভ করলো, "ড্রইং হল ছাড়া, আছে আরও দুটো বেড রুম ; একটায় আমরা শুই আর একটায় রাজা যখন আজমীরের পাবলিক স্কুল থেকে ফেরে তখন শোয়। আর একটা গেস্ট রুম। তাছাড়া আছে ওর স্টাডি, ডাইনিং রুম, কিচেন, প্যানট্রি, ঢাকা ব্যালকনি এবং বক্স রুম। বাইরে আছে চাকরদের কোয়ার্টার। ১২০ স্কোয়ার ফুট। প্লাস গাড়ির জন্যে পার্কিং স্পেস।"

সুদর্শনা সত্যিই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছে। শ্যামলদা যে ভাল অফিসে চাকরি করে তা সে জানতো, চাকরিতে কয়েকবার প্রমোশন হয়েছে তাও শুনেছে, কিন্তু তা বলে এমন বাড়ি! এ যেন রূপকথার রাজ্য।

সুদর্শনা এবার যে-ঘরে ঢুকলো সেইটাই গেস্ট রুম। দুটো খাট পাশাপাশি লাগানো আছে। দোলন বললে, "এইটেই তোর শোবার ঘর। দুখানা খাট দেখেই বুঝছিস, স্বামী-স্ত্রীকেও আমরা অ্যাকমডেট করতে পারি। সুতরাং বিয়ে-থা হয়ে গেলে জোড়েও চলে আসতে পারবি।"

আঁচলটা সামলে নিয়ে দোলন বললে, "দেখতেই পাচ্ছিস ঘরে কনসিল্ড্ ইলেকট্রিক ওয়ারিং। পিয়ানো টাইপের সুইচগুলো সব মেঝের কাছে, যাতে খাটে শুয়ে-শুয়েই সুইচগুলো জ্বালাতে-নেভাতে পারা যায়। শুধু একটা জিনিস বিশ্রী হয়ে আছে—দেওয়ালের প্লাস্টিক ইমালশন রঙের সঙ্গে পিয়ানো সুইচের রঙগুলো ম্যাচ করেনি। একেবারে হরিব্‌ল রঙ সুইচগুলোর। আমি আগে লক্ষ্য করিনি। কাল তোর টেলিগ্রাম পেয়ে ঘর সাজাতে গিয়ে সুইচগুলোর দিকে নজর পড়লো। আমি সঙ্গে-সঙ্গে মেনটেন্যান্স ডিপার্টমেণ্টে ফোন করে দিয়েছি। সোমবারের মধ্যেই নিশ্চয় পাল্টে দিয়ে যাবে। তোর জামাইবাবুকেও একটু মনে করিয়ে দিতে হবে, ফলো আপের জন্যে।"

একটা স্লিপের ওপর খস-খস করে কি লিখে ফেললো দোলন। "কী লিখছিস দিদি?" সুদর্শনা একটু ঘাবড়ে গিয়েছে।

"স্লিপ লিখছি। ওইটা তোর জামাইবাবুর কোটের পকেটে দিয়ে দেবো, সোমবার সকালে অফিসে গিয়েই মনে পড়ে যাবে, সুইচ পাল্টানোর কথা।"

সুদর্শনা ঘরটার দিকে তাকিয়ে দেখছে। দিদি বললে, "বস না বিছানায়।"

"উঃ দিদি, এ যে ডুবে যাচ্ছি।"

"দূর বোকা—এ যে ছ' ইঞ্চি ফোম রবারের গদি। মনে হবে তুই ভাসছিস, শরীরের যেন কোনো ওজন নেই।"

"এই বিছানায় শুয়ে-শুয়ে তোর অভ্যেস হয়ে গিয়েছে, তাই না?"

"কেন বল তো?"

"আমি ভাবছি, গতবার যখন তুই পাটনায় আমাদের বাড়িতে গেলি, তখন

দশবছরের পুরানো তোশকের বিছানায় শুতে তোর খুব কষ্ট হয়েছিল। সেই জন্যে বোধহয় তোর ঘুম আসতো না। তোর পাশে আমি তো ঘুমোতাম। একদিন হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়ে দেখলাম, তুই জেগে আছিস। তখন বুঝতে পারিনি, ভেবেছিলাম, বিরহ-যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিস। রাত্রে শ্যামলদার অনুপস্থিতিটা বেশি করে অনুভব করছিস।"

ফিক করে হেসে ফেললো দোলন। "আজকালকার মেয়ে তোরা, বড্ড পেকে গেছিস। বিয়ের আগে থেকেই বুঝতে পারিস বিরহ কাকে বলে।"

"দিদি তুই আবার হাস।" সুদর্শনা বলে।

"কেন বল তো?" দোলন প্রশ্ন করে।

"তুই হাসলে তোর গালে ভারি সুন্দর টোল পড়ে। শ্যামলদা ওটা নোটিশ করেনি?"

"তোর শ্যামলদার আজকাল ওসব নজর করবার সময় নেই। অফিসে কত কাজ, কত দায়িত্ব!"

"সে বললে শুনছি না। আজই শ্যামলদাকে শাসন করছি। যত কাজের লোকই হও, বউয়ের গালে টোল পড়লে কেমন দেখায় তা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় দিতেই হবে।" সুদর্শনা হাসতে-হাসতে নিজের মতামত জানিয়ে দিলো।

দিদি বললে, "ডানদিকের এই সুইচটা দেখে রাখ। এটা সকাল বেলায় টিপবি। তাহলে প্যান্ট্রি থেকে গোমেজ এসে তোকে বেড্-টী দিয়ে যাবে।"

"আগে গোমেজ সকাল ছ'টায় চা করে দরজায় নক্ করতো। কিন্তু এখন এই নিয়ম করেছি। অনেক সময় সকালে বড় কুড়েমি লাগে। বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করে না।"

বোতামটা এখনই টিপে দিলো দোলন। গোমেজ এসে দরজায় নক্ করলে। দিদি বললে, "কাম ইন্।"

গোমেজ ভিতরে এসে সেলাম করলো।

দিদি পরিচয় করিয়ে দিলো, "মেমসাহেব এখানে কিছুদিন থাকবেন। আমার বোন।"

দোলন জানতে চাইলো, "টুটুল এখন কী খাবি? চা না কফি?"

"বাড়িতে আমরা তো চা ছাড়া কিছু খাই না দিদি, জানিস তো।"

"এখন তুই তো বাড়িতে নেই, দিদির কাছে বেড়াতে এসেছিস। সুতরাং কফি খা। এসপ্রেসো কফি করতে বলি। কিচেনে আমরা একটা এসপ্রেসো মেশিন বসিয়েছি। ওর গেস্টরা অনেকে এসপ্রেসো পছন্দ করে।"

"এসপ্রেসো !"

"কেন পাটনাতেও নিশ্চয় এসপ্রেসো কফির দোকান হয়েছে।"

"হ্যাঁ, সোঁ-সোঁ করে রেল এঞ্জিনের মতো শব্দ হয়, আর কফিটা ফেনায় ভরে ওঠে," সুদর্শনা বললে।

দোলন বললে, "তোর ঘরের সঙ্গে অ্যাটাচ্‌ড বাথ রয়েছে। ওখানে তোর তোয়ালে, নতুন সাবান, টুথব্রাশ, পেস্ট, তেল, শ্যাম্পু, থ্রোট গার্গল লোশন, ডেটল সব দেওয়া আছে। আর কাপড়চোপড় এই বিল্ট-ইন ওয়ার্ডরোবে রাখতে পারবি।"

একটু থেমে দোলন বললে, "তোর যদি বাইরের পৃথিবী দেখতে ইচ্ছা করে, পূর্ব-দক্ষিণের পর্দাটা আলতোভাবে টেনে সরিয়ে দিবি। খুব ভাল ভিউ পাবি—সমস্ত কলকাতা শহরটাকেই একটা রূপকথার দেশ মনে হবে তোর। আর যদি ভাল না লাগে, তাহলে আবার পর্দা টেনে দিবি।"

সুদর্শনা দিদির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। দিদি বললে, "এই পর্দার রঙটা আমার তেমন ভাল লাগে না। যখন চয়েস করেছিলুম, অন্য রকম ছিল। কিন্তু একবার ধোপার-বাড়ি গিয়েই কেমন হয়ে গেল। এখনও তিন মাস সহ্য করতে হবে। ম্যানেজাররা বছরে একবার করে পর্দা পালটাতে পারে। ডিরেকটর হলে ওসব হাঙ্গামা নেই। যখন ইচ্ছে, বলে দিলেই হলো।"

দিদি আরও বললে, "এ ঘরটা মন্দ নয়। কিন্তু এয়ারকণ্ডিশন নেই। আমাদের মাত্র একটা রুমে এয়ারকণ্ডিশন। ডিরেকটররা নিজেদের বেড রুম, চিলড্রেনস রুম এবং গেস্ট রুম, সব এয়ারকণ্ডিশন করাতে পারে। এটা যেন কেমন। ওর বন্ধু, মিস্টার সান্যালের ওয়াইফও সেদিন বলেছিলেন, এটা কোম্পানির খাটো নজরের পরিচয়। ডিরেকটরদের গেস্ট গেস্ট, আর আমাদের গেস্ট যেন গেস্ট নয়।"

গোমেজ এবার কফি হাতে ঘরে ঢুকলো। দিদি বললে, "এখানে খাবি, না আমার ঘরটা দেখবি?"

"চল, তোর ঘরটাও দেখা যাক," সুদর্শনা তার মতামত দেয়। তারপর যে-যার কাপ হাতে করে ওরা শ্যামলেন্দুর বেড রুমে ঢুকলো। এই ঘরটা বেশ বড়। পাশের ঘরের সঙ্গে একটা লাগোয়া দরজা রয়েছে। দিদি বললে, "দেখছিস, এমনভাবে প্ল্যান করা যে পাশের ঘরটা বাচ্চাদের বেড রুম হিসেবে ব্যবহার করা যায়।"

দোলন আরও বললে, "এই যে খাট দুটো দেখছিস, এর একটা ইতিহাস আছে। এ-ধরনের খাট এই ঘরে মানায় না। একটু উঁচুও বটে। তোর

বিয়েতে বাবাকে নিচু খাট দিতে বলবি। আচ্ছা, তোকে বলতে হবে না, আমিই বাবাকে প্ল্যানটা দিয়ে দেবো।”

“বেশ তো নিজের ঘরদোর দেখাচ্ছিস, এর মধ্যে আবার আমার বিয়ের কথা কেন?” সুদর্শনা প্রতিবাদ করলো।

দোলন বললে, “যা বলছিলাম। তোর জামাইবাবুর এসব সেন্টিমেণ্ট প্রবল। ও বললে, তোমার বাবার দেওয়া খাট, তার ওপর ফুলশয্যার স্মৃতিচিহ্ন, খাট পালটাতে হবে না।”

সুদর্শনা দিদির মুখের দিকে তাকায়। দিদি ব্যাখ্যা করলে, “এতে অবশ্য আমাদেরই লোকসান। কারণ খাটের খরচ দিতো কোম্পানি।”

“শোবে তোমরা, আর খরচ দেবে কোম্পানি!” সুদর্শনা বিস্ময় প্রকাশ করে।

“আজ্ঞে, হ্যাঁ স্যার। এই নিয়ম। সারাদিন খাটিয়ে-খাটিয়ে কভেনেণ্টেড ম্যানেজারদের রক্ত নিংড়ে বার করে নিচ্ছ, আর রাত্রে তারা যাতে একটু নিশ্চিন্তে বউ ছেলে নিয়ে ঘুমোতে পারে তার ব্যবস্থা করবে না?”

“উঃ দিদি! তুই খুব ভাল শ্রমিক নেতা হতে পারতিস, কীভাবে স্বামীর পক্ষে ওকালতি করছিস!”

দিদি হেসে বলে, “তুই জানিস না, টুটুল। এক-আধটা স্বার্থপর ডিরেকটর আছে, যারা চায়-শুধু তাদের জন্যই সব কিছু হোক—আর এরা ভেসে যাক। কভেনেণ্টেডরা মুখের রক্ত তুলে কাজ করে যায়, অথচ মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না।”

“তুই ভাল কথা মনে করিয়ে দিলি দিদি। আমার অনেক দিনের জানবার ইচ্ছে এই কভেনেণ্টেড কথার মানে।”

“আগে কথাটা শুনেছিস তাহলে।”

“খবরের কাগজে বিয়ের বিজ্ঞাপনে প্রায়ই দেখি। আমাদের ক্লাসফ্রেণ্ড ললিতা, সেও আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল। কারণ ওর বিয়ের বিজ্ঞাপনে মাসিমা কথাটা লিখে দিয়েছেন। খুব দেখতে ভাল তো, তাই কভেনেণ্টেড পাত্র চাই। ললিতা ওর মাকে জিজ্ঞেস করেছিল। মাসিমা বললে, ঠিক জানি না। তবে নিশ্চয় খুব ভাল কিছু হবে, না-হলে সুন্দরী মেয়ের বাবা-মারা কেন পয়সা খরচ করে ডাক্তার, সি-এ, কভেনেণ্টেড পাত্র চায়?”

“তুই আর রসিকতা করিস না টুটুল! ও শুনলে হাসতে-হাসতে পাগল হয়ে যাবে,” দোলন উত্তর দেয়।

“তোকে সত্যি কথা বলছি, দিদি! ওই সি-এ ব্যাপারটা জানি। কলেজে আমরা সি-আই-এর বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়েছি। আমরা সি-আই-এ চাই না,

কিন্তু সি-এর গলায় মালা দিতে রাজী আছি। সি-আই-এ হলো মার্কিন গুপ্তচর ; আর আইটা তুলে দিলেই চার্টার্ড অ্যাকাউনট্যাণ্ট, বর হবার পক্ষে আদর্শ মেটিরিয়াল। বিলিতি চার্টার্ড হলে তো কথাই নেই ; দেশী চার্টার্ডও মন্দ নয়। যদিও আমাদের বন্ধু নন্দিতার স্বামী সেদিন বললে দিশী সি-এ হলো 'শ্যাটার্ড অ্যাকাউনট্যাণ্ট।"

দিদি বললে, "কভেনেণ্টেড মানে সোজা বাংলায় মার্চেণ্ট অফিসের ভেরি হাই অফিসার। তোর জামাইবাবু কভেনেণ্টেড – হিন্দুস্থান পিটারস্-এ এরকম মাত্র সাত-আট জন আছে। কভেনেণ্ট মানে কনট্রাক্ট, তিন বছর কিংবা পাঁচ বছর অন্তর চুক্তি হয়। তোর জামাইবাবুর দলিলটা তোকে একদিন দেখাবো। ওটা লকারের মধ্যে রয়েছে। বহু কিছু লেখা আছে তাতে, আমি সব কথার মানে বুঝতে পারি না।"

দিদির খাটের কাছেই ছোট্ট টেবিলে চারটে ছবি দাঁড করানো রয়েছে। শ্যামলদার বাবা-মা ও দোলনের বাবা-মা। শ্যামলদার বাবাকে দেখেছে টুটুল। দানাপুর ইস্কুলে ইংরিজীর টিচার ছিলেন। ইংরিজী গ্রামারের একখানা বই লিখে নাম করেছিলেন। আর শ্যামলদার মা অবশ্য আগেই দেহ রেখেছিলেন. শ্যামলদার মা ছিলেন আবার দোলনের মায়ের বন্ধু, ছোটবেলায় ওঁরা বকুলফুল পাতিয়েছিলেন।

টেবিলের ওপর আরও দুটো ছবি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটা শ্যামলদার আর একটা দিদির। বিয়ের ক'দিন পরেই পাটনার স্টুডিওতে তোলা। সুদর্শনা না বলে পারলো না, "দিদি, তোর এই ছবিটা দেখলে আমার হাসি পায়। তুই তখন ঠিক আমার মতো গাঁইয়া ছিলি। তোকে হিন্দুস্থান পিটারস্-এর কভেনেণ্টেড অফিসারের বউ মনে হচ্ছে না। মাথায় ঘোমটা-টোমটা লাগিয়ে কী করেছিস? আর শ্যামলদাকেও কেমন লাগছে।"

"মফঃস্বলের স্টুডিওতে তোলা ছবি আর কত ভাল হবে বল? আমি ওকে কতবার বলেছি, চলো একদিন বোর্ন শেফার্ড, আমেদ আলী বা বম্বে ফটো থেকে একটা ছবি তুলিয়ে আনি। তোর জামাইবাবু রাজী হয় না। এই ছবিটার দিকে তাকিয়ে ও বলে, ছবি তুলতে দুটো জিনিস লাগে – ফটোগ্রাফার এবং যাদের ছবি তোলা হবে। ভাল ফটোগ্রাফার নিশ্চয় পাওয়া যাবে। কিন্তু আমাদের জীবনের দশ বছর আগের মুহূর্তটাকে তো কেউ ফিরিয়ে দিতে পারবে না।"

"ও বাবা! তোমরা এখনও চান্স পেলে প্রেম চালাও। শ্যামলদাকে পাকড়াও করতে হবে তো।"

দোলনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। কিন্তু পরমুহূর্তেই প্রতিবাদ করলো, "দূর।

তোর শ্যামলদার মাথায় সব সময় অফিসের কথা ঘুরছে! দারাপুত্রপরিবার এখন মাইনর ব্যাপার হয়ে পড়েছে। বেচারার দোষও নেই। হিন্দুস্থান পিটারস্-এর কর্তারা যত পারছে ওর ঘাড়ে দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে যাচ্ছে।"

"দায়িত্ব দেবার মতো লোক বলেই তো দায়িত্ব দিচ্ছে," সুদর্শনা দিদিকে ভরসা দেবার চেষ্টা করে।

"সব বাজে কথা। সায়েবরা এই শনিবার এখন ঘোড়ার বই মুখস্থ করছে। আমাদের এই বাড়ির মিস্টার রুণু সান্যাল, মিস্টার হরগোবিন্দ চোপরা, মিস্টার পিল্লাই, মিস্টার নিগম, মিস্টার জৈন সবাই এতক্ষণে সস্ত্রীক রেসকোর্সে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে পড়েছেন। ওখানে সায়েবদের সঙ্গে দেখা হবে। আর তোর জামাইবাবু শনিবারেও অফিসে গেল।"

"রেসে গেলে কী হয় দিদি?"

"ভগবান জানেন। ছোট-ছোট বই নিয়ে সবাই সমস্ত সপ্তাহ ধরে ঘোড়ার নাম মুখস্থ করে। আমাদের সেক্রেটারী সেনগুপ্ত সায়েব, উনি তোর শ্যামলদাকে খুব ভালবাসেন। উনি একদিন বললেন, 'করছেন কী চ্যাটার্জি। আমি পুরনো কথা শুনতে চাই না, ঘোড়ার ক্লাবের মেম্বার হোন।' ও বলেছিল, 'ভাল লাগে না আমার।' সেনগুপ্ত সায়েব বলেছিলেন, 'সব জিনিস প্রথমে ভাল লাগে না। তাছাড়া ভাল লাগবার জন্যে আমরা সব কাজ করি না। যে পুজোর যে মন্ত্র!'"

"তারপর?"

"এখন তোর শ্যামলদা মাঝে-মাঝে যায়, টার্ফ ক্লাবের মেম্বারও হয়েছে।"

সুদর্শনার মুখটা শুকিয়ে গেল। "তোর ভয় করে না দিদি?"

"ভয় করবে কেন?"

"এই যে শুনি ঘোড়ার মাঠে লোকে সর্বস্বান্ত হয়ে যায়।"

"ওসব বাংলা নভেল-নাটকে হয়। লিমিটের মধ্যে থাকলে চিন্তার কিছু নেই। ও তো পঞ্চাশ টাকার বেশি খেলে না, তাছাড়া এটা একটা স্পোর্টসও বটে। দেখিস না খবরের কাগজে খেলাধুলার পাতায় ঘোড়দৌড়ের খবর থাকে। লাটসায়েবও একদিন মাঠে আসেন। খারাপ জিনিস হলে লাটসায়েব নিশ্চয় যেতেন না।"

রাজার ছবিটাও দেখতে পাচ্ছে সুদর্শনা। দিদিকে বললে, "রাজা থাকলে বেশ মজা হতো। কতদিন যে দুষ্টু ছেলেটাকে দেখিনি।"

"গরমের ছুটিতে ইস্কুল থেকে ফিরবে, তখন যদি পারিস একবার চলে আসিস।"

"কলকাতায় তো অনেক ভাল-ভাল ইস্কুল আছে। সেখানে কোথাও পড়ালে পারতিস। একটা মাত্র ছেলে, তাকেও যদি এই বয়স থেকে চোখের আড়াল করে রাখলি, তাহলে আর কী হলো?"

খানিকটা রাজী হয় দোলন। রাজার প্রসঙ্গ উঠতেই বেচারার চোখ ছলছল করে ওঠে। একটু ভেবে বললো, "মাঝে-মাঝে যে তা মনে হয় না, এমন নয়। আফটার অল, বাচ্চাদের এই বয়সটা বাবা-মায়ের কাছে সবচেয়ে আনন্দের। কোথায় যেন পড়েছিলাম, সন্তানকে ক্রমশ বড় হতে দেখার মতো মধুর অভিজ্ঞতা বাবা-মায়ের আর নেই। কিন্তু…"

"কিন্তু আবার কি?" সুদর্শনা জিজ্ঞেস করে।

"কমারসিয়াল এগজিকিউটিভের বউ হলে অনেক কিছু ত্যাগ করার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হয়, বুঝলি টুটুল।"

"কেন? অফিসে কি কেউ বলে দিয়েছে ছেলেকে নিজের কাছে রাখতে পারবে না?"

"তা নয়। কিন্তু বদলির চাকরি। বিয়ের পর দিল্লীতে বদলি হলো, তারপর মাদ্রাজে। তারপর বোম্বাই। এখন অবশ্য হেড অফিস থেকে আবার ট্রান্সফার হবার চান্স নেই। মাদ্রাজ থেকে আমরা বোম্বাই বদলি হয়েছিলাম চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশে। তুই বিশ্বাস করবি, ডেভিডসন সায়েব ট্রাঙ্ককল করে বললেন, 'চ্যাটার্জি তোমাকে যদি বোম্বাইতে পোস্ট করি?' ও বললো, 'আনন্দের সঙ্গে, তাতে যদি কোম্পানির সুবিধে হয়। কবে থেকে যেতে হবে বলুন।' 'ডেভিডসন সায়েব বললেন, 'আমি তোমাকে কম সময় দেবার জন্যে দুঃখিত। যদি বলি পরশুদিন থেকে।' ও রাজী। বললো, 'পরশুদিনই আমি বোম্বাই অফিসে রিপোর্ট করবো।' আমি তো শুনে রেগে লাল। বললুম, 'ইচ্ছে করলে, তুমি সায়েবের কাছে দশটা দিন সময় নিতে পারতে। সায়েব তোমাকে অত ভালোবাসেন।' কিন্তু তোর জামাইবাবু কী উত্তর দিলো জানিস? বললো, 'দোলন, কখনও ভুলো না তুমি কমারসিয়াল এগজিকিউটিভের বউ। আমরা হলাম মিলিটারির মতো। সবসময় মার্চিং অর্ডারের জন্যে রেডি।'"

সুদর্শনা কফির কাপটা নামিয়ে রেখে বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে দিদির দিকে। "বলিস কি! এইসব মালপত্তর বাঁধাবাঁধির ব্যাপারে তুই তো একেবারে ল্যাদাড়ু ছিলি।"

"সে-দিদি আর নেই, মাকে বলিস। চাপে পড়ে, আর শাসনে-শাসনে দিদি এখন টিট হয়ে গিয়েছে। তোর শ্যামলদার আর কি, আমাকে ফেলে রেখেই পরের দিন বোম্বাই পালালো। আর আমি এই গন্ধমাদন পর্বত প্যাকিং করিয়ে

অফিসের গুদামে তুলে দিয়ে স্বামীসন্ধানে বোম্বাইয়ে গেলাম। ওখানে গিয়েও দেড়মাস তাজমহল হোটেলে থাকতে হলো। কোম্পানি অবশ্য হোটেলের খরচ দিয়েছিল কিন্তু খরচটাই কি সব? হোটেলে থাকার কষ্টটা যে কি তা সায়েবরা মোটেই বোঝে না।"

"জানিস দিদি, আমি কিন্তু কখনও হোটেলে থাকিনি।"

"থাকবি, থাকবি। বয়স তো এখন সবটাই পড়ে রয়েছে। তখন হোটেল সম্বন্ধে ঘেন্না ধরে যাবে। তখন বুঝবি, হোমই হলো সব কিছু। তা যা বলছিলাম, আমি ওকে সোজাসুজি জানিয়ে দিলুম, আমি বউ, আমার ওপর যত পারো অত্যাচার করো। কিন্তু আমার রাজার ওপর এসব চলবে না। ওকে প্রথম সুযোগেই ভাল বোর্ডিং স্কুলে দিয়ে দাও।"

"মিসেস ডেভিডসন বলেছিলেন, বিলেতের নাম করা পাবলিক স্কুল রেনটনে ঢুকিয়ে দেবেন। কিন্তু আজকাল খোদার ওপর খোদগারি করবার জন্যে গভরমেণ্ট আছেন। ওঁরা বললেন, বিদেশী মুদ্রা দিতে পারবেন না। তার মানে সায়েবদের ছেলেগুলো শুধু মানুষ হোক আর আমাদের ছেলেগুলো উচ্ছন্নে যাক। কিন্তু গভরমেণ্টের ওপর কে কথা বলবে? তাই ইণ্ডিয়ান পাবলিক স্কুলেই রাজাকে দিতে হলো।"

এসব শুনেও, রাজার জন্যে মন কেমন করছে সুদর্শনার। থাকলে বেশ মজা করে যেতো। রাজা পাটনাতেই হয়েছিল। তখন দিদিকে নিয়ে সবার কি দুশ্চিন্তা। বাবা ও শ্যামলদা দুজনে হাসপাতালের বাইরে বসে আছে। তারপর রাজা এলো। ছোটবেলায় কি দুষ্টু ছিল। গালগুলো ছিল রাজভোগের মতো। সুদর্শনা বললো, "তোর মনে আছে দিদি, আমি রাজার গাল টিপে রাগিয়ে দিতাম। গাবু বলে ডাকলেই বেজায় চটে উঠতো।"

"এখন আর শ্রীমান সেই গাব্বু নেই। আমাকেই কথাবার্তা বলতে হয় সমীহ করে। বাবাকে প্রায়ই ইংরেজীতে চিঠি লেখে!"

"বলিস কী?"

"হ্যাঁরে, তোকে সব দেখাবো। এখন তুই একটু বিশ্রাম করে নিবি নাকি? সারারাত ট্রেনে ধকল সয়ে এসেছিস। বরং কিছু খেয়ে নে, তারপর স্নান সেরে ফেল। ততক্ষণে তোর জামাইবাবুও এসে পড়বে। সদ্যস্নাতা বিদ্যুৎশিখা বিদুষী শ্যালিকাকে দেখে জামাইবাবু বেশ খুশী হবে।"

"দাঁড়া শ্যামলদা আসুক! তারপর তোর মজা দেখাচ্ছি," এই বলে সুদর্শনা নিজের ঘরে ঢুকে পড়লো।

ঘরের দরজা বন্ধ করে সুদর্শনা কিছুক্ষণের জন্যে বিছানার ওপর বসলো।

তারপর ব্যাগ খুলে নিজের কাপড়-চোপড গুছিয়ে নিলো। স্নান সারবার জন্যে এবার সে বাথরুমে ঢুকে পড়লো।

বাথরুমটা দেখেও অবাক হবার পালা। সাদা টালিগুলো যেন আজকেই বসানো হয়েছে! নতুনের মতো ঝক ঝক করছে। এক কোণে বাথটব রয়েছে। না-বাপু এই টবে স্নান করা চলবে না। যদিও এক ইংরিজী সিনেমাতে নায়িকাকে বাথটবে স্নান করতে দেখেছে সুদর্শনা। ভদ্রমহিলা সাবান ঘষে-ঘষে এত ফেনা করেছেন, যে ফেনায় সমস্ত দেহ ঢেকে গিয়েছে। সেই সময় হঠাৎ কীভাবে যেন বাথরুমের দরজা খুলে গেল। সে এক বিশ্রী ব্যাপার। হাঁদাগঙ্গারাম নায়ক সেই অবস্থায় ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। শেষে ওই ফেনাতেই শ্লীলতা রক্ষা হলো! ইংরিজী সিনেমার লোকগুলো মাথা-খাটিয়ে-সিনও বার করতে পারে! আইনও বাঁচলো অথচ যা দেখাবার তাও দেখানো গেল।

হাতে করে তোয়ালে ও সাবান এনেছিল সুদর্শনা। কিন্তু দিদি দেখছি আগে থেকেই সব ব্যবস্থা করে রেখেছে। গোটা চার-পাঁচেক বিভিন্ন আকারের তোয়ালে টাঙানো রয়েছে। একটা লোকের স্নান করতে এতগুলো তোয়ালে কী হয় রে বাবা। তাছাড়া দিদি সাজিয়ে দিয়েছে নতুন সাবান, নতুন এগ্‌শ্যাম্পু, নতুন টুথ ব্রাশ, নতুন পেস্ট, নতুন জবাকুসুম। আরও গোটা কয়েক শিশি রয়েছে, যা সুদর্শনা কখনও দেখেনি—বাথ সল্ট, ডি অডারেন্ট লোশন, ক্লিনসিং মিল্ক, আরও কত কী।

পাটনার বাড়ির দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠছে সুদর্শনার। ওদের বাড়িতে তবু বাথরুমের মেঝেটা মোজেক করা। মাথায় একটা পুরানো শাওয়ার আছে—তা প্রায়ই খারাপ হয়ে থাকে। একেবারে পাগলা শাওয়ার—কখনও হুড়-হুড করে জল পড়ে, কখনও একেবারেই নয়। কখনও খুলবার দু মিনিট পরে হঠাৎ বৃষ্টি শুরু করে দেয়। শ্যামলেন্দুদার বাড়ির কথা মনে পড়ছে সুদর্শনার। শ্যামলেন্দুদার বাবা খুব যত্ন করতেন বাড়িতে গেলে। ওখানে তো বাথরুমের মধ্যে একটা চৌবাচ্চা। সেখান থেকে ফুটো মগ নিয়ে মাথায় জল ঢালতে হতো। দরজার গায়ে কয়েকটা পেরেক পোঁতা ছিল—সেখানেই কাপড় রাখতে হতো। উঃ, পেরেকগুলোতে কাপড় রাখা বেশ শক্ত ছিল। একবার তো সুদর্শনার ফ্রক জলের মধ্যে পড়ে গিয়ে ভিজে গেল। দিদি তখন বিয়ের পর সবে শ্বশুরবাড়িতে এসেছে, সুদর্শনাও সঙ্গে করে অন্য কোনো ফ্রক আনেনি। দিদি লজ্জায় কিছু বলতে পারলো না।

কিন্তু শ্যামলেন্দুদার নজর এড়ায়নি। শ্যামলদা বলেছিলেন, "টুটুল, তোমার জামাটা যেন ভিজে মনে হচ্ছে।"

খুব লজ্জা পেয়ে গিয়েছিল টুটুল এবং দিদি। টুটুল বলেছিল, "এই মানে স্নান করতে গিয়ে একটু জল লেগে গিয়েছে।"

শ্যামলদা বুঝতে পেরেছিলেন। বলেছিলেন, "নিশ্চয় বাথরুমের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। ওই পেরেকগুলো কোনো কাজের নয়। ওখানে একটা র‍্যাক লাগাতে হবে।"

সেসব দিনের কথা শ্যামলদার মনে আছে কী? দিদির?

শ্যামলদাকে কিন্তু টুটুলের খুব ভাল লাগতো। সত্যি কথা বলতে কি, দিদিও শ্যামলদাকে অত ভালবাসত কিনা সন্দেহ। দিনরাত পড়াশোনার মধ্যে ডুবে থাকতেন শ্যামলদা। আর তাছাড়া শ্যামলদার মধ্যে একটা আদর্শ ছিল। পৃথিবীর মানুষদের সমস্যাগুলো জানবার এবং বোঝবার একটা আন্তরিক চেষ্টা ছিল শ্যামলদার মধ্যে।

শ্যামলদা বলতেন, "এই বিরাট দেশের কোটি-কোটি মানুষের দারিদ্র্য দিল্লীর কয়েকটা লোক ঘোচাতে পারবে না। দেশ তো কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছে—তার মানে তো ইউনিয়ন জ্যাকের বদলে তেরঙা পতাকা ওড়ানোর স্বাধীনতা। এরপরের সব কাজটাই পড়ে রয়েছে। কবে যে কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙবে কে জানে। কিন্তু সে এক যুগান্তরের দিন। আসমুদ্র হিমাচলের কোটি-কোটি মানুষ জানতে চাইবে কেন আমাদের অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, স্বাস্থ্য নেই, সুখ নেই, স্বাচ্ছন্দ্য নেই। তারপর হয়তো শুরু হবে প্রলয় নাচন। সুতরাং ঘুম ভাঙার আগেই আমাদের অনেক কিছু করে ফেলতে হবে।"

টুটুল এবার কলটা খুলে দিয়ে টেলিফোন শাওয়ারটা হাতে তুলে নিলো। টেলিফোনের মতো ঝারিটা যেদিকে ইচ্ছে বেঁকিয়ে দেওয়া যায়। মুখের ওপর বৃষ্টিধারার মতো জল ঝরছে, আর সুদর্শনা তখন অনেকদিন আগের সেই শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জি, যে ইউনিভার্সিটিতে ইংরিজী পড়তো, তাকে দেখতে পাচ্ছে। শেক্সপীয়র থেকে কী সুন্দর আবৃত্তি করতো শ্যামলদা ওই ভারি গলায়।

শ্যামলেন্দুদা তাঁর মাকে সঙ্গে নিয়েই প্রথম টুটুলদের বাড়িতে এসেছিল। শ্যামলেন্দুদার মাকে দেখে টুটুলের মার কী আনন্দ। "কমলা যে! পথ ভুলে নাকি ভাই? কতদিন পরে এলি। অথচ থাকিস তো কয়েক পা দূরে।"

কমলা মাসিমা বলেছিলেন, "জানিস তো ভাই, ইস্কুল-মাস্টারের সংসার। সব কিছু সামলাতে-সামলাতেই সূয্যি অস্ত যায়।"

টুটুলের মা বলেছিলেন, "সঙ্গে কাকে এনেছিস?"

"আমার সবেধন নীলমণি শ্যামলকে," কমলা মাসিমা উত্তর দিয়েছিলেন।

"ওমা কী লজ্জা! শ্যামল তো আমার ছেলের মতো, আর ওকেই বাইরে

দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছিস ?”

“আমি বলেছিলাম ভিতরে আসতে। কিন্তু বেজায় লাজুক, বাইরে দাঁড়িয়ে রইলো,” কমলা মাসিমা উত্তর দিয়েছিলেন।

“সে কি কথা! তুই আমার ছোটবেলার বকুলফুল বলে কথা, আর তোর ছেলে রইলো বাইরে দাঁড়িয়ে ?” টুটুলের মা বলেছিলেন।

সামনে তখন দোলন আর টুটুল দুজন বসে খেলা করছিল। মা বললেন, “ওরে তোরা গিয়ে তোদের শ্যামলদাকে ভিতরে এনে বসা।”

দোলন লজ্জা পেয়ে গিয়েছিল। টুটুলকে বলেছিল, “তুই ডেকে নিয়ে আয়।”

টুটুল রাজী হয়নি। “আহা আমার বুঝি লজ্জা লাগে না ?”

অগত্যা দুই বোনে ঠিক করেছিল, “চল আমরা দুজনে একসঙ্গে গিয়ে কমলা মাসির ছেলেকে ডেকে আনি।”

টুটুল তখন আর কতটুকু ? ফ্রক পরে। দোলন তখন শাড়ি পরছে। ওরা দুজনে একসঙ্গে ছুটে গিয়ে দেখলো, ওদের বাইরের ঘরের সামনের বারান্দায় মোটা চশমা-পরা, কোঁকড়া-চুল এক ছোকরা উদাস হয়ে বাইরের ল্যাম্পপোস্টের দিকে তাকিয়ে আছে।

বাইরে তখন পড়ন্ত বিকেল, সোনালি সূর্যের শেষ রশ্মি ‘পূর্বাচল’-এর ওপর সোনার জল মাখিয়ে দিচ্ছে। (বাড়িটার নাম বাবাই রেখেছিলেন পূর্বাচল।) এই আলোকেই বোধহয় কনে-দেখা-আলো বলে, টুটুল বড় হয়ে শুনেছে। সেদিন এই আলোতেই দিদি আর টুটুল শ্যামলদাকে প্রথম দেখেছিল।

দোলন এবার টুটুলকে আঙুলের খোঁচা দিয়ে বলেছিল, “তুই ডাক।”

টুটুল মোটেই রাজী হয়নি। ফিস-ফিস করে বলেছিল, “তুই বুড়োধাড়ি মেয়ে, তোর যদি সাহস না হয়, তাহলে আমার কী করে সাহস হবে ?”

দিদি বেচারা বোনের কাছে প্রেস্টিজ নষ্ট হওয়ার ভয়ে, সাহস সঞ্চয় করে, আরও কাছে এগিয়ে গিয়ে বলেছিল, “শুনুন।”

শ্যামলদা নিশ্চয় তখন কবিতা-টবিতা লিখতো। না-হলে, কেউ অমন হাঁদাগঙ্গারামের মতো আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে ? দিদির কথাটা ঠিক যেন কানে গেল না। তাছাড়া দিদি বোধহয় ডেকেওছিল মিহি সুরে; একেই দিদির গলাটা নিচু। টুটুলের তখন রাগ হয়ে গিয়েছিল। শ্যামলদার খুব কাছে এগিয়ে বলেছিল, “শুনছেন ?”

শ্যামলদা এবার সংবিৎ ফিরে পেয়ে ধড়মড় করে ওদের দিকে তাকিয়েছিল। “কিছু বলছো খুকী ?”

“হ্যাঁ। আমার দিদি দোলন আপনাকে ডাকছে, শুনতে পাচ্ছেন না ?”

শ্যামলদা এবার দিদির দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে এমন বোকার মতো চেয়েছিল যে টুটুল আজও ভুলতে পারেনি। দিদিও লজ্জা পেয়ে গিয়েছিল।

দিদি তাড়াতাড়ি বলেছিল, "আমি নয়, আমার মা আপনাকে ডাকছেন। আপনি কমলা মাসিমার ছেলে তো?"

তখন কে জানতো, খাল কেটে বাড়ির মধ্যে কুমীর ডেকে আনছে দিদি নিজে।

কমলা মাসিমা বলেছিলেন, "লজ্জা কি খোকা? তুই এখানে বস।"

আর মাকে বলেছিলেন, "আশা, আমার ছেলেকে তুই অনেকদিন দেখিসনি।"

"হ্যাঁ, তোর ছেলে তো অনেক ডাগর হয়ে গিয়েছে। তোর আর কি ভাই, ছেলে তো মানুষ করে ফেললি। তারপর ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাঙ দিয়ে, ছেলের রোজগার আর বউ-এর সেবা খাবি।"

বেচারা কমলা মাসিমা। ছেলের রোজগার, বউ-এর সেবা কোনোটাই ভোগ করে যেতে পারলেন না।

টুটুলের মা জিজ্ঞেস করেছিলেন, "কমলা, তোর ছেলে এখন কী পড়ছে?"

কমলা মাসিমা উত্তর দিয়েছিলেন, "তা তোদের আশীর্বাদে, খোকা আমার পড়াশোনায় ভাল। এবারেই তো বি এ অনার্স পরীক্ষা দিয়েছিল, ইংরিজীতে ফার্স্ট হয়েছে।"

টুটুল নিজে, দিদি, মা সবাই একসঙ্গে চমকে উঠেছিল। শ্যামলদার আলোটা নেভানো ছিল, কমলা মাসিমা যেন সুইচ টিপে ১০০ পাওয়ারের বাতি জ্বালিয়ে দিলেন।

"ফার্স্ট হয়েছেন, ইংরিজীতে? ক'দিন আগেই তো কাগজে নাম বেরিয়েছিল আপনার?" দোলন বলেছিল।

কমলা মাসিমার ছেলে ঘাড় নেড়ে জানিয়েছিল, হ্যাঁ।

দিদি এমনিতে এত লাজুক। কিন্তু উত্তেজনার মাথায় তখন বলে বসেছিল, "দাঁড়ান, আপনি বলবেন না। আমি আপনার নাম বলে দিচ্ছি।"

টুটুল অবাক হয়ে দেখলো, দিদি সত্যি-সত্যিই নামটা বলে দিলো। একটু থেমে দিদি বললো, "আপনার নাম নিশ্চয় শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জি।"

শ্যামলদা তখনও লজ্জা কাটিয়ে উঠতে পারেননি। কিন্তু কমলা মাসিমা বলেছিলেন, "ঠিক বলেছিস মা। কেমন করে বুঝলি?"

"বাঃ রে, আমাদের পাটনা উইমেন্স কলেজে যে আলোচনা হয়। আজকেই তো কমন রুমে কথা হচ্ছিলো। আপনি তো এম এ ক্লাসে খুব গম্ভীর হয়ে থাকেন। কারুর সঙ্গে কথা বলেন না।"

শ্যামলদা তখনও মুখ বন্ধ করে ছিল। কমলা মাসিমা বলেছিলেন, "তাই

নাকি ? তুই ক্লাসে মুখ গোমড়া করে বসে থাকিস কেন, খোকা ? এ তো ভাল কথা নয়। তা তোরা জানলি কি করে মা ?"

দোলন তখন গল্পের ডিটেকটিভের মতো আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে। বলেছিল, "আপনি অসীমা ঝাকে চেনেন ? আপনাদের সঙ্গে সেকেণ্ড ক্লাস ফার্স্ট হয়েছে। অসীমাই বাড়িতে বলেছে। ওর বোন সীতা আমাদের সঙ্গে পড়ে। ওর কাছেই শুনেছি।"

টুটুলের মা অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "ভ্যাখো বাবা ভাল রেজাল্ট করার কি ফল ? সবাই তোমাদের সম্বন্ধে আলোচনা করে। দোলনও তো ইংরেজীতে অনার্স পড়ছে, পাটনা উইমেন্স কলেজে। সামনের বছর পরীক্ষা দেবে।"

তারপর চায়ের ব্যবস্থা করেছিলেন মা। বলেছিলেন, "তাহলে কমলা, আর ভাই বলা চলবে না, ঘরামির ঘর ফুটো। তোর কর্তা ইস্কুলে পরের ছেলে পড়াচ্ছেন, আবার নিজের ছেলেকে মানুষ করছেন।"

কমলা মাসিমা ভারি সরল মানুষ ছিলেন, বললেন, "আমি ভাই মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ। ওসব বুঝি না। তবে ছেলে নিজের মনেই লেখাপড়া করে। আর উনি তো সারাক্ষণ ওঁর গ্রামারের বই নিয়ে পড়ে আছেন। সারা বছর ধরে গ্রামার সংশোধন করছেন, যাতে পরের বারে আরও ভালো করে ছাপা হয়। আর ভাই, আমার চেপে রাখা ঠিক হবে না, এবার আমাকে ছ'গাছা চুড়ি গড়িয়ে দিয়েছেন, গ্রামার নাকি ভাল বিক্রি হয়েছে।"

"তা কমলা, তুই নতুন চুড়ি পরে এলি না কেন ? আমরা দেখতুম," টুটুলের মা বলেছিলেন।

"বুড়ো বয়সে আর চুড়ি পরে কাকে দেখাবো ? রেখে দিচ্ছি যত্ন করে যাতে পালিশ নষ্ট না হয়। ছেলের বউ হলে, ছ'গাছা চুড়ি দিয়ে মুখ দেখবো," কমলা মাসিমা উত্তর দিয়েছিলেন।

মা এবার শ্যামলদাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "এম এ ক্লাসে যখন ঢুকেছো, তখন ওঁর সঙ্গে নিশ্চয় আলাপ হয়েছে। টুটুলের বাবা ইংরিজীর লেকচারার।"

"উনি আমাদের শেক্সপীয়র পড়ান।" শ্যামলদা বলেছিল।

"হ্যাঁ বাবা, উনি তো শেক্সপীয়র-শেক্সপীয়র করেই জীবনটা নষ্ট করলেন। ভদ্রলোক নিজে আর ক'খানা বই লিখেছিলেন ? কিন্তু তার মানে-বইতে উনি লাইব্রেরি ভরিয়ে ফেলেছেন। আমাদের একটা মেয়েলী কথা আছে, বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি।"

শ্যামলদা ও দোলন দুজনেই একসঙ্গে হেসে উঠেছিল। দোলন তারপর মাকে সাবধান করে দিয়েছিল, "তুমি কার কাছে এসব বলছো ? শেক্সপীয়র

পেপারে শ্যামলদা রেকর্ড নম্বর পেয়েছে।"

"বাঃ, দিদি! শ্যামলবাবু এক মিনিটেই শ্যামলদা হয়ে গেল। ফার্স্ট হলে অনেক লাভ দেখছি। ফার্স্ট না হলে জীবনে সুখ নেই।" টুটুল পাকা মেয়ের মতোই বলেছিল।

কমলা মাসিমা বললেন, "খোকা কিছুতেই আসতে চাচ্ছিলো না। আমি বললাম, আশা আমার আইবুড়ো বেলার বন্ধু। চল, বটুবাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই! কখন কি কাজে লাগে।"

"তা বেশ করেছিস, কমলা। ছেলের জন্যে এবার যদি তোর সঙ্গে মাঝে-মাঝে দেখা হয়," মা আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। তারপর দোলনকে বলেছিলেন, "তোর বাপের কথা শ্যামলদাকে বল।"

দোলন বলেছিল, "বাবা ভাগলপুরে গিয়েছেন। ওখানকার ইউনিভার্সিটির কী একটা কাজে। ফিরবেন গতকাল।"

খিল-খিল করে হেসে উঠেছিল টুটুল। "গতকাল কিরে দিদি? গতকাল মানে তো ইয়েসটারডে! বল আসছে কাল—টু-মরো।"

লজ্জায় দোলনের কান লাল হয়ে উঠেছিল। "কিছু মনে করবেন না।"

"জানেন শ্যামলদা, গতকাল আর আগামী কালের মধ্যে দিদি প্রায়ই গোলমাল করে ফেলে।"

শ্যামলদা বোধহয় দোলনের নিগ্রহ সহ্য করতে পারলো না। দোলনকে বাঁচাবার জন্যে টুটুলকে বললো, "তুমি যখন বড় হবে তখন দেখবে, একটা মতবাদ আছে গতকাল বা আগামীকাল বলে কিছুই নেই। যা কিছু আছে তা হলো বর্তমান—অর্থাৎ এই মুহূর্ত।"

দোলন বলেছিল, "বাবা ফিরলেই আপনার কথা বলা হবে।"

মা বলেছিলেন, "এ-বাড়ি তোমার নিজের মতো। যখন খুশী চলে আসবে।"

বাল্যসখীকে নিয়ে মা এবার রান্নাঘরে গিয়ে গল্প শুরু করেছিলেন। আর টুটুল ও দোলন নতুন অতিথিকে নিয়ে বাবার পড়ার ঘরে ঢুকেছিল। বড্ড পাকা ছিল টুটুল। শ্যামলদাকে সে ছাড়বে না। দিদিকে হেনস্তা করবার এমন সুবর্ণসুযোগ শ্যামলদা নষ্ট করে দিলো। পাকা-পাকা কথায় টুটুল ঝগড়া করেছিল সেদিন। "আপনি কী বললেন? বাবা নেই বলে পার পেয়ে যাবেন ভাবছেন? গতকাল এবং আগামীকাল যদি না থাকে, তাহলে আমাদের বইতে তিন রকম টেন্স আছে কেন—অতীত কাল, বর্তমান কাল, ভবিষ্যৎ কাল?"

"বা, সুন্দর বলেছো তুমি," শ্যামলদা হেসে উত্তর দিয়েছিল।

দোলন তখন শ্যামলদার দিকে তাকিয়েছিল। শ্যামলদাও দিদির দিকে

তাকিয়ে বলেছিল, "আপনি ক্রিস্টোফার ফ্রাই পড়েছেন? উনি এক জায়গায় বলছেন, বর্তমান বলে কিছুই নেই। আসলে, বর্তমান হলো অতীত এবং ভবিষ্যতের মধ্যে একটা বিন্দুমাত্র।"

শ্যামলদা তখন ছিলেন একটা রিয়েল ইনটেলেকচুয়াল। বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি ছিল ক্ষুরের মতো। সাধে কি আর বাবা শ্যামলেন্দু বলতে অজ্ঞান হতেন। বাবা বলতেন, "ভাল ইংরেজী জানলেই শেক্সপীয়রকে বোঝা যায় না। শেক্সপীয়রের ভিতরে ঢুকতে গেলে ভাল মানুষ হতে হয়। নিজের অন্তরে সোনা থাকলে তবে শেক্সপীয়রের খনি থেকে সোনা তোলা যায়। এবং সেই সোনা ঠিকমতো তুলতে পারলে, পৃথিবীতে মানুষ আর নাবালক থাকবে না। আমি বলে রাখলাম, শ্যামলেন্দু এই কাজ করতে পারবে, তোমরা দেখে নিও।"

দিদির এবং শ্যামলদার এসব কথা মনে আছে? কে জানে! শাওয়ারটা বন্ধ করতে-করতে টুটুল ভাবলো। দিদির রাখা টাওয়েলটার কী সাইজ, বাবা—ঠিক যেন একখানি শাড়ি।

এবার দরজায় টোকা পড়লো। "টুটুল, আমি দিদি বলছি। তুই এখন নিজের কাপড় পরিস না। আমার কাপড় একটা এখানে রেখে গেলাম।"

দিদির দেওয়া কাপড়টা পরেই সুদর্শনা বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো। দোলন বললো, "তুই আমার ঘরে ড্রেসিং টেবিলে চুল আঁচড়ে নে।"

"শ্যামলদা এসে গিয়েছে?"

"হঁ্যা," দোলন উত্তর দেয়।

শ্যামলেন্দু প্যাণ্ট পরেই নিজের বিছানায় চিৎপটাং হয়ে শুয়ে পড়েছিল। দোলন বললো, "তুমি বাইরে গিয়ে বোসো। টুটুল মেক-আপ করবে।"

"সদ্যস্নাতা শ্যালিকার কেশচর্চা অবলোকনের সুযোগ থেকে আমাকে বঞ্চিত করবে?" শ্যামলেন্দু রসিকতা করলো।

"আজকাল আপনি বাজে বকছেন, শ্যামলদা," হেসে উত্তর দিয়েছিল সুদর্শনা।

"যাই বলো, আমি ভাবছি সেই অতীতের টুটুলের কথা, যার নাক দিয়ে সর্দি গড়াতো। 'কোনো কালে ছিলে কি গো পিলেরোগা কাঁদুনে বালিকা হে, সর্বদাহাসিনী শ্যালিকা?' "

"আঃ শ্যামলদা!" সুদর্শনা কপট রাগ দেখায়।

"বেশ অতীতের কথা তুলবো না। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলি:

চাহিয়া তোমার পানে অচঞ্চল রহে আঁখিতারা
ভায়রা ভায়ের জন্য ভাবি ভাবি চিত্ত আত্মহারা
বহে অশ্রুধারা।"

দোলন বললো, "কেন বেচারাকে রাগাচ্ছো ?"

চিরুনিটা হাতে নিয়ে আয়নার সামনে বসে সুদর্শনা উত্তর দিলো, "আপনিই না একদিন বলেছিলেন, অতীতও নেই ভবিষ্যৎ নেই। আছে শুধু বর্তমান।"

"আমি বলেছিলাম ? কবে ?" শ্যামলেন্দু অবাক হয়ে যায়।

"আপনি যে মিনিস্টারদের মতো হয়ে গেলেন শ্যামলদা। কোথায় কী বলে আসেন মনে থাকে না।"

দিদির দিকে তাকিয়ে সুদর্শনা জিজ্ঞেস করলো, "তোর মনে পড়ছে ?"

অতীতের গর্ভে ডুব দিয়ে প্রথম দিনের স্মৃতিরত্ন খুঁজে পেল দোলন। মুখটা হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

"কবে বলেছিলাম ?" শ্যামলেন্দু জানতে চাইলো।

"সেদিন প্রাণের দায়ে কথাটা বলেছিলেন শ্যামলদা। তখন দিদিকে খুশী করাটা আপনার কাছে জীবন-মরণ সমস্যা ছিল। এখন নেই, তাই বেমালুম অস্বীকার করছেন ?"

সুদর্শনার উত্তর শুনে দোলন ও শ্যামলেন্দু এবার একসঙ্গে হেসে উঠলো। বহুদিন আগেকার দৃশ্যটা মনে পডে গিয়ে দুজনেই খুশীতে ভরপুর হয়ে উঠলো।

দিদির স্নান সারা হয়ে গিয়েছিল। শ্যামলেন্দুও এবার বাথরুমে ঢুকে পডলো। সুদর্শনা জিজ্ঞেস করেছিল, "একটা ঘরে দুটো বাথরুম কেন দিদি ?"

"এইটেই তো লেটেস্ট। স্বামী এবং স্ত্রীর আলাদা বাথরুম। ওঁর অফিসের মেমসায়েবরা বলেন, 'এক সঙ্গে বাস করছি বলে এক বাথরুমে শেয়ার করতে হবে এটা ভাবা যায় না। কোনদিন হয়ত বলে বসবে একই তোয়ালেতে দুজন স্নান করো।' তাই এখানকার সব ফ্ল্যাটে বড় বেডরুমের সঙ্গে দুটো কলঘর—হিজ বাথরুম এবং হার বাথরুম।"

সুদর্শনা বলেছিল, "তোদের যতগুলো কলঘর আছে তাতে বাড়িতে ত্রিশজন লোক থাকলেও স্নানের অসুবিধে হবে না।"

"সে-উপায় নেই রে," দোলন দুঃখ করে বলে। "সায়েবদের নিয়ম-কানুনও অদ্ভুত।"

"মানে ?" সুদর্শনা প্রশ্ন করে।

"স্ত্রী এবং ছেলেপুলে ছাড়া কাউকে পাকাপাকিভাবে রাখা চলবে না এই ফ্ল্যাটে।"

"বলিস কি দিদি ?"

"সত্যি বলছি, টুটুল। নিজের মা-বাবাকে নয়। মা-বাবা তো ফ্যামিলির অংশ নয়," দোলন বলে।

"তাহলে মা-বাবা কি ফ্যামিলির খোসা ?" টুটুল জিজ্ঞেস করে।

"অনেক মার্চেন্ট অফিসের নিয়মই তাই।"

"কেউ কিছু প্রতিবাদ করে না দিদি ?" টুটুল জিজ্ঞেস করে।

"প্রতিবাদ করবে কী। অনেকে যে খুশী হয়। গিন্নিরা বলে বেড়ায়, আমাদের কোম্পানি এত স্ট্রিক্‌ট যে ওরা মা-বাবাকে ফ্ল্যাটে থাকবার পারমিশন দেয় না।"

টুটুল মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। আর দিদি বলে, "আমাদের চোপরা সাহেব, সাততলায় থাকেন। উনি তো নিজের বাবাকে স্রেফ বলে দিলেন, কোম্পানির মানা আছে, এখানে থাকা চলবে না! বুড়ো বাবা বেচারা ভবানী-পুরে একটা আধা-বস্তিতে থাকেন। মাঝে-মাঝে গিন্নির তৈরি আচার নাতী-নাতনীদের দিতে আসেন।"

চুপ করে থাকে টুটুল। আর দোলন বলে, "এইসব শুনলে তোর শ্যামলদা ভয়ঙ্কর রেগে যায়। ওর চোখ লাল হয়ে ওঠে। ও বলে, বাবা-মা বেঁচে থাকলে একটা হট্টগোল বাধাতাম। দেখতাম কার সাধ্য বাধা দেয়।"

টুটুল চুপ করে থাকে। দোলন বলে, "এখানে আরও সব নিয়ম আছে। ভারি জিনিস থাকলে চাকরদের লিফট ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। চাকরদের কোয়ার্টারে মেয়ে থাকবে না। আমাদের গোমেজ বেচারার বউ অসুস্থ, তাই হাসপাতালে দেখাবার জন্যে কলকাতায় আনিয়েছিল। তিনদিন পরেই প্রপার্টি অফিসারের টেলিফোন। আপনার স্টাফ তার কোয়ার্টারে মেয়েমানুষ রেখেছে। আমি বললুম, ব্যাপারটা কী। কিন্তু ভদ্রলোক খুশী হলেন না। বললেন, 'এতে ডিসিপ্লিন নষ্ট হয়।' বললুম, নিজের স্ত্রীকে নিজের ঘরে রাখার মধ্যে অপরাধ কী। উনি উত্তর দিলেন, মিসেস চ্যাটার্জি এই চাকর ক্লাসটাকে আপনারা এখনও চিনে উঠতে পারেননি। কোনটা বউ আর কোনটা নয়, আমি বা দারোয়ানরা কী করে বুঝবো ?"

"তুই বললি না কেন, কোনটা বিয়ে-করা বউ নয়, সাহেবদের বেলায় কী-ভাবে বোঝেন্ ?"

"আমি আর হাঙ্গামা বাড়াইনি, ভাই। আর ফরচুনেটলি গোমেজের বউ-এর চিকিৎসাও সেদিন শেষ হয়ে গেল," দোলন বললো।

শ্যামলেন্দুর স্নান শেষ হয়ে গিয়েছে। তিনজনে একসঙ্গেই খেতে বসলো। শ্যামলেন্দু বললো, "মাকে নিয়ে এলে না কেন ?"

"বাবাকে দেখবে কে ?" সুদর্শনা উত্তর দেয়। "তাছাড়া, বাবা আজকাল এমন হয়ে গিয়েছেন যে, মাকে ছেড়ে একদম থাকতে পারেন না।"

"মা-বাবা দুজনকেই ধরে নিয়ে এলে পারতিস," দোলন বললো।

"তাহলে আমার অবস্থাটা কী হতো? মা তোমার সঙ্গে আলু-পটলের হিসেব নিয়ে বসতো, আর বাবা তাঁর প্রিয় জামাইয়ের সঙ্গে শেক্সপীয়র নিয়ে আলোচনায় বুঁদ হয়ে থাকতেন। (শেক্সপীয়র ছাড়া আরও অনেক পীর যে পৃথিবীতে রয়েছেন তা বাবার খেয়ালই থাকে না।) মাঝখান থেকে আমার দিকে তোরা নজর দিতিস না।"

টুটুলের কথায় হেসে ফেললো শ্যামলেন্দু। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "পরীক্ষার রেজাল্ট কেমন আশা করছো?"

"আপনি যা করে এসেছেন, তা তো আর পারব না। ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হবার কোনো চান্স নেই।"

"আমাদের সময় পড়াশোনা অনেক সহজ ছিল, টুটুল।"

"অত জানি না, তবে আপনি বাবা-মার অভ্যাস খারাপ করে দিয়েছেন। ফার্স্ট না হলে ওঁদের মন ভরে না।"

"পরীক্ষার পরে কী?" শ্যামলেন্দু প্রশ্ন করে।

"দিন না আপনাদের হিন্দুস্থান পিটারস্-এ একটা চাকরি। শহরে-শহরে ঘুরে-ঘুরে পিটারস্ ফ্যান বিক্রি করবো।"

"এইরকম সুন্দরীরা আমাদের ফ্যান-ফিরি করলে, আমরা গুলমার্গেও ফ্যান বিক্রি করতে পারবো!"

দোলন এবার বোনকে বললো, "ওই সব বাজে কথা ছাড়। মেয়েদের চাকরি-বাকরিটাই সবচেয়ে বড় কথা নয়।"

"এসব কি প্রতিক্রিয়াশীল কথাবার্তা বলছিস, দিদি?" সুদর্শনা খাওয়া বন্ধ রেখে দিদির মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে।

শ্যামলেন্দু বললো, "মেয়েদের এই একটা অসুবিধে। এম এ পাস করার পরও বিয়ে পরীক্ষায় বসতে হয়!"

ঘড়ির দিকে তাকালো দোলন। "তুমি বরং দেরি কোরো না। তাড়াতাড়ি টার্ফ ক্লাব থেকে ঘুরে এসো।"

"না-গেলে কেমন হয়?" শ্যামলেন্দু জিজ্ঞেস করে।

"আজকে সমস্ত ডিরেকটররা নিশ্চয় যাবেন?" দোলন জিজ্ঞেস করে।

"হ্যাঁ, দিল্লী থেকে মিস্টার মূর্তিও এসেছেন। নিশ্চয় মাঠে যাবেন।"

"তুমি তাহলে একবার ঘুরে এসো," আবার ঘড়ির দিকে তাকালো দোলন। "রুণু সান্যাল এতক্ষণে নিশ্চয় বেরিয়ে গিয়েছে।"

"রুণুর ঘোড়ার নেশা আছে, আমার নেই," শ্যামলেন্দু এবার শ্যালিকাকে

জানায়। কিন্তু স্ত্রীর ইচ্ছা অনুযায়ী তাকে উঠতে হয়।

বিলেতের মতো কলকাতার রেসও একটা সামাজিক ব্যাপার। বুশ শার্ট এখানে অচল। তাই সায়েবদের মতো ঘন নীল রঙের স্যুট এবং ম্যাচিং টাই পরে ফেললো শ্যামলেন্দু। তারপর চোখে কালো চশমা লাগিয়ে এবং বাইনোকুলারটা কাঁধে চড়িয়ে শ্যামলেন্দু বেরিয়ে পড়লো।

স্বামীকে বেস্ট অফ লাক জানিয়ে দোলন দরজা বন্ধ করে দিলো। তারপর একটু সোফাতে বসলো। এবং বোনকে জিজ্ঞেস করলো, "কোথায় শুবি তুই? আমার ঘরে চলে আয়, শুয়ে-শুয়ে গল্প করা যাবে।"

এয়ারকণ্ডিশনারটা চালু করে দিয়ে দুই বোন পাশাপাশি বসলো। দেওয়ালের পর্দাগুলো টানা রয়েছে। ঘরের মধ্যে তাই প্রায় রাত্রের অন্ধকার। এয়ারকুলার মেশিনের একটানা গোঙানি কিছুক্ষণ পরে গা সওয়া হয়ে যায়।

হংকং স্লিপারটা কার্পেটের ওপর রেখে, বিছানার ওপর পা মুড়ে বসলো দোলন। একটা ক্রিমের জার হাতে নিয়ে বললো, "মুখে একটু মাখবি নাকি? খুব ভাল ক্রিম, প্যারিসে তৈরি। ইমপোর্ট বন্ধ, নিউ মার্কেটের রহিম অনেক কষ্ট করে আনিয়ে দেয়। নামটা যদিও বিশ্রী।"

"কী নাম দিদি?"

"এই নে, দেখ না—বুর্জোয়া।"

একটু ক্রিম নিয়ে নিজের গালে ঘষতে-ঘষতে দোলন বললো, "কি জানি ভাই, নামটা শুনলে আজকাল আমার ভয় করে। কলকাতার যা ব্যাপার-স্যাপার! যাকে-তাকে ক্যাপিটালিস্ট, বুর্জোয়া এইসব মার্কা করে দিচ্ছে।"

ক্রিমটা সযত্নে ঘষতে-ঘষতে দিদি বললো, "তোরও তো আমার মতো ড্রাই স্কিন, সুতরাং বুর্জোয়া নাম্বার ওয়ান লাগবে। যাদের অয়েলি স্কিন তাদের জন্যে বুর্জোয়া নাম্বার টু। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, কলকাতার লোকেরা আজকাল কিছুই বোঝে না। কেউ সারাদিন খাটছে, রাত্রে বসেও অফিসের কথা চিন্তা করছে, অফিসের চিন্তায় ঘুম নেই, তার জন্যে যদি দুটো পয়সা বেশি পায়, অমনি সে ক্যাপিটালিস্ট হয়ে গেল। এটা কী ধরনের কথা? তুমিও চেষ্টা করো, তুমিও রোজগার করো। এই যে তোর শ্যামলদা, তুই তো জানিস, যখন আমাকে বিয়ে করলো, কলেজের প্রফেসরিতে তখন ক'টাকা পেতো? আর এখন নিজের চেষ্টায় পাঁচ হাজার একশ' টাকা মাইনে পাচ্ছে। সায়েবরা তো মুখ দেখে এই টাকা দেয় না, কাজ পায় বলেই দেয়।"

সুদর্শনা দিদির মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। দিদি বললো, "ক্রিমটা খুব আলতোভাবে মাখবি—না-হলে মাসলগুলো মিসেস সান্যালের মতো চোয়াড়ে হয়ে

যাবে। আর আঙুলটা ঘোরাবি ক্লক-ওয়াইজ, ঘড়ির কাঁটা যেদিকে ঘোরে।”

দিদির দেখাদেখি টুটুলও গালের ওপর আঙুল ঘোরাচ্ছে। দিদি বললো, “কীরে খুব ঠাণ্ডা লাগছে না? মনে হচ্ছে না, কে যেন মুখে বরফ স্প্রে করছে। এটা হলো ইভ-২২-এর এফেক্ট। ইভ-২২ একটা স্পেশাল কেমিক্যাল ‘যা বুর্জোয়া ছাড়া কেউ ব্যবহার করতে পারে না।”

এবার ড্রয়ার থেকে দুটো এবজরভ্যাণ্ট পেপার টাওয়েল বার করলো দোলন। একটা বোনকে দিয়ে, আর একটা নিজের গালে চেপে ধরলো। “খুব আলতো-ভাবে, মোটেই না-ঘষে, কেবল আস্তে-আস্তে প্যাট কর।”

দোলন বললো, “মাঝে-মাঝে জানিস, অত্যন্ত বিশ্রী লাগে। দেওয়ালের গায়ে পোস্টার মেরেছে: ধনীর চামড়া দিয়ে গরীবের পায়ের জুতো তৈরি হবে, সেদিন বেশি দূর নয়। আমার খুব খারাপ লাগে ভাই। হোল ইণ্ডিয়াতে ক'টা বড়লোক আছে? তাদের পিঠের চামড়ায় ক'খানা জুতো তৈরি হবে? প্রত্যেকে তাতে এক জোড়া জুতো পাবে না। আর তাছাড়া, সেদিন মিস্টার সেন এসেছিলেন, বাটানগরে ওঁর যাতায়াত আছে। উনি বললেন, মানুষের চামড়া ট্যান করার অনেক হাঙ্গামা, তাতে জুতোও টেকসই হবে বলে মনে হয় না।”

“তুই আজকাল খুব ভাবিস, তাই না দিদি?” টুটুল জিজ্ঞেস করে।

“হাতের গোড়ায় কিছুই নেই। ও সারাদিন কাজে ডুবে আছে। আমি আর কিঁ করি? ফ্যাশনের ম্যাগাজিনগুলো পড়ি। নিউ মার্কেটে যাই, দশতলার জানলা থেকে কলকাতাকে দেখি, রাজাকে চিঠি লিখি, বাবা-মা, তোর কথা ভাবি। এইভাবেই একদিন বুড়ো হয়ে যাবো।”

“নে শুয়ে পড়,” দিদি এবার ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে পড়লো।

টুটুলও দিদির দেখাদেখি চুল এলিয়ে শুয়ে পড়লো শ্যামলেন্দুর বিছানায়।

দিদি বললো, যদি তোর শীত-শীত লাগে তাহলে পায়ের গোড়ার চাদরটা টেনে নিস।”

“দিদি, তোর এখানে বাবা-মা এলে খুব আনন্দ পেতেন। মা রোজ একবার অন্তত জামাই-এর গুণগান করে।”

দোলন বলে, “একবার অন্তত পাকড়াও করে ধরে নিয়ে আসতে হবে।”

“মা আমাকে কি বলে জানিস? নিজে বড় হওয়া থেকে বড়লোকের বউ হওয়ার মধ্যে সুখ অনেক বেশি। আমি মার সঙ্গে তর্ক করি। তাহলে, এই যে আজকাল মেয়েরা বৈজ্ঞানিক হচ্ছে, রাষ্ট্রদূত হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী হচ্ছে, বিখ্যাত লেখিকা হচ্ছে, এসব বৃথা?”

“মা তোকে কী বলে?” দোলন জিজ্ঞেস করে।

"মা বলে, আরও বয়েস হোক তখন বুঝবি। সাফল্য আর সুখ এক জিনিস নয় ?"

দোলন বললো, "আমি ভাই, আজকাল খুব গভীর কোনো চিন্তা করতে পারি না। কোনো বড় বইও পড়তে পারি না, হাঁফ ধরে যায়। আমি তো তোর মতো লেখাপড়া করলাম না। আমার এখন একটামাত্র চিন্তা—ও কবে ডিরেকটর হবে। তারপর আছে ছেলের চিন্তা।"

"দিদি, তুই এখান থেকে এম এ পরীক্ষায় বসলে পারিস। দু বছর তো পড়েছিলি।"

"দূর, শিং ভেঙে আর বাছুরের দলে ঢোকা যায় না। তাছাড়া তোকে বললাম না, আমি এখন ম্যাগাজিন আর ডিটেকটিভ বই ছাড়া কিছুই পড়তে পারি না। ও-বেচারার তাই অবস্থা হয়েছে।"

"ওটা বাজে কথা দিদি। পড়াশোনায় তুই তো খারাপ ছিলি না। শুধু বিয়ের জন্যে তোর পরীক্ষা দেওয়া হলো না।"

"কপালে লেখাপড়া ছিল না। তোর শ্যামলদাই সব নষ্ট করে দিলো।"

"দিদি, তোর সেইসব দিনের কথা মনে পড়ে ? শ্যামলদা আসতো বাবার কাছে, আর তুই দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ওদের আলোচনা শুনতিস। তারপর তুই নিজেই শ্যামলদার অনার্সের খাতাগুলো চেয়ে নিয়েছিলি। তখন বড় সিরিয়াস ছিল শ্যামলদা, তাই না ?"

"যা কিছু করে, তাতেই ও সিরিয়াস," দোলন বলে। "এই যে চাকরি। কত লোক তো গায়ে হাওয়া লাগিয়ে, গল্‌ফ, ককটেল, টার্ফ ক্লাব করে চাকরি সামলাচ্ছে। ও কিন্তু তা পারে না। আমি যখন রেগে যাই, তখন ও বলে, আমাদের তো ওই গতরটুকুই সম্বল, দোলন। গতর খাটিয়েই তো আমাদের অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হবে।"

"প্রেমে এবং কর্মে শ্যামলদার সমান নিষ্ঠা, তুই বলছিস !"

"আঃ, দিদির সঙ্গে ফচকেমি," দোলন হাসে।

"আচ্ছা দিদি, তুই তো ছিলি মুখচোরা। আর শ্যামলদা ছিল গম্ভীর। কেমন করে তোরা প্রেম করলি ?"

"আমার ওকে সেই প্রথম যেদিন দেখেছিলাম সেদিনই ভাল লেগে গিয়েছিল।"

"প্রথম বছরটা তোরা লুকোচুরি খেলেছিলি। তারপর তুই যেমন বি এ পাস করে ইউনিভার্সিটিতে এসে জুটলি, খুব সুবিধে হয়ে গেল," সুদর্শনা মন্তব্য করে।

"তুই বিশ্বাস করবি না টুটুল, তোর শ্যামলদা, পড়াশোনার ব্যাপারে বড্ড সিরিয়াস ছিল। দেখা হলে গজর-গজর করে শুধু শেক্সপীয়র, শ' আর হার্ডির কথাই বলতো।"

"অন্য কিছুই বলতো না?" সুদর্শনা মুখ টিপে হেসে দিদিকে জেরা করে।

"এই তোর গা ছুঁয়ে বলছি! গজর-গজর করে শেক্সপীয়র এবং বার্নার্ড শ' সম্পর্কে আলাচনা করতো। আর উপদেশ দিতো, মন দিয়ে লেখাপড়া করুন, পরীক্ষায় ভাল রেজাণ্ট করা মোটেই শক্ত নয়। তাছাড়া আপনার কত সুবিধে? বাড়িতে অমন লাইব্রেরি রয়েছে! আমি ভয়ে সিঁটকে থাকতাম, সাহস করে বলতেও পারতাম না পড়াশোনা আমার ভাল লাগে না।"

"তাহলে বলতে চাস, প্রেমটা আপনা-আপনিই হয়ে গেল?" টুটুল এবার বোনকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করলো।

দোলন ছোট মেয়ের মতো বললো, "প্রায় তাই। তবে মিথ্যা কথা কেন বলবো, মাঝে-মাঝে কেমন ওই মোটা চশমার মধ্য দিয়ে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকাতো।"

"তুই বাবা চালাক মেয়ে, তাতেই সন্তুষ্ট। বুঝেছিলি, ভাল আমটিই পেড়ে খাবার সুযোগ এসেছে।"

"ছাখ, টুটুল, তুই আমাকে রাগাস না বলছি। তখন কে জানতো তোর শ্যামলদা একদিন ব্লু হ্যাভেনে আসবে? তখন তো আশ্রয় বলতে কদমকুয়ার ভাড়া বাড়িটা। আর জানতাম, ভালভাবে পাস করলে অন্তত একটা কলেজে চাকরি পাবে। আমার ভলে লাগতো ওর চোখ দুটো আর ওর ব্রাইট কথাবার্তা, বিশেষ করে বাবার সঙ্গে যখন তর্ক করতো।"

দিদির অবস্থা দেখে টুটুল মিটমিট করে হাসছে। শুয়ে-শুয়ে আড়চোখে দিদি তা লক্ষ্য করলো। তারপর বললো, "এই টুটুল! কিছুদিন আগে কাগজে দিয়েছিল, হ্যারল্ড উইলসন তখন ইংলণ্ডের প্রাইম মিনিস্টার, রিপোর্টাররা ওঁর বউকে জিজ্ঞেস করলো, প্রধানমন্ত্রী সম্বন্ধে আপনার মতামত কী? মিসেস উইলসন গম্ভীরভাবে বললেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের শুধু মনে করিয়ে দিতে চাই, ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীকে আমি কোনোদিন বিয়ে করতে চাইনি। আমি যাকে বিয়ে করেছিলাম, তিনি ছিলেন অক্সফোর্ডের একজন শিক্ষক।' আমাকেও যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, সোজা বলবো, আমি হিন্দুস্থান পিটারস্-এর কভেনেণ্টেড অফিসারকে বিয়ে করিনি, আমি বিয়ে করেছিলাম পাটনা কলেজের এক ছোকরা অধ্যাপককে, যার মাইনে ছিল ১৯০ টাকা, যে সাইকেলে চড়ে কলেজে যেতো এবং সাইকেলে ফিরতো।"

টুটুল উত্তর দিচ্ছে না কেন? ঘুমিয়ে পড়লো নাকি? পাশ ফিরে দোলন দেখলো টুটুল সত্যি ঘুমিয়ে পড়েছে। হাতটা ওর মুখের উপর এসে পড়েছে। টুটুলকে ভারি মিষ্টি দেখাচ্ছে। আহা বেচারা সারারাত থার্ড ক্লাস ট্রেনের ধকল সয়ে এসেছে, একটু ঘুমোক।

কিন্তু দোলনের চোখে ঘুম আসছে না। হিন্দুস্থান পিটারস্-এর কর্তা-ব্যক্তিরা এতক্ষণ রেসকোর্সে ঘোড়ার পিছনে সব কিছু ঢালছেন। মিসেস ফেরিস তাঁর হাতির দাঁতের কৌটো থেকে নস্যি নিচ্ছেন। মেয়েদের সিগারেটটা এখন চোখ-সওয়া হয়ে গিয়েছে, কিন্তু নস্যিটা নয়! অথচ বড় সাহেবের বউ-এর দেখাদেখি ব্লু হ্যাভেনের অনেক বউ নস্যি কৌটোর ব্যবস্থা করেছে। মিসেস ফেরিসকে কেউ জিজ্ঞেস করতে সাহস করেনি। কিন্তু গোপনে গোয়েন্দাগিরি করে, মিসেস সান্যাল বার করে ফেলেছেন, কোথা থেকে কি নস্যি কেনেন মিসেস ফেরিস।

তবে দোলন নস্যি নিতে কিছুতেই পারবে না। সে কথা দোলন সেদিন শ্যামলেন্দুকে বলে দিয়েছে, "তাতে তুমি ডিরেকটর হলে আর না হলে। এই মদের গেলাস ধরতেই কী খারাপ লাগে। যদি বাবা-মা কোনোদিন দেখেন, তাহলে কী ভাববেন বলো তো?"

"কেন? মদ খেলে লোক খারাপ হয়ে যায়? এই হিন্দুস্থান পিটারস্-এ যত অফিসার আছে খারাপ?" শ্যামলেন্দু জিজ্ঞেস করেছিল।

"তা নিশ্চয় নয়। কিন্তু ছোটবেলায় মদ খায় শুনলেই আমার ভীষণ ভয় করতো। মদ খেয়ে এসে আমাদের পাশের বস্তির সনাতন তার বউকে মারতো। উঃ! সে মদের গন্ধ আমার এখনও নাকে লেগে আছে।"

"সে যে দেশী মদ, আর এ যে বিলেতী জিনিস।" শ্যামলেন্দু উত্তর দিয়েছিল।

মিস্টার সান্যাল একদিন পার্টিতে বলেছিলেন, "মধ্যবিত্ত সেন্টিমেন্ট নিয়ে বাঙালী জাতটার সর্বনাশ হতে চলেছে। মদ খাওয়া খারাপ, ঘোড়ার মাঠে যাওয়া পাপ, মেয়েরা সিগ্রেট খাবে না, নস্যি শুধু ছেলেরাই নেবে। হোয়াই? মেয়েরা কী দোষ করেছে? ভাবুন তো মেয়েরা নস্যি নিলে নস্যির বিক্রি কত বাড়বে! চাষারা তাহলে তামাক বিক্রি করে আরও দুটো পয়সা পাবে, নস্যির কারখানায় বেকার লোকেরা চাকরি পাবে, ইনডাসট্রির উন্নতি হবে, আবার গভরমেন্টও সমাজ উন্নয়নের জন্যে আবগারী কর থেকে টাকা পাবে। ফলে বস্তি উন্নয়ন হবে, শিক্ষা বাড়বে, পথঘাটের জন্য শ্রমিক লাগবে, আরও লোক চাকরি পাবে। একেবারে চেইন রি-একশন।"

রুণু সান্যাল সেদিন একটু নেশার ঘোরে রঙিন হয়েছিলেন। হঠাৎ বলে

ফেলেছিলেন, "আসলে ব্যাপার কি জানেন, এ-দেশে আমরা এখনও শিল্প-বিপ্লবের জন্যে তৈরি হইনি। আর একটা জিনিস মনে রাখতে হবে। শিল্প-বিপ্লব সফল করতে হলে এগজিকিউটিভ চাই। কিন্তু কিলিয়ে কাঁটাল পাকানো যায় না। এক জেনারেশনে কমারসিয়াল এগজিকিউটিভ তৈরি হয় না। এই মার্চেণ্ট অফিসের উঁচু পোস্ট, এটা ঠিক চাকরি না। এটা একটা আলাদা কালচার —আলাদা সংস্কৃতি। আলাদা ওয়ে অফ লাইফ—একটা নতুন জীবন দর্শন।"

গেলাস থেকে আর একটু হুইস্কি গলায় ঢেলে, মিসেস চোপরার ঘাড়ে হাত রেখে, রুণু বলেছিল, "সোজা কথায় যা দাঁড়ায়, প্রথম জেনারেশন এগজিকিউটিভরা একটু প্যাচপেচে সেন্টিমেণ্টাল, একটু ভ্যাদভেদে আদর্শবাদী হবেই। কোনো উপায় নেই। তারা নিজেরাও জ্বলবে, অপরকেও জ্বালাবে। দোলনকে রুণু বলেছিল, আপনি তো লেখা-পড়া জানা মহিলা। আপনি বিবর্তনবাদ মানেন। প্রকৃতিতে ডবল প্রমোশন বলে কোনো জিনিস নেই। কেরানি বা ইস্কুল মাস্টারের ছেলে, খেলাৎ মেমোরিয়াল ইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করে, বঙ্গবাসী কলেজ থেকে পাইকারী ডিগ্রী নিয়ে, কখনও লাফ দিয়ে এগজিকিউটিভ হতে পারে না। হ্যাঁ বাবা, এখন থেকে চেষ্টা করো, যাতে তোমার ছেলে বা নাতি তা হতে পারে। সেটা সম্ভব!"

মিসেস সান্যাল সেই সময় হঠাৎ এসে পড়েছিলেন। তাড়াতাড়ি স্বামীকে সামলে নিয়ে বলেছিলেন, "তুমি কী সব বকছো?"

"শোনো ডার্লিং, আমি যা বোঝাতে চাইছি, তা হলো আমি প্রথম পুরুষের অফিসার নই। আমার বাবাও অফিসার ছিলেন শ' ওয়ালেসে।"

জোর করে স্বামীকে সরিয়ে নিয়ে মিসেস সান্যাল ক্ষমা চেয়েছিলেন। বলেছিলেন, "ও আজকে একটু ডিসটার্বড আছে—একটু বেশি খেয়ে ফেলেছে, কিছু মনে করবেন না।"

শ্যামলেন্দু সেদিন বাড়ি ফিরে এসে দোলনকে জিজ্ঞেস করেছিল, "রুণুর সঙ্গে তোমার কী হয়েছিল?"

"তুমি কি করে জানলে?"

"রুণু নিজে এসে আমার কাছে ক্ষমা চাইলো। বিবি বলে গেল কিছু মনে করবেন না।"

"আমি ঠিক বুঝলাম না। হঠাৎ এসে ফার্স্ট জেনারেশন, সেকেণ্ড জেনারেশন, প্রথম পুরুষ, দ্বিতীয় পুরুষ কী সব বকে গেল।"

শ্যামলেন্দু গম্ভীর হয়ে উঠেছিল। বললো, "বুঝলে না? আমি সাধারণ ঘর থেকে এসেছি, বাবা ইস্কুল-মাস্টার। ফার্স্ট জেনারেশন অফিসার—আর

রুশ্ড্ পুরুষের অফিসার।"

ওকে ওসব কথা বলা বোধহয় ঠিক হয়নি। সেদিন থেকে কেমন একটু পাল্টে গেল শ্যামলেন্দু। ওর মাথায় যেন কী একটা গোঁ চেপে বসেছে। তারপর গল্‌ফ ক্লাবে যাওয়ায় আর বাদ পড়ে না। ককটেলও ফাঁক পড়ে না। গোবিন্দপুর ক্লাবে নিয়মিত ঢুঁ মেরে আসে। আর রেস তো আছেই।

একবার দোলনের মনে হয়েছে শ্যামলেন্দুর এসব মানায় না। মার্চেন্ট অফিসের এই ক্ষুদে লোকগুলোর তুলনায় শ্যামলেন্দু অনেক বড়। কিন্তু শ্যামলেন্দু বলেছে, "এইসব যে আমি ভালবাসি তা নয়। কিন্তু আমি কিছুতেই হেরে যেতে রাজী নই। একটু-আধটু এসব করা দরকার, যদিও ককটেল ম্যানেজারদের দিয়ে আর কাজ হবে না। কর্তারা বুঝতে পেরেছেন একচেটিয়া বাণিজ্যের যুগ শেষ হতে চলেছে। প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়ে এখন ভারতবর্ষে ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে হলে কোম্পানিকে কাজ করতে হবে। তাই বিদেশী কর্তারা এখন কাজের লোক চান—তাঁরা মানুষ যাচাই করে নিতে শিখেছেন।"

পাশ ফিরে শুলো দোলন। আহা বেচারা শ্যামলেন্দু, এতক্ষণ একটু ঘুমোতে পারতো। ওর একটু বিশ্রাম দরকার ছিল। তা নয়, এই দুপুর রোদে ঘোড়া-রোগ!
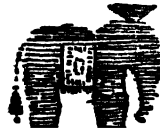
দুপুর গড়িয়ে কখন বিকেল এসেছে খেয়াল হয়নি। দুই বোন বেঘোরে ঘুমোচ্ছে। শ্যামলেন্দু কখন বাড়ি ফিরেছে তাও খেয়াল করেনি।

বিকেলবেলায় বাড়ি ঢোকবার সময় বেল বাজায়নি শ্যামলেন্দু। পকেট থেকে ডুপ্লিকেট চাবি বার করে চুপিচুপি ঢুকে পড়েছিল। ঘুমোবার একটু ইচ্ছে যে ছিল না এমন নয়। কিন্তু ঘরে ঢুকেই টুটুলকে দেখতে পেলো।

বাইরে সোফায় এসে বসলো শ্যামলেন্দু। একটা সিগারেট ধরালো। ফেরিস সায়েবের কপালটা আজ খারাপ। পুরো দেড়শ' টাকাই হেরেছেন। ওঁর নিজস্ব ঘোড়াটাও সুবিধে করতে পারেনি। মিসেস ফেরিস অবশ্য কিছু জিতেছেন। ভাগ্যে শ্যামলেন্দু হেরেছে আজ! যারা জিতেছে আজ তাদের সবার ওপরই বেশ চটিতং হয়ে আছেন হিন্দুস্থান পিটারস্-এর ম্যানেজিং ডিরেকটর।

না, একটু গড়িয়ে নিতে পারলে মন্দ হতো না। শ্যামলেন্দু এবার গেস্টরুমে ঢুকে পড়লো।

সিগারেট টানতে-টানতে আস্তে-আস্তে পায়ের আঙুলগুলো নাচাচ্ছিল শ্যামলেন্দু। ঘরের কোণে একটা বুককেসে শেক্সপীয়রের গ্রন্থাবলী চকচক করছে। দশটা খণ্ডে সোনার জল দিয়ে নাম লেখা। হিন্দুস্থান পিটারস্‌-এর প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে দোলন নিজে কিনে দিয়েছিল। কী? হাসি হাসছে?

কিন্তু সত্যি কথা। বিশ্বাস করুন, প্রথম মাসের মাইনে থেকেই এই দামী সংস্করণ কেনা হয়েছিল। তার আগে তো কলেজে মাইনে ছিল ১৯০ টাকা। আর প্রথম মাসেই হিন্দুস্থান পিটারস্ থেকে পাওয়া গিয়েছিল আটশ' টাকা। দোলন তখন পাটনায়। নীল খামে চিঠি লিখে দিয়েছিল, "আমি কোনো কথা শুনতে চাই না। আমি মনে করবো আরও একমাস তুমি প্রফেসারি করছো। তুমি অবশ্যই শেক্সপীয়রের নতুন সিরিজটা কিনবে—আমার মাথার দিব্যি রইলো।"

স্ট্র্যাটফোর্ড-অন-অ্যাভনের ঐ দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক আজ এই অপরাহ্ণে যেন কাঁচের বন্দীশালার ভিতর থেকে উদীয়মান কোম্পানি-এগজিকিউটিভ শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জির দিকে রোষকষায়িত নেত্রে তাকিয়ে আছেন।

শেক্সপীয়র লোকে মন দিয়ে পড়ে কেন? দোলনের বাবা যখন বলতেন, "শ্যামল, শেক্সপীয়রের মধ্যে ডুবে থাকো। এ এক অপূর্ব জগৎ," তখন কেন তা বলতেন তিনি? শেক্সপীয়র ভাঙিয়ে যুগ-যুগ ধরে ছাত্ররা পরীক্ষায় ভাল করছে। শেক্সপীয়রকে বার-বার পড়া মানে তাঁকে জানা, আর জানা মানে পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাওয়া, আর ভাল নম্বর পাওয়া মানে ভাল চাকরি পাওয়ার সুবিধা। তারপর শেক্সপীয়র শেষ। তারপর আমার জন্যে বাড়ি, গাড়ি, বউ, ক্লাব, ককটেল, কনট্রাক্ট ব্রীজ, ডিনার, ডান্স, পেরিমেসন এবং টাইম ম্যাগাজিন। সিন্ধুপারের বিশ্বকবি, আপনি মাথায় থাকুন। আপনাকে যে বাড়ির শোভাবৃদ্ধির জন্যে ফার্নিচার হিসেবে রেখেছি, জঞ্জাল কমাবার জন্যে আব্দুলকে বাইরে ফেলে দিতে বলিনি, এই যথেষ্ট। মোর দ্যান এনাফ্!

শ্যামলেন্দু বললো, "মিস্টার উইলিয়ম শেক্সপীয়র, আপনি আমার দিকে ওইভাবে তাকাবেন না। আমি আপনাকে সত্যি কথা বলছি, আপনি যেসব কথা কায়দা করে লিখে গিয়েছেন, তাতে আমাদের হিন্দুস্থান পিটারস্-এর ফ্যান বা ইলেকট্রিক ল্যাম্প কোনোটাই বিক্রি করতে সুবিধে হয় না। আমি তো আপনার লেখা একসময় তন্ন-তন্ন করে পড়েছি, বলুন তো একটা লাইন, যা দিয়ে আমি ফোরকাস্ট করতে পারি, আগামী তিন বছরে ইণ্ডিয়াতে কত ইলেকট্রিক ফ্যান বিক্রি করা যাবে? তার মধ্যে আটচল্লিশ ইঞ্চি এবং ছাপ্পান্ন ইঞ্চির অনুপাত কত হবে? বলুন তো, ওয়েস্ট বেঙ্গলের অর্থনৈতিক অধঃপতনের

জন্যে পশ্চিমবঙ্গে ফ্যানের বিক্রি কমবে কিনা? মিস্টার শেক্সপীয়র, আপনি চুপ করে বসে আছেন কেন? আপনার তো বিশ্বজোড়া নাম, আপনি তো মানুষের সমস্ত বড়-বড় সমস্যা সম্পর্কে নিজস্ব মতামত দিয়ে গিয়েছেন—প্রেম, বিরহ, হিংসা, উচ্চাশা, হত্যা, মৃত্যু কোনো সাবজেক্টই তো ছাড়েননি। কিন্তু বলুন তো, নির্দিষ্ট তারিখের পনেরো দিন আগে গরম পড়লে ইলেকট্রিক পাখার বাজারে তার কী প্রতিক্রিয়া হবে? এসব আপনার কাছে হাস্যকর মনে হতে পারে, কিন্তু আমাদের কাছে জীবন-মরণের প্রশ্ন। এই সব প্রশ্নের ভুল উত্তর দিলে এই দশতলার ফ্ল্যাট থেকে বিতাড়িত হয়ে স্ত্রীর হাত ধরে আমাকে রাস্তায় দাঁড়াতে হতে পারে। এই আমার সুখী সংসার, এই এয়ারকণ্ডিশন ঘর, কার্পেট, ফ্রীজ, টেলিফোন, বয়, বাবুর্চি, বাড়ি, গাড়ি সবার সঙ্গে পিটারস ফ্যানের অদৃশ্য তার জড়িয়ে জট পাকিয়ে রয়েছে। অথচ আপনি দর্শনের বিলাসিতায় বুঁদ হয়ে রয়েছেন। 'টু বি অর নট টু বি', এই সব প্রশ্ন তুলে সস্তা হাততালি কুড়োচ্ছেন তাদের কাছ থেকে, যাদের মনে থাকে না কত সাধ্য-সাধনা করে মাটির বুক থেকে কৃষক শস্য সংগ্রহ করে, কত যন্ত্রণার মধ্যে ধরিত্রীর গর্ভ থেকে কয়লা এবং লোহা ছিনিয়ে আনতে হয়, কত কষ্ট করে ব্লাস্ট ফার্নেসের অগ্নিপরীক্ষায় ইস্পাত শুদ্ধ করতে হয়, তিল-তিল করে কত মানুষের চেষ্টায় একখানা পিটারস্ ফ্যান গড়ে ওঠে, তারপর সেই ফ্যানের বিক্রির জন্যে আমাদের কী প্রাণান্তকর পরিশ্রম করতে হয়। কিছু মনে করবেন না, মিস্টার শেক্সপীয়র, আমাদের এই শিল্পযুগে আপনি অচল। নিতান্ত করুণাবশতই ইস্কুলে কলেজে আপনাকে এখনও স্থান দেওয়া হচ্ছে—কিন্তু আপনি আমার অফিসের কেরানি সুধন্যবাবুর মতো ভেবে বসবেন না যে আপনাকে এক্সটেনশন দেওয়া হয়েছে বলেই আপনাকে আমাদের খুব প্রয়োজন আছে, আপনাকে ছাড়া আমাদের চলবে না।

"শেক্সপীয়র সাহেব, আপনি মিটিমিটি হাসবেন না। আপনার ওই দাড়িওয়ালা মুখের চাপা হাসির পিছনে একটা চাপা মোনালিসা ঔদ্ধত্য উঁকি মারছে। আমি আপনাকে সত্য কথা বলছি, আপনার বই আমার পড়তে ভাল লাগতো। ভারি মজার-মজার কথা লিখেছেন—তার কিছু সত্যি, কিছু আজগুবী। এই সব কথা শিখে ভাল থিয়েটার করা যায়, ভাল ক্রস্ওয়ার্ড চক্র সমাধান করা যায়, ভাল ইংরিজীর মাস্টার হওয়া যায়। আমি মাস্টার হয়েছিলাম। কিন্তু আপনার সমস্ত বুলি কপচিয়েও মাসে ১৯০ টাকার বেশি পাওয়ার পথ নেই। তার থেকে আবার সাড়ে আট টাকা প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড এবং দশ পয়সা রেভিনিউ টিকিট কেটে নিলে, হাতে থাকে ১৮১ টাকা চল্লিশ

পয়সা। তার থেকে বাড়িভাড়া বাদ দিন ৩১ টাকা, তাও বাবার আমলে ভাড়া নেওয়া তাই। রইলো কত? ১৫০ টাকা। এই ১৫০ টাকা হাতে নিয়ে যদি শোনেন আপনার বাবার স্বাস্থ্য ভাল নয়, চাকরি বন্ধ, এখনই এক্স-রে ইত্যাদি করাতে হবে এবং আরও শোনেন স্ত্রী সন্তানসম্ভবা, যে স্ত্রীকে, আপনি অনেক আদর করে ভালবেসে কলেজের লেখাপড়া ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছেন, তাহলে আপনার মনের অবস্থা কেমন হয়? আপনার সময় ডাক্তাররা কি লিখতো জানি না, কিন্তু এখন এক্স-রে পরীক্ষায় ফুসফুসে দোষ দেখলে ডাক্তাররা বিরাট-বিরাট ওষুধের সঙ্গে লেখেন দুধ, ঘি, ছানা, ডিম, ফল। সন্তানসম্ভবা মেয়েদের স্বামীদের ডেকে ভিটামিনের নাম বলেন, আর সাবধান করে দেন, দেখবেন খাওয়া-দাওয়া যেন কমতি না হয়, মাছ মাংস ডিম দুধ ইত্যাদি। একজনের নাম করে দুজন খাচ্ছে এটা মনে রাখবেন।

"এই অবস্থায় কেউ যদি কাগজে দেখে কোনো বিলিতি কোম্পানি বিজ্ঞাপন দিয়েছে মার্কেটিং ডিপার্টমেণ্টে লোক চাই—মাইনে যোগ্যতা অনুসারে। সঙ্গে নানা সুবিধা, যেমন বাড়িভাড়া, বিনাপয়সায় স্বামী-স্ত্রীর চিকিৎসা, বোনাস ইত্যাদি, তাহলে আপনি কি হাতগুটিয়ে বসে থাকবেন? আপনি নিজে এই বিজ্ঞাপন দেখলে কী করতেন, বুকে হাত দিয়ে বলুন তো? তাতে না-হয় আপনার মিডসামার নাইটস ড্রিম লেখা না-ই হতো।

"তাহলে বুঝতে পারছেন কেন আমি অ্যাপ্লিকেশন করেছিলাম বক্স নম্বর ধরে। তারপর হিন্দুস্থান পিটারস্ লিমিটেড থেকে একদিন উত্তর এসেছিল। খোদ সেলস্ ম্যানেজার ডেভিডসন সায়েব কী কাজে পাটনায় এসেছিলেন; সেই সময় ইনটারভিউ।"

"আমার আবার সেদিন কলেজ। জীবনে কখনও ইনটারভিউ দিইনি। তবু সাইকেলখানা নিয়ে বোঁ-বোঁ করে চালিয়ে ডেভিডসনের হোটেলে হাজির হয়েছিলাম। জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন বিষয়ে এম-এ পড়েছো?' বললাম, ইংরিজী। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার ফেভারিট অথর?' তা আমি আপনারই নাম করলাম। আমি কী করে জানবো ডেভিডসন সাহেব নিজে আপনার অমন ভক্ত। বেলিয়ল কলেজ, অক্সফোর্ডে, এক সময় মন দিয়ে শেক্সপীয়র অধ্যয়ন করে ভদ্রলোক এখন ইণ্ডিয়াতে ফ্যান এবং ল্যাম্প বিক্রি করছেন। আমাকে আপনার সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞেস করলেন। আমার স্মৃতিশক্তি খারাপ ছিল না, তাছাড়া দোলনের বাবা সারাজীবন ধরে সাধনা করে আপনার সম্পর্কে যা যা অনুভব করেছেন, তার নির্যাস ভাবী জামাতাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, তার কিছু-কিছু ছাড়লাম।

কথায়-কথায় অ্যামবিশনের কথা উঠলো। ইনটারভিউয়ের কথা ভুলে ভদ্রলোক আপনার অষ্টম হেনরী নাটকের সেই বিখ্যাত বচন মুখস্থ বললেন—'*As ambitious as Lady Macbeth, Cromwell I charge thee, fling away ambition ; By that sin fell the angels.*'

"দোলনের বাবার সঙ্গে এ-বিষয়ে একবার অনেক আলোচনা হয়েছিল। বললাম, শেক্সপীয়রের সমগ্র রচনায় ছেচল্লিশবার অ্যামবিশন প্রসঙ্গ উঠেছে কিন্তু 'অ্যামবিশাস' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে ছত্রিশবার, কেন জানি না।

"আমার উত্তর শুনে অবাক হয়ে গেলেন ডেভিডসন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কলেজে কত পাও?' ফিগারটা শুনে ভদ্রলোক একটু ঘাবড়ে গেলেন। ইণ্ডিয়াতে মাস্টারদের এই মাইনে!' বললাম, আজ্ঞে হ্যাঁ স্যর। আমি এই সময়ে ঘড়ির দিকে তাকালাম। ডেভিডসন জিজ্ঞেস করলেন, 'ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছ কেন?' বললুম, বেলা একটা থেকে অনার্সের ছেলেদের হ্যামলেট পড়াতে হবে। এখন বারোটা বেজে চুয়াল্লিশ। ভাবছিলাম, জোরে সাইকেল চালিয়ে গেলে, ক্লাসটা নেওয়া যায়! ছেলেগুলোর ক্ষতি হয় না।

" 'তুমি সাইকেল চড়ে ইনটারভিউ দিতে এসেছো?' বলেছিলুম, হ্যাঁ। হাজার হোক অক্সফোর্ডের সায়েব। আমার শেক্সপীয়র জ্ঞান, ইংরিজী ভাষার ওপর দখল এবং আমার মফঃস্বলী নিষ্ঠা তাঁর মনে দাগ কেটেছিল। বলেছিলেন, 'চ্যাটার্জি, তোমাকে বলে যাচ্ছি চাকরি তুমি পাবে। এখন আমরা কিন্তু সবসুদ্ধ সাড়ে-আটশ'র বেশি দিতে পারবো না।'

"আমি প্রথমে ভাবলাম, ভুল শুনছি। তারপর দেখলাম, না, সায়েব তো বলছেন সাতশ' টাকা মাইনে, দেড়শ' টাকা বাড়ি ভাড়া।

"ডেভিডসন লোকটা একটু অদ্ভুত ধরনের। হোটেলের বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন। আমি তখন সাইকেলে চড়ে বসেছি। সায়েব জিজ্ঞেস করলেন, 'চ্যাটার্জি, কিন্তু শেক্সপীয়রের কী হবে। আমাদের ওখানে তো মাল বেচার কাজ!'

"আমি ঘাবড়ে গেলাম। চাকরিটা আবার পিছলে বেরিয়ে না যায়। বললাম, আপনি চিন্তা করবেন না মিঃ ডেভিডসন। শেক্সপীয়র আমার মাথার ওপরে থাকবেন। একবার যে শেক্সপীয়রের রস পেয়েছে, সে কখনও শেক্সপীয়রকে ছাড়তে পারে?

"আমার ওই শেষ কথাটা একটু অসত্য বলতে পারেন। কিন্তু মিস্টার শেক্সপীয়র, মানুষের মনের কোনো রহস্য তো আপনার দুর্জ্ঞেয় নয়, আপনি তো জানেন, চাকরিটা রক্ষা করবার জন্যে আমি তখন সব কিছু করতেই রাজী ছিলাম। আর তাছাড়া আমি তখনও ভাবিনি আমি এমন হয়ে যাবো—

লিমিটেড কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের দায়িত্বের মতো, আমি নিজেও সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বো।

"কী হলো? এখনও আমার মুখের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রয়েছেন যেন আপনার কাছে টাকা ধার নিয়ে শোধ দিইনি, আপনাকে ঠকিয়েছি? আমি তো বলছি, প্রথমদিকে আমি ভেবেছিলাম, শ্যামও রাখবো কুলও রাখবো। আমার বউ, ইংরিজীর রীডার বটুকেশ্বর ভট্টাচার্যর মেয়ে দোলনও তাই চেয়েছিল। না-হলে প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে গয়না না-গড়িয়ে কেউ স্বামীকে ওই রকম দামী শেক্সপীয়র এডিশন কিনতে বলে?

"আরও কত প্ল্যান ছিল। ট্রেনিং-এ থাকার সময় তো দু-একটা রিপোর্টের মধ্যেও লিখেছি—লাভস লেবার লস্ট। অথবা মাচ এডো অ্যাবাউট নাথিং। বিশ্বাস না হলে আপনি হিন্দুস্থান পিটারস্-এর পুরানো রেকর্ড দেখতে পারেন। হাজার হোক বিলিতী কোম্পানি, স্বয়ং আপনি দেখতে চেয়েছেন শুনলে খুব গোপনীয় নোটও বার করে দেবে। তাছাড়া, আপনি তো জানেন ইংরেজদের যত দোষই থাকুক তারা জোচ্চোর নয়। এট দেয়ার ওয়াস্ট', কিছু ইংরেজ খল হতে পারে, কিন্তু আমাদের দেশের ব্যবসাদার বলে পরিচিত পেটমোটা গুড়ের নাগড়িগুলোর মতো তারা ডাকাত এবং শয়তান হতে পারে না। দেখুন, বিলিতী কোম্পানিরা সৎপথে ব্যবসা করে, খদ্দেরদের ঠকায় না, ব্লাকমার্কেটে নিজেদের কালো করে না, কর্মচারীদের বেশ ভাল মাইনে দেয় এবং প্রতিভা দেখাতে পারলে যে-কেউ ওপরে উঠে যেতে পারে, তার জন্যে গুড়ের নাগড়ির মতো পেট হবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এসব তো অন্য কথা! যা বলছিলাম আপনাকে, শেক্সপীয়র থেকে কোটেশন দেওয়া নোট লিখে আমার বেশ নাম হয়েছিল।

"তখন আমাদের ডিপার্টমেন্টের ডিরেকটর ছিলেন এন কে মেনন। কেরালার খ্রীস্টান, ক্ষুরের মতো বুদ্ধি। দোষের মধ্যে ছোটবেলায় আপনার খপ্পরে পড়েছিলেন। মেনন আমাকে ডেকে একদিন কফি খাইয়েছিলেন। ডিরেকটরের ঘরে ছোকরা সেল্সম্যান কফিতে নিমন্ত্রিত হলে মনের অবস্থা কী হয়, আপনি বুঝবেন না। আপনার তো ইনডাসট্রিয়াল রেভলিউশন, মানে শিল্প-বিপ্লবের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা নেই! মেনন সায়েব আমার প্রশংসা করে বলেছিলেন, 'এই কোম্পানিতে তোমার ভবিষ্যৎ আছে। কিন্তু তোমার লক্ষ্যকে আরও ছুঁচলো করে তুলতে হবে। সুঁচের মতো পয়েণ্টেড হতে হবে।'

"মিস্টার মেনন বলেছিলেন, 'জানো তো আমাদের এই হিন্দুস্থান পিটারস্-এর ইতিহাস। মিস্টার জন পিটারস্ ছিলেন ওয়েলস্-এর এক কয়লাখনির

শ্রমিক। একবার খনিতে আহত হয়ে বাড়িতে বসেছিলেন। ইংলণ্ডে যা আশ্চর্য তাই হলো সেবার। হঠাৎ বেজায় গরম পড়লো ওয়েলসে। আর কয়লাখনির ওয়ার্কারদের বাড়ি! বুঝতেই পারছো, কোনো বাতাস নেই। অসহ্য গরমে পচতে-পচতে হঠাৎ পিটারস্-এর মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেল। কেমন করে একটা চাকাকে বিদ্যুতের সাহায্যে ঘুরিয়ে হাওয়া সৃষ্টি করা যায়। সামান্য একটা আইডিয়া, তার থেকেই আবিষ্কার হলো পিটারস্ ফ্যান। সাধারণ একটা পেটেন্ট থেকে এই জগৎ-জোড়া কোম্পানি। দুনিয়ার যেখানে যাবে সেখানেই দেখবে পিটারস্ লিমিটেড, পিটারস্ ইনকরপোরেটেড, পিটারস্ ইনডাসট্রিজ ইত্যাদি। ফ্যান ছাড়াও ইলেকট্রিক ল্যাম্প তৈরি আরম্ভ করেছে পিটারস্ কোম্পানি। ল্যাম্পের আবিষ্কর্তা আলভা এডিসনের সঙ্গে ওদের কী একটা দূর সম্পর্কের আত্মীয়তা ছিল। তারপর থেকে এরা কখনও পিছনে তাকায়নি। নেভার, নেভার। ইণ্ডিয়াতেও এসেছে হিন্দুস্থান পিটারস্, যদিও এখানে আমরা তেমন একটা বড় কোম্পানি নই। কিন্তু মনে রেখো, সেনসাস রিপোর্ট অনুযায়ী ইণ্ডিয়াতে সাড়ে-নয় কোটি হাউসহোল্ড আছে। একটু অবস্থা ভাল হলেই এইসব পরিবারের লোকেরা বাড়িতে ইলেকট্রিক আলো জ্বালাবে এবং পাখা টাঙাবে।'

"মিস্টার শেক্সপীয়র, আবার তাকাচ্ছেন আমার দিকে? ভাবছেন আউট অফ পয়েণ্টে বকে চলেছি? মোটেই তা নয়। শুনুন, মিস্টার মেনন তারপর আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'বলো তো তোমাদের এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য কী?' আমি বলেছিলাম, মানুষের মঙ্গল করা, ওই যে পিটার সায়েবের সচিত্র জীবনীতে লেখা আছে। মেনন সায়েব সোজাসুজি বলেছিলেন, 'শোনো চ্যাটার্জি, আমাদের উদ্দেশ্য একটা। আরও পিটারস্ ফ্যান এবং লাইট তৈরি করা; আরও পিটারস্ ফ্যান ও লাইট বিক্রি করা এবং শুধু বিক্রি করা নয়, আরও লাভ করা।' আমি প্রশ্ন করেছিলাম, তারপর? মেনন সায়েব বলেছিলেন, 'আরও উৎপাদন বাড়ানো এবং বিক্রি করা, তারপর আরও··· আমি ওঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, 'এই লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্যে যা প্রয়োজন আমরা তাই করবো, যা প্রয়োজন নয় তা করবো না।'

"এখন আপনি বলুন, আপনাকে এই জীবনের মধ্যে কী করে আমি বা মেনন সায়েব ঢোকাতে পারতাম? আর আপনাকে বলে রাখছি, শুনুন, জেনুইন এগজিকিউটিভ হলো যুদ্ধের সুইসাইড স্কোয়াডের মতো। তারা নিজেদের টার্গেটে পৌঁছনোর জন্য সুইসাইড করতে পারে। সুইসাইড বলতে আপনি যেন আবার অভিধানের অর্থ নিয়ে নেবেন না। মানে আপনি নিজেই

আপনাকে মেরে ফেলে, আপনার বাড়ির মধ্যে আর-একটা লোককে ঢুকিয়ে দিতে পারেন। আরও ভাল হয় যদি আপনার হৃদয় এবং মস্তিষ্ক কেটে ফেলে দিয়ে সেই জায়গায় একখানা আই-বি-এম কমপিউটর বসাতে পারেন। জানেন তো, আই-বি-এম কমপিউটরের যতই বুদ্ধি থাকুক, নিজে কিছু করতে পারে না! যারা তাকে কেনে বা ভাড়া করে তারা হুকুম করে, আর কমপিউটর মন্ত্রের মতো উত্তর দিয়ে যায়।

"আমি অবশ্য তখনও অতটা বুঝিনি। একশ' নব্বই থেকে সাড়ে-আটশ'র ঝোঁকে দিনরাত সেল্সের কথা ভাবছি। ভক্ত যেভাবে ঈশ্বরের মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দেবার চেষ্টা করে তেমনিভাবে হিন্দুস্থান পিটারস্-এর সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি। আপনাকে বলছি, ফল হয়েছে।

"আমাকে দিল্লীতে পাঠানো হয়েছে। যেখানে দশ হাজার ফ্যান বিক্রি হতো না, সেখানে আমি কুড়ি হাজার ফ্যান বিক্রি করেছি। আপনি বিশ্বাস করবেন, দিল্লীর দারুণ শীতেও আমি পিটারস্ ফ্যান বিক্রি করেছি। মেনন সায়েব জানতে চেয়েছিলেন, কী করে পারলে? আমি বলেছিলুম, চেষ্টায় ভগবানকে পাওয়া যায়, আর শীতকালে পাখা বিক্রি হবে না? এরপর আমি গিয়েছিলাম রাউরকেল্লা, ভিলাই, দুর্গাপুর, জামসেদপুর এবং বার্ণপুরে। তৈরি করেছিলাম সেই বিখ্যাত *sales forecast*—যাতে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম, সরকারের ইস্পাত-পরিকল্পনার সুযোগ নিয়ে আমরা ওইসব শহরে আগামী দশ বছরে কেমনভাবে পিটারস্ ফ্যানের বিক্রি বাড়াতে পারবো।

"তারপর আপনি জানেন না, এই কোম্পানি কীভাবে গুণের আদর করেছে। প্রথম বছরের শেষে মেনন সায়েব বলেছেন, 'তোমার ইনক্রিমেণ্ট কত হলে খুশী হবে?'

"আমি লজ্জার মাথা খেয়ে বলেছি, দেড়শ' টাকা বাড়িয়ে পুরোপুরি এক হাজার হলে আর প্রত্যাশার কিছু থাকে না। হেসে ফেলে ভদ্রলোক বলেছিলেন, 'এই নাও তোমার চিঠি। খুলে ত্মাখো।' চিঠি খুলে আমি অবাক! আপনার কখনও এমন হয়েছে? আমার মাইনে বেড়ে হয়েছে বারো শ' টাকা।

"তারপর দীর্ঘ ঘটনা। সেসব বর্ণনা করতে বসে আপনাকে বিব্রত করতে চাই না। শুধু বলতে চাই, আমি এর পরে আর পিছনে ফিরিনি। ক্রমশ এগিয়ে গিয়েছি। একের পর এক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, আমি তা পালন করেছি। লোকে বলেছে, মিটিয়রিক রাইজ—মানে উল্কার মতো এস চ্যাটার্জি শুধু উঠছে, উঠছে।

"কিন্তু মিস্টার মেনন বলেছেন, 'এ আর এমন কি? তোমাকে এবং

স্যানিয়ালকে আরও উঠতে হবে।'

"শুধু আমার নামটাই করতে পারতেন ভদ্রলোক, সঙ্গে আবার স্যানিয়ালের নাম কেন ? স্যানিয়ালও আমাদের সেল্‌সে রয়েছে। এখন ল্যাম্প বিক্রি করে। না, আপনি স্যানিয়ালকে চিনতে পারবেন না। আপনি মিস্টার মেননের ব্যাপারটা শুনুন। লোকটা অনেক ফাইট করেছিল, কিন্তু আপনি এই কেরলী খ্রীস্টানের সর্বনাশ করলেন।

"মিস্টার মেননের মধ্যে, কী একটা জিনিস ছিল। কনসেন্স না কি বলে। আপনি তো ও বিষয়ে স্পেশালিস্ট। আরও ফ্যান এবং আরও লাইট বেচে-বেচে ক্লান্ত হয়ে একদিন ভদ্রলোক চাকরিতে ইস্তফা দিলেন। বললেন, কোথাকার কোন এক কলেজে ছেলে পড়াবেন, আর দেশের মানুষের উপকার হয়, এমন কোনো কাজ করবেন।

"আপনি কপিলাবস্তুর রাজকুমার সিদ্ধার্থের নাম শুনেছেন ? আপনাদের থেকে কিছু বয়সে বড় ভদ্রলোক। উনি যখন বিরাট রাজত্ব আর সুন্দরী বউ ছেড়ে চলে গেলেন, লোকে বুঝতে পারেনি কেন ? আমাদের এই মিস্টার মেনন বউকে রাখলেন, কিন্তু রাজত্ব ত্যাগ করলেন। আপনি ভাবছেন, অফিসে ঝগড়া হয়েছিল ? মোটেই তা নয়। আপনি ভাবছেন, কোনো শোক পেয়েছিলেন ? মোটেই নয়। জাস্ট এমনি। আপনার কোনো এক ভজঘট লেখার দোষে—ম্যাকবেথ নামে বইতে আপনি উচ্চাশার বিরুদ্ধে কী সব লিখেছেন, সেই পড়ে।

"কিন্তু দেখুন, মেনন সায়েবের বাবার অনেক টাকা। আমি ইস্কুল মাস্টারের ছেলে। আমি নিজেই মাইনে পেতাম ১৯০ টাকা। আমাকে খেটে খেতে হয়। মেনন সায়েব আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে পারেন, কিন্তু আপনার সঙ্গে সম্পর্ক রাখাটা আমার কাছে বিলাসিতা, বুঝছেন ?

"কী হলো, এখনও হাসছেন ? দেখুন, ফের যদি হাসেন, তাহলে বলবো, আপনি নিজেই জাল। শেক্সপীয়র বলে কেউ কোথাও ছিল না। আপনি যে আপনার বইগুলো লেখেননি তার সপক্ষে অনেক এভিডেন্স আছে। সেগুলো আমি যদি মেনে নিই। তখন ?"

"এই শ্যামলদা, শ্যামলদা !" কে যেন গায়ে খোঁচা দিলো। ধড়মড় করে উঠে বসলো শ্যামলেন্দু। সুদর্শনা ডাকছে।

"বাঃ, কখন চুপি চুপি এসে ঘুমিয়ে পড়েছেন," সুদর্শনা বলছে। "ডাকলেন না কেন ? আমি তাহলে বেরিয়ে আসতাম। নিজের বউ-এর কাছে শুতে

পারতেন!"

দোলনও এসে দাঁড়িয়েছে কাছে। শ্যামলেন্দু এখনও ঠিক যেন সংবিৎ ফিরে পায়নি! "জানো, আজকে বিশ্রী একটা ব্যাপার হতে যাচ্ছিলো। স্বয়ং উইলিয়ম শেক্সপীয়র স্বপ্নে দেখা দিয়েছিলেন। ভদ্রলোকের সঙ্গে খুব কথা-কাটাকাটি হচ্ছিলো, হয়তো হাতাহাতি হতো, এমন সময় টুটুল এসে ঘুম ভাঙিয়ে দিলো।"

"কেন? দুপুরে কিছু খেয়েছো নাকি?" দোলন জিজ্ঞেস করে।

"এমন কিছু নয়। ক্লাবে তিনটে জিন। ফেরিস সায়েব সবাইকে নিয়ে গিয়ে খাওয়ালেন।"

"তিনটে জিনে তোমার তো কিছু হয় না। নিশ্চয় শরীর দুর্বল হয়ে আছে।" দোলন উদ্বেগ প্রকাশ করে।

"কফি খাবেন তো? না আরও ঘুমোবেন?" সুদর্শনা জিজ্ঞেস করে।

"আর ঘুম নয়। কী ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগা, অমন শ্যালিকা পাশে এসে বসেছিল তবু জাগোনি!" শ্যামলেন্দু আবৃত্তি করতে-করতে নিজেই হেসে ওঠবার চেষ্টা করলো।

বেয়ারা জটাধর দাশ ইংরিজী নেমপ্লেটটা মোছা শেষ করে কোম্পানির বাংলা নেমপ্লেটটা ধরেছে, ঠিক সেই সময় চ্যাটার্জি সায়েবের গাড়িটা হিন্দুস্থান পিটারস্ অফিসের সামনে এসে দাঁড়ালো।

জটাধর টুল থেকে নেমে সায়েবকে সেলাম করতে গিয়ে দেখলো গাড়ির মধ্যে মেমসায়েব ছাড়াও আরও একটি মেয়ে রয়েছে। মেমসায়েবের মুখের সঙ্গে নতুন দিদিমণির মুখের আদল দেখেই প্রখরবুদ্ধি জটাধরের বুঝতে বাকি রইলো না, ইনি মেমসায়েবের বোন না-হয়ে যায় না। সুতরাং মেমসায়েবকে সেলাম করার আগে সায়েবের শালীকেও একটা সেলাম ঠুকে দিলো জটাধর। তারপর আবার টুলের ওপর উঠে নিজের কাজে মন দিলো।

জামাইবাবুর সঙ্গে সুদর্শনাও গাড়ি থেকে নেমে পড়লো। বললো, "আপনাদের অফিস বাড়িটা কী সুন্দর দেখতে, শ্যামলদা! একেবারে ইন্দ্রপুরী করে রেখেছেন।"

"ইন্দ্রপুরী করে না-রাখলে কর্মচারিদের কাজে মন বসবে কেন? সবাই বাড়ি ফেরবার জন্যে ছটফট করবে!" শ্যামলেন্দু হেসে উত্তর দিলো।

চ্যাটার্জি সায়েবও তাহলে সব সময় গম্ভীর নন, মাঝে-মাঝে রসিকতা করেন। দেওয়ালের নেমপ্লেটে ব্রাশো লাগাতে-লাগাতে জটাধর নিজের মনেই বললো।

সুদর্শনার নজর এবার নেমপ্লেটের দিকেই গেল। "শ্যামলদা, শ্যামলদা, অবাক কাণ্ড! আপনারা তাহলে বাংলা ব্যবহার করেন? কোম্পানির নাম বাংলায় লিখে রেখে দিয়েছেন!"

প্লেটটা একটু খুঁটিয়ে দেখে, সুদর্শনা বলে উঠলো, "এ আবার কি ধাঁধা—'ভারতে সমিতিভুক্ত ও সভ্যগণের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ'। এটা লিখে আপনারা কী বোঝাতে চাইছেন শ্যামলদা?"

শালীদের কাছে মিলিটারিরা পর্যন্ত নরম! চ্যাটার্জি সায়েবের মিষ্টি কথা শুনতে জটাধরের ভারি মজা লাগছে। চ্যাটার্জি সায়েব বললেন, "প্রথম যেদিন চাকরিতে ঢুকেছিলাম, আমার কাছেও ব্যাপারটা ধাঁধার মতো মনে হয়েছিল। তারপর কোম্পানির সেক্রেটারী সেনগুপ্ত সায়েবকে ধরেছিলাম। উনি বলেছিলেন, ওর অনেক আইনের প্যাঁচ আছে। এর মানে লিমিটেড কোম্পানি, শেয়ারহোল্ডারদের দায়িত্ব পার্টনারশিপ ব্যবসার মতো সীমাহীন নয়। সোজা কথায় কোম্পানি আইনে বলছে, কয়েকটি প্রয়োজনীয় তথ্য ইংরিজী এবং স্থানীয় ভাষায় কোম্পানির দরজাগোড়ায় লিখে রাখতে হবে।"

"মার্চেণ্ট অফিসেও কত মজার জিনিস থাকে তাহলে। অথচ লোকে বলে, মার্চেণ্ট অফিস মানে হচ্ছে কড়াক্রান্তির হিসেব এবং একঘেয়ে জীবন," সুদর্শনা বললো!

দোলন গাড়ির ভিতর থেকে তার মতামত সোজাসুজি জানিয়ে দিলো, "ওসব কথা অফিসের লোকরা বাড়িতে ফিরে বউদের বলে। আসলে, অফিসে এরা বেশ মজায় কাটায়।"

প্যাণ্ট-কোট-টাই-এর সঙ্গে কপালে মস্ত দই-এর টিপ লাগিয়ে এক ভদ্রলোককে দূর থেকে দেখা গেল। দোলন ফিস-ফিস করে টুটুলকে বললো, "রামলিঙ্গম সায়েব, ওঁদের মাইনে দেন। এখানকার সবচেয়ে পুরানো কর্মী।"

রামলিঙ্গম সায়েব আজ একটু দেরি করে ফেলেছেন। রামলিঙ্গম দূর থেকেই সস্নেহে চীৎকার করে উঠলেন, "গুড মর্নিং মিঃ চ্যাটার্জি।"

শ্যামলেন্দুর তুলনায় রামলিঙ্গম অনেক ছোট অফিসার। কিন্তু বৃদ্ধ রামলিঙ্গম বড়-বড় অফিসারদের প্রথম চাকরিতে ঢোকার দিন থেকে দেখছেন। তাছাড়া রামলিঙ্গম কাউকে তেমন তোয়াক্কাও করেন না। নিজের খেয়ালে থাকেন। বলেন, "রাজা মহারাজা, ম্যানেজিং ডিরেকটর, এঁরা আর ক'দিনের জন্যে!

আসল হলো তোমার বাবা-মা এবং লর্ড ভেঙ্কটেশ।"

রামলিঙ্গম বললেন, "মিস্টার চ্যাটার্জি, আজ স্টেলার পোজিশন খুব ভাল। ভেনাস সকাল ৭টা ৪৫ মিনিটে মকরে প্রবেশ করলেন। তাই ভেঙ্কটেশকে আজ পঞ্চাশটা বেশি ফুল দিলাম। একটু দেরি হয়ে গেল।"

তারপর রামলিঙ্গমের নজর টুটুলের দিকে পড়ে গেল। ওর মুখের দিকে খুঁটিয়ে তাকিয়ে রামলিঙ্গম বললেন, "খুবই সৌভাগ্যবতী।"

"আমার সিস্টার-ইন-ল," শ্যামলেন্দু পরিচয় করিয়ে দিলো।

রামলিঙ্গম বললেন, "দেখে নিও, একদিন এই সিস্টার-ইন-ল-এর জন্যে তোমরা সকলে প্রাউড ফিল করবে।"

"টেক্ দিস," পকেট থেকে পুজোর জবাফুল বার করে রামলিঙ্গম টুটুলের হাতে দিলেন। টুটুল ফুলটা মাথায় ছোঁয়ালো।

দোলন বললো, "মিস্টার রামলিঙ্গম, ওর বিবাহযোগটা একটু দেখুন তো।"

"খুবই ভাল স্বামী-ভাগ্য, তবে সামনের বারো মাসের মধ্যে নয়। ইচ্ছে করলে লর্ড শিভাকে প্রত্যেক বুধবার ছুটো করে বেলপাতা দিতে পারো।"

নিজের সম্বন্ধে দু-একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবার ছিল। কিন্তু সকলের সামনে লজ্জা পেল দোলন।

"টুটুল, তুই গাড়িতে এসে বস," দোলন এবার বোনকে ডাকলো। একটু নিউ মার্কেট ঘুরে আসবার ইচ্ছে।

"তোমার তো এখন গাড়ির দরকার নেই?" দোলন স্বামীকে জিজ্ঞেস করে নেয়।

"না। তুমি টুটুলকে সব ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখাও।" শ্যামলেন্দু উত্তর দিলো।

গাড়িটা চলে যেতেই রামলিঙ্গম ও শ্যামলেন্দু একসঙ্গে ভিতরে ঢুকলো।

"সেদিন ফিনানস ডিরেকটরের পার্টিতে দেখলাম না কেন?" শ্যামলেন্দু এবার রামলিঙ্গমকে জিজ্ঞেস করে।

"ট্রাইং টু উইথড্র...," রামলিঙ্গম চীৎকার করেই বললেন। "মিস্টার চ্যাটার্জি এবার নিজেকে গুটিয়ে ফেলতে হবে, রিটায়ারমেণ্টের তো আর তিন মাস বাকি।"

"মাত্র তিন মাস! সে কি!" শ্যামলেন্দু বিস্ময় প্রকাশ করে!

"দেখতে যাই হই, মিস্টার চ্যাটার্জি, বয়স হচ্ছে তো। ইন দি ইয়ার নাইনটিন হানড্রেড থার্টিফাইভ আমি মাদ্রাজ থেকে ক্যালকাটায় এসেছিলাম। তখন তোমরা কোথায়?"

"আমি তখনও জন্মাইনি।"

রামলিঙ্গম সাহেব এই ভোরবেলায় শ্যামলেন্দুর ঘরে এসে বসলেন। "শোনো মিস্টার চ্যাটার্জি, আমি আমার ফাদারের আশীর্বাদ নিয়ে, লর্ড ভেঙ্কটেশকে পুজো দেবার প্রমিস করে নাইনটিন থার্টিফাইভের সেভেনথ মার্চ ম্যাড্রাস মেলের থার্ড ক্লাসে চেপে বসেছিলাম। তখন জানো তো, কি বাজারের অবস্থা। চারিদিকে মন্দা চলছে। সবাই বললো, এখন কোলকাতায় যাচ্ছ চাকরির সন্ধানে! ম্যাড্। আমি বললাম, ফাদারের আশীর্বাদ পেয়েছি, আমার আর কোনো চিন্তা নেই।"

শ্যামলেন্দুর বেশ লাগছে রামলিঙ্গমের কথা শুনতে। অফিস আরম্ভ হতে এখনও প্রায় কুড়ি মিনিট বাকি।

"আমার পকেটে তখন বারোটা টাকা, মায়ের গয়না বেচে মা দিয়েছেন। তখন অবশ্য বারো টাকা মানে অনেক টাকা। তিন মাস পরে আমি যখন তামিলনাড়ুতে ফিরে যাবো তখন আমার সঙ্গে থাকবে দু লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার সাতশ' ছত্রিশ টাকা। তুমি তো জানো, আমি মিথ্যে কথা বলি না।"

সেটা সত্যি কথা, রামলিঙ্গম সায়েব অন্য ধরনের মানুষ।

রামলিঙ্গম বললেন, "আমার ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স তখন ৪৫।১২০।"

"অ্যাঁ! মাদ্রাজে পুরুষ মানুষেরও মেয়েদের মতো স্ট্যাটিসটিক্স নেওয়া হয়?" শ্যামলেন্দু জানতো না।

"নো, নো, মিঃ চ্যাটার্জি, আমি তোমাকে টাইপিং ও শর্টহ্যাণ্ড স্পিডের কথা বলছি। ম্যাড্রাসে বেকার ছেলেদের এইটাই ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স ছিল, বুঝতেই পারছো জীবন-মরণের প্রশ্ন!"

রামলিঙ্গম বলে চললেন, "ক্যালকাটায় পনেরো দিনেও কিছু হলো না। ফাদারের কাছে ফ্রেশ আশীর্বাদ চেয়ে চিঠি ছাড়লাম। কিন্তু কোনো রেজাণ্ট নেই। তিন সপ্তাহ পরে বেশ নার্ভাস হয়ে গেলাম। শেষে একদিন ভোরবেলায় গঙ্গাস্নান সেরে, উপবাস করলাম। চোখ বুজে লর্ড ভেঙ্কটেশকে বললাম, 'এই পবিত্র মুহূর্তে তুমি আমার মুখের দিকে তাকাও। যদি দয়া করে একটা চাকরি দাও, তোমাকে রোজ জবা ফুল দিয়ে পুজো করবো।' মিস্টার চ্যাটার্জি, আজকালের ছেলেরা প্রেয়ারে বিশ্বাস করে না, কিন্তু সেদিনই আমি পিটারস্ কোম্পানিতে চাকরি পেয়েছিলাম। পিটারস্ কোম্পানির তখন ছোট্ট অফিস বৌবাজার স্ট্রীটে। বিলেত থেকে ফ্যান নিয়ে এসে বিক্রি করে। আমি যেমন অন্য সব অফিসে ঢুঁ মারতে যাই, সেদিন প্রেয়ারের পর প্রথম ঢুকে পড়লাম পিটারস্ কোম্পানিতে। তখন সর্বেসর্বা ছিলেন মিলার সায়েব, আর তাঁর বড়বাবু মিস্টার বাসুদেবন! মিস্টার বাসুদেবন আমার সব কথা শুনলেন, আমার

অ্যাপ্লিকেশন পড়লেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন বিয়ে করেছি কি না। বললাম, নিজে খেতে পাচ্ছি না, বউকে কী করে খাওয়াবো? বাসুদেবন আমাকে মিলারের কাছে নিয়ে গেলেন। সায়েব ডিকটেশন দিলেন, চাকরি হয়ে গেল। তখনকার দিনকাল অন্য।

"কয়েক সপ্তাহ পরে মিলার সায়েব নিজে একদিন বললেন, 'রামলিঙ্গম, তুমি তো জানো বাসুদেবনের স্পেশাল অনুরোধেই তোমাকে চাকরি দিয়েছি। এখনও কনফার্ম হওনি। এদিকে বাসুদেবন বেচারা এলডেস্ট ডটারের বিয়ের জন্য চিন্তিত। আমি ব্যাপারটা বুঝলাম। বললাম, আমার আপত্তি নেই। যদি না আমার পেরেণ্টস আপত্তি করেন। বাবাকে লম্বা চিঠি লিখে দিলাম, চাকরির এই অবস্থা। মিস্টার বাসুদেবনের দাদা গিয়ে বাবার সঙ্গে দেখা করলেন। শেষ পর্যন্ত বিয়ে হয়ে গেল—তবে কনফারমেশনের পরে।"

"তাহলে ভগবান ভেঙ্কটেশ আপনাকে অর্ধেক রাজত্ব এবং রাজকন্যা একসঙ্গে দিলেন," শ্যামলেন্দু হেসে মন্তব্য করলো।

"সেই জন্যেই তো মিঃ চ্যাটার্জি, ফুলের এত দাম হওয়া সত্ত্বেও রোজ ভেঙ্কটেশকে পূজো দিয়ে যাচ্ছি," মিস্টার রামলিঙ্গম উত্তর দিলেন।

একটু থেমে, মিস্টার রামলিঙ্গম বললেন, "দেখো আমি হ্যাপি—আমার কোনো দুঃখ নেই। স্টেনো হয়ে ঢুকেছিলাম, পরে ফ্যানের গায়ে লেবেলও এঁটেছি। তখন ছোট্ট অফিস, মাসে একশ'খানা ফ্যান বিক্রি হলে হৈ-হৈ পড়ে যেতো, মিলার সায়েব সকলকে চা খাইয়ে দিতেন। তারপর কোম্পানি বড় হয়েছে, সঙ্গে-সঙ্গে আমিও বড় হয়েছি। আমার নিজেরই আজ সাড়ে-তিন হাজার মাইনে। দুটো ছেলেকেও ঢুকিয়েছি। জামাইও এখানে কাজ করে। আর কি চাই? বলো!"

রামলিঙ্গম সায়েব অভিযোগ করলেন, "আজকালকার ছেলেরা বিশ্বাস করবে না, কিন্তু এ-সবই ভেঙ্কটেশের আশীর্বাদ, আর বাবার অবাধ্য হইনি বলে। বাবা যখন খবর পেলেন আমার চাকরি হয়েছে, তখন আমাকে একটা চিঠি লিখেছিলেন, জানো, সেই চিঠিটা আমি সব সময় কাছে রেখে দিই।"

রামলিঙ্গম পকেট থেকে মানি ব্যাগ বার করে তার মধ্য থেকে একটা বিবর্ণ কাগজের টুকরো বার করলেন। তামিল ভাষায় লেখা চিঠিটার গায়ে সিঁদুরের দাগ। চিঠিটা পরম যত্নে খুলে রামলিঙ্গম সায়েব বললেন, "বাবা লিখেছিলেন: মনে রাখবে সায়েব হচ্ছে অগ্নির মতো। অগ্নি থেকে খুব দূরে থাকলে তাপ পাওয়া যায় না আবার খুব কাছে গেলে দগ্ধ হবার প্রবল সম্ভাবনা। সুতরাং ভেঙ্কটেশ্বরের আশীর্বাদে আগুন থেকে ঠিক মাঝামাঝি দূরত্বে থাকবে।"

চিঠিটা মহামূল্যবান দলিলের মতো আবার সযত্নে ব্যাগের মধ্যে পুরে রেখে রামলিঙ্গম বললেন, "সারা জীবন আমি অফিসে বাবার উপদেশ মেনে চলেছি। দ্যাখো কত লোক এলো, কত লোক হু-হু করে উঠলো, আবার চলে গেল—আমি কিন্তু ঠিক আছি।"

ঘড়ির দিকে নজর দিয়ে রামলিঙ্গম এবার প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলেন। শ্যামলেন্দুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "মিস্টার চ্যাটার্জি, সামনে তোমার আরও ভাল সময় আসছে। আমি জানি তুমি ভাবছ তেত্রিশ বছর বয়সে পাঁচ হাজার টাকা পাচ্ছ, আর কী ভাল হবে? কিন্তু আমি বলছি আরও অনেক কিছু পড়ে আছে। তবে মঙ্গল তোমাকে নিয়ে একটু মজা করতে পারে। একটু চেষ্টা করতে হবে তোমাকে। তুমি একটা 'কোরাল' নাও!"

"সেটা আবার কী?"

"তোমরা যাকে প্রবালের আংটি বলো—লাল প্রবাল, বেশ বড় সাইজের।"

রামলিঙ্গম চলে যেতে চ্যাটার্জি একটু হাসলো! ভাবখানা যেন কে বললো, মার্চেণ্ট অফিসে কিছু দেখবার নেই!

রামলিঙ্গমের মতো সন্তুষ্টি থাকলে বোধহয় ভাল হতো। এই তো মাত্র দশ বছরে শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জি যে উন্নতি করেছে তা গল্পের মতো। মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে কমারসিয়াল ম্যানেজার। কিন্তু তাতেও সন্তোষ নেই। শ্যামলেন্দু যে লোভী তা নয়। পয়সার লোভটাই যে বড় তা নয়। কিন্তু উপরে ওঠার নেশাটা রক্তের মধ্যে আগুন ধরিয়ে রেখেছে।

পাবলিসিটি অফিসার মিঠু সেন এবার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। "মিস্টার চ্যাটার্জি, আমাদের নতুন ফ্যানের বিজ্ঞাপনের মিডিয়া-লিস্টটা দেখাবেন নাকি একটু? কোন-কোন কাগজে যাচ্ছে তার লিস্ট রেডি, তা ছাড়া রেডিও জিংগল্ এবং সিনেমা শর্ট রয়েছে।"

মিঠু সেন চোঙা প্যাণ্ট পরেন। দু গালে বিরাট লম্বা জুলপি। আসল নাম ললিত সেন, কিন্তু প্রফেশনে সবাই মিঠু বলে ডাকে। মিডিয়া-লিস্টে সই করে দিলো শ্যামলেন্দু।

"নতুন ফ্যানের নামটা ভালই হয়েছে—কী বলেন? উর্বশী।" শ্যামলেন্দু জিজ্ঞেস করে।

"ভাল মানে? ওয়াণ্ডারফুল! এজেন্সীর মিস নারগোলওয়ালা তো একসাইটেড। নিজে থেকে স্বীকার করলেন, অনেকদিন ফ্যানের বাজারে এমন ক্রিয়েটিভ নাম পাওয়া যায়নি," মিঠু উত্তর দেন।

"বিশেষ করে আমরা যখন বিয়ের উপহার হিসেবে উর্বশীকে চালাতে চাই,

কী বলেন মিঃ সেন ?" শ্যামলেন্দু উত্তর দেয়।

"নিশ্চয়, মোস্ট সার্টেনলি। আমাদের বিজ্ঞাপন এজেন্সীর রিসার্চের যদি কোনো দাম থাকে, তাহলে মিস নারগোলওয়ালা বলছেন, আমরা ফ্যান সাপ্লাই দিয়ে উঠতে পারবো না।"

"কিন্তু এক্সপোর্ট মার্কেট ? বিদেশের বাজারটাও ক্রমশ ভাইটাল হয়ে উঠেছে;" শ্যামলেন্দু মতামত দেয়।

"আপনার কি ম্যারিকান বাজারের দিকে নজর আছে ? তাহলে মিস্টার চ্যাটার্জি সেনসেশন পড়ে যাবে—ইণ্ডিয়ার রাভিশঙ্কর, ইণ্ডিয়ার গাঁজা, আর ইণ্ডিয়ার চির-রহস্যময়ী সোসাইটি গার্ল উর্বশী। মিস নারগোলওয়ালা অবশ্য ওঁর ক্রিয়েটিভ নোটে বলেছেন, আমেরিকার বিজ্ঞাপনে আমাদের এই সেন্সটা আরও হাইলাইট করতে হবে। যেমন একটা সাজেশন দিয়েছেন, মেড ইন ইনডিয়া—ভারতে প্রস্তুত না বলে, বিজ্ঞাপনে লেখা যেতে পারে কামসূত্রের দেশে তৈরি—মেড ইন দি ল্যাণ্ড অফ কামসূত্র।"

শ্যামলেন্দু কিন্তু মিঠু সেনের মতো উৎসাহিত হলো না। সিগারেট ধরিয়ে বললো, "কিন্তু আমাদের ব্রীফে দেখেছেন, আমেরিকাতে আমাদের পাখার বাজার একেবারেই নেই বললেই হয়। সাড়ে-সাত টাকায় এফ-ও-বি একটা পাখা দিতে পারলে ওরা হাজার খানেক নিতে পারে। আমি এখন থাইল্যাণ্ড, কোরিয়া, মালয় এসবের কথা ভাবছি।"

বিশেষজ্ঞের মতো গম্ভীরভাবে মিঠু উত্তর দিলেন, "ডেফিনিটলি এ-বিষয়ে কিছু বলতে গেলে বোধহয় মিস নারগোলওয়ালা এবং আমাকে একবার দেশগুলো দেখে আসতে হবে। তবে এজেন্সীর ডেস্ক রিসার্চ বলছে, থ্যাংকস টু আওয়ার পিতৃপুরুষ, থাইল্যাণ্ডে উর্বশী নামটা এবং এই মহিলার কীর্তিকলাপ প্রায় সবাই জানে। সুতরাং উর্বশীকে এসট্যাবলিশ করার জন্য আমাদের খুব হেভি বিজ্ঞাপন করতে হবে না।"

মিঠু সেন এবার শ্যামলেন্দুকে খুশী করার জন্যে বললো, "দেশে এবং বিদেশে আপনি যেভাবে জাল ছড়াচ্ছেন তা দেখে মিস নারগোলওয়ালা তো অবাক। কালকেই লা-ভেগা বার-এ বসে আমরা একটু ক্রিয়েটিভ ডিসকাশন করছিলাম। মিস নারগোলওয়ালা বললেন, এজেন্সীর দৃঢ় বিশ্বাস বিজ্ঞাপনের খরচটা আরও কিছু বাড়ালেই সামনের বছরে আমাদের কারখানা বাড়াতে হবে—সাবসটেনসিয়াল এক্সপ্যানশনের জন্যে শিগগির গভরমেণ্টের কাছে আবেদন করতে হবে।"

শ্যামলেন্দু আর কথা বাড়াতে দিলো না। গম্ভীরভাবে বললো, "রপ্তানি [illegible] ব্যাপারটা আরও ডিটেলে চিন্তা করা যাবে। আপনি নোট তৈরি

করুন! ইতিমধ্যে দেখা যাক কী হয়।"

"বড়-বড় কাগজগুলোতেও তাহলে সোলাস পোজিশন নিচ্ছি—ডবল চার্জ—কিন্তু সেখানে আর কোনো বিজ্ঞাপন থাকবে না।"

"ভাল আইডিয়া—সোলাস নিন," শ্যামলেন্দু এবার মিঠু সেনকে বিদায় করলো।

সোলাস—এই সোলাস পোজিশনের জন্যেই পৃথিবীর লোকেরা মারামারি করছে। শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জিও সোলাস পোজিশন চায়। ডিরেকটরের পদটাই সোলাস। কিন্তু সেখানেও রুণু সান্যালের ছায়াটা তাকে তাড়া করছে। একই বছরে রুণু ঢুকেছিল—হিন্দুস্থান পিটারস্‌-এ। তারপর দুজনেই একই সঙ্গে উন্নতি করে যাচ্ছে। যেন ৪৪০ গজ রেস চলেছে। পাকের পর পাক খেতে-খেতে অনেকে পিছিয়ে পড়েছে। এখন আর একটা মাত্র পাক বাকি—সেখানে মাত্র দুজন প্রতিদ্বন্দ্বী—শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জি আর রুণু সান্যাল।

একটু পরেই দরজায় টোকা পড়লো। রুণু ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে জিজ্ঞেস করলো, "আসতে পারি?"

রুণুর এই টোকা-মারা অভ্যাসটা শ্যামলেন্দুর ভাল লাগে না। একটা লোক দরজা খুলে অর্ধেক নাক বাড়িয়ে দিলে, কী করে বলা যায় এখন আসবেন না!

শ্যামলেন্দু নিজে তা কখনও করে না। রুণুর সঙ্গে কোনো দরকার থাকলে ইনটারন্যাল টেলিফোনে আগে জিজ্ঞেস করে নেয়।

মনের ভাব চেপে রেখেই শ্যামলেন্দু বললো, "এসো এসো।"

একখানা ফাইল নিয়ে রুণু সামনের চেয়ারে বসে পড়লো। "তোমার সঙ্গে কয়েকটা পয়েন্ট আলোচনা ছিল।"

"তুমি তো সব সময়ই ওয়েলকাম," শ্যামলেন্দু বলে। তারপর জিজ্ঞেস করে, "তোমার মার্কেট কেমন? আমি তো ভাই পাখা বিক্রি করতে গিয়ে নাস্তানাবুদ হচ্ছি। সেলসের লোকেরা বলছে, একখানা পিটারস্‌ ফ্যান কিনলেই সারাজীবন কেটে যায়। সুতরাং রিপ্লেসমেণ্ট সেল বলে কোনো জিনিসই নেই।"

"আমাদের মার্কেট ফোরকাস্ট অনুযায়ী ল্যাম্পের বাজার খুব খারাপ হওয়ার কথা ছিল। লিস্ট প্রাইস থেকে হানড্রেড ওয়াট দশ পয়সা কমে বিক্রি হবে আমরা ভেবেছিলাম! কিন্তু এখন দেখছি প্রত্যেক পিস পিটারস্‌ ল্যাম্প পঞ্চাশ পয়সা প্রিমিয়ামে বিক্রি হচ্ছে। ব্ল্যাক কথাটা এই ব্যবসায় কেউ ব্যবহার করে না—তার বদলে বলে প্রিমিয়াম! দাম চড়লে প্রিমিয়াম, নামলে ডিসকাউন্ট।"

"কনগ্রাচুলেশন ব্রাদার, মার্কেটিং জিনিয়াস না-হলে এমন সম্ভব হয় না।" শ্যামলেন্দু অভিনন্দন জানায় রুণু সান্যালকে।

রুণু সান্যাল বিনা প্রতিবাদে কথাটা এমনভাবে গ্রহণ করলো যেন অভিনন্দনটা সত্যিই তার পাওনা ছিল। সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললো, "মিস্টার ফেরিসও আজ কনগ্রাচুলেট করলেন। স্টকে মাছি ঘুরছে। টেবিলে বসতে পারছি না, ডীলাররা হানড্রেড ওয়াট ল্যাম্প আরও নেবার জন্যে মিনিটে-মিনিটে টেলিফোনে জ্বালিয়ে খাচ্ছে। তবে ব্রাদার, আমাকে কিছু করতে হয়নি। যদিও মিঠু সেন লাফাচ্ছে—গত মাসে ঐ মুটকি মিস নারকোলওয়ালা না গোলমালওয়ালা কি বিজ্ঞাপন ছেড়েছিল, তার জন্যেই নাকি আমাদের বিক্রি বেড়ে গিয়েছে। আসলে তুটো ল্যাম্প কোম্পানিতে স্ট্রাইক চলছে, তারা বাজারে একদম মাল দিতে পারছে না।"

"আমিও এই তালে দুষ্টু ডীলারগুলোকে টাইট দেবার ব্যবস্থা করছি। ব্যাটাচ্ছেলে মণ্ডল কোম্পানি দু মাস আগেও বড়-বড় বাত্ ছেড়েছে বাজারে একটু যোগান বেশি ছিল বলে। এখন স্যর স্যর করছে। আমি খোসলাকে বলে দিয়েছি একটা ল্যাম্পও যেন মণ্ডলকে না দেওয়া হয়! তার থেকে সাপোর্ট করো চোখানিয়া ব্রাদার্সকে, যারা সব সময় গাঁটের পয়সা আগে ফেলে মাল তুলে নিতে রাজী থাকে।"

চোখানিয়া ব্রাদার্স পিটারস্ ফ্যানও বিক্রি করে। পূর্বাঞ্চলের সেলস্ ম্যানেজার হীরাচন্দানির মুখে গতকালই শ্যামলেন্দু শুনেছে, চোখানিয়া কোনোরকম বাড়তি সাহায্য করে না। কারণ চোখানিয়া জানে অদূর ভবিষ্যতে ইণ্ডিয়াতে ফ্যানের কোনো অভাব হবে না। ও-বিষয়ে কোনো কথা না তুলে, শ্যামলেন্দু বললো, "তাহলে এখন বেশ ঝাড়া হাত-পা?"

"হ্যাঁ, কাজ যখন নেই, তখন ভাবলাম এই দশকের চ্যালেঞ্জের জন্যে প্রস্তুত হওয়া যাক। বড় সায়েব প্রায়ই বলেন না, চ্যালেঞ্জ অফ দি ডেকেড! ভাবলাম, সামনের দশ বছরের একটু অ্যাডভান্স প্ল্যানিং করা যাক। ডেভিডসন ফিরলেই আলোচনা করা যাবে।"

"ডেভিডসনের তো ফেরার সময় হয়ে গিয়েছে, তবু ফিরছেন না কেন?" শ্যামলেন্দু জিজ্ঞেস করলেন।

"তোমার বেলটা টিপে বেয়ারাকে একটু কফি আনাতে বলো না। বিবি আর আমি ফিরেছি ভোর তিনটেয়। আমার ফ্রেণ্ড, হিগিনস কোম্পানির ডিরেক্টর সুরিন্দর লাল-এর বাড়িতে ডিনার ছিল। ইনফরমাল পার্টি। কিন্তু ভাই, মালের ঝোঁকে সবাই ডান্স করতে চাইলো। নাচ সেরে মাথা ধরে গেল।

রাত্রে একটুও ঘুম হয়নি। সুরিন্দর লাল আমার সঙ্গেই ডুন ইস্কুলে পড়তো। মাথায় পবিত্র গোবর ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কিন্তু কেমন টপাটপ এগিয়ে গিয়ে হিগিনসের ডিরেকটর হয়ে গেল।"

বেয়ারাকে ডেকে কফি আনতে বললো শ্যামলেন্দু। সান্যাল সায়েব বেয়ারাকে অনুরোধ করলেন, "নটবর, আসবার সময় আমার টেবিল থেকে স্যাকারিনের শিশিটা এনো।"

"আবার স্যাকারিন কেন?" শ্যামলেন্দু জিজ্ঞেস করে।

"বিবি বিরক্ত হয়েছে, বলছে ভুঁড়ি কমাতে হবে। যত হুইস্কি খাচ্ছি তার সবটাই নাকি মধ্যপ্রদেশে জমা হচ্ছে।" রুণু নিজের কোমরটা দেখিয়ে দিলো।

কফির কাপে চুমুক দিয়ে শ্যামলেন্দু জিজ্ঞেস করলো, "হ্যাঁ, গুজবের ব্যাপারটা কী বললে?"

"জানি না কতটা সত্যি। মাই ওল্ড ফাদারকে দেখতে গিয়েছিলাম গতকাল সকালে। সবাই জিজ্ঞেস করলেন, সুতানুটি ক্লাব না কোথায় শুনেছেন ডেভিডসনের নাকি পেটে ক্যানসার সন্দেহ করছে। ভগবান জানে ব্রাদার। তা ছাড়া মাই পিতৃদেব ভদ্রলোকটির কথাও একটু ডিসকাউণ্টে নিতে হবে। সাত-সকালেই আড়াইখানা হুইস্কি শেষ করে বসে ছিলেন। রিটায়ার্ড লোক। কোনো কাজকম্ম নেই। মা পূজো করছেন, আর পিতৃদেব মেজর জামাইকে ধরে সস্তায় মিলিটারি ক্যানটিন থেকে হুইস্কি আনিয়ে টানছেন।"

"অসুখ? ডেভিডসনের?" শ্যামলেন্দুর মনটা খারাপ হয়ে গেল। এক মূহূর্তের জন্যে মনে পড়ে গেল পাটনা হোটেলের সেই দৃশ্যটা। ডেভিডসন মফঃস্বল কলেজের এক অখ্যাত ছোকরা মাস্টারকে সাইকেল পর্যন্ত এগিয়ে দিতে আসছেন।

কফির কাপে স্যাকারিন ফেলে চামচটা নাড়ছে রুণু। হঠাৎ শ্যামলেন্দুর নজরটা সেই দিকেই পড়লো। রুণুর হাতে আগে ওটা ছিল না—বিরাট একটা লাল রঙের প্রবালের আংটি।

রুণু ব্যাপারটা লক্ষ্য করলো। বললো, "গিন্নি এটা পরতে বাধ্য করলেন। ভগবান জানেন কেন। এদিকে মেমসায়েব—কিন্তু সম্প্রতি এইসব গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কে দুর্বলতা দেখা যাচ্ছে। বাগবাজারের ওখানে এক রাজজ্যোতিষীর কাছে প্রায়ই যাতায়াত করছে।"

এরপর দুজনের ব্যবসায়িক কাজ শুরু হয়ে গেল। রুণু চায়, কিছু সেল্‌সম্যান লাইট এবং পাখা দুই বেচুক। তাহলে তার ডিপার্টমেণ্টের খরচ একটু কমে। শ্যামলেন্দু বললো, "তুমি তো জানো, পাখা আর ল্যাম্প বিক্রি এক

জিনিস নয়। তা ছাড়া সামনের বছর থেকে আমার ইনডাসট্রিতে প্রোডাকশন শতকরা কুড়ি ভাগ বেড়ে যাবে। তখন পিটারস্ পাখা বিক্রির জন্যে অনেক মেহনত করতে হবে।"

"কাম অন! শ্যামলেন্দু, তুমি কিন্তু কোরো না। মাল বিক্রির অসুবিধে হবে কোম্পানির—তোমার উর্বশী মডেলের নয়।"

• "ভাই, ইণ্ডিয়াতেও সাধারণ মানুষ বোকা থাকছে না। উর্বশী, মেনকা, রম্ভা কেউ খরিদ্দারের মন টলাতে পারবে না, যদি দাম বেশি হয় এবং জিনিস ভাল না হয়," শ্যামলেন্দু উত্তর দিলো।

আলোচনার পরে শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো একটা অঞ্চলে সিস্টেমটা চালু করে দেখা যাক—দুটো জিনিসের জন্যে একটা সেল্‌সম্যান। "তবে আমার কাজে অসুবিধে হলেই উইথড্র করবার স্বাধীনতা রইলো।" শ্যামলেন্দু সোজাসুজি জানিয়ে দিলো।

রুণু বললো, "ঠিক হ্যায়। আমি তাহলে ম্যানেজিং ডিরেকটরকে নোট দিয়ে দিই।"

রুণু এবার বেরিয়ে গেল। তার হাতে নতুন পলার আংটিটা আবার শ্যামলেন্দুর নজরে পড়ে গেল: দোলনকে রাজজ্যোতিষীর কথা বললে এখনই বাগবাজারে ছুটবে—পলার আংটি কিনে স্বামীকে পরিয়ে তবে ছাড়বে। কিন্তু এর মধ্যে নেই শ্যামলেন্দু। উপরে উঠতে যদি হয় কাজ করেই উঠবে শ্যামলেন্দু। —মামার জোরে নয়, বংশকৌলীন্য দেখিয়ে নয়, এমন কি গ্রহ-নক্ষত্রকে সন্তুষ্ট করেও নয়।

ইতিমধ্যে ম্যানেজিং ডিরেকটরের ঘর থেকে ডাক পড়লো।

ফেরিস সায়েব ফিনানস ডিরেকটর গর্ডনকে নিয়ে কোম্পানির অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যের পর্যালোচনা করছেন। গর্ডন বললেন, চ্যাটার্জি, তোমার ফ্যান ডিভিসনের নোট পড়লাম। আমার মনে হয় পরিকল্পনা খুবই ভাল হয়েছে। কারণ ফ্যান কারখানার নয় মাসের প্রোডাকশন তুমি ইণ্ডিয়াতে বেচছো—আর তিন মাস পুরো কাজ হতো না। শীতের এই প্রোডাকশনটা তুমি বিদেশে রপ্তানি করছো।"

ফেরিস বললেন, "তোমার রপ্তানির অবস্থা কেমন?"

"মোটামুটি ভাল। আর দশ দিনের মধ্যে আমরা থাইল্যাণ্ড এবং কোরিয়ায় শিপিং করবো। এই রপ্তানি থেকে আমরা যে খুব ভাল করবো তা নয়। কিন্তু কোম্পানির সুনাম বৃদ্ধি পাবে। সরকার খুশী হবেন। ল্যাম্প ডিভিসনের যে সমস্ত সাবকমপোনেণ্ট এখনও বিদেশ থেকে আসে সেগুলোর জন্যে বাড়তি

ইমপোর্ট লাইসেন্স পাওয়া যাবে। অথচ আমাদের হোম-মার্কেটের কোনো ক্ষতি হবে না," শ্যামলেন্দু উত্তর দেয়।

"ফ্যাকটরি থেকে সমস্ত সহযোগিতা পাচ্ছ তো? কোনো অসুবিধা হলে বলো, টেকনিক্যাল ম্যানেজার হার্টলের সঙ্গে আমরা কথা কইবো।" ফেরিস সায়েব উত্তর দিলেন।

একটা কাগজের দিকে তাকিয়ে ফিনানস ডিরেকটর এবার বললেন, "সবই ভাল। শুধু যদি তোমার ডিভিসন থেকে আরও দশ লক্ষ টাকা প্রফিট করতে পারতাম, তাহলে চলতি আর্থিক বছরে রেকর্ড লাভ হতো।"

ফেরিস সায়েব বললেন, "হোম অফিস থেকে টেলেক্স পাঠিয়েছে—বলছে লাভের নতুন রেকর্ড করার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা প্রয়োজন।"

মিস্টার গর্ডন জানতে চাইলেন, "চ্যাটার্জি, এক্সপোর্ট থেকে কিছু করা যায় না?"

"এক্সপোর্ট তো সবই কনট্রাকটের ব্যাপার—অনেক দিন আগেই সই হয়ে গিয়েছে," শ্যামলেন্দু উত্তর দেয়।

ফেরিস সায়েব বললেন, "চ্যাটার্জি, তুমি সব জিনিসটা রিভিউ করে দেখো। তুমি চেষ্টা করলে কিছু প্রফিট আসবেই।"

শ্যামলেন্দু যখন বেরিয়ে এলো, ম্যানেজিং ডিরেকটরের ঘরে তখনও লাল আলো জ্বলছে। শ্যামলেন্দুর মনে হলো, কেউই তাহলে সর্বশক্তিমান নন। ফেরিস এবং গর্ডনও তাঁদের হোম বোর্ডের কাছে নাম কেনার চেষ্টা করছেন। ফেরিস তো সেদিন বলেছিলেন, "ক্যাপিটালের ওপর আমরা কত টাকা লাভ করতে পারলাম, সেই হিসেব করে হোম অফিস আমাদের মেরিট বিচার করে!"

ঘরে বসতে-না-বসতেই বেয়ারা হাতে একটা স্লিপ দিলো। টুটুল না! দেখছো মেয়ের কাণ্ড—স্লিপ পাঠিয়েছে। টেলিফোনে মিস চক্রবর্তীকে শ্যামলেন্দু বললো, "মিস ভট্টাচার্যকে পাঠিয়ে দিন।"

মিস ভট্টাচার্যের সঙ্গে এক গাল হেসে দোলনও ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো। করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে শ্যামলেন্দু বললো, "টুটুল, এই রসিকতা কেন? সোজা চলে এলে পারতে।"

দোলন বললো, "টুটুলের ইচ্ছে হলো একটু মজা করে, তাই স্লিপ পাঠালো।"

"তা ধন্যি আপনি," টুটুল বললো। "কতক্ষণ স্লিপ দিয়ে বসে আছি, কোনো খবর নেই। রাগ করে চলেই যাচ্ছিলাম।"

"আমি খুবই দুঃখিত, টুটুল। ম্যানেজিং ডিরেকটর ডেকে পাঠিয়েছিলেন।"

"বউ আগে, না ম্যানেজিং ডিরেকটর আগে?" টুটুল মুখ টিপে প্রশ্ন করে।

উত্তরটা দোলনই দিলো। "মার্চেন্ট অফিসের কেষ্ট-বিষ্টুরা জানে চাকরি থাকলে বউয়ের অভাব হবে না!"

শ্যামলেন্দু বললো, "ম্যানেজিং ডিরেকটর হুকুম করলে কিছু কাঁচাখেকো অ্যামবিশাস এগজিকিউটিভ সীতাকে বনবাসে পাঠাতে পারে। কিন্তু তুমি তো জানো প্রিয়া, তোমার রামচন্দ্র গেরস্ত বাঙালী!" এবার শ্যালিকার দিকে তাকিয়ে শ্যামলেন্দু বললো, "দিদিকে একটু ঠাণ্ডা করো, আমি তো অপরাধের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেছি।"

হাসতে-হাসতে সুদর্শনা বললো, "আচ্ছা, এবারের মতো ক্ষমা করলাম।"

দিদির দিকে মুখ ফিরিয়ে টুটুল বললো, "দিদি, এবার মুখে হাসি ফোটা। তুই তো আজকে বললি, খিটখিটে মেয়েদের বরদের পদস্খলন করতে হয়।"

"তোমরা কফি খাবে?" শ্যামলেন্দু জিজ্ঞেস করলো।

দোলন বললো, "ঘড়ির দিকে তাকাও। একটা বাজতে পাঁচ মিনিট।"

"শ্যামলদা, আপনার ঘরটা কী সুন্দর সাজানো," সুদর্শনা প্রশংসা করে। "আপনাকে এই পরিবেশে ঠিক সিনেমার হিরোর মতো দেখাচ্ছে।"

"সিনেমার হিরোদের ফ্যান বেচতে হয় না," শ্যামলেন্দু উত্তর দেয়।

"আচ্ছা শ্যামলদা, আপনার ঘরের ঐ ছবিটা কিসের?"

"ছবিটা নতুন আনিয়েছে বিলেত থেকে। আমাদের কোনো একটা বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করবার ইচ্ছে আছে। মিলিয়ন পাউণ্ড খরচ করে তৈরি হয়েছে ওই হাওয়া গবেষণা কেন্দ্র।"

"গায়ে হাওয়া লাগাবার জন্যে আপনারা মিলিয়ন পাউণ্ড খরচ করে বসলেন!" চটপট উত্তর দিলো সুদর্শনা।

"সেই কথাটাই তো পাবলিককে জানাতে চাই। ওখানে আমরা বিভিন্ন চেম্বারে বিভিন্ন পরিবেশ সৃষ্টি করি—ইণ্ডিয়ার জুন মাস, ইথিয়োপিয়ার সেপ্টেম্বর মাস, স্পেনের মার্চ মাস, যা খুশী। তারপর সেখানে নানারকম হাওয়া বইতে থাকে—সমুদ্রের হাওয়া, নদীর হাওয়া, শীতের হাওয়া, বসন্তের হাওয়া! কমপিউটর এই সব হাওয়া সম্বন্ধে রিপোর্ট তৈরি করে। সেই সব রিপোর্ট পড়ে নামকরা সায়েনটিস্টরা আমাদের পিটারস্ ফ্যানের নতুন মডেল তৈরি করেন। বুঝলে?"

"ওয়াণ্ডারফুল। আপনি সত্যি সুপার-সেল্‌সম্যান, শ্যামলদা," জামাইবাবুকে সার্টিফিকেট দিলো সুদর্শনা। "এখন বুঝতে পারছি মাত্র ন'বছরে আপনি কেন এত উন্নতি করতে পেরেছেন।"

দরজার কাঁচের মধ্য দিয়ে কে যেন উঁকি মারলো। শ্যামলেন্দু বললো, "কাম ইন।"

ঘরে ঢুকলো সুদর্শন শ্যামলকান্তি ছিপছিপে এক যুবক। ম্যানেজমেণ্ট ট্রেনি অতনু রে নিশ্চয় সারাজীবন ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনা করেছে। এদের বাংলার মধ্যে একটু আদুরে-আদুরে ভাব থাকে। বেশ বিনয়ের সঙ্গেই বাংলায় অতনু রে জিজ্ঞেস করলো, "আপনি আমাকে খুঁজেছিলেন? আমি একটু রাধাবাজারে গিয়েছিলাম মার্কেট রিসার্চে। মফঃস্বল থেকে যারা ইলেকট্রিক পাখা কিনতে আসে তাদের পাঁচজনকে ইনটারভিউ করেছি আজ। আপনার কথাটাই সত্যি, মিস্টার চ্যাটার্জি। এরা বিভিন্ন পাখা-কোম্পানির বিজ্ঞাপন দেখেছে, কিন্তু কেনবার বেলায় বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন এবং অফিসের সহকর্মীদের পরামর্শ নিয়েছে।"

শ্যামলেন্দু বললো, "এ-বিষয়ে আপনার সঙ্গে পরে বিস্তারিত আলোচনা হবে। আপনি অন্ততঃ দেড়শ' সামপ্‌ল ইনটারভিউ করুন। দরকার হলে ঠিকানা নিয়ে ওদের বাড়িতে যান, ওদের বাইং হ্যাবিটস এবং সাইকলজী স্টাডি করুন। আপনাকে এখন কোনো দরকার নেই, এমনি খোঁজ করছিলাম।"

অতনু বেরিয়ে গেল। দোলন বেশ খুঁটিয়েই অতনুকে দেখে নিলো। "ওকে আগে কোথায় যেন দেখেছি?" দোলন জিজ্ঞেস করে।

শ্যামলেন্দু বললো, "হ্যাঁ, এম-ডির বাৎসরিক টি-পার্টিতে দেখেছো। বছরে ওই একদিনই তো জুনিয়র অফিসার এবং ম্যানেজমেণ্ট ট্রেনিদের সঙ্গে আমাদের সামাজিক মেলামেশা হয়।"

"ম্যানেজমেণ্ট ট্রেনিদের ভবিষ্যৎ কী রকম?" দোলন জানতে চাইলো।

শ্যামলেন্দু মিটমিট করে হাসতে হাসতে বললো, "এক কথায় উজ্জ্বল। ইংরেজের তল্পিবাহক বড়লোকের গবেট ছেলেরা আগে বংশপরিচয়ের সুবাদে মার্চেণ্ট অফিসে চান্স পেতো। স্বাধীনতার ঠিক পরেই গভরমেণ্টের বড়-বড় অফিসাররা তাদের ছেলে এবং জামাইদের এই লাইনে ঢুকিয়েছে। কোম্পানির কর্তারা দিল্লীর আমলাদের খুশী করবার সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছেন। ইনডাসট্রির ভবিষ্যৎকে নিরাপদ করার এইটাই সহজতম উপায় মনে হয়েছে। কারণ কে চাইবে, ছেলে এবং জামাইয়ের অফিস উঠে যাক! এখন কোম্পানিগুলো ঠেকে শিখছে। বুঝছে, এদেশে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে বুদ্ধিমান এবং কর্মঠ লোকদের চাই—যারা দেশের মানুষদের জানে, তাদের মনের কথা বোঝে। এখন তাই কলেজের সেরা ছেলেদের ইনডাসট্রি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে। ম্যানেজমেণ্ট শিক্ষানবীশদের আমাদের এখানে দু বছরের ট্রেনিং নিতে

হয়। তারপর ওরা ঝপাঝপ উন্নতি করে। বোম্বাইতে দু-একটা কোম্পানিতে ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিরা এর মধ্যেই ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়েছে।"

ওরা এবার বেরিয়ে পড়লো। আড়চোখে বাবুরা দেখলো, মিসেস চ্যাটার্জি এবং একটি সুদেহী সুন্দরী যুবতীকে নিয়ে মিস্টার চ্যাটার্জি আজ একটা বাজবার ত্রিশ সেকেণ্ড আগেই অফিস থেকে বেরিয়ে গেলেন।

"এবার কোথায় যাচ্ছি আমরা?" গাড়িতে বসে দোলন জিজ্ঞেস করলো।

"ক্লাবে," উত্তর দেয় শ্যামলেন্দু।

"এখন ক্লাবে?" টুটুলের মুখে জিজ্ঞাসা।

"দুপুরের খাওয়াটা আমরা ক্লাবেই সেরে নেবো, টুটুল," দোলন বলে।

"ক্লাবে খাবার পাওয়া যায় নাকি?" টুটুল বেশ অবাক হয়ে যায়।

"একি আর আমাদের কদমকুয়ার ক্লাব! এখানকার ক্লাবে রেস্তরাঁ আছে, বার আছে, সুইমিং পুল আছে।" দোলন বোনকে বুঝিয়ে দিলো।

গোবিন্দপুর ক্লাবের বিরাট বাড়িটা দেখেও টুটুল অবাক। দোলন বললো, "ও মেম্বার, তবে সব খরচ কোম্পানি দেয়। ক্লাবের মেম্বার হলে কত নামকরা লোকের সঙ্গে আলাপ হয়, তাতে অফিসের কাজের সুবিধে। ব্যবসাদাররা ঠেকে ঠেকে শিখছে, অচেনা লোকের কাছে হঠাৎ হাজির হলে কাজ আদায় করা যায় না। এই চেনা-জানা ব্যাপারটা কোম্পানির পক্ষে খুব ইমপর্টান্ট।"

কার্ডরুমে বসে কয়েকজন মহিলা তখন সিগারেট ও বীয়ার সহযোগে তাস খেলছেন। দোলন বললো, "মেম্বারের বউরা দুপুরে এখানে তাস খেলতে আসে। তারপর ইচ্ছে করলে লাঞ্চটাও এখানে সেরে যায়। সঙ্গে পয়সা আনতে হয় না —চালানে সই করে দিলেই হলো। মাসের শেষে ক্লাবের নগেনবাবু স্বামার কাছে বিল পাঠিয়ে দেবেন।"

দোলন ফিস-ফিস করে বোনকে বললো, "দেশের স্বাধীনতায় এই ক্লাবের বিরাট দান আছে, বুঝলি? তখন কলকাতায় ছিল কেবল সুতানুটি ক্লাব—ওনলি ফর সাদা চামড়া। ইণ্ডিয়ানদের সেখানে নেওয়া হতো না। তারই প্রতিবাদে ন্যাশনালিস্ট ইণ্ডিয়ানরা স্যর হরেন পালের নেতৃত্বে বহু ত্যাগ স্বীকার করে এই ক্লাব প্রতিষ্ঠা করে।"

"তারপর?" টুটুল জিজ্ঞেস করে।

"তারপর আর কী, সায়েবদের চোখ ট্যারা। কিন্তু স্যর হরেন পাল ওদের মোক্ষম জুতো মারলেন, বললেন, গোবিন্দপুর ক্লাব সুতানুটি ক্লাবের পথ অনুসরণ করবে না। আমাদের ক্লাবে সায়েবরাও মেম্বার হতে পারবে।"

টুটুলের দৃষ্টি এবার অন্যদিকে নিবদ্ধ হলো। হল-এর এক কোণে বিরাট

একটা বীয়ারের মগ নিয়ে নির্বাক নিস্তব্ধ হয়ে বসে আছেন এক শীর্ণ বৃদ্ধ। ঠিক যেন মিশরের মমি। "দেখ দেখ দিদি।"

"চুপ চুপ," সাবধান করে দেয় শ্যামলেন্দু। "আমাদের ডিরেকটর স্যর বরেন রায়, আই-সি-এস রিটায়ার্ড। বউ বড্ড খিটখিটে, ছেলেটা হাবা-বোবা। বেচারা বাধ্য হয়ে এই ক্লাবে এসে চুপচাপ বসে থাকেন আর বীয়ার খান।"

ওরা তিনজন এবার লাঞ্চ রুমে প্রবেশ করলো। একটা টেবিল দখল করে শ্যামলেন্দু জানতে চাইলো, "কী খাবে টুটুল – চীনে না ইংরিজী? না তন্দুরি? তাছাড়া আছে কোল্ড বুফে।"

"অত আমি বুঝি না, শ্যামলদা," টুটুল বলে ফেললো।

"আজকে চাইনীজ বলো, টুটুলের খারাপ লাগবে না! চাইনীজ স্টুয়ার্ড মিস্টার হুয়াকে ডাকো, আমি নিজে অর্ডার দিচ্ছি। গোবিন্দপুর ক্লাবের চীনে কুকের খুব নাম, বুঝলি টুটুল।"

টুটুল একটু বিস্ময়ের সঙ্গে চারদিক খুঁটিয়ে দেখছে। দোলন বললো, "কলকাতায় এক-একটা দোকানে এক-একটা খাবার ভাল। তোকে এক-এক করে সব রেস্তরাঁ ঘোরাবো। ব্লু-ফক্সে সিজলিং স্টেক, স্কাই রুমে বেকটি মেয়নেজ, ফারপোতে ফ্রায়েড ফিস উইথ টার্টার সস, অ্যামবারে রোটি কাবাব, মোকাম্বোতে চিকেন তন্দুরি, মদিরাতে বেঙ্গলী ডিশ। লিডো রুমে স্মোকড হিলশা খুব ভাল করে। কিন্তু এখন সিজন নয়, পাওয়া যাবে না।"

"আমরা মাঝে-মাঝে রান্না বন্ধ দিয়ে বাইরে ডিনার খেতে বেরোই," দোলন বোনকে জানায়।

খাবার টেবিলে শ্যামলেন্দু জিজ্ঞেস করলো, "সকাল থেকে আজ কী করলে তোমরা?"

দোলন লিস্টি দিতে আরম্ভ করলো, "প্রথমে গেলাম ক্যালিকোর দোকানে। ওখান থেকে হাসেমের টেলরিং শপে। টুটুলের দু-একটা বডি-ফিটিং ব্লাউজ করিয়ে দেবার জন্যে। তা মেয়ের কি লজ্জা – কিছুতেই বোনের টাকায় জিনিস নেবেন না। আমি বললাম, হাসেম হচ্ছে ওয়ার্লড ফেমাস। এ-ব্লাউজ তুই পাটনায় পাবি না।"

"তারপর লিণ্ডসে স্ট্রীট ও নিউ মার্কেট ঘুরে-ঘুরে ওকে দেখালাম। চারটে পেটিকোট কেনা গেল। সেদিন কাগজে বেরিয়েছিল না, নিউ মার্কেটের পেটিকোটের সমস্ত ইণ্ডিয়া জোড়া নাম। টুটুল বিশ্বাস করতে চায় না। জানো এ-রকম বউ তুমি পাবে না। দরদস্তুর করে তোমার ছ'টাকা বাঁচিয়ে দিয়েছি।"

"এই তো চাই," শ্যামলেন্দু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

তারপর বলে, "জানো টুটুল, আমাদের অফিসের পারচেজ ডিপার্টমেণ্টের লোকগুলো যদি তোমার দিদির মতো হতো, তাহলে কোম্পানির আরও উন্নতি হতো। কোম্পানির টাকায় ওদের মায়া দয়া নেই।"

শ্যামলেন্দুর মন্তব্যে কান না-দিয়ে দোলন বললো, "নিউ মার্কেট থেকে বেরিয়ে আমরা দুজনে গেলাম জেনি টিউডর হেয়ার ড্রেসারের ওখানে। টুটুলের চুল বাঁধালাম। নিজের হেয়ার ডু করলাম। কী ভীড় ওখানে। এক সপ্তাহ আগে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করতে হয়। তবু তোমরা বলবে কলকাতায় ব্যবসা-বাণিজ্য কমে যাচ্ছে। জেনি টিউডর থেকে ছাড়া পেয়েই ছুটেছি মোকাম্বোতে —মিসেস ফেরিসের কফি পার্টি।"

"আচ্ছা।" শ্যামলেন্দু বলে।

টুটুল বললো, "জানেন শ্যামলদা, আমি গাড়িতে বসেছিলাম। কিন্তু মিসেস ফেরিস এমন সুন্দর মহিলা যে দিদির মুখে আমার খবর পেয়ে নিজে বেরিয়ে এসে আমাকে ভিতরে নিয়ে গেলেন।"

"লেডিজ কফি মীট-এ কাদের ডেকেছিলেন?" শ্যামলেন্দু জিজ্ঞেস করে।

"ওনলি কভেনেণ্টেড অফিসারদের বউদের। বললেন, দেখছো তো ইণ্ডিয়ার পুওরদের অবস্থা কী হচ্ছে। আমাদের সকলের উচিত সাধ্যমতো গরীবদের সেবা করা। শিলিগুড়ি হোমসের ফ্ল্যাগ ডে হবে সামনের সপ্তাহে! আমাদের সবাইকে বাক্স নিয়ে রাস্তায় ভিক্ষে করতে হবে।"

টুটুল বললো, "চমৎকার মহিলা! ম্যানেজিং ডিরেকটরের বউ, কিন্তু কোনো চাল নেই। শিলিগুড়ির অনাথ ছেলেদের কথা বলতে গিয়ে চোখে ওঁর জল এসে গেল।"

দোলন বললো, "আর সেই না দেখে, আমাদের মিসেস সান্যালও শিলিগুড়ির ছেলেদের জন্যে চোখ মুছতে লাগলেন। মিসেস সান্যাল আবার কুকুর প্রেমিক সমিতিতেও ঢুকেছেন শুনলাম। মিসেস ফেরিস নাকি এ-বছরে ওখানকার অনারারি সেক্রেটারী হচ্ছেন।"

খাওয়া শেষ করে ওরা ক্লাবের গাড়ি-বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। ড্রাইভার সৃষ্টিধর হুস করে গাড়িটাকে সামনে দাঁড় করালো। টুটুল ভিতরে ঢুকে পড়লো।

সেই সুযোগে দোলন স্বামীকে বললো, "এই শোনো।" তারপর ফিস-ফিস করে কী একটা বললো।

"কী বলছিস রে দিদি?" টুটুল জানতে চাইলো।

দোলন স্বামীর দিকে চোখের ইশারা করে বললো, "কিছুই নয়।"
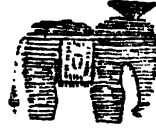
দোলনের ফিস-ফিস কথাটা শ্যামলেন্দুর কানে লেগে রয়েছে। অফিসে নিজের ঘরে ঢুকেই বললো, "মিসেস অ্যাণ্ডারসন!"

নোটবুক নিয়ে মিসেস অ্যাণ্ডারসন ছুটে এলেন। "না, ডিকটেশন নয়। একবার অতনু রায়ের পার্সোনাল ফাইলটা দেখতে চাই!"

এক মিনিটেই ফাইলটা এনে হাজির করলো মিসেস অ্যাণ্ডারসন। একটা কাগজে শ্যামলেন্দু লিখে নিলো—অতনু রে। বাবার নাম সুধাময় রায়, রিটায়ার্ড জেলা জজ। বয়স পঁচিশ। খড়্গপুর আই আই টি থেকে বি-এস-সি (টেক) ইলেকট্রনিকসে। তার আগে স্কুল ফাইনালে ফার্স্ট ডিভিসন। সেণ্ট জেভিয়ার্স থেকে আই এস-সি ফার্স্ট ডিভিসন। হিন্দুস্থান পিটারস্‌-এ দেড় বছর হলো ঢুকেছে। ম্যানেজমেণ্ট ট্রেনি হিসেবে। রেকর্ড ভালই। এখনই আটশ' টাকা পাচ্ছে। ভবিষ্যৎ খারাপ নয়। হাইট পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি, টুটুলের পাচ ফুট চার। ভালই মানাবে।

বাড়িতে একটা ফোন বুক করলো শ্যামলেন্দু। দোলনকে অতনু রায়ের সব বিবরণ জানালো। বললো, "বেশ কালচার্ড এবং স্মার্ট ছেলে। আমার আণ্ডারেই এখন রয়েছে। কিছুদিন আগে আমাদের দিল্লীর রেসিডেণ্ট ডিরেকটর মিস্টার মূর্তি শান্তিনিকেতনে যেতে চাইলেন, বললেন একটা গাইড দিতে পারো। আমি অতনুকে দিয়েছিলাম। মিস্টার মূর্তিও বেশ ইমপ্রেসড, খুব প্রশংসা করেছেন।"

দোলন সঙ্গে-সঙ্গে বললো, "তাহলে দেখো না। আজই মায়ের চিঠি এসেছে, লিখেছেন পাত্র আমাদেরই খুঁজতে হবে। আমি বলি কি, ছোকরাকে আমাদের এখানে বিকেলে চা খেতে নেমন্তন্ন করো। দু পক্ষের দেখাও হবে, তারপর যা হয় করা যাবে।"

"দেখি," বলে ফোন নামিয়ে দিলো শ্যামলেন্দু।

অতনুকে ডেকে পাঠিয়ে বিকেলের চায়ের ব্যবস্থা পাকাপাকি করলো শ্যামলেন্দু। বললো, "বিকেলে বাড়িতে বসে-বসে আপনার সঙ্গে মার্কেট রিসার্চ সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাই। ইংলণ্ড আমেরিকার সর্বত্র এখন মার্কেট রিসার্চের জয়জয়কার। বাজারটা স্টাডি করে যে কোম্পানি আগে থেকে বুঝতে পারবে পোটেনসিয়াল কাস্টমার কী চায়, তার রুচি কী রকম, তার দুর্বলতা কোথায়, সেই কোম্পানিই কমপিটিশনে জিতে যাবে।"

অতনুর সঙ্গে আরও কথাবার্তা হতো, কিন্তু ফ্যাকটরি থেকে সেলসের টেকনিক্যাল অফিসার রাও এসে হাজির।

"আপনি কি খুব ব্যস্ত মিস্টার চ্যাটার্জি? আপনার সঙ্গে আমার খুব আর্জেণ্ট দরকার। এইমাত্র ফ্যাকটরি থেকে ফিরছি।"

রাওকে বসতে বললো শ্যামলেন্দু।

"ব্যাপারটা কিন্তু খুবই কনফিডেনসিয়াল, স্যর।"

শ্যামলেন্দুর ঘরের বাইরে লাল আলোটা জ্বলে উঠলো।

ঠিক একই সময় আর একটা ঘরে লাল আলো জ্বলে উঠলো। দিল্লীর রেসিডেণ্ট ডিরেকটর মিস্টার মূর্তি কলকাতায় এলে এই ঘরটা ব্যবহার করেন। সেই ঘরেই মূর্তি সায়েব কোম্পানির সেক্রেটারী নীলাম্বর সেনগুপ্তকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

দিল্লীর দোর্দণ্ডপ্রতাপ বাণিজ্যদূত আজ যেন একটু মিইয়ে রয়েছেন, সেনগুপ্তর মনে হলো। মূর্তি সাধারণতঃ বেশ ডাঁটের ওপর থাকেন, কথাবার্তা প্রয়োজন না-হলে বলেন না। কথায়-কথায় ম্যানেজিং ডিরেকটর দেখান। আর দেখাবেন নাই বা কেন? বিজনেসের টিকি বাঁধা রয়েছে দিল্লীতে। আর সেই টিকি যাতে কাটা না পড়ে তা দেখাশোনার দায়িত্ব মূর্তি সায়েবের। ইমপোর্ট লাইসেন্স, কারখানার উৎপাদন বাড়াবার লাইসেন্স, বিদেশে টাকা পাঠাবার অনুমতি সব কিছুই নির্ভর করছে দিল্লীশ্বরের অমাত্যদের হুকুমের ওপর। সুতরাং মূর্তি সায়েবের দায়িত্ব এবং ক্ষমতা দুই অসীম। কিন্তু আজ মূর্তি বেশ নরম হয়েই বললেন, "সেনগুপ্ত একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে।"

"আপনার প্রবলেম?"

"আমারও বটে, কোম্পানিরও বটে।"

"আপনাদের প্রবলেম মানেই তো কোম্পানির প্রবলেম, কারণ কোম্পানিকে তো আপনারাই পাইলটের মতো চালাচ্ছেন।" সেনগুপ্ত উত্তর দেয়।

"তোমাকে ব্যাপারটা বলি। আমার মেয়ে রাগিণীকে তো দেখেছো তুমি।"

"নিশ্চয় দেখেছি। কতবার দেখেছি। দিল্লীতে সেবার যখন আমরা এক সপ্তাহ রইলাম তখন রাগিণীর সঙ্গে খুব আলাপ হয়েছিল। ভারি মিষ্টি মেয়ে। আমার স্ত্রীর তো খুব পছন্দ ওকে। রাগিণী এখন কী পড়ছে?"

"কী পড়ছে জানি না, তবে মিরাণ্ডা হাউসে বি-এ অনার্সে নাম লেখানো আছে। লেখাপড়া কিছু করে বলে মনে হয় না।" দোর্দণ্ডপ্রতাপ মূর্তি সায়েবের কণ্ঠস্বর বেশ অসহায় মনে হলো।

"না, ভারি ইনটেলিজেণ্ট মেয়ে। আপনি চিন্তা করবেন না।" সেনগুপ্ত সান্ত্বনা দেয়।

মূর্তি সায়েব বললেন, "ডিরেকটরের ওয়াইফ হয়েও আমার স্ত্রী এখনও নিজে ধোসা তৈরি করেন। এখনও ভোর চারটেয় উঠে সংসারের কাজ গুছিয়ে রাখেন। আর রাগিণী ওসব খেয়ালও করে না। কখনও মিনিস্কার্ট, কখনও বেল-বটম, কখনও লুঙী পরছে, নিজেকে নিয়েই সর্বদা ব্যস্ত।"

"যুগ তো পাল্টাচ্ছে মিস্টার মূর্তি।"

"এসব নিয়ে চিন্তা করতাম না আমি, কিন্তু রাগিণী আমাদের বিপদে ফেলেছে," মিঃ মূর্তি বেশ উত্তেজিত হয়েই বললেন। "বলতে লজ্জিত হচ্ছি, রাগিণী একটি ছেলের সঙ্গে প্রেম করছে। এখনও উনিশ পুরো হয় নি, এর মধ্যেই বিয়ে করবে বলছে।"

"এ-বিষয়ে আমরা আর কী বলবো মিস্টার মূর্তি? ছেলেপুলের বাবা হিসেবে আপনাকে কেবল সহানুভূতি জানাতে পারি। ব্যাপারটা নিতান্তই আপনাদের।"

"এগজ্যাক্টলি। আমিও তাই ভেবেছিলাম। ব্যাপারটা আমার, আমার স্ত্রীর এবং আমার মেয়ের ব্যক্তিগত অ্যাফেয়ার। মেয়ে যেরকম বেঁকে বসেছে তাতে আমাকে বিয়েতে মত দিতেই হবে। কিন্তু এইখানে একটা মস্ত বড় কিন্তু এসে হাজির হয়েছে।"

মিঃ মূর্তি বলে চললেন, "কালকে মিঃ ফেরিসকে ড্রিংকসে ডেকেছিলাম। ওইখানে আমার ওয়াইফ ক্যাজুয়ালি ব্যাপারটা জানিয়ে দিয়েছেন। এম-ডি সঙ্গে-সঙ্গে বললেন, ব্যাপারটা বেশ সিরিয়াস। তুমি বিয়েতে মত দেবার আগে সেনগুপ্তের সঙ্গে পরামর্শ করো।"

"আপনার মেয়ে আপনি যেখানে খুশী বিয়ে দেবেন, তাতে আমাদের কী করবার আছে?" সেনগুপ্ত উত্তর দিলেন।

"এগজ্যাক্টলি। তাই না?" মিস্টার মূর্তি যেন একটু ভরসা পেলেন। "ছেলে বাইরের হলে আমি জিজ্ঞেসও করতাম না। কিন্তু ছোকরাটি আমাদের অফিসের স্টাফ হয়েই গোলমাল বাধিয়েছে।"

"আমাদের স্টাফ? তাহলে সত্যিই গোলমেলে ব্যাপার, মিস্টার মূর্তি। কোম্পানিজ অ্যাকটে বিয়ে আটকাবে!"

মিস্টার মূর্তি অভিমানে ফুলে উঠলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "আমরা ডিরেকটররা কি মানুষ নই? আমরা কি সেকেণ্ড ক্লাস নাগরিক? নিজের মেয়ের ব্যাপারে গভরমেণ্টের অনুমতি ভিক্ষা করতে হবে?"

কোম্পানি আইনে ধুরন্ধর সেনগুপ্ত বললেন, "গভরমেণ্টের অনুমতি নয়, কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের অনুমতি প্রয়োজন। যতদূর মনে হচ্ছে— সেকশন ৩১৪ কোম্পানিজ অ্যাক্‌ট, ১৯৫৬, অ্যাজ অ্যামেণ্ডেড। ডিরেক্টরের আত্মীয়কে অফিস অফ প্রফিট দিতে হলে শেয়ারহোল্ডারদের জেনারেল মিটিংয়ে স্পেশাল রেজলিউশন পাস করাতে হবে।"

"মাই গড্। মিসেস মূর্তি যে দিনক্ষণ ঠিক করে ফেলেছেন," মিস্টার মূর্তি প্রায় ভেঙে পড়লেন। "দেখুন তো কি ডেনজারাস মেয়ে এই রাগিণী--বেছে-বেছে আমার অফিসের ছেলের সঙ্গে প্রেম করা। মিঃ ফেরিসও এই সেকশন ৩১৪-র কথা শুনলে আমার ওপর বিরক্ত হবেন।"

একটু ভেবে মূর্তি সায়েব বললেন, "সাপোজ আমি যদি এই বিয়েতে মত না দিই?"

"তাতে কিছু এসে যায় না। আপনার মত না নিয়ে বিয়ে করলেও আইনের চোখে আপনার মেয়ের স্বামী আপনার জামাই; এবং কোম্পানি আইন অনুযায়ী ডিরেক্টরের জামাই হলো রিলেটিভ। শুধু জামাই কেন আপনার মেয়ের মেয়ে হলে সে যাকে বিয়ে করবে সেও আপনার রিলেটিভ হবে।"

"মাই গড্।" মূর্তি আবার ঈশ্বরকে স্মরণ করলেন।

"আমি স্যরি মিস্টার মূর্তি, কোম্পানিজ অ্যাক্‌টে ডিরেক্টরদের ৩৮ রকম আত্মীয়র লিস্টি দেওয়া আছে—জামাই তার মধ্যে একটি।"

শেয়ারহোল্ডারদের বিনা অনুমতিতে বিয়ে হলে তার ফলাফল কী হতে পারে মিস্টার মূর্তি জানতে চাইলেন।

সেনগুপ্ত বললেন, "ব্যারিস্টারের অ্যাডভাইস নিতে হবে। তবে যতদূর মনে হচ্ছে, জামাই হওয়ার পরে শেয়ারহোল্ডারদের প্রথম যে জেনারেল মিটিং হবে সেখানে রেজলিউশন পাস না হলে জামাইয়ের চাকরি যাবে। তাছাড়া যত টাকা আগে মাইনে হিসেবে পেয়েছে তাও ফেরত দিতে হবে। এখন তো তবু ভাল। ১৯৭৫ সালের অ্যামেণ্ডমেণ্টের আগে হলে কোম্পানি আইন অনুযায়ী ডিরেক্টরের চাকরি যেতো।

"এ্যাঁ।" মিঃ মূর্তির আর্তনাদ।

"আপনি এত চিন্তা করছেন কেন? জুলাই মাসেই তো শেয়ারহোল্ডারদের জেনারেল মিটিং। সেখানে একটা স্পেশাল রেজলিউশন পাস করিয়ে নেওয়া যাবে।"

"আর কোনো পথ নেই?" মিস্টার মূর্তি কাতরভাবে অনুরোধ করলেন।

"সেটা আমার বলা ভাল দেখায় না—ভাবী জামাইকে বিয়ের আগে

বরখাস্ত করা !"

"না, তাও হয় না। আমার ডটার যে কীরকম সেন্টিমেন্টাল তুমি জানো না।"

"তাহলে মাসিক মাইনে পাঁচশ' টাকার কম করে দিতে পারেন।"

"পাঁচশ' টাকায় আমার মেয়ের শাড়ির খরচ উঠবে না সেনগুপ্ত," কাতর-ভাবে বললেন মিস্টার মূর্তি।

সেনগুপ্ত বললেন, আরও পথ থাকতে পারে। আমি সেকশন ৩১৪ এবং সাবসেকশন (২) ভাল করে স্টাডি করি। রাগিণীর ফিঁয়াসের ফাইলটাও দেখতে পারলে মন্দ হতো না।"

"নাম চাও ?" মিঃ মূর্তি একটু ইতস্ততঃ করে স্লিপে নামটা লিখে দিলেন।

পাঁচটা বাজবার আর বেশি দেরি নেই। শ্যামলেন্দুর ঘরের সামনে আলোটা বহুক্ষণ লাল হয়ে থেকে এবার শাদা হলো।

শ্যামলেন্দুকে ভীষণ উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। মুখ কুঁচকে সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে আছে।

ঘরের মধ্যে সেনগুপ্ত সায়েব ঢুকলেন। সেনগুপ্ত সায়েব সবসময় হাসিখুশি থাকেন। জিজ্ঞেস করলেন, "কী হলো ? বড্ড চিন্তিত দেখাচ্ছে।"

"ভীষণ প্রবলেম, মিঃ সেনগুপ্ত।"

"তার জন্যে আপসেট হয়ে কী হবে ? সমস্যা এসেছে, একটা সমাধান হবে। রবি ঠাকুরের ওই গানটা আমি প্রায়ই শুনি—'তোমার 'পরে নাই ভুবনের ভার ওরে ভীরু, হালের কাছে মাঝি আছে করবে তরী পার'।"

হেসে ফেললো শ্যামলেন্দু। বললো, "বড্ড ফ্যাসাদে পড়ে গেলাম সেনগুপ্ত সায়েব। কাউকে বলবেন না, এক্সপোর্টের জন্যে নতুন পিটারস্ উর্বশী ফ্যানের বিরাট একটা কনসাইনমেন্ট ফ্যাকটরিতে রেডি। এখন আমাদের সেল্সের টেকনিক্যাল এক্সপার্টরা চেক করতে গিয়ে দেখে পাখা ডিফেকটিভ। বেশ গোলমাল হয়েছে। ভিতরের ছোট্ট একটা পার্টস বিলিতী দেবার কথা ছিল। তা ফ্যাকটরির কর্তারা গাফিলতি করে দিশী কোম্পানিকে দিয়ে তৈরি করিয়েছে। কোয়ালিটি মোটেই ভাল নয়। এখন বিপদ। সমস্ত পাখা গুদামে রেডি, এই সময় দোষ ধরা পড়লো।"

সেনগুপ্ত সায়েব বললেন, "আমারও বিপদ। এখনই ব্যারিস্টার এ কে চৌধুরীর সঙ্গে কনসালটেশন করতে যাচ্ছি। আপনার আণ্ডারে কাজ করে, অতনু রে, ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি, ওর পার্সোনাল ফাইলটা একটু দিন তো।"

"অতনু রে ? ওর ফাইল ?" শ্যামলেন্দু একটু অবাক হয়ে যায়।

"হ্যাঁ মশাই। আপনিই তো এর জন্যে দায়ী!"

"আমি?"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ। এই রয়াল রোমান্সের ফাঁদ তো আপনিই পেতেছিলেন। ডিরেকটর মিস্টার মূর্তির মেয়ে রাগিণী আর অতনু রায়। আপনিই তো শুনলাম অতনুকে গাইড হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন যখন মিস্টার মূর্তি, তাঁর বউ এবং মেয়েকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে বেড়াতে গেলেন।"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ। কিন্তু সে তো দু দিনের জন্যে—একটা উইক-এণ্ডে!"

হেসে ফেললেন সেনগুপ্ত সায়েব। "এক পলকের দেখাই যেখানে অঘটন ঘটিয়ে দেয় সেখানে পুরো দুটো দিন কি কম কথা হলো?"

অতনু রায়ের পার্সোনাল ফাইলটা হাতে নিয়ে সেনগুপ্ত বললেন, "ঘটক বিদায় পাবেন আপনি। নেমন্তন্ন চিঠিও—চি অতনু এবং সৌ রাগিণী। মাদ্রাজীরা বিয়ের চিঠিতে ওই দুটো কথা—চি এবং সৌ ব্যবহার করে। তবে দাঁড়ান আগে কোম্পানি আইনটা সামলে নিই। ডিরেকটর নিজের অফিসের কাউকে জামাই করলে মুশকিল আছে। কন্যার স্বামী হচ্ছে রিলেটিভ—কোম্পানি আইনের সেকশন ৬, অ্যাজ অ্যামেণ্ডেড বাই অ্যাকট থার্টিওয়ান অফ ১৯৬৫।"

গম্ভীর হয়ে যায় শ্যামলেন্দু! তারপর জিজ্ঞেস করে, "আচ্ছা স্ত্রীর বোনের স্বামী?"

"দাঁড়ান মশায়, আপনি বিপদে ফেললেন। দেখে নিই একটু, গন্ধমাদন পর্বত তো সঙ্গেই রয়েছে।" কোম্পানি আইনের বিরাট বইটা খুলে সেনগুপ্ত বললেন, "জোর বেঁচে গেলেন। পুরানো আইনে স্ত্রীর বোনের স্বামী আত্মীয়। এবারে সংশোধনীতে স্ত্রীর বোন আত্মীয়া, কিন্তু বোনের স্বামী আত্মীয় নয়। তবে বলা যায় না। কিছু লোক আত্মীয়র এই তালিকা আরও বাড়াবার জন্যে গভরমেণ্টের ওপর চাপ দিচ্ছে।"

সেনগুপ্ত সায়েব বেরিয়ে যেতেই ইনটারন্যাল ফোন তুলে একটা নম্বর ডায়াল করলো শ্যামলেন্দু।

"রায় নাকি? আমি চ্যাটার্জি বলছি। আই অ্যাম অ্যাফরেড, আমার শরীরটা আজ ভাল লাগছে না, বাড়িতে যে মিটিংয়ের কথা ছিল সেটা যদি না হয়?"

অতনু উত্তর দিয়েছিল, "ঠিক আছে; তাতে কী হয়েছে।"

"আপনার কিছু অসুবিধে হলো না তো?"

"মোটেই না। পারফেক্টলি অল রাইট।"

রাত্রে ডিনারের পর নাইট শোয়ের টিকিট কেটে রেখেছিল দোলন। যাবার তেমন ইচ্ছে ছিল না শ্যামলেন্দুর। কিন্তু সুদর্শনা এসেছে দু দিনের জন্যে। বেচারা দোলন নিজের লোকদের নিয়ে হৈ-হৈ করার সুযোগ পায় না। সুতরাং ওদের আনন্দে ছন্দপতন ঘটাতে দেয়নি শ্যামলেন্দু।

নির্ধারিত সময়ের একটু আগেই ওরা মেট্রোতে হাজির হয়েছিল। ইভনিং শো তখন সবে ভাঙছে। সেইখানেই মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। অতনু সিনেমা হল্ থেকে বেরিয়ে আসছে। সঙ্গে রাগিণী। মূর্তি সায়েব তাহলে এবার সকন্যা কলকাতায় এসেছেন।

একটু লজ্জা পেয়ে গেল শ্যামলেন্দু। অতনু বরং বেরিয়ে এসে বললো, "গুড ইভনিং মিস্টার চ্যাটার্জি। ছবিটা আপনাদের ভাল লাগবে।"

শ্যামলেন্দু বললো, "শরীরে এখনও যুত পাচ্ছি না। কিন্তু বাড়িতে বসে-বসেও ভাল লাগলো না।"

অতনুর গাড়ি নেই। হিন্দুস্থান পিটারস্-এর অলিখিত নিয়ম অনুসারে অফিসার স্থানীয় লোকেরা বাসে-ট্রামে যাতায়াত করে না। অতনুও ট্যাক্সি করে অফিসে আসে। এখন কিন্তু দূর থেকে শ্যামলেন্দু দেখলো হিন্দুস্থান পিটারস্-এর ইউনিফর্ম-পরা ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে হল্-এর সামনে দাঁড়ালো। ভিতরে বসে আছেন স্বয়ং মূর্তি সায়েব।

দোলনও গম্ভীর হয়ে আছে। শো আরম্ভ হওয়ার পর বেশ চুপচাপই রইলো। শ্যামলেন্দু শুধু একবার ফিস-ফিস করে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি টুটুলকে কিছু বলোনি তো?"

"পাগল!"

ইনটারভ্যালে টুটুল একটু বেরিয়ে গেল। শ্যামল বললো, "অমন গম্ভীর হয়ে গেলে কেন?"

"আমি ভেবেছিলুম টুটুলটা লাকি আছে। এক চান্সেই পার হয়ে যাবে," দোলন বললো।

"প্রথম সুযোগটাই কিছু জীবনের শেষ সুযোগ নয়। প্রথমবার টেস্ট ম্যাচে নেমেই সব ক্রিকেটার কিছু সেঞ্চুরি করে না।" শ্যামলেন্দু সান্ত্বনা দেয়।

আরও কাছে সরে এসে দোলন বললো, "না, আমি ভাবছি টুটুলটা তোমার-আমার মতো লাকি নয়। আমাদের প্রথম দর্শনেই বিয়ে, প্রথম ইনটারভিউয়ে

তোমার চাকরি, আর যদি প্রথম চান্সেই ডিরেকটর হয়ে যাও তাহলে তো হ্যাটট্রিক হয়ে গেল।"

ডিরেকটর! কথাটা শুনেই শ্যামলেন্দুর মনের মধ্যে একটা কাঁটা বিঁধে গেল। বেশ ভুলে গিয়ে সিনেমা দেখতে এসেছিল।

"আচ্ছা, ডিরেকটরদের কত মাইনে গো?" দোলন জিজ্ঞেস করে।

"সাত হাজার। তাছাড়া লাভের ওপর কমিশন আছে। আরও নানা রকম সুযোগ সুবিধে আছে। তবে সবসুদ্ধ বছরে একলক্ষ কুড়ি হাজার টাকা।"

"তাহলে মাসে কত দাঁড়াচ্ছে?" দোলন হিসেব করতে লাগলো। "বারো দশকে একশ' কুড়ি, মানে মাসে দশ হাজার টাকা।" বেশ আনন্দ পাচ্ছে দোলন —ঠিক যেন স্বপ্ন দেখছে। রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা। "হ্যাঁগো ডিরেকটরদের ক'টা পোস্ট খালি আছে?"

"মাত্র একটা। তার বেশি ডিরেকটর নিতে হলে, কোম্পানির আর্টিকলস্ অফ অ্যাসোসিয়েশন পাল্টাতে হবে," শ্যামলেন্দু উত্তর দিলো।

"তোমাকে সত্যি কথা বলছি, টুটুলের জন্যে আমার আর দুঃখ হচ্ছে না।"

"হঠাৎ এ-রকম মত পাল্টে ফেললে?" শ্যামলেন্দু হেসে জিজ্ঞেস করে।

"অতনুর সঙ্গে ব্যাপারটা যে বেশিদূর গড়ায়নি, খুব ভাগ্য। শালীর বর-এর জন্যে তুমি হয়তো অসুবিধেয় পড়তে। ডিরেকটর হওয়া মাত্রই ওই মূর্তি সায়েবের মতো কোম্পানি অ্যাকট নিয়ে ছটফট করতে।"

অন্ধকারে দোলনের হাতটা ধরে মৃদু চাপ দিলো শ্যামলেন্দু।

দোলন কিন্তু থামলো না। ফিস-ফিস করে জিজ্ঞেস করলো, "গভরমেণ্ট এমন আইন করেছে কেন বলো তো!"

"যাতে আত্মীয়-তোষণ না হয়। তবে জানোই তো, এদেশে সরকারের বজ্র-আঁটুনি ফস্কা গেরো।"

দোলন এবার ছেলেমানুষের মতো প্রশ্ন শুরু করে। "আচ্ছা, ওই যে সেকশন ৩১৪ না কি বললে, তাতে শেয়ারহোল্ডারদের মিটিংয়ে আত্মীয় সম্পর্কে রেজলিউশন পাস করতে অসুবিধে হতে পারে?"

"আজকাল কিছুই অসম্ভব নয়। আমাদের পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি, যে-কেউ বাজার থেকে একখানা শেয়ার কিনে মিটিংয়ে এসে গোলমাল বাধাতে পারে। বম্বেতে ইউনিয়নের লোকেরা তো প্রায়ই করছে। তা ছাড়া আছে বড় শেয়ারহোল্ডার, সরকারী লাইফ ইনসিওর কর্পোরেশন, ইউনিট ট্রাস্ট। ফেরিস সায়েব এদের বড্ড ভয় করেন, যদিও জানেন ভোটের জোরে তিনি যা-ইচ্ছে পাস করিয়ে নিতে পারেন, কারণ শতকরা পঁচাত্তর ভাগ শেয়ার এখনও

বিলেতের কোম্পানির হাতে।"

টুটুলকে ফিরে আসতে দেখেই কথা বন্ধ হয়ে গেল। জামাইবাবুকে মধ্যিখানে বসিয়ে দুই বোন দুধারে দুখানা চেয়ার অধিকার করেছে। বিজ্ঞাপনের ছবি আরম্ভ হলো। হঠাৎ টুটুল জামাইবাবুকে খোঁচা দিলো। বললো, "আরম্ভ হলো আপনার পিটার্স্ ফ্যানের গুণকীর্তন।"

শ্যামলেন্দু মাথা নাড়লো। এক মিনিটের ছবি শেষ হওয়া মাত্রই টুটুল বললো, "উঃ জামাইবাবু, বিজ্ঞাপনে আপনারা দিনকে রাত, রাতকে দিন করতে পারেন! আমার তো এখনই একখানা উর্বশী ফ্যান কিনতে ইচ্ছে করছে— যার হাওয়ায় সব কষ্ট, সব দুঃখ মুছে যাবে!"

এই বিজ্ঞাপনের ছবিটাই সব মাটি করে দিলো। একবার আলো জ্বলে আসল ছবিটা আরম্ভ হলো। কিন্তু শ্যামলেন্দুর চোখের সামনে শুধু কারখানার গুদামঘরের দৃশ্য ভেসে উঠতে লাগলো। গুদামের ছাদ পর্যন্ত বাক্স-বাক্স পাখা সাজানো রয়েছে। গায়ে ইংরেজিতে লেখা—রপ্তানির জন্য। কিন্তু প্রতিটি পাখায় গলদ।

আর মনে পড়ছে গর্ডন সায়েবের কথা। রূপালী পর্দার রঙীন নায়িকার মুখের ওপর সুপার-ইমপোজ হয়েছেন গর্ডন সায়েব, ফিনানস ডিরেকটর। চলতি আর্থিক বছরে আরও দশ লাখ টাকা প্রফিট চাইছেন তিনি।

শোনা যাচ্ছে রুণুর কাছেও ফিনানস ডিরেকটর কিছু টাকা চেয়েছেন। রুণু নাকি এ-বছরে পাঁচ লাখ টাকা খরচ কম দেখাবে। ঠিক হ্যায়, রুণু সান্যাল যদি পাঁচ লাখ বাঁচাতে পারে—শ্যামলেন্দু নিশ্চয় দশ লাখ পারবে। বিজ্ঞাপনের জন্যে অনেক টাকা আছে—তার থেকে পাঁচ লাখ টাকা বাঁচিয়ে ফেলবে শ্যামলেন্দু। তিন লাখ টাকার একটা অদৃশ্য প্রভিশন রেখেছিল এমার্জেন্সির জন্যে। সেটাও ফিরিয়ে দেবে কোম্পানিকে। তাহলে হলো আট লাখ। আর দু লাখ এদিক-ওদিক যা হয় করা যাবে। গ্রামে-গ্রামে মাল না-পাঠিয়ে বেশির ভাগ পাখা বড়-বড় শহরে বিক্রি করে দেবে। তাতে কম খরচ পড়বে। সেল্‌সম্যানদের ঘুরে বেড়াবার খরচ কমে যাবে!

মেট্রোর রূপালী পর্দায় এখন সমুদ্রে সফেন হাওয়াই-এর রোমান্টিক দৃশ্য। প্রায় বিবসনা বিদেশিনী নায়িকা এবার নায়কের বক্ষলগ্না হতে চলেছেন। সামনের সস্তা সীটগুলোতে প্রবল উত্তেজনা। দু-একটা সিটি পড়লো। দোলন রসিকতা করে শ্যামলেন্দুর পায়ে একটু চাপ দিলো। আলিঙ্গনে আবদ্ধ নায়ক-নায়িকা এবারে চুম্বনে মগ্ন হলো—বিশাল স্ক্রিন জুড়ে শুধু ওদের মুখ দুটো দেখা যাচ্ছে। দোলন বললো, "সায়েবগুলো ভারি অসভ্য!"

কিন্তু শ্যামলেন্দু শুধু ডিফেকটিভ পাখার ডাঁই দেখতে পাচ্ছে। কোনো কথাই তার কানে আসছে না। শুধু মনে হচ্ছে, দশ লাখ টাকা না-হয় জোগাড় হলো, কিন্তু এই এক্সপোর্টের কী হবে?
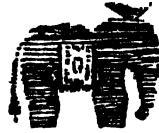
এক্সপোর্টের চিন্তা মাথায় নিয়েই পরদিন শ্যামলেন্দু আবার অফিসে এসেছে। হিন্দুস্থান পিটারস্-এর কেউ এখনও ব্যাপারটা জানে না। বড় সায়েবকে রিপোর্ট করা দরকার।

নোটটা নিজের হাতেই লিখে ফেললো শ্যামলেন্দু। মিসেস অ্যাণ্ডারসনকে টাইপ করতে দিতেও সাহস হলো না।

নোটটা পাবার পর কয়েক মিনিট পরেই মিস্টার ফেরিস ইণ্টারকমে ফিনানস ডিরেকটরকে ডাকলেন, "জন, একবার আমার ঘরে চলে আসবে?"

মিস্টার ফেরিসের ঘরে লাল আলোটা জ্বলে উঠলো। কয়েক মিনিট পরে শ্যামলেন্দুরও ডাক পড়লো। ডাক আসবে শ্যামলেন্দু জানতো। তাই কোটটা পরেই সে অন্য কাজ করছিল।

মিসেস ডিকের টেলিফোন পাওয়া মাত্রই শ্যামলেন্দু এম-ডির ঘরে চলে গেল।

রুণু সান্যাল অন্য ব্যাপারে এম-ডির দর্শনপ্রত্যাশী হয়ে এসে কয়েকবার বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে গেল। মিসেস ডিককে রুণু জিজ্ঞেস করলো, "কী ব্যাপার। আজ সমস্ত সকালই মিটিং চলবে নাকি?"

মিসেস ডিক ঠোঁটে লিপস্টিকের ডবল কোটিং লাগাতে-লাগাতে বললো, "ভগবান জানেন, আর মিস্টার ফেরিস জানেন। তবে মিটিং চলবে মনে হয়। কারণ এবার টেকনিক্যাল ম্যানেজারের ডাক পড়েছে।"

ফ্যাকটরির সর্বেসর্বা, টেকনিক্যাল ম্যানেজার হার্টলে হাসি মুখে এম-ডির ঘরে ঢুকলেন। কিন্তু মিনিট পনেরো পরে যখন বেরিয়ে এলেন তখন তাঁর মুখ কালো হয়ে গিয়েছে।

কী একটা কাগজ নিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে হার্টলে আবার ফিরে এলেন।

ঘরের ভিতর তিনজন তখনও গম্ভীর হয়ে বসে আছেন। মিস্টার ফেরিস বললেন, "তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে কী?"

টেকনিক্যাল ম্যানেজার বললেন, "এটা বোঝা যাচ্ছে যে, এই ফ্যান আমরা

কিছুতেই বিদেশে পাঠাতে পারি না। সমস্ত মাল রিজেক্‌ট হয়ে ফিরে আসবে।"

ঠোঁটের পাইপে একটা টান দিয়ে হার্টলে বললেন, "দোষটা অবশ্য খুবই সামান্য। থার্ড পার্টির কাছ থেকে কিনে আমরা যে পার্টস ব্যবহার করেছিলাম সেটা পাল্টে দিলেই উর্বশী পৃথিবীর বেস্ট ফ্যান হয়ে যাবে। আমি আজই টেলেক্স পাঠাচ্ছি শেফিল্ডে। পার্টসগুলো এরোপ্লেনে পাঠাবার জন্যে।"

"ইমপোর্ট লাইসেন্স ?" মিস্টার গর্ডন জিজ্ঞেস করলেন।

"আমাদের ব্লানকেট কোটা থেকে এখনকার মতো নিয়ে যাচ্ছি—যাতে আমাদের রপ্তানি না বাধা পায়।"

হার্টলে নিজের কাগজের দিকে তাকিয়ে বললেন, "শেফিল্ডে যদি মাল এয়ার ফ্রেট করে, আমি তিন সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত পাখা রেডি করে দেবো।"

হার্টলে আরও বললেন, "উই আর স্যরি, পিটার। আমি এনকোয়্যারি করে দেখছি কাদের দোষে এমন বিশ্রী ভুল হলো। আর স্বীকার করছি দোষটা আমাদেরই আগে খুঁজে বার করা উচিত ছিল। সেল্‌সের ইনস্‌পেকটররা যে সময় থাকতে দোষটা বার করেছে তার জন্য কোম্পানির সম্মান রক্ষা পেলো।"

হার্টলে সায়েব উঠে পড়লেন। ফিনানস ডিরেকটর এবার ফেরিস সায়েবকে বললেন, "পিটার, কোম্পানির সম্মান হয়তো রক্ষা পেলো, কিন্তু তোমার আমার সমূহ বিপদ।"

"কেন ?" পিটার ফেরিস জানতে চাইলেন!

গর্ডন বললেন, "থাইল্যাণ্ড এবং কোরিয়ায় যে মাল যাচ্ছিলো তার দাম এক কোটি টাকা। প্লাস রপ্তানির জন্য গভরমেণ্টের কাছ থেকে আমরা সাহায্য পাচ্ছিলাম দশ লাখ টাকা।"

"কিন্তু জন, আমরা তো মার্চ মাসে এই আর্থিক বছর শেষ হবার আগেই মালটা পাঠিয়ে দিচ্ছি," ম্যানেজিং ডিরেকটর উত্তর দিলেন।

"দশ নম্বর ক্লজটা পড়ে দেখো পিটার।" গর্ডন গম্ভীরভাবে বললেন, "তোমার সমস্ত মাল জাহাজে তোলার শেষ তারিখ এই মাসের পনেরোই। তার মধ্যে এরোপ্লেনে নতুন পার্টস বিলেত থেকে এসে পড়বে, কিন্তু মাল তখনও রেডি হবে না।"

"তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে, জন ?"

"পরের প্যারাগ্রাফটা পড়লেই বুঝতে পারবে। যে-ক্লজের জন্যে চ্যাটার্জি আজ তোমার কাছে ছুটে এসেছেন। পনেরো তারিখে রাত এগারোটার মধ্যে মাল জাহাজে না-চড়লে আমাদের পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।"

"অ্যাঁ! অমন শর্তে আমরা রাজী হয়েছিলাম কেন ?" প্রায় আর্তনাদ করে

উঠলেন ফেরিস সায়েব।

কনট্রাকটের শর্তগুলো আগে ডিরেকটররা দেখেননি এমন নয়। তাঁরা অনুমোদন করার পরই কনট্রাকট সই হয়েছে। কিন্তু সেকথা মনে করিয়ে দিয়ে লাভ নেই। কলমের পিছন দিকটা হাতের তালুতে ঠুকতে-ঠুকতে শ্যামলেন্দু উত্তর দিলো, "ওই শর্ত না-রাখলে থাইল্যাণ্ড এবং কোরিয়া কেউই আমাদের কাছে মাল নিতো না।"

ফিনানস ডিরেকটর বললেন, "পিটার, তুমি আর আমি কনট্রাকট সই হবার আগে ওটা পাস করেছি। আর ওদের কথাও ভেবে দেখো। গ্রীষ্মকাল কেটে যাওয়ার পর ফ্যান এসে পৌঁছলে, সেই পাখা দিয়ে ওরা কী করবে?"

"ঠিক সময়ে ডেলিভারির ব্যাপারে ইণ্ডিয়াকে এখনও কোনো দেশ বিশ্বাস করে না," শ্যামলেন্দু দুঃখের সঙ্গে বললো।

ঘস-ঘস করে নিজের নোটবুকে কী একটা অঙ্ক কষে ফেললেন চার্টার্ড অ্যাকাউনটেণ্ট গর্ডন সায়েব। তারপর বললেন, "পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ, দশ লক্ষ টাকা এক্সপোর্ট সাবসিডিতে লোকসান—মোট ষাট লক্ষ টাকা। প্লাস ওই ডিফেকটিভ মাল তৈরির খরচ নব্বুই লাখ টাকা। ঐ মাল ইণ্ডিয়াতেও বিক্রি হবে না, কারণ পাখাগুলোর ভোলটেজ মাত্র ১১০। ইণ্ডিয়াতে ২২০। আমরা এবার আশি লক্ষ টাকা লাভ করতে যাচ্ছিলাম। সুতরাং বেশ কয়েক লক্ষ টাকা লোকসান। চমৎকার!"

ফেরিস সায়েবের লাল মুখটা আরও লাল হয়ে উঠলো! বললেন, "দেখি আমাদের কনট্রাকটটা!"

শ্যামলেন্দু দলিলটা ফাইল থেকে খুলে এগিয়ে দিলো।

অনেকক্ষণ ধরে মন দিয়ে প্রতিটা লাইন পড়লেন ফেরিস সায়েব। তারপর গম্ভীরভাবে বললেন, "আমি তো কোনো পথ দেখছি না। অল আই ক্যান সে, ফ্যাকটরির ম্যানেজারকে নেক্সট জাহাজে বাড়ি পাঠিয়ে দাও।"

"ফ্যাকটরি থেকে বোধহয় আরও অনেককে বাড়ি পাঠানো দরকার হবে। কিন্তু এই ষাট লক্ষ টাকা বাঁচাবার তো কোনো পথ দেখছি না। হিসট্রিতে এই প্রথম হিন্দুস্থান পিটারস্-এর লোকসান হবে, হিসেবের খাতায় লাল কালির আঁচড় পড়বে," বললেন গর্ডন সায়েব।

"দেখি একবার কনট্রাকটটা," গর্ডন সায়েব এবার দলিলটা পড়ে ফেললেন। তারপর ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, "না কোনো উপায় তো দেখছি না।"

ভীষণ বিব্রত বোধ করছে শ্যামলেন্দু। সে আবার বললো, "আমি অত্যন্ত দুঃখিত।"

"না, তোমার দুঃখিত হবার কিছু নেই। ফ্যাকটরিই এর জন্যে দায়ী," ফেরিস সায়েব বললেন।

শ্যামলেন্দু বললো, "আমি বরং কাগজগুলো সব নিয়ে যাই, আরও খুঁটিয়ে রিভিউ করে দেখি, যদি কোনো পথ থাকে।"

গর্ডন বললেন, "তোমাকে মনে করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই, কাকপক্ষী যেন ব্যাপারটা এখন না জানতে পারে। শেয়ার মার্কেট এবার বাড়তি ডিভিডেণ্ড আশা করছে, সেই সঙ্গে বোনাস শেয়ার। কোনো রকমে খবরটা রটে গেলে শেয়ার বাজারে সর্বনাশ হবে।"

ফেরিস এবার হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। "উইশ ইউ অল দি লাক, ইয়ং-ম্যান," এই বলে শ্যামলেন্দুর সঙ্গে করমর্দন করলেন।

ম্যানেজিং ডিরেকটরের ঘর থেকে যেন অন্য এক শ্যামলেন্দু বেরিয়ে এলো : যে-শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জি কমারসিয়াল ম্যানেজার, সকালে মিস্টার ফেরিসের ঘরে ঢুকেছিল—তার সঙ্গে এ-শ্যামলেন্দুর অনেক তফাত। শ্যামলেন্দু এখন অনেক দায়িত্বশীল। হিন্দুস্থান পিটারস্-এর ভবিষ্যৎ যেন সে নিজেই সৃষ্টি করছে, বোর্ডের অন্য মেম্বারদের সঙ্গে।

শ্যামলেন্দু নিজেকে বোঝাচ্ছে—তোমার নামের পাশে ম্যানেজার বলে একটা কথা আছে। শিল্পে ও বাণিজ্যের সমরাঙ্গনে তুমি একজন লীডার—তোমার নেতৃত্বের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। সংসারে হয়তো অনেক জরুরী সমস্যা আছে, কিন্তু এই মুহূর্তে হিন্দুস্থান পিটারস্-এর শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জির কাছে ওই ষাট লক্ষ টাকা ক্ষতির সম্ভাবনা বিরাট চ্যালেঞ্জের মতো হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

লাঞ্চের আগে পর্যন্ত শ্যামলেন্দু মন দিয়ে থাইল্যাণ্ডের সঙ্গে চুক্তির কাগজগুলো খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়েছে। তারপর কাছাকাছি রেস্তরাঁতে গিয়ে কয়েকটা স্যাণ্ডউইচ খেয়ে ফিরে এসেছে। মিস্টার ফেরিস ও গর্ডন লাঞ্চে বেরিয়ে গিয়েছেন। মিসেস ডিকের কাছে শুনেছে বিকেলে বড় সায়েব গল্‌ফ খেলতে যাবেন। ডিকিনসন কোম্পানির চেয়ারম্যান হ্যাডো সায়েবের সঙ্গে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে গল্‌ফ কোর্সে। যত দায়িত্ব এখন শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জির।

ওঁরা দুজন বোধহয় শ্যামলেন্দুকে পরীক্ষা করছেন। দেখছেন বিরাট একটা অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে শ্যামলেন্দু কেমনভাবে বেরিয়ে আসতে পারে। এ-কথা বলা যায় না তাঁরা শ্যামলেন্দুর ঘাড়ে দায়িত্বটা জোর করে চাপিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু উঁচু পর্যায়ে তো কিছুই চাপিয়ে দেওয়া হয় না। দায়িত্ব নিজে কুড়িয়ে নিতে হয়। প্রাইভেট সেকটরে এই নিয়ম। পশ্চিমের শিল্প-বিপ্লবের

ভোর থেকে এই নিয়ম চলে আসছে।

এক্সপোর্ট ফাইলের মধ্যে ডুবে থেকেও শ্যামলেন্দুর মনে পড়তে লাগলো—জেমস ওয়াটকে কেউ বলেনি বাষ্প ইঞ্জিন আবিষ্কার করো, স্টিভেনসনকে কেউ হুকুম করেনি রেল ইঞ্জিন তৈরি করো, জন বয়েড ডানলপকে কেউ চোখ রাঙায়নি হাওয়াভরা টায়ার আবিষ্কার না-করলে তোমার ইনক্রিমেণ্ট হবে না, হেনরি ফোর্ড কারুর ইনস্ট্রাকশন মতো মোটরগাড়ি তৈরিতে মন দেননি, সুইডেনের আলফ্রেড নোবেলকে কেউ বিস্ফোরক আবিষ্কারের জন্য রিমাইণ্ডার দেয়নি, হলাণ্ডের এনটন ফিলিপসকে কেউ বলেনি যে রাশিয়ার জারের কাছ থেকে ইলেকট্রিক বাতির বিরাট অর্ডার না-আনলে তোমার চাকরি যাবে। এসব এমনিই হয়েছে—প্রয়োজনের সময়, বিপদের সময় কাজের লোকরা এগিয়ে এসেছে, চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করেছে—ফলে তারা উপরে উঠে গিয়েছে। ইনডাসট্রির ইতিহাসে তাদের নাম লেখা হয়ে গিয়েছে সোনার অক্ষরে। এদের তুলনায় একান্ত পুঁটকে কোম্পানি হিন্দুস্থান পিটারস্-এর ততোধিক পুঁটকে অফিসার শ্যামলেন্দুর কাছ থেকে আর কতটুকু আশা করা হচ্ছে!

শ্যামলেন্দুকে কেমন যেন নেশায় পেয়ে বসেছে। দলিলটা সে আবার মন দিয়ে পড়তে শুরু করলো—যেভাবে বড়-বড় ব্যারিস্টাররা ব্রীফ পড়েন, যেভাবে শার্লক হোমস কোনো এভিডেন্স বিচার করেন, যেভাবে দোলনের বাবা শেক্সপীয়র পড়েন। লাল পেন্সিল নিয়ে, দাগ দিয়ে—কোথাও যদি নতুন কোনো অর্থ উদ্ধার করা যায় যা এতদিন খুঁজে পাওয়া যায়নি।

শ্যামলেন্দু একটু যেন আলো দেখতে পাচ্ছে। আবার আলোটা আলেয়ার মতোই মিলিয়ে যাচ্ছে।

এরই মধ্যে আবার পাবলিসিটি অফিসার মিঠু সেন ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

"মিস্টার চ্যাটার্জি, আপনার নোট পেলাম। পাঁচ লাখ টাকার বাজেট কেটে দিচ্ছেন।. অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সীর মিস নারগোলওয়ালা খবরটা শুনে ভীষণ মুষড়ে পড়েছেন। উনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।"

"আমি এখন বড্ড ব্যস্ত, মিস্টার সেন," শ্যামলেন্দু গম্ভীরভাবেই জানায়। ওর মুখ দেখে কে বলবে ভিতরে কি চিন্তা চলছে।

"কিছু যদি মনে না করেন, একটু যদি টাইম দেন। আপনাকে সত্যি কথা বলছি, মিস নারগোলওয়ালা খুবই স্পর্শকাতর।"

মনের রাগ চেপে রেখে, মুখে হাসি ফুটিয়ে শ্যামলেন্দু বললো, "কুমারী মহিলা, স্পর্শ করলে কাতর তো হবেনই।"

লজ্জায় জিভ কেটে মিঠু সেন বললেন, "আমি বোধহয় ঠিক বোঝাতে পারিনি, স্পর্শকাতর মানে—একটু সেনসিটিভ, একটু অভিমানিনী।"

"আই অ্যাম স্যরি! আমার হয়ে ওঁকে একটু বুঝিয়ে বলবেন, আমি দু-তিনদিন পরে মিস নারগোলওয়ালাকে মিট করবো।"

মিঠু সেন এবার একটা বিরাট বোর্ড টেবিলের ওপর রেখে শ্যামলেন্দুকে বললেন, "আমাদের এক্সপোর্টের বিজ্ঞাপন। উর্বশী ফ্যান নিয়ে যেদিন জাহাজ কলকাতার খিদিরপুর ডক থেকে ছাড়বে—সেদিন কাগজে বেরুবে। মিস নারগোলওয়ালা এবং আমি, দুজনে একসঙ্গে বসে কপি লিখেছি। উনি খুব এক্সাইটেড। প্রথম লাইন: উর্বশী চললেন বিদেশে অভিসারে।"

"মিঃ সেন, এই বিজ্ঞাপন সম্বন্ধেও মতামত দিতে একটু দেরি হবে।" শ্যামলেন্দু বেশ গম্ভীরভাবে তার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলো।

দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে হতাশ মিঠু সেন আবার ফিরে এলেন। কমারসিয়াল ম্যানেজারের হাবভাবে ভদ্রলোক বিচলিত হয়েছেন। বেশ করুণ কণ্ঠে বললেন, "মিস্টার চ্যাটার্জি, আপনি বলেছিলেন এক্সপোর্ট বিজ্ঞাপনটা খুব আর্জেন্ট—পনেরো তারিখেই সমস্ত ইণ্ডিয়াতে রিলিজ করতে হবে। তাহলে, আমি অন্ততঃ এজেন্সীকে উর্বশীর জন্যে কয়েকটা সুন্দরী মডেলের ছবি তুলতে বলি।"

"তা তুলুন আমার আপত্তি নেই," শ্যামলেন্দু মিঠু সেনকে বিদায় করতে পারলে বাঁচে।

তারপর আবার চিন্তায় ডুবে গিয়েছে শ্যামলেন্দু।

মিসেস অ্যাণ্ডারসন বাইরে চুপচাপ বসে আছেন। কোনো কাজ নেই। শুধু লোক তাড়াচ্ছেন, কেউ যেন বিনা নোটিশে মিস্টার চ্যাটার্জির ঘরে ঢুকে না পড়েন।

ঘস-ঘস করে বাংলায় দু'পাতা চিঠি একখানা লিখে ফেলেছে সুদর্শনা। "পড়বি নাকি দিদি?" সুদর্শনা এবার বোনকে জিজ্ঞেস করে।

"তুই এখন বড়সড় হয়েছিস—তোর চিঠি পড়াটা ঠিক নয়," দোলন সোজাসুজি বলে দেয়।

"এমন কিছু গোপনীয় নয়—বাবা এবং মাকে একই সঙ্গে তোদের এখানকার রিপোর্ট দিয়ে দিলাম।"

"হুইস্কি-টুইস্কির কথা লিখিসনি তো? মা আবার যা সেকেলে," দোলন তার উদ্বেগ প্রকাশ করে।

"পাগল হয়েছিস! তবে লিখে দিলুম, তোমাদের বড় কন্যা এবং জামাতা যেখানে থাকে সে-এক রূপকথার দেশ। এবং সবচেয়ে যেটা গর্বের কথা, শ্যামলদা নিজের অধিকারে এবং চেষ্টায় এখানে স্থান করে নিয়েছে।"

"চেষ্টা বলে চেষ্টা! সায়েবরা দোকানদারের জাত, মুখ দেখে কাউকে কমারসিয়াল ম্যানেজার করে না। ওকে ওরা বড্ড খাটিয়ে নেয়।"

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দোলন বললো, "এই আজকের ব্যাপারটাই দেখ না। হিন্দুস্থান পিটারস্-এর সব সায়েবরা বাড়ি ফিরে এসেছে, একমাত্র তোর জামাইবাবু ছাড়া।"

কথার মধ্যেই জুতোর আওয়াজ পাওয়া গেল। রসিকতা করে শ্যামলেন্দু বললো, "হুম! পরচর্চা চলেছে মনে হচ্ছে!"

"পর নয়, আপনচর্চা চলছে, শ্যামলদা। বিষয়: হিন্দুস্থান পিটারস্-এর কমারসিয়াল ম্যানেজার মিস্টার চ্যাটার্জি যিনি কখনও সময়মতো অফিস থেকে বাড়ি ফেরেন না।" সুদর্শনা সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিলো।

"দিদি নিশ্চয় কমপ্লেন করেছে তোমার কাছে। কিন্তু কী করি বলো? দায়িত্ব জিনিসটা ঈশ্বর কেন যে সৃষ্টি করেছিলেন!" শ্যামলেন্দু সোফার ওপর বসে পড়লো।

"যে-পুরুষমানুষের দায়িত্বজ্ঞান নেই মেয়েরা তাকে পছন্দ করে না, শ্যামলদা।" সুদর্শনা জামাইবাবুকে মনোবল দেবার চেষ্টা করে।

কিন্তু দোলন সঙ্গে-সঙ্গে বাধা দেয়। "দায়িত্বের মতো দায়িত্ব হলে তো কথা থাকে না। সায়েবরা গল্ফ খেলার মাঠে সময় কাটাচ্ছে, রুণু সান্যাল পার্টি দিচ্ছে, চোপরা সায়েব তাসের জুয়ায় মেতে আছেন, আর তোর জামাইবাবু শুধু খেটেই চলেছেন। সেনগুপ্ত সায়েবের বউ অথচ আমাকে প্রায়ই বলেন, শুধু খেটে মার্চেন্ট অফিসে কেউ উপরে উঠতে পারে না।"

"বোকার মতো খাটলে হয় না; তার সঙ্গে বিদ্যাবুদ্ধি চাই," শ্যামলেন্দু সিগারেট ধরিয়ে বলে। "তা ছাড়া, আমার কখনো হেরে যেতে ইচ্ছে করে না। কাজ-কর্মে আমরা যে সাদা চামড়াদের থেকে নিরেস নই সেটা প্রমাণ করবার দায়িত্ব নতুন যুগের ইণ্ডিয়ান ম্যানেজারদের ওপর। আমরা যারা সাধারণ অবস্থা থেকে এই ব্লু হ্যাভেনের দশতলায় উঠে এসেছি তাদের প্রমাণ দিতে হবে, আমরা কারুর থেকে কম যাই না।"

"সত্যিই তো," জামাইবাবুর কথায় সায় দিয়ে সুদর্শনা বলে। "বাবা

আপনার কথাগুলো শুনলে খুব খুশী হতেন।"

চায়ের পর্বটা খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল। শ্যামলেন্দু আজ তেমন আড্ডা জমাতে পারলো না। শুধু দোলন বললো, "দুপুরে একটু পাড়া বেড়াতে বেরিয়েছিলাম টুটুলকে নিয়ে। মিসেস সান্যালের কাছেও গিয়েছিলাম।"

"কেমন বুঝলে, টুটুল ?" শ্যামলেন্দু জিজ্ঞেস করলো।

টুটুল উত্তর দিলো, "খুব সাজানো-গোছানো, শ্যামলদা। কিন্তু বাঙালী মহিলা নস্যি নিচ্ছে, সিগারেট খাচ্ছে, স্বামীকে নাম ধরে ডাকছে, মা দেখলে, মাথায় হাত দিয়ে বসবে।"

শ্যামলেন্দু একটু বিব্রত বোধ করলো। তারপর বললো, "প্রথম ' থম আমার এবং তোমার দিদিরও এসব খারাপ লাগতো। এখন সহ্য হয়ে গিয়েছে। আসলে, এদের সংস্কৃতিটাই অন্যরকম। বিলেত আমেরিকা থেকে আমদানি হয়ে, প্যাকিং না খুলেই এখানে চলে এসেছে।"

"তোর জামাইবাবু আগে এইসব নিয়ে খুব ভাবতো। শেষে আমি একদিন বকাবকি করলাম। কালচার-কালচার করেই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালীরা ব্যস্ত হয়ে রইলো, মাঝখান থেকে অন্যরা এসে বড-বড় চাকরিগুলো বাগিয়ে নিলো। আমি বলি যস্মিন্ দেশে যদাচার। সায়েবরা মাইনে দিচ্ছে, যা চাইবে তাই করতে হবে। আর দেখ না, সায়েবদের গালাগালি করা একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু কে আমাদের এত সুখে রাখতো ? দেশী মালিকদের তো দেখছি। তাদের নজর সবচেয়ে নিচু—প্রত্যেকটি অফিসারকে নিজের চাকর মনে করে।"

শ্যামলেন্দু আজ আর কথা বাড়ালো না। নিজের পডার টেবিলে গিয়ে বসলো।

সুদর্শনা ভেবেছিল শ্যামলদা এই সময় বই-টই পড়ে। কিন্তু সে দেখলো শ্যামলেন্দু সঙ্গে করে অফিসের ফাইল এনেছে।

একসময় যেভাবে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে শেক্সপীয়রের প্রতিটি লাইন পড়তো, এখন তেমনি নিষ্ঠার সঙ্গে এক্সপোর্ট কনট্রাকটের প্রতিটি শর্ত পরীক্ষা করে দেখছে শ্যামলেন্দু। বিরাট দলিল। প্রায় পঁচিশ-তিরিশ পাতা সিঙ্গল স্পেসে টাইপ করা। দোলনের বাবাকে মনে পড়ছে শ্যামলেন্দুর। শেক্সপীয়র পড়তে-পড়তে ভাল লাগলেই নানা রঙের পেন্সিলে দাগ দিতেন। এক-এক রঙের নাকি এক-একটা অর্থ আছে। শ্যামলেন্দুও এখন কনট্রাকটের কপিতে দাগ দিচ্ছে।

দূর থেকে দুই বোন শ্যামলেন্দুকে কাজে ডুবে থাকতে দেখে আর জ্বালাতন করলো না। ওরা দুজনে অন্য ঘরে গিয়ে নিজেদের প্রাণের কথা বলতে আরম্ভ করলো।

পরের দিন সকালে অফিসেও মিস্টার শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জির ঘরের সামনে লাল আলো জলতে দেখা গেল। অথচ ঘরের মধ্যে দ্বিতীয় কোনো প্রাণী নেই। নিবিষ্টমনে মিষ্টার চ্যাটার্জি একটা দলিল পড়ে যাচ্ছেন।

লাঞ্চের একটু পরেই মিসেস অ্যাণ্ডারসন দেখলেন, মিস্টার চ্যাটার্জি বেশ একসাইটেড হয়ে কোট না-পরেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

লাল আলোটা বড় সায়েবের ঘরের মাথায় আবার জ্বলে উঠলো। তারপর দুজনে কী যে আলোচনা হলো ভগবান জানেন।

আধঘণ্টা পরে শ্যামলেন্দু যখন বেরিয়ে গেল, তখন মিসেস ডিক এম-ডির ঘরে ঢুকেছিল। মিসেস ডিকের মনে হলো, লাঞ্চের আগে মিস্টার ফেরিসকে যতটা চিন্তিত দেখাচ্ছিল, এখন আর তেমন মনে হচ্ছে না।

শ্যামলেন্দু নিজের ঘরে না-ঢুকে পার্সোনেল অফিসার তালুকদারের ঘরে উঁকি মারলো। হরিহর তালুকদার এই অফিসে তেমন উন্নতি করতে পারেননি। তবে রুণু সান্যাল এবং শ্যামলেন্দু দুজনকেই তিনি খাতির করেন। কারণ তালুকদার জানেন, এই দুটো খুঁটির একটাই শেষ পর্যন্ত বোর্ডরুমে গিয়ে পৌছবে। তখন কাজে লাগতে পারে এরা।

"আসুন, মিস্টার চ্যাটার্জি, কি সৌভাগ্য আমার," হরিহর অভ্যর্থনা জানালেন।

"এলুম আপনাদের একটু খোঁজখবর করতে।"

অনেকক্ষণ কাজের কথার পর শ্যামলেন্দু ফ্যাকটরির খবর জানতে চাইলো। "এখন ফ্যান কারখানায় কত লোক কাজ করে?"

তিতি-বিরক্ত হরিহর বললেন, "আটশ' লোক মাত্র—কিন্তু আমার এক-এক সময় মনে হয় আট কোটি। পৃথিবীতে যত রকম সমস্যা আছে তার নমুনা আমাদের ফ্যাকটরিতে পাবেন। কী করে যে সামলে রেখেছি ভগবান জানেন।"

"আপনার মতো অভিজ্ঞ লোক রয়েছে এটা আমাদের সৌভাগ্য," হরিহরকে চাঙ্গা করার জন্যে শ্যামলেন্দু উত্তর দেয়।

"কোম্পানি সেটা অ্যাপ্রিসিয়েট করে না স্যার। তাহলে আমাকে এতদিনে কভেনেণ্টেড ম্যানেজার করে দিতো।" হরিহর মনের দুঃখ চেপে রাখতে পারেন না।

শ্যামলেন্দু চুপ করে থাকে। তালুকদার বললেন, "আপনি বাঙালী বলেই

দুঃখ করছি। আমরা ল্যাম্প ফ্যাক্টরি আর ফ্যান ফ্যাক্টরি মানিকজোড়ের নাম দিয়েছি হিরোশিমা নাগাসাকি।”

“তার মানে।”

“সত্যি কথা বলবো স্যার? এটম বোমার কেস।” তালুকদার হা-হা করে হেসে ফেললো।

শ্যামলেন্দু হাসতে পারলো না। তালুকদার লজ্জিত হয়ে বললেন, “কিছু মনে করলেন না তো স্যার—আপনি বেঙ্গলি বলেই বললাম। আমার অবস্থা দেখুন, ফ্যান ফ্যাকটরিতে তিনটে ইউনিয়ন। ‘ক’ ইউনিয়ন যদি উত্তর দিকে যাবে বলে, ‘খ’ ইউনিয়ন বলবে দক্ষিণ দিকে যাবো। ‘গ’ ইউনিয়ন তখন সুযোগ বুঝে আকাশে চাঁদ ধরতে চাইবে। তারপর আছে কোম্পানি-পরিচালিত লেবার ক্যানটিন। বাড়িতে বউ শাক-চচ্চড়ি যা দেবে ঘাড়গুঁজে মেনিবেড়ালের মতো সুড়-সুড় করে খেয়ে নেবে, অথচ কারখানায় নবাব খাঞ্জা খাঁ পান থেকে চুন খসলেই ডিমনেস্ট্রেশন।”

শ্যামলেন্দু তারপর ঘরে ফিরে চুপচাপ বসে আছে। পাঁচটা বাজলো বলে। মিসেস অ্যাণ্ডারসন হন্তদন্ত হয়ে এসে বললেন, “ফ্যাকটরি ক্যানটিনে যারা মাল সাপ্লাই করে তাদের নাম ঠিকানাগুলো চেয়েছিলেন, এই নিন।” শ্যামলেন্দু দেখলো—মাছ, তরকারি, তেল, ডিম সমস্ত সাপ্লায়ারেরই নাম ও ঠিকানা রয়েছে।

ঘড়ির ছোট কাঁটা ইতিমধ্যেই পাঁচটার ঘরে ঢুকে পড়েছে! কিন্তু শ্যামলেন্দু উঠলো না। আজ পাঁচ তারিখ। পনেরো তারিখ হতে আর বেশি সময় নেই। পনেরো তারিখটা যেন ক্রমশ বড় হচ্ছে! অক্ষর দুটো বড়-বড় হতে-হতে যেন সমস্ত ক্যালেণ্ডারটাকে গ্রাস করে ফেলেছে। অক্ষরেরও তাহলে ক্যানসার হয়। ক্যানসার না-হলে কী করে এত বেড়ে যাচ্ছে টিউমারের মতো!

দোলন ও সুদর্শনা সেজে-গুজে বসে আছে। ঘন-ঘন ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে দোলন। মিস্টার ফেরিসের বাড়িতে আজ ককটেল আছে।

“তোর শ্যামলদার কাণ্ডটা দেখ,” দোলন বোনের কাছে অভিযোগ করে।

“তোর বর, তুই দেখ!” সুদর্শনা হেসে উত্তর দিলো।

দশতলা থেকে উঁকি মারলে নিচে গাড়িগুলো দেখা যায়। মিস্টার-মিসেস

সান্যাল, মিস্টার-মিসেস চোপরা, রাও, ভার্গিজ সবাই একে একে বেরিয়ে গেল। ভার্গিজ অবশ্য একা গেল, ওর ওয়াইফ প্রেগনেন্ট।

দোলন যখন প্রায় আশা ছেড়ে দিতে বসেছে তখন শ্যামলেন্দু হন্তদন্ত হয়ে ফিরলো। বললো, "এক্সট্রিমলি স্যরি।"

"ওই একটা ইংরিজী কথা শিখে রেখেছো—সব রোগে পেনিসিলিনের মতো চালিয়ে যাচ্ছ," দোলন বেশ বিরক্ত হয়ে উত্তর দিলো।

"দায়িত্ব জিনিসটা বড় খারাপ দোলন।"

দোলন ঠোঁট বেঁকালো। "দায়িত্ব তোমার একার—ম্যানেজিং ডিরেকটরের নয়, ফিনানস ডিরেকটরের নয়, মিস্টার মূর্তির নয়, চোপরার নয়, রুণু সান্যালের নয়।"

"দেবী, মার্জনা ভিক্ষা করছি," শ্যামলেন্দু হাত জোড় করে হাসতে-হাসতে বললো।

"অফিসে ছবার টেলিফোন করেছি, তোমার ঘরে ডাইরেক্ট নম্বরে। কোনো সাড়া নেই," দোলন বললো।

সুদর্শনা বললো, "দিদির শুধু চিন্তা মিসেস অ্যাণ্ডারসনকে নিয়ে! আমরা তো ভাবছি আজকে এম-ডিকে বলবো ওঁর বদলে দিদিকেই বসাতে।"

শ্যামলেন্দু বললো, "খুব ভাল আইডিয়া।" তারপর কথা না বাড়িয়ে, সট করে ভিতরে ঢুকে গেল। "জাস্ট তিন মিনিট।"

খুব তাড়াতাড়িই তৈরি হয়ে বেরিয়ে এলো শ্যামলেন্দু। কিন্তু দোলন স্বামীর-ড্রেস দেখে আঁতকে উঠলো। "উঃ! আর পারা যায় না। লাউঞ্জ স্যুট পরলে কি বলে? কার্ডটা দেখো, ড্রেস ফর্মাল।"

"ভেরি স্যরি, ভুলে গিয়েছিলাম," বলে শ্যামলেন্দু আবার ডিনার জ্যাকেট পরতে ভিতরে চলে গেল।

"ড্রেস কী দিদি? কি পরে আসতে হবে তাও কর্তারা হুকুম দেয় নাকি?"

"নিশ্চয়। ম্যানেজিং ডিরেকটরের পার্টিতে যাচ্ছে—এটা ইয়ারকি নয়। সেবারে পাণ্ডে বলে একটা লোক ডিনার স্যুট পরে আসেনি বলে চাকরি গেল। তখন এম-ডি ছিলেন বোয়লান সায়েব। লর্ড ফ্যামিলির ছেলে, ম্যানারের অভাব বরদাস্ত করতে পারতেন না!"

শ্যামলেন্দু এবার বেরিয়ে এলো ডিনার জ্যাকেট পরে সাদা কোট, কালো বো টাই, কালো প্যান্ট। প্যান্টের ছধার দিয়ে ছটো দাগ নেমে গিয়েছে। প্যান্টের তলায় ফোল্ড নেই। সঙ্গে ছুঁচলো কালো পেটেন্ট লেদারের জুতো! দেখে তো সুদর্শনার হাসি চেপে রাখা দায়।

"হাসিতেছ কেন, শ্যালিকা সুন্দরী?" শ্যামলেন্দু প্রশ্ন করে। ৯৬

"আপনাদের পাটনাতে জয়সোয়ালরা একবার বিয়েতে ব্যাণ্ড পার্টি নিয়ে গিয়েছিল। যে-লোকটা বিরাট একটা ড্রাম পিঠে বইছিল, সে এই রকম ড্রেস পরেছিল," টুটুল বলে ফেলে।

"রসিকতা!" শ্যামলেন্দু চোখ বড়-বড় করলো।

গাড়িতে বসে টুটুল বললো, "আপনাদের মিসেস ফেরিস কিন্তু খুব ভাল মানুষ। আমি এখনও কলকাতায় আছি শুনে নিজে টেলিফোন করে আমাকে আসতে বললেন, অথচ আমি তো অফিসের কেউ নই।"

"নয় মানে? অফিসের শ্যালিকা বলে কথা," শ্যামলেন্দু পরিবেশটা হাল্কা করার চেষ্টা করে।

"অফিসের শ্যালিকা হতে যাবো কোন দুঃখে? আমি আপনার শ্যালিকা," টুটুল উত্তর দেয়।

দোলনের রাগ পড়েছে এবার বোঝা গেল। সে জিজ্ঞেস করলো, "সোনালি বুটি দেওয়া বেনারসী শাড়ি পরে শ্যালিকাকে কেমন দেখাচ্ছে বললে না তো?"

চোখ বড়-বড় করে শ্যামলেন্দু উত্তর দিলো, "তোমার সামনে বলতে সাহস হচ্ছে না, মনের ভাব আড়ালে নিবেদন করবো!"

"ইয়ারকি ছাড়ুন। দিদিকে কী মিষ্টি দেখাচ্ছে বলুন তো—এখনই আবার বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে দেওয়া যায়। দিদির সম্বন্ধে কিছু মতামত দিন," সুদর্শনা সমস্ত পরিবেশটা আনন্দোচ্ছল করে তুললো।

ড্রাইভ করতে-করতে শ্যামলেন্দু বললো, "বলতে পারি—যদি তোমার দিদি অনুমতি দেন।"

"দিদির হয়ে আমিই অনুমতি দিচ্ছি, মশাই," সুদর্শনা সঙ্গে-সঙ্গে জানিয়ে দিলো।

শ্যামলেন্দু বললো, "নিজের ভাষায় কুল পাচ্ছি না। তাই কবির ভাষায় বলছি:

তুমি মোর অবন্তীর প্রিয়া!
হেমচম্পক বরণী—
তুঙ্গপীন পয়োধর কাঁচলি
আঁটিতে নাহি পারে,
অলস মন্থর গতি বিপুল
জঘন-গুরুভারে
ইন্দীবর আঁখিকোণে মদালস
ভঙ্গুর চাহনি।"

লজ্জায় গাল রাঙা হয়ে উঠলেও সুদর্শনা মিট-মিট করে হাসতে লাগলো। বোনের সামনে অপ্রস্তুত হয়ে দোলন রেগে গিয়ে বললো, "একেবারে ঠেলে ফেলে দেবো। মার্চেন্ট অফিসের লোকগুলো বড্ড অসভ্য হয়, জানিস টুটুল।"

"কার লেখা শ্যামলদা?" টুটুল জিজ্ঞেস করে।

"আন্দাজ করো।"

"রবীন্দ্রনাথের?"

"শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। এক সময় খুব পড়তাম। মার্চেন্ট অফিসের ফেরিওয়ালা হয়ে এখন সব জলে গিয়েছে। এখন শুধু স্মৃতিশক্তির ওপর বেঁচে আছি। পুরানো দিনে যা পড়েছিলাম তার থেকে কোটেশন দিয়ে চালাই।"

ম্যানেজিং ডিরেকটরদের বাড়ির সামনে উঁচু পাঁচিলঘেরা লন। নরম কচি সবুজ ঘাসের কার্পেট পাতা রয়েছে যেন লনটায়। লনের চারিদিকে ছোট-ছোট জোনাকির মতো রঙীন আলো। আলোগুলোও কেমন নরম-নরম। রুণু সান্যালের লাইট ডিভিসনের বিশেষজ্ঞরা বহু মাথা ঘামিয়ে এই আলোক-সজ্জার ব্যবস্থা করেছেন। রুণু বলে, "ককটেল পার্টির লাইট আলো দেবার জন্যে নয়, শুধু অন্ধকারকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্যে। নরম মিষ্টি আলো মানুষকে অন্তরঙ্গ হবার সুযোগ দেয়।"

এম-ডির বাড়িতে এই আলোকসজ্জা সম্পর্কেই বোধহয় রুণুর সঙ্গে মিসেস ফেরিসের আলাপ-আলোচনা চলছিল। অনেক অতিথিই এসে গিয়েছেন। শ্যামলেন্দুকে দেখে সস্ত্রীক মিঃ ফেরিস একটু এগিয়ে এলেন এবং করমর্দন করলেন। টুটুলকে বেশ খাতির করলেন মিসেস ফেরিস। বললেন, "তুমি যে আসতে পেরেছ এর জন্যে আমি খুব আনন্দিত।"

ভিড়ের মধ্যে শ্যামলেন্দু কোথায় হারিয়ে গেল। একটা টমাটো জুসের গেলাস নিয়ে টুটুল জিজ্ঞেস করলো, "শ্যামলদা বেশ লোক তো! কোথায় কেটে পড়লো?"

দোলন বললো, "পার্টিতে এই নিয়ম। বউ-এর আঁচল ধরে ঘুর-ঘুর করলে সকলে হাসাহাসি করে। বলে, গৃহিণী কিছু হারিয়ে যাচ্ছে না। এখন মন দিয়ে ড্রিংক করো।"

রুণু এবার সামনে এসে দাঁড়ালো। মিসেস চোপরাও একটা হুইস্কির গেলাস নিয়ে হাজির হলেন। মিসেস চোপরাকে রুণু বললো, "আমাদের দিকে একটু নজর দিন মিসেস চোপরা। আপনাকে ওয়াণ্ডারফুল দেখাচ্ছে।"

"কাঁচা মিথ্যে কথাগুলো কেন বলছেন, মিস্টার সান্যাল!"

"হাইকোর্টের জজের সামনে এফিডেভিট করে বলতে পারি, হানড্রেড ওয়াট পিটারস্ ল্যাম্পের মতো ব্রাইট ঝক্‌ঝকে দেখাচ্ছে আপনাকে। দাঁড়ান, চোপরা সায়েবকে ডেকে আনছি। আমি যা বলছি, মিস্টার চেপরার নজরে তা পড়েনি, হতেই পারে না।"

চোপরা সায়েবকে এবার সত্যিই পাকড়াও করে আনলো রুণু। বললো, "চোপরা সায়েব, আপনার স্ত্রীর সৌন্দর্য যে সম্প্রতি বৃদ্ধি পেয়েছে, এটা আপনি নোটিশ করেননি, তা কেমন করে হতে পারে?"

আনন্দে বিগলিত মিসেস চোপরা বললেন, "তাহলে সত্যি কথা বলছি, লাস্ট ছ'সপ্তাহ মিড্‌লটন রোতে যে নতুন ফিগার সেলুন হয়েছে ওখানে যাচ্ছি। ওখানকার মিসেস কাউর আমার অনেকদিনের জানাশোনা—লণ্ডন থেকে বিউটি ডিপ্লোমা নিয়ে এসেছে। খুব রিজনেবল্ রেট—আধঘণ্টা সেশনের জন্যে মাত্র কুড়ি টাকা।"

"চোপরা সাহেব খরচে নিশ্চয় কোনো আপত্তি করছেন না। অথচ অফিসের খরচের ব্যাপারে আমাদের সকলকে চেন দিয়ে বেঁধে রেখেছেন। মিসেস চোপরা, আপনার স্বামীর কাছে আমাদের সম্বন্ধে একটু রেকমেণ্ড করে দিন। অফিসে উনি যেন হাতে মাথা না কাটেন!"

রুণু সান্যালের কথা শুনে মিস্টার চোপরা সমেত সবাই হেসে ফেললো।

চোপরা দম্পতি এবার ফিনানস ডিরেকটর গর্ডনের দিকে সরে গেলেন। মিসেস সান্যাল দূর থেকে মিসেস চোপরাকে দেখে মন্তব্য করলেন, "ভদ্রমহিলার হলো কী? গতবারের পার্টিতে যে ভায়োলেট রঙের শাড়িটা পরে এসেছিলেন এবারেও সেটা পরেছেন! না-হয় এম-ডির ফেভারিট রঙ ভায়োলেট।"

উপস্থিত মহিলাবৃন্দের অনেকেই এটা লক্ষ্য করেছেন। টুটুল তো অবাক। মিসেস সান্যালের স্মৃতিশক্তির প্রশংসা না করে পারা যায় না। দোলন ফিস-ফিস করে বোনকে বললো, "এই পার্টিগুলো অফিসারদের পরীক্ষা। কে কত-খানি সামাজিক তা কর্তারা বাজিয়ে দেখেন। বউরা, সেই পরীক্ষায় যতখানি পারে স্বামীদের সাহায্য করে।"

"কিন্তু দিদি, কে কোথায় কবে কোন শাড়ি পরে এসেছে তা মনে রাখবে কী করে?" টুটুল জিজ্ঞেস করে।

"যাদের একটু উচ্চাশা আছে, যারা তাড়াতাড়ি উন্নতি করতে চায়, তাদের বউদের স্পেশাল নোট বই রাখতে হয়। তাতে কোন বড় কর্তার সঙ্গে কবে কোথায় সামাজিক ভাবে দেখা হলো লিখে রাখতে হয়, এবং সেই 'অকেশনে' শাড়ির এবং ব্লাউজের কী রঙ ছিল তা নোট করতে হয়, যাতে রিপিট না হয়।"

"বলিস কী দিদি!" টুটুল নিজের বিস্ময় চেপে রাখতে পারে না। দোলন বলে, "সেই নোট বইতে, নিজের বাড়িতে কোনো পার্টি দিলে, তার মেনু এবং অতিথিদের নামও লিখে রাখতে হয়। মনে কর, ডেভিডসন সায়েব ঝুনুদের বাড়িতে একবার ডিনারে গিয়ে মুলিগটানে স্যুপ, তন্দুরি চিকেন এবং নান খেয়েছেন, শেষে ফ্রুট স্যালাড। পরের বারে যদি ডেভিডসন খেতে আসেন তখন যাতে একই খাবার না হয় তার জন্যে সাবধান হতে হবে। তারপর ধর, মিসেস গর্ডনের চিংড়ি মাছে এলার্জি; অথচ মিস্টার গর্ডন চিংড়ি মাছ খেতে ভালবাসেন। ফলে তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে, মিস্টার গর্ডনকে যখন নেমন্তন্ন করেছো তখন মিসেস গর্ডন বিলেতে রয়েছেন কিনা।"

"দিদি তুই আর বলিস না, আমার মাথা ঘুরছে। পাটনার সমস্ত বান্ধবীদের বলে দেবো, তাদের পক্ষে কভেনেণ্টেড অফিসারদের বউ হবার কোনো চান্স নেই। এর জন্যে চাই স্পেশাল ট্রেনিং।"

"দূর বোকা, মেয়েরা চাপে পড়লে পারে না এমন কোনো কাজ নেই। সময় মতো সব ঠিক হয়ে যায়। শুধু শেখবার আগ্রহ থাকা চাই।" দোলন বোনকে আশ্বাস দেয়।

মিসেস সেনগুপ্ত এবার ওদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। বেচারার মুশকিল অনেক। ইংরিজী তেমন জানেন না। বর্ষীয়সী ভালমানুষ মহিলা পার্টিতে এসে বেশ অস্বস্তি বোধ করেন। দোলনদের দলে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। বললেন, "ইংরিজীটা না-শিখে যে কী ভুলই করেছি। এদের কাছে মান-সম্মান থাকে না।"

টুটুল বললো, "মাসিমা, আপনি এ-কথা বলছেন কেন? আপনি যে দেশের লোক সেখানকার ভাষা জানেন তো? জাপানী বউরা কি ইংরিজী জানে না বলে লজ্জা পায়!"

দোলন বললো, "মিসেস সেনগুপ্তর অসুবিধাটা আমি বুঝি। জানিস টুটুল, ইণ্ডিয়া কোনোদিন জাপান হবে না!"

"হলে সুবিধেই হতো, দিদি। আচ্ছা-আচ্ছা আমেরিকান, ইংরেজ, জার্মান আমাদের ভাষা জানে না বলে ক্ষমা চাইতো," টুটুল সোজাসুজি উত্তর দিলো।

মিসেস সেনগুপ্ত বললেন, "আমরা দুজনে একটু আলাদা ধরনের মানুষ। ছেলেদের পড়াশোনায় ক্ষতি হবে বলে বেশি পার্টিতে আসি না।"

দোলন বললো, "মিস্টার সেনগুপ্ত এসব এড়িয়ে চলবার সাহস রাখেন, কারণ উনি নিজের সাবজেক্টটা খুব ভাল জানেন। আর কোম্পানি আইনকে কো'ন সায়েব না ভয় করে? কিন্তু বাকি সকলের কথা আলাদা। তাদের

কাজও করতে হবে এবং মন যুগিয়েও চলতে হবে। এটাই মার্চেন্ট অফিসের অলিখিত নিয়ম।”

টুটুল বলে, “কাজ করবো। কিন্তু মন যোগাবো কোন দুঃখে ?”

“এই জন্যেই তো বাঙালীরা মরে,” মিসেস সেনগুপ্ত জানালেন, “বেশির ভাগ বাঙালী এত সেন্টিমেণ্টাল যে চাকরিও করবে অথচ চাকরির এই দিকটা দেখবে না।”

দোলন বললো, “নতুন কোনো সায়েব এলে সবাই চিন্তায় পড়ে যায়। কী খেতে ভালবাসেন, কী রঙ পছন্দ করেন, কোন-কোন বিষয়ে আগ্রহ।”

“তাতে তোমাদের কী দরকার ?”

“বা রে! পার্টিতে আমাদের কর্তারা কোন-কোন বিষয়ে আলোচনা করবে ?”

দোলন বললো, “আগেকার এম-ডি মিস্টার বোয়লান, ওঁর ছিল আর্কিটেকচারে আগ্রহ। মার্চেন্ট অফিসের লোকরা আর্কিটেকচারের কী বুঝবে ? কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে অনেক দামী-দামী বই কিনে, ইণ্ডিয়ার মন্দির স্থাপত্য সম্বন্ধে পড়াশোনা আরম্ভ করলো। মুশকিল হলো আবার মিস্টার ফেরিস এলেন। ওঁর যে কী বিষয়ে আগ্রহ তা কিছুতেই জানা যাচ্ছিলো না। সকলে বেশ দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছিল। এমন সময় দেখি মিস্টার এবং মিসেস জৈন আমাদের এম-ডির সঙ্গে কুকুর সম্বন্ধে আলোচনা করছেন। জৈনদের আটতলার ফ্ল্যাটে গিয়ে দেখি কুকুরের সম্বন্ধে তিন-চারখানা বই টেবিলের ওপরে রয়েছে। অথচ ওঁরা কোনো বইপত্র কেনেন বলে জানতাম না। মিসেস জৈন আমার বিশেষ বান্ধবী। ওঁকে চেপে ধরলাম। বেচারা তখন আমাকে খুব গোপনে বললেন, মিস্টার এবং মিসেস ফেরিস দুজনেই কুকুরে আগ্রহী। বললুম, জানলেন কী করে ? মিসেস জৈন জানালেন, অনুসন্ধানের মতলবটা ওঁর বোনের স্বামী দিয়েছে, ‘একটু সুযোগ পেলেই এম-ডির বাড়িতে একবার টয়লেটে যেতে চাইবে। মেয়েরা টয়লেটে যেতে চাইলে সাধারণতঃ গৃহস্বামীর শোবার ঘরের লাগোয়া বাথরুমেই নিয়ে যাওয়া হয়। শোবার ঘরের ভিতর দিয়ে যাবার সময় টুক করে দেখে নেবে বিছানার মাথার গোড়ায় কী-কী বই আছে। সায়েবরা তাঁদের ফেভারিট বইগুলো এখানে রাখে।’ এরপর সোজা ব্যাপার। মিসেস জৈন ফেরিসদের বেডরুমে তিন-চারখানা কুকুর সংক্রান্ত বই দেখলেন।”

মিসেস সেনগুপ্ত বললেন, “ওমা ? তাই বলি হিন্দুস্থান পিটারস্-এর অফিসার মহলে হঠাৎ এত কুকুর সম্পর্কে আগ্রহ বাড়ল কেন ?”

এবার কথায় বাধা পড়লো, খোদ মিসেস জৈন এসে দলে যোগ দিলেন।

তার একটু পরেই এলেন মিস্টার গর্ডন। মিসেস জৈনের মুখের সিগারেটে আগুন ধরিয়ে দিলেন মিস্টার গর্ডন। বললেন, আজকের ওয়েদার খুবই সুন্দর। তিনি প্রতি মুহূর্তে এনজয় করছেন, আশা প্রকাশ করলেন সুন্দরী মহিলারাও এখানে আনন্দ পাচ্ছেন।

গর্ডন সায়েবকে দেখেই অ্যাকাউন্টসের জনার্দনম হাজির হলেন। "কেমন আছো জনার্দনম ? গর্ডন জিজ্ঞেস করেন!

"ভালই আছি, মিস্টার গর্ডন। কিন্তু আমাদের নতুন ইনভয়েসিং সিস্টেম নিয়ে একটু গোলমালে পড়ে গিয়েছি।" এই বলে জনার্দনম ইনভয়েস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আরম্ভ করতে যাচ্ছিলেন। দেখাতে চান অফিস সম্বন্ধে তিনি কত ভাবেন।

কিন্তু গর্ডন সায়েব পিছলে বেরিয়ে গেলেন। রসিকতা করে বললেন, "অফিসের বাইরে অফিস সংক্রান্ত আলোচনায় আমার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু তার জন্যে আমি মিনিটে দশ টাকা চার্জ করে থাকি।"

জনার্দনম তখন বললেন, "তাহলে কালকেই আপনার সঙ্গে দেখা করবো।"

"যখন খুশী। আমার সেক্রেটারীকে একটু টেলিফোন করে জেনে নিও ফ্রি আছি কিনা।" গর্ডন উত্তর দিলেন।

সায়েবরা না-চাইলেও ইণ্ডিয়ানরা পার্টিতে প্রাণ খুলে অফিসের কথা আলোচনা করে যাচ্ছেন। অফিসের বাইরে ঘোড়ার মাঠ ছাড়া আর কোনো কিছুর সঙ্গে তেমন পরিচয় নেই এঁদের অনেকের। গৃহিণীরা অবশ্য আলোচনা করছেন বাজার দর সম্পর্কে। দেশী প্রসাধন সামগ্রীর খারাপ কোয়ালিটি সম্পর্কে। কয়েকজন এর মধ্যে ইংরিজী ফিল্ম সম্পর্কেও কথা তুলেছেন। আর বিষয় হলো সার্ভেন্ট। কলকাতা শহরের সার্ভেন্টগুলো যা নবাব হয়ে উঠেছে শেষ পর্যন্ত হবে কী! গৃহভৃত্যরা যে গোল্লায় যাচ্ছে এ সম্বন্ধে গৃহিণীদের মধ্যে কোনোরকম মতদ্বৈধ নেই।

মিস্টার মিঠু সেন বোধহয় একটু বেশি হুইস্কি টেনে ফেলেছেন! মহিলাদের কাছে এসে বললেন, "মিসেস চ্যাটার্জি, আজকে যে কার মুখ দেখে উঠেছি, সকাল থেকেই গালাগালি খাচ্ছি। এজেন্সীর মিস নারগোলওয়ালার সঙ্গে একটু ক্রিয়েটিভ আলোচনার জন্য দুপুরবেলায় লা-ভেগা বার-এ গিয়েছিলাম। সেখানে খোকন বাসু আর্টিস্ট মাল টানছিল। নেশার ঘোরে খোকন বাসু বলে কী জানেন? বস্তির ছোটলোকদের আগে যেসব গুণ ছিল, এখন ফ্ল্যাটবাড়ির হাই-অফিসাররা সেইগুলো পেয়েছেন। যেমন ছোটলোকেরা লেখাপড়া করতো না, গালাগালি দিতো, সারাক্ষণ ড্যাংগুলি খেলে বেড়াতো, মদ খেয়ে

বেসামাল হতো এবং বউকে মারতো। খোকন বাসুর এত বড় আস্পর্ধা যে চীৎকার করে বললো, এখন এই নিউ ইণ্ডাসট্রিয়াল সোসাইটিতে কোট-প্যাণ্ট পরা লোকগুলোও ঠিক তাই করে। মিস নারগোলওয়ালা আমাকে থামিয়ে দিলেন তাই, না-হলে আজ হাতাহাতি হয়ে যেতো। অফিসেও মিস্টার চ্যাটার্জি এক্সপোর্ট বিজ্ঞাপনটা পাস করলেন না। এখানেও আমার দিকে আপনারা কেউ তাকাচ্ছেন না। তার ওপর পাঞ্জাবী ওয়াইফও এই ভিড়ের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গিয়েছে খুঁজে পাচ্ছি না!"

মিঠু সেনের মত্ত অবস্থা দেখে দোলনের বোধহয় মায়া হলো। বললো, "আপনার বউকে খুঁজে দিচ্ছি। একটু আগেই মিস্টার সান্যালের সঙ্গে কথা বলছিলেন উনি। এক্সপোর্ট বিজ্ঞাপনের ব্যাপারটা আমি ঠিক জানি না, তবে আমার স্বামীকে জিজ্ঞেস করবো'খন। আর আপনার লা-ভেগা বার-এর খোকন বাসু লোকটা সত্যিই অসভ্য, দুনিয়ার এত লোক থাকতে শুধু হাই অফিসারদের দোষ খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাকে বলবেন, হিংসেটা একটু কমাও। হিংসে করে বলেই, আমাদের জাতের কিছু হচ্ছে না।"

সাড়ে-দশটা নাগাদ ওরা ককটেল থেকে বেরিয়েছিল। গাড়িতে বসে দোলন জিজ্ঞেস করলো, "টুটুল তোর কেমন লাগলো?"

"মনে হচ্ছিলো আমি তখন ভারতবর্ষে নেই। অনেক দূরে, বিলেত কিংবা আমেরিকায় চলে গিয়েছি।" টুটুল গম্ভীর হয়েই উত্তর দিলো।

"তোমার সহকর্মীদের বউদের অনেক গুণ—দেখতে সুন্দরী, মদ খেতে পারে, বাজনার তালে-তালে নাচতে পারে," দোলন স্বামীকে বললো।

শ্যামলেন্দু হাসলো। টুটুল জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা দিদি, তোমাদের মিস্টার ফেরিস, মিস্টার গর্ডন, মিস্টার মূর্তি এদের ঘিরে সবাই এত গদগদ হচ্ছিলো কেন?"

"বাঃ, ডিরেকটর যে। তুমি তুষ্টে জগৎ তুষ্ট!"

"আপনাদের সেই শর্মাকে তো দেখালেন না শ্যামলদা! যে বাড়িতে পার্টির দিনে প্রেস্টিজ নষ্ট হবার ভয়ে বুড়ো কেরানি বাবাকে ঘরে তালা দিয়ে রেখেছিল," টুটুল জিজ্ঞেস করলো।

"ছিল তো। ছিনে জোঁকের মতো এম-ডির গায়ে শর্মা লেগে ছিল সারাক্ষণ," শ্যামলেন্দু বললো।

"বাবাকে তালা বন্ধ করে রাখা, মাকে আয়া বলে ইংরিজীতে পরিচয় দেওয়া অনেকেই করে—ধরা পড়ে গেছে বেচারা শর্মা একা," দোলন যোগ করলো।

প্রসঙ্গ পাল্টে গেল। দোলন বললো, "তোমার কী হলো আজ? পার্টিতে ঢুকলে হাসিমুখে, তারপর একবার ফেরিসের সঙ্গে এককোণে গিয়ে গুজগুজ করলে এবং মুহূর্তের মধ্যে ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেলে। মনে হলো কিছুই তোমার ভাল লাগছে না।"

"কই? না তো।" শ্যামলেন্দু প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গিয়ে ড্রাইভ করতে লাগলো।

অফিসে সকাল থেকেই কাজের মধ্যে ডুবে ছিল শ্যামলেন্দু। কিন্তু মাঝে-মাঝে ওই পনেরো তারিখটার দিকে নজর পড়ে যাচ্ছিলো, যেদিন রাত বারোটার পরেই কোম্পানিকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

কিন্তু অফিস দেখে সে কথা কে বুঝতে পারবে? বড সায়েবের পার্টিতে গতকালের আনন্দোৎসব ও ডান্স দেখে কে বলবে হিন্দুস্থান পিটারস্-এর সামনে বিরাট একটা সমস্যা আছে—পনেরো তারিখে টাইম বোমার মতো সেটা ফেটে পড়ে এই কোম্পানির ভিৎ নড়িয়ে দেবে।

বিকেল তিনটের সময় হরিহর তালুকদার বেশ চিন্তিত মুখে এম-ডির ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। করিডর দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে হরিহরের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। দুয়ে আর দুয়ে যোগ দিয়ে চার হচ্ছে।

শ্যামলেন্দুর ঘরে ঢুকে হরিহর বসে পড়লেন। এই এয়ার কণ্ডিশনেও হরিহরের টাকে ঘাম জমতে দেখে শ্যামলেন্দু বুঝলো ভদ্রলোক উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। শান্তভাবে শ্যামলেন্দু বললো, "বসুন মিঃ তালুকদার। আপনাকে এত ভাবিত দেখাচ্ছে কেন?"

"বেশ বিপদ স্যার। ফ্যাকটরিতে সিরিয়াস টেনসন। দুপুরে খাওয়ার সময় ক্যানটিনে গোলমাল শুরু হয়েছে—মাছের টুকরোর সাইজ নাকি ছোট দিয়েছিল। আমাদের তো দমকল বাহিনীর কাজ, খবর পেয়েই ছুটেছিলুম—আমার আজ লাঞ্চ হলো না।"

শ্যামলেন্দু দুঃখ প্রকাশ করলো, জানতে চাইলো ফিরে এসে হরিহর কিছু খেয়েছেন কিনা।

"আরে খাওয়া! ওয়ার্কারদের অ্যাটিচুড আমার ভাল মনে হলো না। তাই ফ্যান কারখানা থেকে ফিরেই এম-ডির কাছে রিপোর্ট দিতে গিয়েছিলাম। কিন্তু বড় সায়েব সাফ বললেন, এখন উনি ব্যস্ত থাকবেন—ফ্যান ফ্যাকটরির

সব ব্যাপার যেন আপনার কাছে রিপোর্ট করি। আপনাকে এইরকম কিছু বলছেন নাকি?"

"হ্যাঁ, হুকুমটা পেয়ে গিয়েছি," শ্যামলেন্দু গম্ভীরভাবে উত্তর দিলো।

প্রচণ্ড হতাশায় মুষড়ে পড়লেন হরিহর তালুকদার। দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, "সারা জীবন এম-ডির ডাইরেক্ট আণ্ডারে কাজ করেছি। রিটায়ার হবার দেড় বছর আগে আমার কপালে এই শাস্তি ছিল—কিছু মনে করবেন না স্যার, আপনি বাঙালী বলেই নিজের দুঃখের কথা বলছি। আফটার অল, বাঙালী কখনও বাঙালীর মাংস খেতে পারে না।"

সত্যি ভেঙে পড়েছেন তালুকদার। ওঁকে চাঙ্গা হয়ে ওঠবার সময় দিলো শ্যামলেন্দু। তালুকদার বললেন, "এ-সম্বন্ধে কোনো অফিস অর্ডার বেরুচ্ছে নাকি, স্যার?"

"এখন কিছু হচ্ছে না। আপনি চিন্তা করবেন না," শ্যামলেন্দু উত্তর দেয়।

"আমরা স্যার ব্রিটিশ আমলের লোক। ডিসিপ্লিনড্ সোলজার। আপনি আমাকে আর যাই বলুন, কখনও ওবিডিয়েণ্ট নই এ-কথা বলবার সুযোগ পাবেন না।"

"বলুন এবার ফ্যাকটরির কথা।" শ্যামলেন্দু কয়েকটা চিঠি সই করতে-করতে প্রশ্ন করলো।

"ওই বলছিলুম—মাছের সাইজের ব্যাপার। আমাকে দেখে ওয়ার্কাররা অকথ্য ভাষায় গালাগালি করলো। বাবা নাম দিয়েছিলেন হরিহর, আর ওরা কী বললো জানেন? হাড়হারামজাদা তালুকদার।"

"অবস্থাটা লক্ষ্য করে যান। হয়তো একদিনের ব্যাপার, কালকেই সব ঠিক হয়ে যাবে," শ্যামলেন্দু গম্ভীরভাবে বললো।

"তাই হোক। আপনাকে সব সময় পিকচারে রেখে যাবো। তবে রামলিঙ্গম আগেই বলেছিল—ভেনাস মকরে প্রবেশ করছে, রবি আমার পক্ষে মোটেই মঙ্গলকারক নয়। বুধ ও শনি পাওয়ারফুল থাকায় আমার কোনো সর্বনাশ করতে পারবে না, বুধ আমাকে ঘিরে রেখেছে মিঃ চ্যাটার্জি।"

তারপরেই খবরটা ছড়িয়ে পড়েছিল। ছোট্ট-ছোট্ট কাঁচের ঘরের খুপরিতে ফিস-ফিস আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। "শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জির এই নতুন দায়িত্ব মানে উন্নতি না অবনতি?"

দেশী সায়েবরা ইনটারন্যাল টেলিফোনে, বাবুরা কলঘরে এবং বেয়ারারা সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আলোচনার মাধ্যমে খবরটা সম্পর্কে নিজেদের ভাষ্য প্রচার করেছিল।

রুণু সান্যাল একটুও দেরি না করে ফোন তুলে নিয়েছিলেন। "বিবি, আমি বলছি। গরম খবর।" তারপর স্ত্রীর কাছে খবরটা রিপোর্ট করেছিলেন সবিস্তারে।

স্ত্রীর মতামত চেয়েছিলেন রুণু সান্যাল। "তোমার কী মনে হয়, বিবি?"

"আমার তো মনে হয়, শেষের শুরু।"

"আমারও তাই মনে হচ্ছে—বিগিনিং অফ দি এণ্ড! হয়তো লেবারের কোনো হাবিজাবি কাজ চাপিয়ে আস্তে-আস্তে মার্কেটিং থেকে সরিয়ে দেবে।"

"বিবি, তোমাকে আগেই বলেছিলাম, পাটনায় ইংরিজিতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হওয়া এক জিনিস, আর বিলিতী কোম্পানির মার্কেটিং এগজিকিউটিভ হওয়া আর এক জিনিস। আর সায়েবদেরও বলিহারি, ওদের গায়েও সমাজতন্ত্রের হাওয়া লেগেছে। ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউণ্ড না-দেখেই যদু মধুর ছেলেদের ম্যানেজমেণ্ট ব্যাপারে চাকরি দিচ্ছে। সোস্যালিজম এক জিনিস, আর এই মাচেণ্ট অফিস চালানো আর এক জিনিস।"

নীলরক্ত সম্পর্কে মিসেস সান্যাল স্বামীর সঙ্গে একমত হলেন। কারণ তার বাবাও উইলিয়ামসন মেগরের চা-বাগানে মেজসায়েব হয়েছিলেন। বিবি বললেন, "আমার বাবা বলতেন, একজন ইণ্ডিয়ানের পিছনে আর একজন ইণ্ডিয়ানকে লাগিয়ে রাখা ম্যানেজমেণ্টের একটা পলিসি। তোমাকে ওরা অত ভালবাসে তবু পিছনে হনুমান লেলিয়ে দিয়েছে।"

"বিবি, তোমার এটর্নি অফিসে চাকরি করা উচিত ছিল। তোমার আইনের ব্রেন অদ্ভুত।"

স্বামীকেও নাম ধরে ডাকে বিবি। "তোমায় কাল রাত্রে বলা হয়নি, রুণু। মিস্টার ফেরিসের সঙ্গে যেন কী একটা কথা কাটাকাটি হলো চ্যাটার্জির। তারপরেই তোমার বন্ধুর মুখ একেবারে লাল হয়ে গেল।"

"ফ্যান ডিভিসন থেকে যদি ওকে সরায় তাহলে কী দাড়াচ্ছে, বিবি?" রুণু সান্যাল স্ত্রীর ভাষ্য শুনতে চায়।

"তোমাকেই আরও দায়িত্ব নিতে হবে। ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো তুমি তো আছই।"

"খবরটা এখন কিন্তু একেবারে টপ সিক্রেট।" রুণু সাবধান করে দেয়।

"তুমি যদি চাও আমি রাঙা মাসিমার সঙ্গে কথা বলতে পারি," বিবি বলে।

"এখন নয় বিবি—হাজার হোক রিটায়ার্ড আই-সি-এস অফিসারের বউ।"

"আচ্ছা গো আচ্ছা! আর শোনো তোমার ঐ গলার আংটিতে যেন এঁটোকাঁটা লাগিয়ো না বুঝলে!"

পরের দিন আরও উত্তেজনা। হরিহর হাঁফাতে-হাঁফাতে চ্যাটার্জির ঘরে ছুটে এলেন। বললেন, "বাইরের লাল আলোটা জেলে দিন স্যার। সিচ্যুয়েশন ইজ কেরোসিন।"

"মানে ?"

"মানে যে-কোনো মুহূর্তে ফ্যান কারখানায় আগুন জ্বলে উঠতে পারে। মাছ নাকি আজকে আরও ছোট হয়েছে। কিছু মাছে গন্ধ ছিল।"

"গন্ধ ?"

"মানে অভিযোগে প্রকাশ—ইট ইজ অ্যালেজ্‌ড, মাছ পচা ছিল। কিন্তু আমরা তীব্রভাবে অস্বীকার করেছি," হরিহর বললেন।

"তারপর ?"

"ওরা স্যার, বিশ্রী কাণ্ড বাধিয়েছে। মাছটা খাওয়া ছাড়েনি—মাছ খেয়ে, মাছের কাঁটা হাতে করে নিয়ে আমার লেবার অফিসারের টেবিলে ফেলে দিয়ে এসেছে ? বিশ্রী ব্যাপার স্যার, দেখলে বমি হয়ে যাবার উপক্রম। তার সঙ্গে শ্লোগান দিচ্ছে—কোম্পানি নিপাত যাক, হাড়হারামজাদার মুড়ো নাও।"

"প্রোডাকশন ?" শ্যামলেন্দু জিজ্ঞেস করে।

"কমতে আরম্ভ করছে স্যার।"

"গো-শ্লো ?"

অভিজ্ঞ পার্সোনেল অফিসার হরিহর বললেন, "ঠিক গো-শ্লো নয়—এখনও গো-মিডিয়াম! আপনি যদি বলেন, আমাদের এটর্নি লায়ন অ্যাণ্ড বড়ালের মিস্টার বড়ালের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারি।"

শ্যামলেন্দু এবার বেশ গম্ভীর হয়ে উঠলো। "যা প্রয়োজন মনে করেন করুন, কিন্তু একটা কথা আমি সোজাসুজি জানাতে চাই, কোনো রকম নিয়ম-ভঙ্গ সহ্য করা কোম্পানির পলিসি নয়।"

"আপনার সঙ্গে আমি ১১০ পারসেণ্ট একমত স্যার। যারা বলেছে, হাড়হারামজাদার মুড়ো নাও, তাদের নামের লিস্টি চেয়েছি—যদি প্রয়োজন হয়, কাল পুলিসে ডাইরি করে দেবো। চার্জসিটও রেডি রাখছি। দলের পাণ্ডা-গুলো এত অসভ্য স্যার যে চার্জসিটকে সব সময় সিট চার্জ বলবে!"

কয়েক দিনের মধ্যে ব্যাপারটা আরও সঙ্গীন হয়ে উঠেছে। হরিহর হন্তদন্ত হয়ে শ্যামলেন্দুর ঘরে ঢুকে বললেন, "স্যার, বাইরের লাল আলোটা জেলে দিন। মাছের কনট্রাকটরের জন্তে কোম্পানি যেতে বসেছে। মাছের দাগার সাইজ এমন কমিয়েছে যে, ওয়ার্কাররা, অ্যাজ এ প্রোটেস্ট, আজ দুপুরে ভাত খেয়ে

এঁটো হাতে ম্যানেজারের ঘরের দেওয়ালে দাগ কেটে দিয়েছে।"

"লায়ন অ্যাণ্ড বড়ালের মিস্টার বড়ালকে কনসাল্ট করেছি। বলেছেন, ক্লিয়ার ব্রিচ অফ ডিসিপ্লিন। তাছাড়া ইউনিয়ন যা-তা দাবী করেছে। এক নম্বর ইউনিয়ন ডিমাণ্ড করেছে—প্রতিদিন দুশো গ্রাম ওজনের রুই মাছ দিতে হবে। এই না-শুনে দু নম্বর ইউনিয়ন বলেছে, ওই সাইজের দুখানা মাছ চাই। আর তিন নম্বর ইউনিয়নের কথা যদি শোনেন, তাহলে আপনি মাথায় হাত দিয়ে বসবেন। ওরা দাবি করেছে, রোজ মাছের সঙ্গে মাংস এবং ডিমও দিতে হবে।"

"প্রোডাকশন?" শ্যামলেন্দু গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করে।

"খুবই খারাপ! এগজ্যাক্ট ফিগারটা আপনাকে একটু পরেই দিচ্ছি। আর শ্লোগান স্যার, আপনাকে কী বলবো! কোম্পানি নিপাত যাক। তা বলছে বলুক, ওয়ার্কাররা রেগে গেলে ওরকম বলে থাকে। কিন্তু আমারই হয়েছে বিপদ। আমার ওয়াইফের একে হাই ব্লাড-প্রেসার। শুনলে কোলাপ্‌স করবে। বলছে হাড়হারামজাদার ল্যাজা মুড়ো দুই নাও।"

হরিহরের স্ত্রীর শরীর খারাপ শুনে শ্যামলেন্দু উদ্বেগ প্রকাশ করলো, জানতে চাইলো কোম্পানির ডাক্তার নিয়মিত যাচ্ছেন কিনা। "প্রয়োজন হলে নার্সিং হোমে পাঠিয়ে দিন কোম্পানির খরচে।"

"নার্সিং হোম কেন, নন্দন-কাননে রাখলেও ওর প্রেসার কমবে না, যতক্ষণ না আমার সম্বন্ধে চিন্তা যাচ্ছে।" গভীর দুঃখের সঙ্গে হরিহর বললেন, ছোকরা লেবার অফিসারদের আজকাল বিয়ে হচ্ছে না, স্যার। পাত্র কী চাকরি করে শুনলেই মেয়ের বাপরা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।"

শ্যামলেন্দু বললো, "পুলিশে খবর দেবেন নাকি?"

"দিতে গিয়েছিলাম স্যার। আফটার অল কোনো হিউম্যান বিয়িং-এর ল্যাজা-মুড়ো নেওয়া, এ তো মার্ডারের ভয় দেখানো। কিন্তু থানার কোনো সহযোগিতা পেলুম না। ওরা বলছে, আমরা আপনাকে হরিহর বলে জানি, আপনি যে 'হাড়হারামজাদা' তা প্রমাণ করুন। আমি বললুম, এর মধ্যে কেন আইনের মারপ্যাচ ঢোকাচ্ছেন? দুনিয়াসুদ্ধ সবাই জানে আমি হাড়হারামজাদা। কিন্তু ব্যাটারা বলে কি জানেন স্যার? কোর্টে গিয়ে এফিডেভিট করুন যে আপনি হাড়হারামজাদা।"

একটু থেমে হরিহর বললেন, "আমি বলি কি, চাঁইগুলোকে চার্জসিট দিই। টাইপ-ফাইপ করে সব রেডি রেখেছি।"

"দিন, তাছাড়া উপায় কী?" শ্যামলেন্দু তার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলো।

"টুটুল বেচারা ক'দিনের জন্যে বেড়াতে এলো, আর তুমি ওর জন্যে কিছু করছো না," অভিযোগ করলো দোলন। "ঠিক সময়ে আজকাল বাড়িও ফেরো না।"

"এক্ষুণি যেন বলে বসবেন না, আই অ্যাম স্যরি," টুটুল টিপ্পনী কাটলো।

"তোমরা দুই বোন একসঙ্গে ষড়যন্ত্র করে আমার মুখ বন্ধ করে দিলে," উত্তর দিলো শ্যামলেন্দু।

দোলন বললো, "আমার অবস্থা দেখছিস তো টুটুল। কমারসিয়াল অফিসের এগজিকিউটিভকে কিছুতেই বিয়ে করিস না।"

"একজনের অপরাধে সমস্ত এগজিকিউটিভ জাতকে শাস্তি দেওয়া কি ঠিক হবে!" শ্যামলেন্দু হাসতে-হাসতে প্রশ্ন করে।

টুটুল এবার কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে জামাইবাবুর পক্ষ নিলো। "তুই বেশ দিদি! আমার মাথাটা গোলমাল করে দিচ্ছিস। ডাক্তার বিয়ে করিস না; দিনরাত পুঁজরক্ত ঘাঁটে, হাসপাতাল নার্সিং হোম রোগী নিয়ে ব্যস্ত থাকে, বউকে আদর করে না। আই-এ-এস শুনতে ভাল, কিন্তু মাইনে কম। তাছাড়া জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টা মফঃস্বলে পচতে হবে। কভেনেণ্টেড অফিসার—সেও বলছিস, না। তাহলে বিয়েটা করবো কাকে। ল্যাম্পপোস্টকে?"

হা-হা করে হেসে উঠলো শ্যামলেন্দু। "খুব ভাল উত্তর দিয়েছে সুদর্শনা। মুখে যাই বলুক, প্রত্যেক শ্যালিকার মনের গহনে জামাইবাবুদের জন্যে একটা চাপা অনুরাগের আগুন সব সময় জ্বলছে।"

"তুমি না করলেও আমি যতটা পারছি টুটুলকে কলকাতা দেখাচ্ছি। হাজার হোক মার-পেটের বোন, আমি তো আর অফিসের নাম করে ওকে ফেলে দিতে পারি না," দোলন বেশ গম্ভীর হয়েই উত্তর দিলো।

শ্যামলেন্দু বললো, "টুটুল, কেমন বুঝছ আমাদের এই জীবন?"

"আপনার র‍্যাক থেকেই তো বই নিয়ে আজ পড়ে ফেললাম।"

"আমি আজকাল বইটই পড়তে পারি না, টুটুল। পাঁচ পাতার বেশি কিছু পড়বার ধৈর্য থাকে না। কী করে যে এম-এ পাস করেছি নিজেই বুঝতে পারি না। কী পড়লে টুটুল?"

টুটুল বললো, "বেকার বসেছিলাম। তাই আপনার বুককেস থেকে বার করে কবিতা পড়ছিলাম—অ্যালন ডুগানের লেখা।"

দোলন বললো, "শু পড়েনি, সঙ্গে-সঙ্গে অনুবাদ করে ফেলেছে।"

এঁটো . ঘুষের একঘেয়ে জীবন সম্বন্ধে ভদ্রলোক বেশ লিখেছেন," টুটুল বললো·
. পনাকে পড়ে শোনাচ্ছি অনুবাদটা।

ঘুম থেকে উঠলাম, অফিসে গেলাম
কাজকর্ম করে বাড়ি ফিরে এলাম।
এবার ভোজনপর্ব, একটু কথাবার্তা,
তারপর শুয়ে পড়েছিলাম।
আবার ঘুম থেকে উঠলাম, অফিসে গেলাম।
কাজকর্ম করে বাড়ি ফিরে এলাম,
এবং খাওয়া-দাওয়ার পরেই শুয়ে পড়েছিলাম।
তারপর ঘুম থেকে উঠে অফিসে গিয়েছিলাম
কাজকর্ম করে বাড়ি ফিরে এলাম।
খাওয়া-দাওয়া হলো, রেডিওতে কিছুক্ষণ
গান শুনে বিছানায় শুয়ে পড়লাম।
তারপর ঘুম থেকে উঠে অফিসে গেলাম
কাজকর্ম শেষ করে বাড়ি ফিরিলাম,
মাংস খাওয়া হলো, এবার নিদ্রা।
তারপর ঘুম থেকে উঠে পড়ে অফিসে গেলাম
কাজকর্ম করে বাড়ি ফিরে এলাম,
খাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে ঘুমোবার আগে
স্ত্রীর সঙ্গে প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ হয়েছিলাম।
তারপর এলো শনিবার, শনিবার, শনিবার!
আমরা দুজনে দোকানে গিয়েছিলাম
আমি নীল মেঘ দেখেছিলাম,
স্ত্রীর সঙ্গে অনেক বিষয়ে কথা হয়েছিল।
শনিবার সান্ধ্য-ককটেলে
কী সব ছাই-পাঁশ গলায় ঢেলেছিলাম,
ফলে রবিবারের অর্ধেক মাঠে মারা গেল।
বিকেলে মনের অবস্থা অবর্ণনীয়।
তারপর শুয়ে পড়েছিলাম।
কাল সকালে আবার ঘুম থেকে উঠে অফিসে যাবো
আবার সেই কাজকর্ম, বাড়ি ফিরে আসা,
খাওয়া এবং ঘুমনো।"

শ্যামলেন্দু বললো, "বাঃ, চমৎকার! পাঠিয়ে দাও কোনো পত্রিকায়! নাম দিও: 'আমার জামাইবাবুকে দেখে'।"

হাই তুললো দোলন। "এবার ঘুমনো যাক।" কবিতাটি ওর ভাল লাগেনি। লেখাটা অত্যন্ত অসভ্য।

বিছানায় শুয়ে শ্যামলেন্দুর ঘুম আসছে না। দোলন কিন্তু কেমন সঙ্গে-সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লো।

শ্যামলেন্দু এসে জানালার কাছে দাঁড়ালো। দূরে, অনেক দূরে চৌরঙ্গীর ব্যবসায়ী নিয়ন আলোগুলো রাস্তার নির্লজ্জ পতিতার মতো তখন পথচারীদের দিকে চোখের ইশারা করছে। একটা বিরাট ফ্রেমের মধ্যে হিন্দুস্থান পিটারস্-এর নিয়ন বিজ্ঞাপনটাও এতদূর থেকে চোখে পড়ছে। ঘন নীল রঙের পিটারস কথাটা স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। তার তলায় একবার জ্বলছে 'ফ্যান'—পরের মুহূর্তে 'ল্যাম্প'। ফ্যান ল্যাম্প, ল্যাম্প ফ্যান, ফ্যান ল্যাম্প—জ্বলছে আর নিভছে, নিভছে আর জ্বলছে।

"তুমি ঘুমোওনি?" চমকে উঠলো শ্যামলেন্দু।

দোলনও কখন উঠে এসেছে।

"মাথা ধরেছে?" দোলন জিজ্ঞেস করে।

"মাথার ভিতরটা কেমন করছে।"

হাতটা ধরে পরম স্নেহে দোলন আবার শ্যামলেন্দুকে বিছানায় নিয়ে গেল। "চলো মাথা টিপে দিচ্ছি।"

ভারি সুন্দর কপালে হাত বুলিয়ে দেয় দোলন! অনেকদিন আগে ছোটবেলায় জ্বর হলে মা এমনি করে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন।

নরম হাতটা বুলোতে-বুলোতে দোলন বললো, "অফিসের জন্যে অত খেটো না, লক্ষ্মীটি।"

ছোট্ট ছেলের মতো শ্যামলেন্দু স্বীকার করলো, "না-খাটলেও চলে, দোলন। কিন্তু ওই যে রুণু সান্যাল পিছনে রাহুর মতো লেগে রয়েছে।"

"থাকগে। ওসব নিয়ে মাথা ঘামিও না," দোলন ধীরভাবে স্বামীকে বলে।

"আমার যে হারতে ইচ্ছে করে না দোলন।"

শ্যামলেন্দু বুঝতে পারে তার চোখেও এবার ঘুম নেমে আসছে।

দেওয়ালে টাঙানো ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে আছে শ্যামলেন্দু। পনেরো তারিখের আর চারটে দিন বাকি। তারিখটা আজ চোখ রাঙাচ্ছে শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জিকে।

হরিহর তালুকদার হুড়মুড় করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। "কারখানার খবর খুবই খারাপ, স্যার। সামান্য একটুকরো মাছ থেকে কি জিনিস আরম্ভ হলো। দু'দলে মাথা ফাটাফাটি। লেবার কমিশনার ডেকেছিলেন। কেউ যাচ্ছে না। ইতিমধ্যে এইমাত্র খবর পেলাম—সিরিয়াস অবস্থা। যাদের আমরা রেকগনাইজ করিনি, থার্ড ইউনিয়ন, যারা মাছ ডিম মাংস তিনটে চাইছে, তারা কারখানার মধ্যে বসে পড়েছে।"

"প্রোডাকশন?" শ্যামলেন্দু গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলো।

"বন্ধ স্যার। আপনি ফ্যাকটরির ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলবেন?" হরিহর জানতে চাইলেন।

"দিন লাইনটা। টেকনিক্যাল ম্যানেজার মিস্টার হার্টলে যখন হরিয়ানাতে রয়েছেন, তখম এফ-এম এর সঙ্গেই কথা বলি।"

শ্যামলেন্দু ফ্যাকটরি ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বললো। তারপর বললো, "ম্যানেজিং ডিরেকটরের সঙ্গে আলোচনা করছি।"

"আপনার নোটটা তাড়াতাড়ি লিখে ফেলুন, মিস্টার তালুকদার। ক'জন আহত হয়েছে, মেশিনের কোনো ক্ষতি হয়েছে কিনা, প্রতিদিন কত টাকা লোকসান হচ্ছে।"

"আমি এখনই নোট পাঠিয়ে দিচ্ছি।" তারপর হরিহর দুঃখের সঙ্গে বললেন, "অথচ, এরা খুবই ভাল মাইনে পায়। এ-রকম সার্ভিস কণ্ডিশন খুব কম ফ্যাকটরিতে আছে।"

একটু থেমে হরিহর বললেন, "এই হিন্দুস্থান পিটারস্-এ বেয়ারা এবং ঝাড়ুদার থেকে আরম্ভ করে বুকে হাত দিয়ে কেউ বলতে পারবে না সে বাইরের অন্য লোকদের তুলনায় সুখে নেই। তবু সামান্য কারণে এরা কী করে বসলো! কী যুগ পড়লো স্যার? কাউকে দোষ দিই না। শুধু এক-এক সময় মনে হয় সমস্ত জাতটার ম্যালেরিয়া ধরেছে—জুন মাসের গরমে হাড় কাঁপানো শীত দিয়ে জ্বর আসে, রোগী মাঝে-মাঝে ভিরমী খায়।"

শ্যামলেন্দু এবার হরিহরের মুখের দিকে তাকালো। কিন্তু কোনো কথা

বুঝলেন মিস্টার চ্যাটার্জি। আমাদের থর্নি সায়েব কিন্তু ব্যাপারটা অনেক আগেই বুঝেছিলেন। তখন আজাদ হিন্দ ফৌজ আন্দোলন নিয়ে সমস্ত দেশ আগুন হয়ে আছে। মেজর থর্নি আমাকে বলেছিলেন, তালুকদার, তোমরা ইংরেজকে দেশ ছেড়ে যেতে বলছো, আমরা হয়তো চলেও যাবো। কিন্তু এই দেশ তোমরা চালাতে পারবে না। তোমাদের পথে বসে কাঁদতে হবে। তখন কিন্তু সাধাসাধি করলেও আমরা আর ফিরে আসবো না।"

"আপনি হীরা সিং-এর চিকিৎসা সম্বন্ধে একটু খোঁজ খবর নিন।" শ্যামলেন্দু এই বলে হরিহরকে বিদায় দিলো।

শ্যামলেন্দুর ইচ্ছে করছে ড্রয়ার থেকে একটু উত্তেজক কিছু বের করে খেয়ে নেয়। অযথা শরীরকে কষ্ট দেওয়া থেকে একটু হুইস্কি গলায় ঢালা ভাল। শ্যামলেন্দু তাই করলো।

ঠিক সেই সময় মিঠু সেন ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো। "আমাদের এক্সপোর্ট বিজ্ঞাপনের জন্য খুব সুন্দরী উর্বশীর মডেল পাওয়া গিয়েছে। ফটোগ্রাফার ভিকটর বিশ্বাস এবং এজেন্সীর মিস নারগোলওয়ালা দুজনেই খুব একসাইটেড! মেয়েটি ওয়াণ্ডারফুল সুন্দরী এবং রীতিমতো সেক্সাইটিং। শুধু একটা প্রশ্ন, মহাভারতের ডেশক্রিপশন মতোই মডেলকে শুধু কাঁচুলি পরানো হবে, না মডার্ন ড্রেস দিয়ে সিনেমায় উর্বশীকে যেরকম দেখানো হয় সেই রকম ফটো নেওয়া হবে! মেয়েটির ফটো দেখবেন নাকি?"

শ্যামলেন্দু গম্ভীরভাবে বললো, "ফটো দেখবার দরকার নেই, মিস্টার সেন! বিজ্ঞাপনও হবে না, কারণ থাইল্যাণ্ডে এখন ফ্যান যাচ্ছে না। তার বদলে একটি বিজ্ঞাপন করে দিন—আজ রাত থেকে ফ্যান কারখানা বন্ধ, দুই দলে মারামারি ইত্যাদির ফলে এবং নাশকতামূলক কাজকর্মে কারখানার যন্ত্রপাতির বিপুল ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কায় ফ্যাকটরিতে ক্লোজার ঘোষণা করতে কোম্পানির কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়েছেন। দাঁড়ান, মিস্টার তালুকদারকে ডেকে পাঠাই।"

"বিজ্ঞাপন এখনই করে দিচ্ছি, কাল সমস্ত কাগজে বেরিয়ে যাবে। তবে আমরা খুবই দুঃখিত। মিস নারগোলওয়ালা ঠিকই বলেন যে ইণ্ডিয়ার কিছু হবে না, বিশেষ করে ওয়েস্ট বেঙ্গলের।"

টেলিফোন পেয়েই হরিহর ফাইল হাতে ঘরে ঢুকলেন। আজ তাঁর দোর্দণ্ড প্রতাপ। যুদ্ধ না হলে মিলিটারিদের কদর বোঝা যায় না!

মিঠু সেন জানতে চাইলেন, "লক-আউটের বিজ্ঞাপনটার কী কী পয়েণ্ট হবে।"

হরিহর বললেন, "লক-আউট নয়, ক্লোজার। দুটোর মধ্যে আকাশ

পাতাল তফাত। একটা হলো সাময়িক অসুস্থতা, আর শেষেরটি হলো ডেথ সার্টিফিকেট। একেবারে মকরধ্বজের মতো কাজ করে। লায়ন অ্যাণ্ড বড়াল বলছিল লক-আউট। আমি কিছুতেই রাজী নই। বললুম, চিকিৎসা যখন করাতেই হবে, তখন মোক্ষম চিকিৎসা করাই ভাল।"

মিঠু সেন বললেন, "তাহলে মিস নারগোলওয়ালাকে ডেকে পাঠাই, বিজ্ঞাপনটা এখনই লিখে ফেলতে হবে।"

একগাল হেসে হরিহর বললেন, "কিছু মনে করবেন না স্যার, এই বিজ্ঞাপন লেখা অত সহজ নয়। বাঘা-বাঘা এটর্নি ব্যারিস্টার এই ড্রাফট করতে ঘেমে ওঠে। লায়ন অ্যাণ্ড বড়ালের মিঃ বড়াল এই লাইনে স্পেশালিস্ট। ইতিমধ্যেই দেড়শ' কোম্পানিতে ক্লোজার করিয়েছেন। আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। আমরা বিজ্ঞপ্তির ল্যাংগুয়েজ ফাইনাল করে এনেছি। ইংরিজি, বাংলা এবং হিন্দীতে ছাপা হবে।

"শুনুন।" বাংলা বিজ্ঞপ্তিটা হরিহর পড়তে লাগলেন :

"৫১০ নম্বর তারাতলা রোডস্থিত ফ্যান কারখানার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে শ্রমিক কর্মিগণ অবগত আছেন। কিছুদিন যাবৎ শ্রমিক কর্মিসাধারণ ইচ্ছাকৃত মন্থর উৎপাদন কৌশল গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহারা তুচ্ছ ও বাজে কারণে অন্যান্যপ্রকার নাশকতামূলক কার্যকলাপ করিতেছেন! যে চুক্তিনামাগুলি প্রবল রহিয়াছে সেগুলি মানিয়া চলিতে শ্রমিক কর্মিগণ ইচ্ছুক নহেন। তাঁহারা আইন নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াছেন। কারখানার নিরাপত্তা নিয়মশৃঙ্খলা একেবারে লোপ পাইয়াছে।

"পরিস্থিতি কর্তৃত্বের বাহিরে চলিয়া যাওয়ায়, পরিচালকগণ এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন যে কারখানা এখনই বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।"

এরপরেও অনেকখানি আছে। যেমন: "১৯৪৭ সালের শিল্পবিরোধ আইনের ২৫ এফ এফ এফ ধারার প্রভাইসোয় লিখিত বিধান অনুসারে শ্রমিক কর্মিগণ ছাঁটাইয়ের ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী হইবেন; ইহা ব্যতীত যদি অন্যান্য কিছু পাওনা থাকে তাঁহারা তাহাও পাইবেন ইত্যাদি।"

কাগজ নিয়ে সেন চলে যাচ্ছিলেন। শ্যামলেন্দু বললো, "হ্যাঁ শুনুন মিস্টার সেন, আর এই বিজ্ঞাপনের পাঁচটা কাটিং কাল সকালেই খবরের কাগজ থেকে কেটে আমাকে পাঠিয়ে দেবেন। ওগুলো আমাকে ফাইলে রাখতে হবে।"

একটু পরেই রুণু সান্যাল বাড়ীতে ফোন বুক করলেন। "বিবি, খবর আছে। ফ্যান ফ্যাক্টরিতেও ম্যাসাকার করলো শ্যামলেন্দু। দায়িত্ব নিতে না

নিতে ফ্যাকটরি বন্ধ। এক্সপোর্টেও মনে হচ্ছে কী একটা গোলমাল বাধিয়ে বসেছে। মাল রেডি অথচ জিনিস জাহাজে উঠছে না। রপ্তানির খবর দিয়ে যে বিজ্ঞাপন বেরোবে ঠিক ছিল তা ক্যানসেল করে দিয়েছে।"

"সেলসে রাখছে ওকে ?" বিবি জিজ্ঞেস করলেন।

"উইকেটই থাকে কিনা আগে ছাখো," রুণু সান্যাল বেশ আনন্দের সঙ্গেই জানালেন।
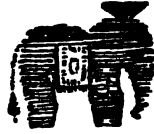
"শ্যামলদা ?" সুদর্শনা ডাকছে। "আলো না-জ্বালিয়ে একলা এই অন্ধকারে ব্যালকনিতে বসে কী ভাবছেন ?"

"বসো," গম্ভীরভাবে বললো শ্যামলেন্দু। "নাথিং পার্টিকুলার—আসলে কিছুই ভাবছি না টুটুল।"

"ফ্ল্যাটের দরজা খুলে অন্ধকার দেখে আমরা ভাবলাম আপনি এখনও আসেননি," সুদর্শনা বললো।

"আমি ফিরে এসে তোমাদের না দেখে কেমন মুষড়ে গেলাম। কোনো-রকমে স্নানটা সেরে, এখানে এসে বসেছি। সিগারেট খেয়ে যাচ্ছি পরের পর," শ্যামলেন্দু বলে।

ফেরার পথে শ্যামলেন্দু যে হাসপাতাল ঘুরে এসেছে তা আর প্রকাশ করলো না। হরিহর বাধা দিয়েছিল, কিন্তু শ্যামলেন্দু শোনেনি। আষ্টেপৃষ্ঠে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হীরা সিং তাকে দেখেই চিনতে পেরেছে। বোধহয় সেলাম করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু হাত-পা বাঁধা। বোতলে ফোঁটা-ফোঁটা করে রক্তও দিচ্ছে। হাসপাতালের দরজার গোড়ায় হীরা সিং-এর বউ ছোট ছেলেটাকে কোলে করে বসে আছে।

"আর সামনের ওই গেলাসে কী নিয়েছ ? আগে তো তুমি এমন ছিলে না ! কই কখনও তোমাকে একলা হুইস্কির বোতল নিয়ে বসতে দেখিনি," অভিমানভরা কণ্ঠে দোলন বললো। বোনের কাছে বোধহয় একটু প্রেস্টিজ নষ্ট হলো দোলনের।

প্রশ্নটা এড়িয়েই গেল শ্যামলেন্দু। জিজ্ঞেস করলো, "তোমরা কোথায় গিয়েছিলে ?"

"সকালে আজ জানোই তো, শিলিগুড়ি হোমের ফ্ল্যাগ ডে ছিল। টুটুলকেও

লাগিয়ে দিয়েছিলাম বক্স কালেকশনে। জানো, টুটুল আমার থেকে বেশি কালেকশন করেছে।”

“নো ওয়াণ্ডার,” শ্যামলেন্দু এবার হাল্কা হবার চেষ্টা করলো। “এই রকম মহিলা সামনে বাক্স নিয়ে দাঁড়ালে কে না বলবে?”

“তারপর ওইসব বাক্স জমা দিয়ে বিকেলে আমরা গিয়েছিলাম ব্লিংকা রেস্তরাঁয় স্পেশাল জ্যাম সেশনে! সুদর্শনার ওসব দেখা উচিত। আজকের তারুণ্যকে।”

“উঃ শ্যামলদা, মাথায় থাকুন আপনাদের পার্ক স্ট্রীটের তরুণ সমাজ! ছেলেগুলো মেয়ে হয়ে যাচ্ছে, আর মেয়েগুলো ছেলে। কতকগুলো ইয়ুথকে দেখে আমার যা হাসি লাগলো; তারা ছেলেও নয় মেয়েও নয়।”

“কলকাতা সম্বন্ধে তোমার বেশ ধারণা হয়ে যাচ্ছে,” শ্যামলেন্দু গম্ভীরভাবে বলে।

“হ্যাঁ। কলেজ স্ট্রীট এবং কফি হাউস ঘুরে এসেছি। বৌবাজারের মোড়ে বোমা পড়াও দেখা হয়ে গেল। ত্রিশটা পয়সা রোজগারের জন্যে দলে দলে মানুষ কেমন করে সারাদিন রোদে জলে রাস্তার ওপর কুমড়োর ফালি কিংবা শাকের আঁটি নিয়ে বসে আছে তাও শেয়ালদা স্টেশনের সামনে দেখা হলো। কাউনসিল হাউস স্ট্রীটে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের সামনে বেকার যুবকদের লাইনও দেখলাম। ট্রামে-বাসে বাদুড়-ঝোলা হয়ে মানুষ কেমন করে ঘরে ফিরছে তাও দেখলুম, আবার এই জ্যাম সেশন, সুইঙ্গিং ক্যালকাটা অফ সেভেনটিজ।”

“কিছু বুঝলে?” শ্যামলেন্দু জিজ্ঞেস করলো।

“বোঝা তো দূরের কথা, শ্যামলদা আমার সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। একই সঙ্গে সমস্ত শরীরটা যেন হাই ব্লাড-প্রেসার এবং লো ব্লাড-প্রেসার, যক্ষ্মা এবং ক্যানসার, মেদ এবং ম্যালিনিউট্রিশনে ভুগছে। আমাদের অর্থনীতির টেক্সট বইতে এ-রকম কোনো কেসের কথা লেখা নেই। আপনি কিছু বুঝছেন?” টুটুল বললো।

“বুঝতে গেলেই সব গোলমাল হয়ে যায় টুটুল। তাই আমরা অর্থাৎ মার্চেণ্ট অফিসের লোকেরা ভাল আছি। আমরা বোঝবারই চেষ্টা করি না। আমাদের দৃষ্টি এবং দায়িত্ব সীমাবদ্ধ। আমরা কেবল অর্ডার সাপ্লাই করি। আমাদের মধ্যে কেউ-কেউ বলে, সমাজে যারা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবার কথা তুলছে তারা হিংসুটে। সুযোগ-সুবিধে পেলে ওরা আমাদের দলেই ঢুকে পড়তো। পায়নি, তাই বুক জ্বলছে। বলছে, আমরা অপদার্থ। ক্যাপি-

টালিস্টরা আমাদের হাতে লজেন্স দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছে।"

"তোমার গেলাসটা আমি সরিয়ে নিচ্ছি," দোলন শাসনের সুরে বললো। "একলা-একলা মদ না খেয়ে তুমি আবার একটু পড়াশোনা আরম্ভ করলে পারো। একটু লেখালেখি। তুমি কত ভাল ছাত্র ছিলে, কী সুন্দর তুমি লিখতে পারতে, নতুন-নতুন ভাবনা তোমার মাথায় আসতো, বাবার কত আশা ছিল তোমার ওপর।"

শ্যামলেন্দু চুপচাপ বসে রইলো। তারপর বললো, "আমার মা বলতেন মাংস খাবার পর দুধ খাওয়া নিরাপদ নয়! মার্চেন্ট অফিসের চাকরি করার পরে অরিজিন্যাল কোনো চিন্তা না-করাই ভাল।"

টুটুল ও দোলন দুটো মোড়া টেনে নিয়ে বসে পড়লো। টুটুল বললো, "শ্যামলদা উই আর স্যরি। আপনার ফ্যাকটরির খবর শুনলাম!"

"কোথা থেকে শুনলে?"

দোলন বললো, "কেন? তোমার ড্রাইভারের কাছ থেকে। আর একটা গুজব, তোমাকে নাকি সেল্‌স থেকে সরিয়ে দেবে!"

"যত সব অমঙ্গলের কথা। আমি বকে দিয়েছি আপনার ড্রাইভারকে," টুটুল বললো।

"টুটুল, তোমার খুব খারাপ লাগছে, তাই না?" শ্যামলেন্দু জিজ্ঞেস করে।

"লাগবে না?" দোলন বললো। "যখন ও-বেচারা এলো তখন তুমি কেমন হাসিখুশী—একেবারে অন টপ অফ দি ওয়ার্লড! আর এখন দেরি করে বাড়ি ফেরো, দিনরাত কী সব ভাবো।"

"কই আমি ভাবছি?" শ্যামলেন্দু উত্তর দেয়। "আমার গুরু মেনন সায়েব বলতেন, আদর্শ ম্যানেজার কখনও অভিভূত হবে না—না দুঃখে, না সুখে। আমি প্রথম জেনারেশনের এগজিকিউটিভ, তাই খাপ খাইয়ে নিতে একটু মানসিক কষ্ট পাচ্ছি—রাজার কোনো অসুবিধে হবে না।"

"দিদি শ্যামলদাকে খবরটা দিই তাহলে?" টুটুল জিজ্ঞেস করলো।

"দাও," দোলন উত্তর দিলো।

"শ্যামলদা, বাবার চিঠি এসেছে। আমি আই-এ-এস লেখার পরীক্ষায় পাস করেছি। দিল্লীর ইণ্টারভিউতে ডাক পড়েছে। এখান থেকেই সোজা চলে যাবো ভাবছি।"

লাফিয়ে উঠলো শ্যামলেন্দু। "নিষ্ঠুর চতুরা নারী। এতক্ষণ খবরটা চেপে ছিলে?"

"আমি খবরটা পেয়েই তোমাকে ফোন করেছিলাম। তা শুনলাম তুমি

বড় সায়েবের ঘরে," দোলন বললো।

"ওয়াণ্ডারফুল! টুটুল বোনটি আমার, তোমাকে মাথায় করে ঘুরপাক খেতে ইচ্ছে করছে!" বেজায় খুশী হয়েছে শ্যামলেন্দু।

"কবে তোমার ইণ্টারভিউ?"

"এখনও কয়েকদিন বাকি আছে," দোলন বললো।

"ঠিক হ্যায়, এখান থেকেই যাবে তুমি। তবে লক্ষ্মী সোনা বোনটি, আমার একটা রিকোয়েস্ট রাখতে হবে। আমার খরচে এখান থেকে তুমি প্লেনে যাবে, সঙ্গে তোমার গার্ড থাকবে দিদি। আমিও যেতাম, কিন্তু অফিসে এখন ছুটি দেবে না।"

"শুধু-শুধু পয়সা নষ্ট করে কী হবে, শ্যামলদা? পাবলিক সার্ভিস কমিশন আমাকে ট্রেনের ভাড়া দেবে।" টুটুল বলে।

"ওসব আমি কিছুই শুনতে চাই না, টুটুল। আমি খুশী হয়েছি, আমাকে একটু আনন্দ করতে দাও।"

"বেশ বাবা, তাই হবে," টুটুল বলে। জামাই-স্নেহে অন্ধ বাবা তো লিখেই দিয়েছেন, 'শ্যামলেন্দু যাহা বলিবে তাহাই করিবে'।"

"এবার একটু ঝগড়া করা যাক," শ্যামলেন্দু তার মুড ফিরে পেয়েছে।

"গোপনে-গোপনে কবে এই পরীক্ষাটা দেওয়া হয়েছে বলোনি তো! এত কথা হলো, একবারও লিক হলো না! কে বলে মেয়েরা সিক্রেট রাখতে পারে না?"

টুটুল বললো, "খেয়ালের মাথায় পরীক্ষা দিয়েছিলুম। পাস করবো ভাবিনি। তাই লজ্জায় কাউকে বলিনি। বাবা এবং মা ছাড়া কেউ জানতো না।"

"আই-এ-এস হয়ে তুই তাহলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হবি?" দোলন বলে।

"তারপর ডেপুটি সেক্রেটারী, জয়েণ্ট সেক্রেটারী, সেক্রেটারী এমন কি রাজ্যপালিকাও হতে পারে। দিল্লীতে যখন পোস্টিং হবে, আমাদের মূর্তি সায়েব তখন হয়তো গিয়ে সুদর্শনা ভট্টাচার্যের পা জড়িয়ে ধরবে। কত ক্ষমতা। রাজা বদলায় কিন্তু রাজকর্মচারী বদলায় না। রবীন্দ্রনাথ তো সিভিল সার্ভেণ্টদের দেখেই লিখেছিলেন, 'ওরা কাজ করে শত-শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ 'পরে'। ওটা মোটেই শ্রমিকদের উদ্দেশ্য করে লেখা নয়।"

একটু থেমে শ্যামলেন্দু বললো, "আমার কিন্তু খুব আনন্দ হচ্ছে টুটুল।"

"দাঁড়ান, এখন গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল," সুদর্শনা জবাব দিলো।

দোলন বললো, "আমার তো ওর সঙ্গে দিল্লী যাবার খুব ইচ্ছে। কিন্তু তোমাকে এই অবস্থায় ছেড়ে…"

"অবস্থা আবার কি ? এখন তো স্ট্যাণ্ডার্ড হয়ে গিয়েছে। যা হয়ে থাকে তাই হবে। ফ্যাকটরি বন্ধ হয়েছে—কিছু লোক খেতে পাবে না, কিছু লোক বউ-এর গয়না বেচবে, কিছু লোক কাবুলিওয়ালার কাছে যাবে, ছেলেমেয়ের মুখে ভাত দিতে না পেরে দু-একটা সেনসিটিভ লোক গলায় দড়ি দেবে, কিছু হিন্দুস্থানী ওয়ার্কার দেশে ফিরে গিয়ে চাষ করবে, কিছু লোক গেটের সামনে দাঁড়িয়ে গরম-গরম বক্তৃতা দেবে, কিছু লোক বাসে-ট্রামে উঠে লোকের নাকের ডগার সামনে কালেকশন বাক্স নাড়বে, কিছু লোক মাথা-ফাটাফাটি করে মরবে, তারপর একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে। আবার কারখানার দরজা খুলবে।"

শ্যামলেন্দু বুঝতে পারছে কয়েকটা পেগের কল্যাণে নিজেকে সামলাতে পারছে না। প্রাণপণে ব্রেক কষে এবার সে বললো, "দোলন, বেশি চিন্তা কোরো না। এখনও তো সময় রয়েছে।"

বাইরে এবার কলিং বেল টেপার আওয়াজ হলো। দোলন বেরিয়ে গিয়ে দেখলো রুণু সান্যাল এবং তাঁর বউ।

"আসুন, আসুন।" ওদের বসালো দোলন।

শ্যামলেন্দুও এসে বসলো। বন্ধুকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললো, "কী সৌভাগ্য।"

দোলন জিজ্ঞেস করলো, "কী খাবেন বলুন ?"

মিসেস সান্যাল উত্তর দিলেন, "কফি।"

"আর আপনি ?" দোলন জিজ্ঞেস করলো, "জিন, হুইস্কি, রাম সব আছে।"

"তাহলে একটা জিন অ্যাণ্ড লাইম হোক।"

জিনের গেলাসে চুমুক দিয়ে রুণু বললো, "কী শুনছি ব্রাদার ? তোমার ফ্যান ফ্যাকটরি বন্ধ হয়ে গেল ?"

"উপায় ছিল না," শ্যামলেন্দু উত্তর দিলো।

রুণু বললো, "শুনেই আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। হাজার হোক এই বিরাট অফিসে দুটো বাঙালী আমরা টিম-টিম করে জ্বলছি, তাও আবার হাঙ্গামা। অফিসে আর জ্বালাতন করলাম না, লোকে নোটিশ করবে। ভাববে বাঙালী আবার বাঙালীর সঙ্গে নাক ঘষাঘষি করছে। তাই সরাসরি এখানেই চলে এলাম। বিবিও বললো, মিসেস চ্যাটার্জিও নিশ্চয় উদ্বিগ্ন। যাই ওঁর মনটাকে একটু হাল্কা করে দিয়ে আসি।"

দোলন বললো, "আমার আর কী করবার আছে বলুন ?"

বিবি সান্যাল বললেন, "এটা কী বলছেন, মিসেস চ্যাটার্জি ? কমারসিয়াল ফার্মে এগজিকিউটিভদের বউদের অনেক দায়িত্ব। মিস্টার ফেরিসই তো সেদিন

পার্টিতে বললেন, প্রত্যেকটি সফল অফিসারের পিছনে নিশ্চয় একটি মহীয়সী মহিলা আছেন।"

দোলন বললো, "বিয়ের সময় অগ্নিসাক্ষী রেখে স্বামী প্রতিজ্ঞা করেছে স্ত্রীকে অন্ন-বস্ত্র যোগাবে। সুতরাং সমস্তটা ওর দায়িত্ব, আমি ওতে নাক গলাতে যাবো কেন?"

"ওরে বাবা!" বলে উঠলো শ্যামলেন্দু।

বিবি বললেন, "মিসেস চ্যাটার্জি, আমি রসিকতা করছি না, অনেক অফিসে হাই পোস্টে চাকরি দেবার আগে বউকেও ইনটারভিউ করে। এটা খুব প্রয়োজনীয়।"

"তাহলে, তোমার তো কোথাও চাকরি হবে না?" দোলন স্বামীকে বললো।

মিসেস সান্যাল বললেন, "আমাদেরও মাইনে পাওয়া উচিত। সারাদিন খাটিয়ে-খাটিয়ে সব রস নিংড়ে ক্লান্ত খিটখিটে স্বামীটিকে কোম্পানি বিকেলে আমাদের হাতে তুলে দিচ্ছেন। আমরা তাকে নার্স করে, চাঙ্গা করে আবার কাজের উপযুক্ত করে পরের দিন অফিসে পাঠিয়ে দিচ্ছি। এটা তো আমরা কোম্পানির জন্যেই করছি।"

রুণু জিজ্ঞেস করলো, "তা কেমন বুঝছো?"

শ্যামলেন্দু কিছুই ভাঙলো না। বললো, "যা হবার তাই হবে, বুঝে কি আর করবো!"

যাবার আগে দোলন বললো, "আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ। দুঃখের দিনেই বোঝা যায় কে বন্ধু কে শত্রু।"

"এইটুকু না করলে নিজেদের বেঙ্গলী বলে পরিচয় দিয়ে লাভ কী!" এই বলে মিস্টার ও মিসেস সান্যাল বিদায় নিলেন।
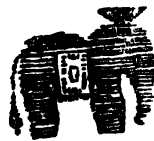
খবরটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। মিঠু সেন কয়েকটা ফোনও পেয়েছে কাগজের অফিস থেকে। গ্রামোফোন রেকর্ডের মতো মিঠু বলে যাচ্ছেন, "কি দুঃখের কথা বলুন দেখি। শুধু প্রোডাকশন নষ্ট নয়—এই সময় আমাদের পাখা বিদেশে যেতে পারতো। মূল্যবান বিদেশী মুদ্রা নষ্ট। প্রতিরক্ষার কাজেও আমাদের ফ্যান লাগে। অবশ্য যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, মিলিটারী অফিসে এবং ব্যারাকে।"

অফিসেও ছোটাছুটি। শ্যামলেন্দুকে কয়েকবার বড় সায়েবের ঘরে ঢুকতে এবং বেরোতে দেখা গেল।

গুজবও রটছে নানা রকম। রুণু সান্যালের ডিপার্টমেন্টের টাইপিস্ট চন্দ্রনাথ বাথরুমে বলে গেল, "খবর মোটেই ভাল নয়। মস্ত একটা উইকেট এবার পড়লো বলে। বুঝতেই পারছো কার উইকেট! যারা কুইক রান তুলতে চায় হিন্দুস্থান পিটারস্-এ তাদের রান আউট হবার চান্স বেশি। বুঝলে ব্রাদার।"

হরিহর তালুকদারও ভয়ানক ব্যস্ত। প্রায় অর্ধেক সময়েই তাঁকে সীটে দেখা যাচ্ছে না। চ্যাটার্জি সায়েবের ঘরে বসে আছেন।

হুঙ্কার ছেড়ে হরিহর বললেন, "বাছাধনরা নরম হয়েছেন। যে-রোগের যে-ওষুধ। আমরা যে এইরকম এটম বোমা ফাটাবো তা নেতারা বুঝতে পারেননি। মিনিস্টারের কাছে গিয়ে কেঁদে পড়েছে নিশ্চয়। না-হলে লেবার কমিশনার ত্রিপাক্ষিক আলোচনার জন্যে আমাকে ঘন-ঘন অনুরোধ করছেন কেন?"

"আলোচনার জন্যে কোম্পানি তো সব সময় প্রস্তুত, আপনাকে বলছি।" শ্যামলেন্দু উত্তর দিলো।

তালুকদার বললেন, "চেম্বারলেন সায়েব যদি হিটলারকে অতটা তেল না দিতেন, তাহলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হতো না। পলিসি অফ অ্যাপিজমেণ্টই তো ইণ্ডিয়াকে পিছিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অমন যে অমন নেপোলিয়ন, তিনিও জনতা সামলাবার জন্যে প্যারিসের রাস্তায় কামান বসিয়েছিলেন। গরীবের কথাটা একটু শুনুন স্যার। এখনও মাসখানেক ক্লোজার চলুক। সহজে আমরা আলোচনায় যাবো না।"

"সেটা ভাল দেখায় না। আপনি ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে যান। বলবেন মাছ ঐ এক পিস-ই থাকবে। তবে আমরা দেখবো যাতে ছোট না হয় বা পচা না হয়। কিন্তু সবাইকে শৃঙ্খলার সঙ্গে কাজ করতে হবে। উৎপাদন কমানো চলবে না।"

এরপর ক'দিন ধরে তালুকদার চরকির মতো ঘুরে বেড়ালেন—একবার লেবার কমিশনার, একবার লায়ন অ্যাণ্ড বড়াল সলিসিটরস, একবার কাউনসেলের বাড়ি, একবার চ্যাটার্জি সায়েবের ঘর।

দোলন এদিকে ফোন করলো, "কী খবর?"

"মনে হচ্ছে মিটমাট একটা হয়ে যাবে। ইউনিয়ন ডিমাণ্ড করেছে যে হরিহরের সঙ্গে ওরা আলোচনা করবে না। তাই এখন আমাকেও ত্রিপাক্ষিক আলোচনায় যেতে হবে।"

"দেখো যদি পারো একটা মিটমাট করে নিও, পরশু আমরা চলে যাবো। তার আগে একটা ফয়সালা হলে মনে শান্তি পাবো।"

"এখনই তো যাচ্ছি মিটিংয়ে। দেখা যাক কী হয়।"

বিকেলেই চুক্তি সই হয়ে গিয়েছিল। কোম্পানি বিনা শর্তে ক্লোজার তুলে নিচ্ছে—তবে শ্রমিকরাও কথা দিচ্ছে তারা প্রোডাকশন বজায় রাখবে। কোনো কর্মীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। মাছ এখন এক পিস-ই থাকবে, তবে দু পিস মাছের দাবিটা প্রয়োজন হলে ট্রাইব্যুনালে পাঠানো হবে। ইউনিয়নের কর্তারা শ্যামলেন্দুর সঙ্গে করমর্দন করেছিলেন, কিন্তু তালুকদারের সঙ্গে নয়। "যত নষ্টের গোড়া তো ওই ভদ্রলোক, আপনি না হলে এত তাড়াতাড়ি মিটমাট হতো না," শ্যামলেন্দুকে ওঁরা বললেন।

গাড়িতে উঠে অফিসে ফিরবার পথে হরিহর বললেন, "আমার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক না করুক, আমার ওয়াইফের ব্লাড-প্রেসারটা আজ কমবে। কালকে পর্যন্ত স্যার, বাড়িতে টেলিফোন করে শ্লোগান শুনিয়েছে হাড়হারামজাদার ল্যাজা-মুড়ো দুই চাই।"

ইতিমধ্যে কারখানার শ্রমিকদের বিজয় শোভাযাত্রা বেরিয়েছে। হরিহর সেই দেখে খিল খিল করে হাসতে লাগলেন। "এর থেকে বিরাট রসিকতা আর কিছু দেখেছেন? গোহারান হেরে যাবার পরও দলের লোকদের বোঝাচ্ছে তারা জিতেছে!"

"মিস্টার তালুকদার, আত্মবিশ্বাস হারিয়ে গেলে কোনো মানুষ, কোনো দল, কোনো জাতি টিকে থাকতে পারে না," শ্যামলেন্দু গম্ভীরভাবে উত্তর দেয়।

"কিছু যদি মনে না করেন, মিস্টার চ্যাটার্জি, সায়েবদের লেখা বই পড়ে এই সব কথা বলছেন আপনারা। লোহালক্কড়ের জঙ্গলে হোল লাইফ কাটিয়ে আমি নিজে যা বুঝেছি, তা হলো মানুষ হচ্ছে হারামজাদা। মানুষের মধ্যে যে শূয়োরটা আছে তাকে মাঝে-মাঝে খাওয়াতে হয়, মাঝে-মাঝে ঠেঙাতে হয়। তবেই মানুষ শায়েস্তা থাকে।"

শ্যামলেন্দু বিরক্ত হলেও বললো, "মানুষকে এতখানি ঘৃণা করলে কী নিয়ে বেঁচে থাকবো, মিস্টার তালুকদার! এ-বিষয়ে আপনার সঙ্গে একদিন বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে।"

হঠাৎ হীরা সিং-এর কথা মনে পড়ে গেল। "হীরা সিং এখন কেমন আছে, মিস্টার তালুকদার?"

"এই সব শান্তি বৈঠক চালাতে গিয়ে ক'দিন খোঁজ নেওয়া হয়নি। যখন

বলছেন, আজ একবার হাসপাতালে যাবো'খন। শুনছি ডায়াবিটিস পেয়েছে ডাক্তাররা, না-হলে এত দিন তো ভাল হয়ে বাড়ি ফিরে আসতো।"

মিটমাটের খবর বাড়িতে দিতেই দোলনের কী আনন্দ! "আমি এখনই কালীঘাটে পূজো দিতে যাচ্ছি। উঃ, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো।"

লাঞ্চ আওয়ারের পরই স্যর ব্রায়ান রের গাড়িখানা হিন্দুস্থান পিটারস্-এর বাড়ির সামনে দাঁড়ালো। ভিজিটরস রুমে সেক্রেটারী সেনগুপ্ত তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। "কেমন আছেন?"

"ভালই। খুব ঘন-ঘন বোর্ড মিটিং করছো দেখছি!"

সেনগুপ্ত বললেন, "কোম্পানি বড় হচ্ছে—আপনাদের উপদেশ সব সময়ই দরকার। এত শর্ট নোটিশে যে আসতে পেরেছেন এই আমাদের সৌভাগ্য।"

কুমার জগদীশও উলুবেড়িয়া থেকে এলেন। তারপর মিস্টার গর্ডন ও মিস্টার মূর্তিকে দুই পাশে রেখে ফেরিস সায়েবও হাজির হলেন। সকলে এবার বোর্ডরুমে ঢুকে পড়লেন।

মিটিং শুরু হয়ে গেল। আইটেম নাম্বার ওয়ান থেকে টেন পর্যন্ত সহজেই পাস হয়ে গেল। তারপর ফ্যাকটরিতে শ্রমিক অসন্তোষের কথা উঠলো। ফেরিস সায়েব বললেন, "সৌভাগ্যক্রমে আমরা তেমন ক্ষতিগ্রস্ত হইনি। কারখানার কাজ আগামীকাল থেকে স্বাভাবিক হয়ে যাবে।"

এরপর শেষ প্রস্তাবটি মিস্টার ফেরিস নিজেই আনলেন।

"আমি প্রপোজ করছি, মিস্টার শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জিকে কোম্পানির সর্বক্ষণের অ্যাডিশনাল ডিরেকটর নিযুক্ত করা হোক, সাবজেক্ট টু সরকারের অনুমতি, এটসেটরা, এটসেটরা।"

স্যর বরেন রায় ঢুলছিলেন। কথাটা কানে যেতে তিনিও খাড়া হয়ে উঠে বসলেন। তারপর অন্য সকলের দেখাদেখি নিজের হাতটা তুলে প্রস্তাবে অনুমতি দিলেন।

নতুন ডিরেকটর শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জিকে এবার সেনগুপ্ত ঘরে নিয়ে এলেন। প্রথমে ফেরিস সায়েব চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে একটু এগিয়ে এসে করমর্দন করলেন, তারপর উপস্থিত অন্য সকলের সঙ্গে তিনি শ্যামলেন্দুর পরিচয় করিয়ে দিলেন।

সেনগুপ্ত সাহেব করমর্দন করবার সময় আস্তে আস্তে বললেন, "দেখালেন বটে। ম্যাজিক জানেন আপনি। আজ সকালেই ফেরিস সায়েব আমাকে খবরটা দিয়ে অবাক করে দিলেন। এত কম বয়সে কাউকে ডিরেকটর হতে দেখিনি কোম্পানিতে।"

ফেরিস সাহেব তারপর শ্যামলেন্দুকে পাকড়াও করে নিজের ঘরে ঢুকে পড়লেন।

কোথায় আনন্দে টগবগ করবে, তা নয়, শ্যামলেন্দু যখন ফেরিস সায়েবের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো তার মুখে কে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে। শ্যামলেন্দুর মনে হচ্ছে তাকে যেন বিষাক্ত কোনো পোকা কামড়ে দিয়েছে।

শ্যামলেন্দু সম্পর্কে সার্কুলারটা ফেরিস সাহেব ডিকটেশন দিয়ে দিয়েছেন। একটু পরেই সারা অফিসে খবরটা রাষ্ট্র হয়ে যাবে। কোথায় নিজের চেম্বারে বসে পরের পর ফোন রিসিভ করবে, লোকের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করবে, তা না, চেয়ারে বসে থাকতে পারছে না শ্যামলেন্দু। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো শ্যামলেন্দু, তারপর বাথরুমের চাবিটা তুলে নিলো টেবিল থেকে।

বাথরুমটা ভিতর থেকে লক করে দিয়েছে শ্যামলেন্দু। এখন এই ঘরে শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জি একা। আয়নার ওপরকার টিউব লাইট জ্বালা ছিল। সেটা নিভিয়ে দিলো শ্যামলেন্দু।

বেশ ছিল শ্যামলেন্দু। ডিরেকটর হয়েছে, বেশ হয়েছে। কিন্তু ফেরিস সায়েব নিজের ঘরে ঢুকিয়ে ওই বিশ্রী প্রসঙ্গটা মনে করিয়ে দিলেন। যে-কাজটা শ্যামলেন্দু গোপনে-গোপনে করেছে, যা সে নিজেকেও ঠিক তেমনভাবে বুঝতে দিতে চায়নি, সেইটেই তুললেন মিস্টার ফেরিস।

ফেরিস সায়েবকে আবার দেখতে পাচ্ছে শ্যামলেন্দু। তিনি বলছেন, "চ্যাটার্জি, মস্ত বিপদ থেকে কোম্পানিকে তুমি উদ্ধার করেছো। থাইল্যাণ্ড এবং কোরিয়ার সঙ্গে চুক্তির ওই শর্তটা ভাগ্যে তুমি খুঁজে বার করলে, স্ট্রাইক, লক আউট, ক্লোজার ইত্যাদিতে কারখানা বন্ধ থাকলে কোম্পানি ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে না। তারপর তুমি যখন আইডিয়া দিলে, তখন ভাবতে পারিনি, ওই ক'দিনের মধ্যে সামান্য মাছের অজুহাতে এবং কয়েকটা লোককে হাত করে শ্রমিক অশান্তি বাধিয়ে সম্মানের সঙ্গে ফ্যান কারখানায় তালা লাগানো যাবে! ষাট লক্ষ টাকা বাঁচলো, বিলেত থেকে পার্টস এসে গিয়েছে—এই মাসেই আমরা প্রতিশ্রুতি মতো রপ্তানি করতে পারবো।"

ফেরিস সায়েব এরপর তার সঙ্গে করমর্দন করতে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

সায়েব বললেন, "এ-কথা কিন্তু কেউ বলতে পারবে না যে আমরা লিগ্যালি কোনো অন্যায় করেছি। আমরা শুধু একটা পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েছি, যেখানে যে-কেউ শ্রমিক অশান্তি বাধিয়ে দিতে পারে।"

শ্যামলেন্দু হাতটায় সাবান লাগাতে-লাগাতে ভাবলো, "লিগ্যালিটিই সব নয় —কোর্টের উকিলদের ওপরেই তো পৃথিবীর সব ন্যায়-অন্যায়ের দায়িত্ব নেই। আইন ছাড়াও একটা যেন কি আছে। যাকে মেনন সায়েব বলতেন মর‍্যাল।"

একি হলো শ্যামলেন্দুর! মুখ-চোখে ঠাণ্ডা জল দিয়েও স্বস্তি আসছে না। ইচ্ছে হচ্ছে বরফের মধ্যে মুখটা ডুবিয়ে রাখে, যাতে কেউ না দেখতে পায়।

দোলনকে খবরটা দেওয়া দরকার। টেলিফোন পেয়েই লাফিয়ে উঠলো দোলন। "কী বলছো! ডিরেকটর! আজই রেজলিউশন হয়েছে, কাল গভরমেণ্টের কাছে অ্যাপ্লিকেশন যাবে!" শ্যামলেন্দু আর কথা বলতে পারেনি। ফোনটা নামিয়ে দিয়েছিল।

হিন্দুস্থান পিটারস্-এর অফিস থেকে ব্লু হ্যাভেনে আর একটা টেলিফোন কল বুক হয়েছিল! রুণু সান্যাল কাতরভাবে বলছে, "বিবি বিবি, সর্বনাশ হয়েছে।"

টেলিফোনেই দুঃসংবাদটা শুনে বিবি চমকে উঠলো। "অ্যাঁ! কী বলছো তুমি? আমি কি একবার এখনই নতুন মেসোমশায়ের কাছে ঘুরে আসবো?"

"আর মেসোমশাই! এসব মেসোমশায়ের কম্ম নয়। একটা শালী-ফালি বাড়িতে এনে কর্তাদের সঙ্গে ভিড়িয়ে দিতে পারলে ফল হতো। নাউ ইট ইজ টু লেট!" দীর্ঘশ্বাস ফেললো রুণু।

বিবি স্বামীর মনের অবস্থা বুঝতে পারছে। বললো, "শোনো ডার্লিং, মনের ভাবটা যেন প্রকাশ করে ফেলো না। চ্যাটার্জিকে অভিনন্দন জানিয়ে এসো।"

"ওই কাজটা আমি মরে গেলেও পারবো না, বিবি।"

"ছেলেমানুষী ছাড়ো। তাছাড়া তুমি অফিস থেকে ফিরে এলে দুজনে সন্ধ্যেবেলায় একসঙ্গে গিয়ে দেখা করবো। আমি নিউ মার্কেটে ফুলের অর্ডার দিয়ে দিচ্ছি।"

পাথরের মতো নিঃস্তব্ধ হয়ে বসে আছে শ্যামলেন্দু। মেনন সায়েবের মুখটা শুধু চোখের সামনে ভেসে উঠছে। মেনন সায়েব কলকাতায় রয়েছেন। ওঁকেই প্রথম ফোন করলো শ্যামলেন্দু। "কর্মজীবনে প্রথম অনুপ্রেরণা আপনার কাছেই পেয়েছিলাম, তাই আপনাকেই প্রথম খবরটা দিচ্ছি। আমি হিন্দুস্থান পিটারস্-এর ডিরেকটর হয়েছি। আপনার আশীর্বাদ চাই।"

মেনন সায়েবের গলাটা কেমন ভারি শোনালো। "আশীর্বাদের কোনো প্রয়োজন নেই। কনগ্রাচুলেশন।"

"মিস্টার মেনন, আমার বাবা বেঁচে নেই। আপনি আমার বাবার মতো। আপনাকে একটা প্রশ্ন করবো। অ্যামবিশন—এই উচ্চাশা কি পাপ?"

হেসে উঠলেন মেনন সায়েব। "মার্চেণ্ট অফিসে এতদিন কাজ করেও সেণ্টিমেণ্টাল রয়ে গিয়েছ! উচ্চাশা কেন পাপ হতে যাবে? মনে নেই জোসেফ কনরাড কি বলেছিলেন—*All ambitions are lawful except those which climb upward on the miseries or credulities of mankind.* দুর্বল অসহায় অজ্ঞ মানুষদের ঘাড়ের উপর দিয়ে তোমার উচ্চাশার রথ যেন এগিয়ে না যায়।"

টেলিফোনটা নামিয়ে দিয়েছে শ্যামলেন্দু। ওর শরীরটা ঠিক ভাল লাগছে না, শুধু মনে হচ্ছে, কত লোকই তো সৎপথে থেকে নিজের প্রতিভা এবং প্রচেষ্টায় ডিরেকটর হচ্ছে, তাদের মতো হতে পারলো না কেন শ্যামলেন্দু? নেশার মাথায়, অন্ধ গোঁ-এর মাথায় উপরে ওঠবার জন্যে সে এ কি করে বসেছে!

শ্যামলেন্দু চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময় হরিহর তালুকদার ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকলেন। "এইমাত্র সুখবরটা পেলাম। আমার আন্তরিক কনগ্রাচুলেশন গ্রহণ করুন।"

করমর্দনের পর হরিহর বললেন, "আজকে কোনো কথা শুনতাম না, আপনার সঙ্গেই ব্লু হ্যাভেনে যেতাম মিসেস চ্যাটার্জির কাছে সন্দেশ খেতে। কিন্তু দেখুন না, এই লাস্ট মিনিটে হাঙ্গামা। আপনাকে বলি না, ইনডাসট্রিতে শান্তি হলেও লেবার অফিসারদের জীবনে কোনোদিন শান্তি আসবে না। ওই যে হাসপাতালে ছিল লোকটা, হীরা সিং, ঘণ্টাখানেক আগে মারা গিয়েছে। আমার লেবার অফিসার দাসকে পাঠিয়েছি। মরবার আর সময় পেলো না। মেট্রোতে সিনেমার টিকিট কাটিয়ে রেখেছি।"

শ্যামলেন্দুর সর্বশরীরে কে যেন বরফের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিলো। হীরা সিং মারা গিয়েছে! বমডিলায় যে লোকটা খোঁড়া হয়ে এসেছিল, এই কলকাতায় আমরা তার বাকিটা শেষ করলাম!

হরিহর বললেন, "আমাদের দিক থেকে দুঃখ করবার কিছু নেই। চিকিৎসার সব ব্যবস্থাই হয়েছিল, কিন্তু ডায়াবিটিস থাকলে কী করা যাবে? সেটা আমাদের দোষ নয়।"

খবরটা মিস্টার চ্যাটার্জিকে যে এমনভাবে আঘাত করবে তা হরিহর

ভাবতেও পারেন নি। মনে-মনে ভাবলেন, এই লোক কী করে ফ্যাকটরির অ্যাডমিনিসট্রেশন চালাবে। মুখে হরিহর বললেন, "হীরা সিং নিজেও স্বীকার করে গিয়েছে, এরকম রাজকীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা কেউ করে না।"

"বাট হি ইজ ডেড," শ্যামলেন্দু কাতরভাবে বললো।

হরিহর এরপর ব্যাপারটা সহজ করবার জন্য বললেন, "দুঃখ নিশ্চয় হয় স্যার। আপনার যে এতটা কষ্ট হচ্ছে, এটা জানালে ওর বউ এবং ছেলেপুলে ভরসা পাবে। তবে কি জানেন, যারা ওয়াচম্যানের চাকরি করে, তার আগে মিলিটারিতে ছিল, প্রাণের ঝুঁকি আছে জেনেই তো কাজে ঢুকেছে। প্রাণটা বন্ধক রেখেই ওরা রুজিরোজগার করে, তা ওদের বউ-ছেলেমেয়ে সবাই জানে। হয়তো দেখবেন, ওর বাপ এবং ঠাকুরদা ওইভাবেই ফার্স্ট এবং সেকেণ্ড ওয়ার্লড ওয়ারে মরেছে। মরাটা ওদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছে।"

শ্যামলেন্দু তখনই হাসপাতালে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু হরিহর প্রবল আপত্তি জানিয়ে তাকে নিবৃত্ত করেছিলেন। ডেড বডি এখন ময়না তদন্তে যাবে। তারপর ওয়াচ এবং ওয়ার্ডের স্টাফরা দল বেঁধে হাজির হবে। বলা যায় না, তাদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিতে পারে। কোম্পানির ডিরেকটর দেখলে তারা উত্তেজিত হয়ে উঠতে পারে। শ্যামলেন্দু তখনও যেতে চাইলে, হরিহর বললেন, "ঠিক আছে, তেমন বুঝলে আগামীকাল সকালে আপনাকে একবার শ্মশানে নিয়ে যাবো। ইতিমধ্যে, আপনার নামে একটা ফুলের মালা নিউ মার্কেটে অর্ডার দিয়েছি। লিখে দিয়েছি: *In deep sympathy from Mr. S. Chatterjee, Director.* আপনি যখন এতটাই কষ্ট পেয়েছেন, তখন মালাটা একশ' টাকা দামের করে দিচ্ছি। তাছাড়া ওর বউকেও আগামীকাল একটা চিঠি লিখে দেবেন। লায়ন অ্যাণ্ড বড়ালের অ্যাপ্রুভড্ চিঠির খসড়া আমার ফাইলে আছে। দারোয়ান স্টাফের মধ্যে তেমন উত্তেজনা দেখলে আমি ওখানেই ঘোষণা করে দেবো, হীরা সিং-এর ছেলেকে আমরা বেয়ারার চাকরি দেবো। সমস্ত দাহখরচও আমাদের।"

শ্যামলেন্দু আর কোনো উত্তর দিতে পারেনি। কিছুক্ষণের জন্য তার বিচারবুদ্ধি যেন রহিত হয়ে গিয়েছিল।

দোলন ও সুদর্শনা এয়ারপোর্টে যাবার জন্যে তৈরি হয়েই ছিল। শ্যামলেন্দু আসতেই সুদর্শনা হৈ-হৈ করে উঠলো।

"দিন, হাতটা বাড়িয়ে দিন," সুদর্শনা বললো। "একটা হ্যাণ্ডশেক করি। শ্যামলদা আপনি ম্যাজিক জানেন বোধহয়। এই বয়সেই ডিরেকটর! তারপর

কী করবেন ?" সুদর্শনার মতো সরল মেয়েও সেই হাতটা চাইছে। যে-হাতটা শ্রমিকদের নেতারা তুলে নিয়েছিলেন। যে-হাতটা একটু আগেই ফেরিস সায়েবের হাতের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল। শ্যামলেন্দু হাতটা বাড়িয়ে দিতে পারলো না। এই নোংরা হাতে জেনে-শুনে সকলের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করা যায় না।

সুদর্শনাকে কাটিয়ে দু মিনিটের জন্যে নিজের বেডরুমে এসে ঢুকলো শ্যামলেন্দু। পিছন-পিছন দোলনও চলে এসে বললো, "দাঁড়াও, তোমাকে একটা জিনিস দিচ্ছি।" তারপর আনন্দের আতিশয্যে দোলন স্বামীর ঠোঁটে উষ্ণ চুম্বন এঁকে দিলো।

"কিন্তু এ কি ! তোমাকে এমন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে কেন ? তোমার শরীর খারাপ নয় তো ?" দোলন জিজ্ঞেস করলো।

"না, শরীর খারাপ হবে কেন ? তোমরা চলো, শেষে প্লেন ফেল হয়ে যাবে।'

ভি-আই-পি রোড ধরে দমদম এয়ারপোরটে যেতে-যেতে দোলন বললো, "আমাব খুব ভাল লাগছে আজ। তোমার এই খবর, তারপর টুটুলের যদি একটা লেগে যায় !"

"টুটুলের লাগা কেউ আটকাতে পারবে না।" শ্যামলেন্দু বলে।

টুটুল বললো, "আমার প্রথম চয়েস ফরেন সার্ভিস, তারপর অ্যাডমিনিস-ট্রেটিভ সার্ভিস, তারপর আই-আর-এস।"

"কোন দুঃখে তুই দেশত্যাগ করবি ? ফরেন সার্ভিস মানেই তো বিদেশে থাকতে হবে ?" তারপর দোলন জিজ্ঞেস করলো, "হ্যাঁ রে তুই বিয়ে করবি না ?"

পিছনে ফেলে আসা কলকাতার দিকে তাকিয়ে টুটুল বললো, "মার্চেণ্ট অফিসের এগজিকিউটিভের বউ হবার প্রবলেম তো দেখলাম। মাস্টারের বউ হলে খেতে পাবো না, তার চেয়ে নিজের পায়ে ভর দিয়ে বিদেশে পালানো ভাল। মেয়ে হিসেবে আমার শ্লোগান লিবার্টি, ইকোয়ালিটি, ফ্রেটারনিটি !"

শ্যামলেন্দুর মনে হলো টুটুলের রসিকতার মধ্যে কোথায় একটু বেদনাও মিশিয়ে আছে ! এই মুহূর্তে টুটুল বোধহয় রসিকতা করছে না। জামাই-বাবুকে শুনিয়ে-শুনিয়ে কথাগুলো বলছে। গভীর দুঃখের সঙ্গে শ্যামলেন্দু বললো, "মার্চেণ্ট অফিসের দিশী সায়েবদের কথা ছেড়ে দাও—আমাদের কাছে লিবার্টি কথাটার মানে হলো লিবার্টি শার্ট। পিটারস্ ফ্যানের মতো আমরা সকলেই সিলিং থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় সীমাবদ্ধ পরিধিতে ঘুরে মরছি।"

জামাইবাবুকে হঠাৎ ইমোশনাল হয়ে উঠতে দেখে সুদর্শনা চুপ করে রইলো।

দোলনের কিন্তু দুশ্চিন্তার শেষ নেই। বোনকে দোলন বললো, "তোদের

ছেলেমানুষী রাখ। আই-এ-এস হও, আর সায়েবই হও, বিয়ে না করলে মেয়েরা পরিপূর্ণ হয় না।"

"ছেলেরা বিয়ে ছাড়াই পরিপূর্ণ বুঝি ?" সুদর্শনা উল্টে প্রশ্ন করে।

"আবার তর্ক করছিস, টুটুল !"

"আই-এ-এস হলে বিয়ে করতে তো বাধা নেই দিদি।" টুটুল দিদিকে সান্ত্বনা দেয়।

শ্যামলেন্দু বললো, "আমরা যে জগতে বিচরণ করি, সেখানকার কাউকে মালা না দিয়ে ভালই করলে টুটুল। নতুন জগতে নতুন পরিবেশে কাউকে নির্বাচন করার স্বাধীনতা তোমার রয়ে গেল। আমাদের শুধু পাতপেড়ে খাবার নেমন্তন্নটা কোরো।"

লজ্জায় সুদর্শনার মুখ রাঙা হয়ে উঠলো। শ্যামলদা আজকে মোটেই রসিকতা করছেন না, সে বুঝতে পারে। জামাইবাবুর দিকে মুখ ফিরিয়ে সে বললো, "ডিরেকটরের গৃহিণীকে একটু সামলান শ্যামলদা। শ্যালিকা কথা দিচ্ছে আপনাদের মুখ ডোবে এমন কিছু সে করে বসবে না।"

দোলন বললো, "ডিরেকটর হওয়া মাত্রই তুমি কেমন গম্ভীর হয়ে গিয়েছ !"

আনন্দের উত্তেজনায় দোলন ছটফট করছে। কী করবে ভেবে উঠতে পারছে না। এয়ারপোরটের লাউঞ্জে দাঁড়িয়ে দোলন বললো, "আমাদের বাড়ি কোথায় নেবে ? আলিপুর রোড- না বার্ডওয়ান রোডে ? আমার বার্ডওয়ান রোডটা ভাল লাগে।"

এরোপ্লেনে ওঠবার ঘোষণা হয়েছে। টুটুল বললো, "আচ্ছা চলি শ্যামলদা।"

টুটুল একটু এগিয়ে গিয়েছে। করিডর ধরে যেতে-যেতে দোলন ছোট্ট মেয়ের মতো বললো, "আজকেই বাবাকে চিঠি লিখবো। নিজের প্রতিভায় এবং পরিশ্রমে তুমি যে বড় হবে বাবা জানতেন। হ্যাঁগো, এত তাড়াতাড়ি তোমায় কেন ডিরেকটর করলে ? নিশ্চয় খু-উব ভাল কাজ করেছ।"

শ্যামলেন্দুর মাথাটা এবার হঠাৎ ঘুরে উঠলো। কী একটা বলতে গিয়েও আটকে গেল। "কিছু বলবে ?" দোলন জিজ্ঞেস করলো।

শ্যামলেন্দু কিছুই বলতে পারলো না। শ্যামলেন্দু পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। তার সর্বশরীর অবশ হয়ে আসছে। একবার ইচ্ছে হলো চীৎকার করে দোলনকে ডেকে বলে, "দোলন শোনো।" কিন্তু কোথায় দোলন ? দোলন ততক্ষণে এয়ারপোরটের টারম্যাকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

কে যেন একটা লোহার শিক পুড়িয়ে শ্যামলেন্দুর ডান হাতটাকে পুড়িয়ে দিতে চাইছে। নিজেকে হঠাৎ অনাথ এবং নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে। কিন্তু কি

এমন অপরাধ করেছে সে? আর কেউ তা বুঝতে পারেনি ওই ফেরিস সায়েব ছাড়া। ইউনিয়ন থেকে আরম্ভ করে স্ত্রী পর্যন্ত আর সকলেই তো তার ডান হাতটা ধরতে চেয়েছে। কিন্তু মনটা বুঝতে চাইছে না।

ওই মনের মধ্যে দাড়িওয়ালা ইংরেজ কবি উইলিয়ম শেক্সপীয়র হাজির হয়ে চোখ রাঙাচ্ছে তাকে। লোকটাকে দূর করে দেওয়া যায়, কিন্তু লোকটা বলছে, আমাকে ভাঙিয়েই তো একদিন হিন্দুস্থান পিটারস্-এর চাকরিতে ঢুকেছিলে!

এয়ারপোরট রেস্তরাঁয় হুইস্কির গেলাসে চুমুক দিয়ে শ্যামলেন্দু ফিস-ফিস করে অদৃশ্য লোকটাকে বললো, "প্লিজ আমার কানের কাছে আর কোটেশন দেবেন না। আমাকে ডিস্টার্ব করবেন না। আমি লাস-কাটা ঘরের এক কোণে বসে হীরা সিংকে দেখছি। ওর দেহকে ফালা-ফালা করে কেটে ডাক্তারবাবু মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করছেন। বাড়িতে তার সদ্য-বিধবা স্ত্রী মাটিতে আছড়ে পড়ছে।"

দাড়িওয়ালা লোকটা তবু কথা শুনছে না। আরও কাছে এগিয়ে এসে বিড়-বিড় করে কী সব বলছে। শ্যামলেন্দু বিরক্ত হয়েই বললো, "আপনার স্পর্ধা কম নয়, আপনি হিন্দুস্থান পিটারস্ লিমিটেডের ডিরেকটরের প্রাইভেসী ভঙ্গ করছেন! কোটেশন দেবার ইচ্ছে থাকলে আপনি পাটনাতে আমার ভূতপূর্ব মাস্টারমশাই বটুকেশ্বর ভট্টাচার্যের কাছে যান।"

লোকটা তবু কানের কাছে মুখ লাগিয়ে নাটকীয় কায়দায় বলছে, "*As ambitious as Lady Macbeth, Cromwell I charge thee, fling away ambition ; By that sin fell the angels.*"

"দাঁড়াও আমি লোকজন ডাকছি। বেয়ারা, বেয়ারা", শ্যামলেন্দু চীৎকার করে উঠলো। এয়ারপোরট রেস্তরাঁর বেয়ারা ছুটে এসে বললো, "স্যার অনেকক্ষণ হয়েছে। এবার বাড়ি যাবেন?"

অফিসের গাড়ি নিয়ে ড্রাইভার সৃষ্টিধর এরোড্রামের সামনে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছিল। সৃষ্টিধর দেখলো সায়েব টলতে টলতে ফিরছেন। এয়ার-পোরট রেস্তরাঁয় দারুপান ভালই হয়েছে, সৃষ্টিধর ভাবলো।

রাতের অন্ধকারে দমদম ভি-আই-পি রোড ধরে বেশ জোরে গাড়ি চালাতে-চালাতে সৃষ্টিধর দেখলো তার সায়েব ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছেন।

গিয়ার-চেঞ্জিং নব্-এ হাত রেখে সৃষ্টিধর ভাবছে সায়েবকে একবার জিজ্ঞেস করে কী হলো। কিন্তু পরের মুহূর্তে মনে পড়লো, সায়েব আজ ডিরেকটর

হয়েছেন। লেখাপড়া তেমন শেখেনি সৃষ্টিধর, কিন্তু সে এইটুকু জানে, খুব আনন্দ হলে মানুষ অনেক সময় কেঁদে ফেলে। সৃষ্টিধর সায়েবকে আর জ্বালাতন করলো না।

সামনের গাড়িটাকে ওভারটেক করার আদিম নেশায় সৃষ্টিধর হেডলাইটটা জ্বালিয়ে গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিলো।

সীমাবদ্ধ সম্পর্কে

জনসমক্ষে আত্মপ্রকাশের আগে 'সীমাবদ্ধ'র নায়ক-নায়িকারা প্রায় দশ বছর আমার মনের মধ্যে অজ্ঞাত বাস করেছেন।

ঐ সময় বিখ্যাত এক আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কাজকর্ম সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত জানা-শোনার সুযোগ হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী এই ভারতবর্ষে শিল্প-বিপ্লবের নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে: যে সব কাঁচের ঘরে একদা শ্বেতাঙ্গদের আসন সংরক্ষিত ছিল সেখানে ভারতীয়রা বিদ্যাবুদ্ধি ও পরিশ্রমের দ্বারা নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে আরম্ভ করেছেন। কিন্তু নতুন যুগের এই শিল্পনায়কদের কাছে যা প্রত্যাশা করা গিয়েছিল তা কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না এমন একটা অভিযোগ শ্রমিক ও কর্মীদের মধ্যে ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কোনো-কোনো প্রতিষ্ঠানে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছয় যে প্রকাশ্যে কর্মীরা বলাবলি করতেন—'কালা সায়েবদের থেকে গোরা সায়েবরাই ভাল। ওঁদের সঙ্গে কাজকর্ম আলাপ-আলোচনা অনেক সহজ।'

শিল্প-বিপ্লবের এই নতুন অভিজাত সম্প্রদায়কে অনেকে 'ভিলেনের চেয়েও খারাপ' বলে ভাবতে অভ্যস্ত হলেন। এই সব নব-নায়করাও সায়েবদের জীবনযাত্রা নির্লজ্জভাবে নকল করতে গিয়ে ব্যক্তিজীবনে নানা সমস্যা ডেকে আনলেন এবং এদেশের জনজীবনের মূল প্রবাহ থেকে নিজেদের স্বেচ্ছানির্বাসিত করলেন। স্বদেশে জন্ম নিয়েও এঁরা হঠাৎ একদিন প্রবাসী হয়ে উঠলেন। নিচুতলায় সহকর্মীদের বিদ্বেষকে এঁরা সপরিবারে হিংসে বলে উড়িয়ে দিলেন। মানুষের মধ্যে দূরত্ব বাড়লো, বিচ্ছিন্নতার প্রাচীর জেলখানার পাঁচিলকেও লজ্জা দিতে লাগলো।

মানবিক সম্পর্কের এই অবস্থা যে-কোনো উপন্যাস লেখকের পক্ষেই পরম লোভনীয় বস্তু। এই উচ্চবিত্ত ও বিলাসিতার জীবনকে ভুল না বুঝে, এঁদের ওপর কোনো রকম অবিচার না-করে কিছু কাজ করার ইচ্ছে হঠাৎ আমার মধ্যেও প্রবল হয়ে উঠলো। কয়েক বছরের মধ্যে কয়েকজন শুভানুধ্যায়ীর সহযোগিতায় বেশ কিছু উপাদানও সংগ্রহ করলাম। 'সীমাবদ্ধ'র শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জি শীতের এক পড়ন্ত দুপুরে আমার মনের পর্দায় নিঃশব্দে আত্মপ্রকাশ করলেন। যেহেতু শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জি আমার উপন্যাসের নায়ক এবং তাঁকে আমি ভিলেন করে তুলতে চাই না, সেহেতু একদিন তাঁর সুন্দরী শিক্ষিতা শ্যালিকা টুটুলও পাটনা থেকে ঘটনাস্থলে হাজির হলেন!

এত জায়গা থাকতে পাটনা কেন? কারণ, একসময় মাঝে-মাঝে আমাকে পাটনা যেতে হতো এবং রেলের কামরায় একবার এক সপ্রতিভ বালিকার সাময়িক অভিভাবকত্ব নিতে হয়েছিল, যে দিদি ও জামাইবাবুর সঙ্গে অবকাশ বিনোদনের জন্যে কলকাতায় আসছিল। বলাবাহুল্য, এই জামাইবাবুটি বিলিতী কোম্পানির তরুণ অফিসার।

এত সব প্রস্তুতি সত্ত্বেও উপন্যাসের পরিকল্পনা বেশীদূর গেল না। উপন্যাসের কাঠামো আঁকবার সময় আমি এমন একটা ঘটনা সন্ধান করছিলাম যেখানে উচ্চাভিলাষী নায়ক পরিস্থিতির দুর্বিপাকে এমন কাজ করবে যা ঠিক বে-আইনী নয়, কিন্তু 'ইম্‌মরাল'। বিবেক বহির্ভূত এই অপরাধের দংশন আমার উপন্যাসের ক্লাইমেক্সের পক্ষে অপরিহার্য মনে হয়েছিল। এই ঘটনার সন্ধানে বহু জায়গায় গেলাম, বহু খোঁজখবর করলাম—কিন্তু আশানুরূপ ফল না-হওয়ায় উপন্যাস রচনার কাজ বন্ধ রইলো। পরের বছর আবার অনুসন্ধান শুরু হলো কিন্তু পছন্দমতো ঘটনা এবারেও জোগাড় হলো না। মনে আছে, এই সময় বিভিন্ন গোপন সূত্র থেকে সম্ভাব্য অপরাধের একটা দীর্ঘ তালিকাও তৈরি করেছিলাম—কিন্তু যা চাইছি তা কিছুতেই মিললো না।

অতি প্রয়োজনীয় এই ঘটনার অভাবে উপন্যাস রচনার পরিকল্পনা যখন বাতিল করবো ভাবছি ঠিক সেই সময় একদা-পরিচিত এক মহিলা টেলিফোন অপারেটর আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন, জানা-শোনা অফিসে কোনো কাজকর্ম খালি আছে কিনা। তাঁকে আমি জানা-শোনা অফিসে এক বন্ধুর কাছে পাঠালাম। কিন্তু তার আগে জানতে চাইলাম, কেন তিনি বিখ্যাত অফিসের ভাল-মাইনের কাজ ছাড়তে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন? মহিলা বন্ধুটি সেই সময়ে চুপিচুপি বললেন, তাঁর বর্তমান অফিসে গোলমাল আসন্ন। ওখানে বিরাট এক্সপোর্টের চুক্তি রয়েছে, যা মান্য করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং ক্ষতিপূরণের ভয়ে, ওঁরা হয়তো কারখানায় গোলমাল বাধিয়ে দেবেন।

মহিলা বিদায় নিলেন, কিন্তু নিজের অজান্তে আমাকে মহাবিপদ থেকে উদ্ধার করে গেলেন। যা আমি তিন বছর থেকে খুঁজছি তা এক মুহূর্তেই পেয়ে গেলাম। আশ্চর্য ব্যাপার, সপ্তাহখানেকের মধ্যেই বিখ্যাত সেই প্রতিষ্ঠানে 'শ্রমিক অশান্তি'র জন্য সত্যই লক-আউট হলো। আমার মহিলা-বন্ধুটির কাছে আর একবার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি—তাঁর সঙ্গে দেখা না-হলে 'সীমাবদ্ধ' হয়তো লেখা হতো না।

সংবাদপত্রের বিশেষ সংখ্যায় 'সীমাবদ্ধ' প্রকাশিত হবার পর নানা ধরনের

রি-অ্যাকশন হয়। সাধারণ পাঠক-পাঠিকারা খুব খুশী হলেন। কোনো-কোনো ট্রেড ইউনিয়ন নেতা এবং কিছু পদগর্বিত বঙ্গসন্তান কিন্তু মোটেও সন্তুষ্ট হতে পারেননি। নেতাদের দুঃখ শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জির প্রতি আমি যথোপযুক্ত কঠোরতা দেখাতে পারিনি—এরা যে সমাজের শত্রু তা ঠিকমতো আঁকা হয়নি। সায়েবপাড়ায় সস্ত্রীক দিশী সায়েবদের কেউ-কেউ সন্দেহ করলেন, নতুন জেনারেশনের উচ্চাভিলাষী সুশিক্ষিত ও পরিশ্রমী যুবকদের সমাজের চোখে অকারণে হেয় করবার ষড়যন্ত্রে আমি অংশ নিয়েছি। একজন নবনিযুক্ত তরুণ ডিরেকটরের স্ত্রী তো অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে অভিযোগ করলেন—জামাইবাবুর পদোন্নতির শুভ সংবাদ পেয়ে তাঁর ভগ্নী যে অভিনন্দনপত্র পাঠিয়েছে তাতে লেখা আছে, "সীমাবদ্ধর শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জির মতো আপনি কী কী গোপন কুকর্ম করলেন তা জানবার আগ্রহ রইলো।"

আর একজন প্রতিভাবান উচ্চপদাধিকারী প্রকাশ্য এক অনুষ্ঠানে অভিযোগ করলেন, তিনি ও তাঁর সহকর্মীর তীব্র প্রতিযোগিতার বিষয়ে খোলাখুলি লিখে আমি তাঁকে লোকচক্ষে হেয় করেছি। সৌভাগ্যক্রমে, সেই অনুষ্ঠানে আরও কয়েকজন ভদ্রলোক তাঁদের অফিসে অনুরূপ রেষারেষির ঘটনা বর্ণনা করলেন। এই ধরনের এতগুলি ঘটনা আমার কানে আসে যে এক-একসময়ে ভয় হয় যে প্রায় প্রত্যেক অফিসেই কয়েকজন শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জি সমসংখ্যক রুনু সান্যালের সঙ্গে জীবন-মরণ লড়াইয়ে ব্যস্ত রয়েছেন।

আর একজন মধ্যবয়সী ম্যানেজারের কথা মনে পড়ছে। নিজের অফিসে শ্রমিকদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার সময় সীমাবদ্ধ প্রসঙ্গ বেশ শ্লেষের সঙ্গে উত্থাপিত হওয়ায় তিনি বিশেষ দুঃখিত হন। এবং এক পত্রযোগে আমার কাছে তাঁর ব্যক্তিগত অভিযোগ নিবেদন করেন: 'দেশের সমস্ত প্রতিভাবান উচ্চাভিলাষী পুরুষই কী নীতিহীনতা ও নির্লজ্জ বিলাসীতার কৃত্রিম পৃথিবীতে বসবাস করছে? যারা সীমাবদ্ধ তাদের কথা তো বিশ্ববাসীকে নিবেদন করলেন, কিন্তু সকলের অলক্ষ্যে কলে-কারখানায় যারা নীরবে নতুন ভারতবর্ষ সৃষ্টির সাধনায় মগ্ন রয়েছে, ইতিহাস ও পরিবেশের নানা বিপত্তি সত্ত্বেও যারা সীমানা-মুক্ত হবার স্বপ্ন দেখছে তাদের কথা কে লিখবে?'

অপরিচিত ভদ্রলোকের এই চিঠিখানি আমাকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। আশা আকাঙ্ক্ষা উপন্যাসের কথা তখনই ভাবতে আরম্ভ করি।

এই উপন্যাসের পুনঃপ্রকাশ উপলক্ষে সেই ঠিকানাহীন অপরিচিত ভদ্রলোককে আমার প্রীতিনমস্কার জানাই।

—জুলাই, ১৯৭৬

লেখকের নিবেদন

বছর কয়েক আগে কোনো এক ছুটির দিনে। বাংলার বাইরে গিয়েছিলাম। সেখানকার এক আণবিক গবেষণাগারে কয়েকজন তরুণ বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে আকস্মিকভাবে পরিচিত হবার সুযোগ এসেছিল। সেই পরিচয় থেকেই এই উপন্যাসের সূত্রপাত। আমাদের এই ভারতবর্ষে তাঁরা নীরবে যে আশা আকাঙ্ক্ষার স্বর্ণলোক সৃষ্টির চেষ্টা করছেন তা সার্থক হোক, দেশজননীকে তাঁরা স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করুন এই প্রার্থনা।

শংকর

কমলেশ রায়চৌধুরীর জীবনে একটু আগে যে অধ্যায় শুরু হয়েছে, সহজেই তার নামকরণ করা যায়: 'ফুলশয্যার পরেই'। নবদম্পতির জীবনে সেই পরম আকাঙ্ক্ষিত, চরম রোমাঞ্চকর এবং বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতার পর মাত্র কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত হয়েছে। এমন সময়ে সুখশয়নের নায়ককে একাকী হাওড়া স্টেশনে ট্রেনের কামরায় বসে থাকতে দেখার কোনো যুক্তি থাকতে পারে না।

কিন্তু বত্রিশ বছরের সুদর্শন কমলেশ রায়চৌধুরী সত্যিই হাওড়া চন্দনপুর এক্সপ্রেসের প্রথম শ্রেণীর কামরায় বসে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। গত রাত্রে নতুন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হওয়ার পরও তার মুখে তীব্র বিরক্তির রেখা ফুটে উঠেছে কেন?

সাধারণ বাঙালীদের তুলনায় কমলেশ একটু লম্বা। সুতপাদি সেবার ফোন করে জানতে চেয়েছিলেন, "ভাই, তোমার হাইট কত?"

কমলেশ ফোন ধরে বলেছিল, "বেশ মানুষ তো আপনি? একটা লোক কতখানি লম্বা জানবার জন্যে কলকাতা থেকে চন্দনপুরে ট্রাঙ্ক টেলিফোন করছেন!"

"আঃ কমলেশ, তুমি বড্ড কথা বাড়াতে পারো। জানোই তো মাত্র তিন মিনিট সময়। চটপট তোমার হাইট বলে ফেলো," কলকাতা থেকে সুতপাদি অনুরোধ করেছিলেন।

"আমার হাইট নিয়ে আপনার কি হবে?" কৌতূহলী কমলেশ একটু অবাক হয়েই প্রশ্ন করেছিল।

সুতপাদি এবার ট্রাঙ্ক কলের রহস্য ফাঁস করলেন, "একটি সুন্দরী মহিলার মাকে তোমার সম্পর্কে খবরাখবর দিতে হবে, বুঝলে শ্রীমান? মেয়েটির গোঁ, পুরুষমানুষ খুব লম্বা না-হলে গলায় মালা দেবে না।"

"লিখে নিন—১'৮০ মিটার," কমলেশ সুতপাদিকে বলেছিল।

"আঃ কমলেশ! আইসক্রিমের মতো ফর্সা মিষ্টি একটা কমবয়সী নরম মেয়ে সেন্টিমিটার থেকে কী করে ভাবী বর সম্বন্ধে আন্দাজ পাবে?"

কমলেশ রসিকতা করেছিল, "তাহলে কিলোগ্রামে লিখে নিন—গতকালই ওজন নিয়েছি: ৬৬ কিলো। গজ-ফুট-ইঞ্চি, মণ-সের-ছটাক এসব যে বাতিল হয়ে এখন মেট্রিক হিসেব চালু হয়েছে জানেনই তো।"

ওপার থেকে সুতপাদি বলেছিলেন, "কিলোতে গিয়ে কী জিনিস হাতছাড়া করছো জানো না! পাত্রী ইতিহাসে এম-এ পড়ে, অতশত অঙ্ক জানে না। তোমার হাইট কত বলো। পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি?"

সুতপাদি ঠিক ধরেছেন। কমলেশ জানতে চাইলো, "আন্দাজ করলেন কেমন করে?"

সুরসিকা সুতপাদি সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিলেন, "কেন! আমার কর্তার পাশে ফেলে। উনি হচ্ছেন পাঁচ ফুট আট—তার থেকে ইঞ্চি তিনেক লম্বা তুমি।"

সুতপাদি চন্দনপুরে ফিরে আসবার পরে কমলেশ বলেছিল, "ধন্য আপনারা আজকালকার মেয়েরা! সে-যুগে মেয়েরা বিয়ের আগে তাদের স্বামীর নাম পর্যন্ত জানতো না, জিজ্ঞেস করবার সাহসও পেতো না। আর আজকালকার মেয়েরা ভাবী বরের নাড়ী-নক্ষত্রের খবর নিচ্ছে। তাছাড়া বিয়ের পর আপনারা স্বামীদের বাড়তেও দিচ্ছেন না!"

"মানে?" সুতপাদি কপট রাগ দেখিয়ে কমলেশের অভিযোগের বিস্তারিত ব্যাখ্যা চেয়েছিলেন।

শুভাশিস্‌দাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে কমলেশ বলেছিল, "বিয়ের আগেও দাদার যা উচ্চতা ছিল এখনও তাই রয়েছে—পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি।"

"তাতে মহাভারতের কী অশুদ্ধি হয়েছে শুনি?" তর্কে পারদর্শিনী সুতপাদি টিপয়ে চা রাখতে-রাখতে দেবরসদৃশ কমলেশকে কোণঠাসা করবার চেষ্টা করলেন।

কমলেশ চায়ের কাপে মুখ দিয়ে বলেছিল, "মাই ডিয়ার সুতপাদি, পুরাকালের ঋষিরা বলেছিলেন—শুয়ে থাকাটাই কলি, বসে থাকাটাই দ্বাপর,

উঠে দাঁড়ানোই ত্রেতা এবং চলাটাই হলো সত্যযুগ। আর আমাদের এই যুগে, ম্যানেজমেণ্ট শাস্ত্রে বলছে……"

"রাখো তোমাদের ম্যানেজমেণ্ট শাস্ত্র," সুতপাদি এবার কমলেশকে মিষ্টি মুখঝামটা দিলেন।

"বেশ! পতিদেবতার মুখেই শুনুন, উনিও তো আজ দিগম্বর বনার্জির সেমিনার লেকচার সেবন করেছেন।"

শুভাশিস্দা বললেন, "আমাদের বলা হচ্ছে, গ্রোথ অর্থাৎ এই বাড়ন্ত ভাবটাই হলো জীবন। বাড় না-থাকাটাই এক ধরনের মৃত্যু। প্রত্যেক কোম্পানিকে, এমন কি আমাদের এই ভারত সরকারী সংস্থা হিন্দুস্থান অ্যাগ্রো-কেমিক্যালস্ লিমিটেডকে, স্রেফ বেঁচে থাকবার জন্যে প্রতিবছর অন্ততঃ শতকরা দশভাগ বেড়ে যেতে হবে।"

কমলেশ হাসতে-হাসতে মন্তব্য করেছিল, "সুতপাদি, তার মানে শুভাশিস্দাকেও বছরে শতকরা দশভাগ বাড়বার অনুপ্রেরণা দিতে হবে আপনাকে!"

"দিচ্ছি!" সুতপাদি নিজের নরম সুন্দর মুখ বেঁকিয়েছিলেন। স্বামীকে সাবধান করে দিয়েছিলেন, "অফিসে যত খুশী বাড়াবাড়ি করো; কিন্তু নিজের ওজন বাড়ালেই ডাইভোর্স!"

ঘরোয়া আক্রমণে বিপর্যস্ত শুভাশিস্দার পক্ষ নিয়ে কমলেশ টেবিলে আলতো টোকা মেরে প্রশ্ন তুলেছিল, "বিয়ের সঙ্গে ওজনের সম্পর্ক কী?"

প্রশ্নটার ওপর কোনোরকম গুরুত্ব না-দিয়ে সুতপাদি মিটমিট করে হাসতে লাগলেন। এবং যার জন্যে লড়াই করা সেই শুভাশিস্দা নির্লজ্জভাবে বউকে সাপোর্ট করলেন। কমলেশের অনভিজ্ঞতা যে ধরা পড়ে গিয়েছে তার ইঙ্গিত দিয়ে তিনি বলেছিলেন, "আছে আছে; দাম্পত্যজীবনের সঙ্গে নরনারীর ওজনের একটা নিবিড় সম্পর্কই আছে! এখনও আইবুড়ো রয়েছ, বিয়ে-শাদি হোক তখন বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে।"

শুভাশিস্দার উত্তর শুনে অমন যে সপ্রতিভ সুতপাদি, তিনিও একটু লজ্জা পেয়েছিলেন। মুখের হাসি চেপে রেখে গম্ভীর ভাব করে তিনি অন্যদিকে তাকিয়েছিলেন, যেন কথাটা শুনতেই পাননি।

শুভাশিস্দার শেষ কথাটাও এখন ট্রেনের কামরায় বসে কমলেশের মনে পড়ে যাচ্ছে। শুভাশিস্দা বলেছিলেন, "আসলে, মেয়েরা সব সময় একটা মাঝামাঝি জিনিস চায়—কমও নয় বেশিও নয়। খুব রোগা নয়, মোটাও নয়।"

শুভাশিস্‌দা জিওলজির ছাত্র। কমলেশের সঙ্গে একই কলেজে পড়েছেন —কয়েক বছরের সিনিয়র। কিন্তু কলেজ হোস্টেল থেকেই কমলেশের সঙ্গে আলাপ ছিল। তারপর পাকে-চক্রে কর্মসূত্রে এই চন্দনপুরে দুজনের আবার দেখা হয়ে গেল। ইতিমধ্যে কমলেশ এম-টেক পাস করেছে; নামের সামনে একটা 'ডক্টর' যোগ হয়েছে। আর শুভাশিস্‌দাও বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন পড়াশোনা করে দু-একটা বাড়তি ডিগ্রির রবার স্ট্যাম্প জোগাড় করেছেন। শুভাশিস্‌দা হিন্দুস্থান অ্যাগ্রো-কেমিক্যালস্‌-এ বেশ জাঁকিয়ে বসেছিলেন। শুভাশিস্‌-গৃহিণী সুতপা মজুমদার ব্যাচেলর কমলেশ রায়চৌধুরীকে প্রায়ই বাড়িতে নেমন্তন্ন করেন।

দেবরসদৃশ কমলেশকে সুতপাদিই বলেছিলেন, "আর এইভাবে আইবুড়ো হয়ে কতদিন যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াবে ভাই?"

সুতপাদির স্নেহপ্রশ্রয়ে কমলেশ খুব সহজ হয়ে যেতে পারে। সে হেসে বললো, "স্বীকার করছি আমি আইবুড়ো। কিন্তু 'যেখানে-সেখানে' ঘুরে বেড়াচ্ছি এমন বদনাম দিচ্ছেন কেন?"

কমলেশের প্রশ্নে মোটেই বিব্রত হলেন না আধুনিকা সুতপাদি। কমলেশের দিকে ডান হাতের আঙুল তুলে বললেন, "ব্যাচেলরদের আমি মোটেই বিশ্বাস করি না!"

কমলেশ নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণ করবার জন্যে বললো, "চরে খাবার সময় কোথায়, সুতপাদি? নিজের কাজকর্ম, নিজের ল্যাবরেটরি এবং নিজের ডিরেকটর দিগম্বর বনার্জিকে নিয়েই তো মশগুল আছি!"

সুরসিকা সুতপাদি সঙ্গে-সঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন, "ব্যস্ত হয়তো আছো কিন্তু মশগুল কিনা জানি না। সত্যেন দত্ত লিখেছিলেন: আমি চাই মধু মশগুল হাওয়া।"

"শুভাশিস্‌দা, সত্যি আপনি গুছিয়ে নিতে জানেন: দেখে-শুনে খুঁজে পেতে বিয়ে করলেন বাংলায় এম-এ সুতপাদিকে। কথায়-কথায় মিষ্টি-মিষ্টি কোটেশন পাচ্ছেন!"

কমলেশের কথা শুনে মজুমদার দম্পতি অনেকক্ষণ ধরে হেসেছিলেন। তারপর সুতপাদি কোলের ওপর পড়ে-যাওয়া আঁচলটা কাঁধে তুলে নিয়ে বলেছিলেন, "বাংলায় এম-এ পাস করা সুন্দরীরা এখনও এদেশে বিরল হয়ে ওঠেনি। প্রতিবছর শতখানেক করে বেরুচ্ছে কলকাতা ইউনিভার্সিটি থেকে। তাছাড়াও আধডজন বিশ্ববিদ্যালয় আছে। একটু ইচ্ছে দেখালেই ঘটকীর ব্যবসায় নেমে যেতে পারি। এম-এ পাস মেয়ের বাবারা এমন ছেলের

খোঁজ পেলে আমার বাড়ির সামনে লাইন দেবে।"

কমলেশ ব্যাপারটাকে এবারে হাল্কা করে দিয়েছিল। গম্ভীরভাবে বলেছিল, "সুতপাদি, এটা মনে রাখবেন, আপনি সরকারী সংস্থায় একজন পদস্থ অফিসারের ওয়াইফ। এইচ-এ-সির বিনা অনুমতিতে সরকারী বাংলো থেকে প্রাইভেট ব্যবসা চালাতে পারেন না। ভিজিলেন্স ডিপার্টমেন্টের দাসাপ্পা আমার জানাশোনা।"

"বেশ করবো, একশ'বার করবো!" সুতপাদি আবার আঁচল সামলে নিলেন। বক্ষদেশের আব্রু সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি বললেন, "আমি তো আর পয়সা রোজগারের জন্যে এ-লাইনে নামছি না। নামছি পুণ্যের লোভে। আইবুড়ো ছেলেমেয়েদের ঘটকালি করলে স্বর্গলাভ হয়।"

মুখটিপে হেসে কমলেশ বললো, "যতই গলা ফাটিয়ে চিৎকার করুন, দাসাপ্পা জানে ঘটকালিটা আজকাল এদেশে একটি ভাল ব্যবসা—অনেকেই টু-পাইস করছে। আপনার অপরাধে দাদা কিন্তু বিপদে পড়ে যাবেন।"

নির্ভীক সুতপাদি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, "তোমাদের তিনটে দাসাপ্পাকে বগলে পুরে রেখে আমি প্রজাপতির কাজ করবো!"

"শাস্তি না হয়ে দাসাপ্পার পক্ষে সেটা দুর্লভ সৌভাগ্যই হতো, কিন্তু বেচারাকে সে-সুযোগ কোনোদিনই দিতে পারবেন না সুতপাদি! ভদ্রলোককে আপনি দেখেননি। অর্ডিনারি ওজন-মেশিনে উঠলে কাঁটা পুরো ঘুরে গিয়ে কল খারাপ হয়ে যায়। খুবই গুরুত্বপুর্ণ পদ তো, তাই তিন মণ ওজনের লোক দেওয়া হয়েছে!"

সুতপাদি এসব কথাতে মোটেই দমে যাননি। কমলেশকে বলেছিলেন, "বাজে কথা ছাড়ো। মেঘে-মেঘে বয়স তো কম হলো না। এখন বিয়ে না করলে, কবে করবে? সোজা পথে না গেলে, শেষ পর্যন্ত কোনো খাণ্ডারনী প্রেমিকার ফাঁদে পড়বে, জীবনটা মিজারেব্‌ল করে ছেড়ে দেবে।"

সুতপাদির সেদিনের কথাগুলো এই মুহূর্তে ট্রেনের কামরাতেও কমলেশের মনে পড়ে যাচ্ছে। আর সেই সঙ্গে গতরাত্রের কথা। গত রাতটা সত্যিই কমলেশের বত্রিশ বছর ধরে গড়া জীবনটাকে মধুরভাবে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে।

কমলেশের কাছে এখন বিবাহের কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই। ডানহাতের মণিবন্ধে হলদে রঙের সুতোটা সে আগেই ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। পকেটে শুধু আছে একটা ছবি। এই ছবিটাও সুতপাদি একদিন কমলেশের কাছে চালান করেছিলেন। বম্বে ফটো স্টুডিওর মিঃ বোসের নিজের হাতে তোলা চন্দ্রমল্লিকার ছবি। মল্লিকার মুখের ওপর স্টুডিওর অনেকগুলো লাইট নানা

কোণ থেকে পড়ে এক বিচিত্র আলো-আঁধারির সৃষ্টি করেছে। চন্দ্রমল্লিকাকে একটু বেশি ফর্সাই দেখাচ্ছে। ঠিক যেন চলচ্চিত্রের নায়িকা—যে-কোনো গল্পে নামিয়ে দেওয়া যায়।

ছবি দেখিয়ে সুতপাদি যখন কমলেশের মতামত জানতে চেয়েছিলেন তখন সে বলেছিল, "সিনেমার কাগজে ছাপিয়ে দিন। ডিরেকটররা দেখলেই চান্স দেবে।"

সেই শুনে সুতপাদি বলেছিলেন, "সিনেমা-থিয়েটার বুঝি না, তোমার জীবনের নায়িকা করে নাও—ঠকবে না।"

কমলেশ মুচকি হেসেছিল। সুতপাদি বলেছিলেন, "ভারি মিষ্টি মেয়ে। যেমন নরম লক্ষ্মীমন্ত গড়ন, তেমনি হরিণ চোখের দুষ্টুমি। যদি একবার ধরা পড়ে যাও সারাজীবন নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবে!"

"ওরে বাবা! ছেলেরা কি গোরু নাকি?" কমলেশ কপট উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল।

"অন্যের কথা জানি না, তবে তুমি একটি গোরু: এইরকম এক উদ্ভিন্ন-যৌবনা সুন্দরীর ছবি হাতে তুলে দিলাম, বিয়ে করো না করো, কিছুক্ষণ খুঁটিয়ে দেখবে তো? তা নয়, একবার দায়সারাভাবে তাকিয়ে খামের মধ্যে পুরে টেবিলে রেখে দিলে," সুতপাদি সোজাসুজি কমলেশকে শুনিয়ে দিয়েছিলেন।

"আহা! করো কি, করো কি! আমার কলেজতুতো ভাই এবং সহকর্মীকে হুলস্থুড়িতে ফেলে এমনভাবে মারছো কেন?" শুভাশিসদা সেই সময় অফিস থেকে ফিরে এসেছিলেন। গিন্নির বক্তব্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়েও শুভাশিসদা কিন্তু কমলেশের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। বলেছিলেন, "হাজার হোক আমরা সরকারী কোম্পানিতে দায়িত্বপূর্ণ পদে রয়েছি—আমাদের প্রেস্টিজবোধ আছে। স্বয়ং নূরজাহানের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব হলেও আমরা হ্যাংলার মতো হুমড়ি খেয়ে পড়তে পারি না।"

"বটে!" স্বামীর দিকে তির্যক দৃষ্টিপাত করে সুতপাদি কপট রাগ দেখালেন।

শুভাশিসদা বললেন, "বেচারাকে একটু সময় দাও। ছবিটা সঙ্গে নিয়ে যেতে অনুরোধ করো। নিজের ঘরে গিয়ে, একান্তে আলো জ্বালিয়ে প্রয়োজন হলে একশ'বার দেখবে, যেমন তোমার ছবিটা আমি দেখেছিলাম···"

সুতপাদির উপরের ঠোঁটে ডানদিকে একটা কালো বিউটি স্পট আছে। রাগ দেখিয়ে মুখ কুঞ্চিত করলে তিলটা স্থানচ্যুত হয়ে ভারি সুন্দর দেখায়। সুতপাদি সেই ভাবেই বললেন, "কলকাতার ছেলেদের মানসিক স্বাস্থ্য দেখছি

মোটেই ভাল নয়।"

"তুমি ইউ পির বাঙালী—সুযোগ পেলেই পশ্চিমবঙ্গবাসীদের গালাগালি দাও। কিন্তু কেন মিথ্যে বলবো, তোমার ছবিখানা আমি প্রথম দিনে সাড়ে-একাশিবার দেখেছিলাম।"

"সাড়ে কেন?" সহাস্য কমলেশ জানতে চেয়েছিল।

শুভাশিস্‌দা বলেছিলেন, "একমাত্র কারণ, আলেখ্যদর্শনের সময় মা বিনা নোটিশে আচমকা ঘরে ঢুকে পড়েছিলেন। আমিও ক্রিকেট খেলোয়াড়—ঝটিতি মালমসলা বালিশের তলায় থো করেছিলাম!"

"তারপর?" সুতপাদিকে বিব্রত করার উপাদান পেয়ে কমলেশ বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠলো।

শুভাশিস্‌দা গম্ভীরভাবে বলেছিলেন, "মা ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারলেন না। ভাবলেন আমি অফিস থেকে ফিরে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে আছি। নিশ্চয়ই মেয়ে পছন্দ হয়নি। তখন মা বললেন, 'খোকা, তুই আর বাধা দিস না! মেয়েটি হিন্দুস্থানী হলেও, বেশ ভাল। লক্ষ্মী সোনা আমার, তুই রাজী হয়ে যা। আমি বললাম, এখন জ্বালাতন কোরো না, একটু ভেবে দেখি। মা তখন ফটোখানা ফেরত চেয়ে বিপদে ফেলে দিলেন! বললাম, কোথায় রেখেছি খুঁজে দেখতে হবে। মা তবুও নাছোড়বান্দা। তখন মোক্ষম দাওয়াই দিলাম, মা, একটু পরে এসো। ভীষণ মাথা ধরেছে।"

সুতপাদি সঙ্গে-সঙ্গে স্বামীকে মধুর মুখ ঝামটা দিলেন, "রাখো রাখো। পুরুষ-মানুষের ভালবাসা মোল্লার মুরগী পোষা! এখন তো মুখ ফিরে তাকিয়েও দেখো না।"

দাম্পত্য কলহ যাতে আর না-বাড়ে সেই উদ্দেশ্যে শুভাশিস্‌দা এবার টেবিল থেকে ছবির খামটা তুলে নিলেন। তারপর খুঁটিয়ে মেয়েটির ছবি দেখলেন। মন্ত্রবৎ কাজ হলো। স্বামীর ওপর মুহূর্তের মধ্যে প্রসন্না হয়ে উঠলেন সুন্দরী সুতপাদি। একগাল হেসে বললেন, "তুমি তো চন্দ্রমল্লিকাকে আগে দেখোনি। কেমন মনে হচ্ছে? শিষ্যকে একটু সৎপরামর্শ দাও।"

শুভাশিস্‌দার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। "যদি ফ্র্যাংক ওপিনিয়ন চাও, তাহলে সোজাসুজি বলবো: কোকাকোলা।"

শুভাশিস্‌দার মন্তব্য শুনে দুজনেই মাথায় হাত দিয়ে বসলো। সন্দিগ্ধ সুতপাদি এবার স্বামীকে সাবধান করে দিলেন, "আমার আত্মীয়স্বজন নিয়ে তোমাদের কারখানার সস্তা রসিকতা চলবে না, একথা আগে থেকেই বলে রাখছি কিন্তু।"

আত্মরক্ষায় তৎপর শুভাশিস্‌দা বললেন, "সস্তা সমালোচনা হলো? এতবড়

প্রশংসা করলাম! পড়োনি বিজ্ঞাপন: *Things go well with Coke*—সোজা বাংলা করলে যার মানে: জমে ভাল কোকাকোলা থাকলে!" এবার কমলেশের দিকে চোখ ফিরিয়ে শুভাশিস্‌দা বললেন, "বুঝলে ব্রাদার! ওয়াইফের দূরসম্পর্কের আত্মীয় বলে নয়—নামটা একটু জবড়জং হলেও, এ-মেয়ের সঙ্গে জমবে ভাল।"

স্নুতপাদি কয়েকদিন পরে আবার টেলিফোনে খবরাখবর নিয়েছিলেন। "কী হলো কমলেশ? ছবি দেখে এমন ঘাবড়ে গেলে যে আর দাদার বাড়িমুখো হচ্ছো না?"

কমলেশ বলেছিল, "উঃ স্নুতপাদি, আর বলবেন না। কর্তা একেবারে ভাবের ঘোরে রয়েছেন। কাজ-কাজ ছাড়া ক'দিন কিছুই বুঝছেন না। এতই তো বশীকরণ মন্ত্র জানেন, বুড়ো এন ডি বনার্জির একটা বিহিত করতে পারেন না?"

এইচ-এ-সির ডিরেকটর নোয়েল দিগম্বর বনার্জিকে স্নুতপাদি যে একেবারেই পছন্দ করেন না, তা কমলেশের অজানা নয়। স্নুতপাদি গম্ভীর হয়ে বললেন, "হিন্দুস্থান সার কোম্পানি সমস্ত ভারতবর্ষ খুঁজে-খুঁজে আর লোক পেলো না—কোথা থেকে যে খেংরা-গুঁফোকে এনে চন্দনপুরে বসালো। রসকষ একটুও নেই।"

কমলেশ বলেছিল, "রস না থাকুক কষের যে অভাব নেই এ-কথা আপিসের লোকেরা হাড়ে-হাড়ে জানে, স্নুতপাদি।"

স্নুতপাদি বললেন, "তোমাদের অফিসের কথা থাক। চন্দনপুরে দিনরাত অফিস-কীর্তন শুনতে-শুনতে কান পচে গেল। তুমি 'কোকাকোলা'র কী করলে বলো?"

কমলেশ সলজ্জভাবে মন্তব্য করেছিল, "মহিলাটি কোকাকোলার মতোই বরফ-ঠাণ্ডা নয়তো?"

বউদিরা অন্যদিকে যতই স্নেহশীলা হোক, প্রেমের দৌত্যে অনেক সময় তারা নিষ্ঠুর হতে দ্বিধা করে না। না-হলে, এই বরফ-ঠাণ্ডার ব্যাপারটা কেউ সোজাসুজি অপর পক্ষের কানে তুলে দেয়?

কলকাতায় কয়েকদিন ছুটিতে এসেছিল কমলেশ। সেই সময় স্নুতপাদি সুযোগ বুঝে হাজির হয়েছিলেন। স্নুতপাদির আগ্রহেই চন্দ্রমল্লিকার সঙ্গে কমলেশের সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হয়েছিল। প্রথমে মেট্রো সিনেমা, তারপর পার্ক স্ট্রীটে কোয়ালিটি রেস্তরাঁয়। সঙ্গে স্নুতপাদি ছাড়া আর কেউ ছিল না। স্নুতপাদির ভাষায়, এর নাম কনট্রোলড্‌ প্রণয়!

চন্দ্রমল্লিকা সেদিন কী সুন্দর সেজেছিল। সাজ-সাজ ভাব নেই, অথচ সাজ। আমাদের শিক্ষিত আধুনিকারা এই আর্ট আজকাল বেশ আয়ত্তে এনেছে। দেখানোর ব্যস্ততা নেই ; অথচ আমার যে সবই আছে এই আত্মবিশ্বাস ছড়িয়ে আছে চন্দ্রমল্লিকার দেহে মুখে ভঙ্গিতে চলনে বলনে।

স্নুতপাদি বলেছিলেন, "তোমাদের আলাপ করিয়ে দিই। এই হলো আমার পিসতুতো দিদির ছোট মেয়ে চন্দ্রমল্লিকা চ্যাটার্জি—ওরফে মল্লিকা—ওরফে ঝুমঝুমি। জন্ম এলাহাবাদে, প্রথম জীবন কেটেছে বোম্বাইতে ; তারপর বাবার চাকরির সঙ্গে বদলি হয়ে এসেছে কলকাতায়। কনভেন্ট শিক্ষিতা বলতে পারো—কারণ ডায়োসেশানের ছাত্রী। তারপর আশুতোষ থেকে বি-এ 'হন্‌স্‌' হয়ে এখন কলেজ স্ট্রীট থেকে এম-এ পরীক্ষা দিয়েছে। রেজাল্ট বেরোয়নি, পরীক্ষা কেন্দ্রে টোকাটুকি করে কোনো বিপত্তি বাধিয়ে এসেছে কিনা জানা নেই!"

"আঃ মাসি," চন্দ্রমল্লিকা চাপা রাগ প্রকাশ করে স্নুতপাদিকে আয়ত্তে আনবার চেষ্টা করেছিল।

স্নুতপাদি বলেছিলেন, "ইনি কমলেশ রায়চৌধুরী। আমাদের প্রোজেক্টের নামকরা বৈজ্ঞানিক। সারকেই জীবনের সারসত্য বলে মেনেছেন। আই-আই-টির এম-এসসি টেক। তারপর পাগলা দিগম্বরের নেকনজরে পড়ে মহামান্য ভারত সরকার পরিচালিত হিন্দুস্থান অ্যাগ্রো-কেমিক্যালস্-এ দ্রুত উন্নতি করছেন। সায়েনটিস্ট সম্বন্ধে অনেক ইংরেজী নভেল পড়েছ নিশ্চয়, কিন্তু বৈজ্ঞানিক চোখে দেখেছ কিনা জানি না ; তাই আলাপ করিয়ে দিলুম।"

"দেশে হাজার-হাজার বৈজ্ঞানিক রয়েছেন, দেখবার কী আছে?" এই বলে কমলেশ হাত তুলে নমস্কার করেছিল চন্দ্রমল্লিকাকে। একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল চন্দ্রমল্লিকা। কিন্তু দ্রুত সাহস সঞ্চয় করে কমলেশকে একটা পরিচ্ছন্ন প্রতিনমস্কার জানিয়েছিল।

স্বল্পালোকিত কোয়ালিটি রেস্তরাঁয় স্নুতপাদি দুজনকে মুখোমুখি বসিয়েছিলেন। তারপর গম্ভীরভাবে বলেছিলেন, "এ-কোথায় আনলে বাবা কমলেশ? একেবারে অমাবস্যার অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না।"

স্নুতপাদি যে জীবনে এই প্রথম কোয়ালিটি রেস্তরাঁয় আসছেন এমন নয়। কমলেশ বুঝলো স্নুতপাদি সুযোগ পেয়ে চাপা রসিকতা করছেন।

কফির কাপে চামচ নাড়তে-নাড়তে কমলেশ ও চন্দ্রমল্লিকা দুজনেই চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল। স্নুতপাদি বললেন, "অন্য সময়ে দুজনেই এক কথা বলো, এখন কী হলো?"

কমলেশ বাধ্য হয়ে নিস্তব্ধতা ভাঙবার চেষ্টা করলো। বললো, "ইতিহাস

সে তো অতীতের ব্যাপার; আর বিজ্ঞান, এ-বিষয়ে আমাদের ডিরেক্টর ডকটর বনার্জি বলেন, ভবিষ্যৎ নিয়েই আমাদের কাজ কারবার।"

চন্দ্রমল্লিকা চুপ করেই শুনছিল। স্থতপাদি খোঁচা দিয়ে বললেন, "বৈজ্ঞানিকদের আজকাল বড় দেমাক, এমন ভাব দেখান যেন পৃথিবীটা ওঁদেরই হাতের মোয়া। ছাড়িস না ঝুমঝুমি, একটা কড়া উত্তর দিয়ে দে।"

চন্দ্রমল্লিকা ওর বড় বড় চোখ দুটো আরও বড় করে নিঃশব্দ হাসি ফুটিয়েছিল। তারপর বলেছিল, "জানো মাসি, আমাদের হেড-অফ-দি ডিপার্টমেণ্ট প্রায়ই বলেন: অতীতকে প্রভাবিত করবার সাধ্য মানুষের নেই। বর্তমান সে তো তার নিজস্ব রূপ নিয়ে আমাদের সামনে এসেই পড়েছে। স্থতরাং হাতে আছে কেবল ভবিষ্যৎ। একমাত্র ইতিহাসের আলোতে বর্তমানে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যৎ তৈরি করা যায়।"

স্থতপাদি বললেন, "বেশ উত্তর হয়েছে।"

এরপর ছল করে স্থতপাদি কিছুক্ষণের জন্যে টয়লেটের দিকে চলে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "তোমরা কফি খাও, কথাবার্তা চালাও, আমি এক মিনিটে আসছি।"

কমলেশ ও চন্দ্রমল্লিকা মুখোমুখি তাকিয়েছিল। কমলেশ জিজ্ঞেস করেছিল, "আপনাকে আর একটু গরম কফি দেবো?"

চন্দ্রমল্লিকা এবার বেশ গম্ভীরভাবেই উত্তর দিয়েছিল, "আপনি তো বলেছেন: আইস কোল্ড, বরফ-ঠাণ্ডা!"

কমলেশের বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করে, স্থতপাদি বলেছিলেন, "কমলেশ, আমার কথা শোনো, এখানেই বিয়ে করো। চন্দনপুরে একলা পড়ে থাকি—হৈচৈ করবার মতো লোকজন নেই। তোমরা ও আমরা মিলে বেশ জমানো যাবে। এতদিন বউদি ছিলাম এবার শাশুড়ি হয়ে যাবো। তোমার জামাই-আদরের কোনো অস্থবিধে হবে না।"

কিন্তু সে বোধহয় ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়। বিয়ে ঠিক হবার পরেই ডিরেক্টরের সঙ্গে ঝগড়া করে শুভাশিসদা চন্দনপুর ছেড়ে অন্য চাকরিতে চলে গেলেন। চন্দনপুর মাইনাস স্থতপাদি ভাবতেই পারা যায় না। কিন্তু স্থতপাদি সেকথা বিশ্বাস করেননি। বলেছিলেন, "ওসব লেকচার রাখো। বরং তোমাদের স্থবিধে হলো। বিয়ের প্রথম বছরটা কাছাকাছি চেনাশোনা লোকজন না থাকলেই ভাল লাগে!"

স্থতপাদি আরও বললেন, "একটু-আধটু মনে রেখো—একদিন তোমাদের দুজনের মধ্যে হাইফেনের কাজ করেছিলাম। সন্ন্যাস হয়ে গেলে লোকে

জানিয়ে কমলেশের অনেক সহকর্মী

হাইফেনকে তাড়িয়ে দেয়!" ই সব টেলিগ্রাম দেখতে-দেখতে

"কোথায় সমাস? এখনও তো বিয়ের ক' এসে একটু গম্ভীর হয়ে

প্রতিবাদ করেছিল। পকেটে পুরে রেখেছিলেন।

সুতপাদি হেসে বলেছিলেন, "একটু প্রাকবৈবাহি

তাহলে তো সুতপা ঘটকীকে দরকার হবেই।" ার ডিরেকটর দিগম্বর

কমলেশের যে ইচ্ছে হয়নি এমন নয়। চন্দনপুর থেকে ও

এসে চন্দ্রমল্লিকার সঙ্গে একটু দেখাসাক্ষাৎ করতে পারলে মন্দ হতো ন।" কমলেশ

সুতপাদিরও আপত্তি ছিল না। কলকাতায় নিজের বাড়িতে ছু

জড়ো করবার বিস্তারিত পরিকল্পনাও করেছিলেন। কিন্তু বাদ সাধলেন চন্দ্রমল্লিকার মা। সুতপাদি জানিয়েছিলেন, "ভেরি স্যরি, কমলেশ! নীহারদি এখনও খুব মডার্ন হয়ে উঠতে পারেননি। রাজী হলেন না।"

কমলেশ যে একটু হতাশ হয়েছিল তা মিথ্যে নয়।

কিন্তু সুতপাদি বললেন, "এই যে বিয়ে ঠিক-ঠাকের পর মেলামেশা নেই এটা একদিকে ভাল। অদেখা জিনিসে টান বাড়ে, বুঝলে শ্রীমান?"

"তাই বুঝি?" কমলেশ জিজ্ঞেস করেছিল।

"পুরুষ-মানুষ তুমি, তোমাদের কথা জানি না। কিন্তু আমাদের মেয়ে তো এখন থেকেই মনোমন্দিরে দিবসযামিনী ভাবী পতিদেবতার পুজো করছে।"

এরপর হনিমুনের প্রসঙ্গ উঠেছে। সুতপাদি জানতে চেয়েছেন, "মধুচন্দ্রের ব্যবস্থা করছো তো? বিয়ের মন্তর পড়েই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বউকে নিয়ে ইলোপ করবে—যাকে বলে লোপাট হয়ে যাবে।"

"কিন্তু কোথায় লোপাট হওয়া যায় বলুন তো?" কমলেশ পরামর্শ চেয়েছিল। চারসপ্তাহ ছুটির জন্য দিগম্বর বনার্জির কাছে সে আবেদনপত্র পাঠিয়ে দিয়েছে।

"মধুচন্দ্রের ব্যাপারটা চন্দ্রমল্লিকার সঙ্গে আলাপ করে ঠিক করতে হয়, বুঝলে মূর্খ!" প্রেমক্রীড়ায় অনভিজ্ঞ দেবরটিকে সুতপাদি মনে করিয়ে দিয়েছিলেন।

সহাস্য কমলেশ অভিযোগ করেছিল, "কী করে আলাপ করবো? তাকে তো আপনারা গায়েব করে দিয়েছেন।"

"ওরে বাবা! ছেলের কথার ধরন দেখো! নীহারদিকে এখনই খবর পাঠাচ্ছি, মল্লিকা উদ্ধারের জন্যে জামাই আপনার নামে পুলিশ কেস করবে।"

কমলেশ বলেছিল, "দোহাই সুতপাদি, হনিমুনের ব্যাপারে চন্দ্রমল্লিকার মতামতটা জানিয়ে দিন। একেবারে গোপনে কিন্তু।"

সে তো অতীতের ব্যাপা৺ও পর্যন্ত ঘটকীর পারিশ্রমিকটা ঠিক করলে না।

ডকটর বনার্জি বলেন, ভবি৺ই। বিয়ের পর কী করবে সে-সম্পর্কেও পরামর্শ

চন্দ্রমল্লিকা চুপ ক

"বৈজ্ঞানিকদের আজ৺ কেড়ে নেবেন না, স্তপাদি।" কমলেশ কাতর

ওঁদেরই হাতের সে

চন্দ্রমল্লি৺সে বলেছিলেন, "আমাকে যে-সে ঘটকী পাওনি। কমলেশবাবু

ফুটিয়ে৺নের কথা তুলবেন তার জন্যে অপেক্ষা না করে নিজেই নায়িকার

৺বিস্তারিত আলোচনা করে রেখেছি।"

"কোথায় যেতে চায়?" সলজ্জ কমলেশ সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলো।

"হনলুলু-হাওয়াই-ওয়াকিকি বীচ-এ আমাদের মেয়ে হনিমুন করুক আমরা চাইবো। কিন্তু তোমার ইচ্ছেটা কোথায়?"

"আমার কোনো ইচ্ছে নেই, ও যা বলবে।"

স্তপাদি বললেন, "উনিও তো সেই এক কথা জানালেন; কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম। উঃ পারোও বটে—তোমরা এখন থেকেই আদর্শ দম্পতি হয়ে উঠলে।"

মাথা চুলকে কমলেশ বললো, "হোয়াট অ্যাবাউট খজুরাহ? ইতিহাসের ছাত্রী ওর নিশ্চয় ভাল লাগবে।"

স্তপাদি মুখ টিপে হেসে বললেন, "তোমার বউ, তুমি যেখানে খুশী নিয়ে যাবে, আমরা বাধা দেবার কে? আমাদের মেয়েটা একেবারে ইনোসেণ্ট এবং সরল, তাকে যদি খজুরাহ মন্দিরে পাথুরে মানব-মানবীদের নির্লজ্জ কীর্তিকাহিনী দেখিয়ে তুমি পাকাতে চাও, পাকাবে!"

শুভাশিস্‌দা এখন কলকাতায় নেই। থাকলে কমলেশের হয়ে তর্ক করতেন। শুভাশিস্‌দার একটা থিওরি আছে: "কলকাতার কলেজে-পড়া মেয়েরা আজকাল অনেক পাল্টেছে। হেদোর ধারে শুভাশিস্‌দার এক চেনা স্টল থেকে তারা অশ্লীল বই এবং পত্র-পত্রিকা কিনে প্রকাশ্যে ভ্যানিটি ব্যাগে পুরতে দ্বিধা করে না।"

ফুলশয্যার দিনেও শুভাশিস্‌দা আসতে পারেননি। নতুন চাকরি, ছুটি মেলেনি। কিন্তু কমলেশের বন্ধু-বান্ধব অনেকে এসেছিল।

ফ্ল্যাশলাইটে বরবধূর ছবিও উঠেছিল। কমলেশের মা জিজ্ঞেস করেছিলেন, "কেমন দেখলেন?"

চন্দ্রমল্লিকার মামা বলেছিলেন, "কী আর বলবো—ঠিক যেন ফিলটার সিগারেটের বিজ্ঞাপন—মেড্-ফর-ইচ-আদার। এনার জন্যে ওনাকে তৈরি করা হয়েছে!"

নব-দম্পতিকে আশীর্বাদ অথবা শুভেচ্ছা জানিয়ে কমলেশের অনেক সহকর্মী চন্দনপুর থেকে রঙীন টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে। সেই সব টেলিগ্রাম দেখতে-দেখতে কমলেশের বাবা একটা টেলিগ্রামের কাছে এসে একটু গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন। কী ভেবে সেই কাগজটা নিজের পকেটে পুরে রেখেছিলেন। অন্যগুলো ছেলের দিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন।

স্তপাদি নিজে এসেও খোঁজ করেছিলেন, "তোমার ডিরেকটর দিগম্বর বনার্জি কোনো টেলিগ্রাম পাঠাননি?"

"এখনও পাইনি। হয়তো পাঠিয়েছেন—পরে হাজির হবে," কমলেশ বলেছিল।

কমলেশের বাবা সুধন্যবাবু কিন্তু টেলিগ্রামটা পকেটে পুরেই ঘড়ির দিকে তাকিয়েছিলেন। প্রায় সাড়ে-দশটা বাজে, বাড়ির লোককে তাগাদা দিয়েছিলেন। "অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে, তোমরা এবার ফুলশয্যার ব্যবস্থা করো।"

ফুলশয্যার ঘরে নব-দম্পতিকে ঢুকিয়ে দেবার সময় পর্যন্ত স্তপাদি সঙ্গে-সঙ্গে ছিলেন। চুপিচুপি কমলেশকে বলেছিলেন, "কী হে শ্রীমান, নাড়িটা একবার মেপে দেখবো নাকি? মিনিটে কতবার বুকটা ধুকপুক করছে? মেয়ে আমাদের যে বরফ-ঠাণ্ডা নয় তার প্রমাণ একটু পরেই পাবে।"

তারপর ওর হাতটা ধরে আশীর্বাদ জানিয়ে স্তপাদি বলেছিলেন, "আজকের রাতটা জীবনে একবারই আসে—সুতরাং বুঝে-সুঝে খরচ কোরো। কোনোরকম আক্ষেপ থেকে যেন না যায়।"

বিদ্যুৎবাহিত চন্দনপুর এক্সপ্রেস ইতিমধ্যেই তীব্র বেগ নিয়েছে। একটা ছোট স্টেশন চোখের নিমেষে বেরিয়ে গেল। একটা বুড়ো মালগাড়ি পাশের লাইনে ধুঁকছিল। উদ্ধত চন্দনপুর এক্সপ্রেসের কাণ্ডকারখানা দেখে নিজেকে আর বেইজ্জতী করবার ইচ্ছে যেন তার নেই। তাই একধারে সরে গিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে।

কমলেশ রায়চৌধুরী এবার ঘড়ির দিকে তাকালো। হিসেব করে দেখলো গত রাত্রে ফুল-দিয়ে-সাজানো শয়নমন্দিরে প্রবেশ করবার পর এখনও চব্বিশ ঘণ্টা সময় পার হয়নি।

চশমার মোটা ফ্রেমে কমলেশ একবার হাত দিলো। এখানেও চন্দ্রার স্পর্শ লেগে আছে। চশমাটা কমলেশ যখন একবার খুলেছিল তখন নিজের শাড়ির আঁচলে সে কাঁচ মুছে দিয়েছিল।

সে এক আশ্চর্য অনুভূতি। বিজ্ঞানের সংযত সেবক কমলেশ রায়চৌধুরী গত রাত্রের বাঁধনহারা বন্যায় অকস্মাৎ কোথায় যেন ভেসে গিয়েছিল।

বাড়ির মেয়েরা সালঙ্কারা সুসজ্জিতা চন্দ্রমল্লিকাকে আগেই ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। কমলেশ ঘরে ঢুকতে একটু ইতস্তত করছিল। কিন্তু বাবা আবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন। "বড় দেরি করছিস তোরা সকলে।"

চন্দ্রমল্লিকা দেখলো পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি লম্বা একটা পুরুষ-মানুষ ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলো। ঘষা কাঁচের জানালার সাটারগুলো আগে থেকেই কারা যেন বন্ধ করে দিয়েছে। কমলেশ তবু একবার খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে নিলো। ফুলের অলঙ্কার সামলাতে-সামলাতে চন্দ্রমল্লিকা লাল বেনারসী ঘোমটার ফাঁক দিয়ে এই প্রস্তুতিপর্ব দেখলো; কিন্তু একটুও ভয় পেলো না। বরং নিশ্চিন্তে বাঁ হাতের বড় নখগুলো নিয়ে খেলা করতে লাগলো।

অথচ এই মেয়েকেই মাত্র ছিয়ানব্বই ঘণ্টা আগে একই কমলেশ রায়চৌধুরীর সঙ্গে প্রকাশ্য রাজপথে একটা চায়ের দোকানে মুখোমুখি বসতে দেওয়া হয়নি। আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে, রাত্রি দশটা বেজে চৌদ্দ মিনিট পর্যন্ত দুজনের মধ্যে কতরকম সঙ্কোচ ও দূরত্ব ছিল। পরের মিনিটে যেমনি পিঁড়িতে বসে সাতপাক খাওয়া হলো অমনি সব পাল্টে গেল। বাইরে থেকে পরিবর্তন নয়—একেবারে রাসায়নিক পরিবর্তন: কমলেশদের কারখানায় যেমন পরিবর্তন হয় কয়লার।

দাদার বিয়ের সময় কমলেশ খুব কাছে দাঁড়িয়ে বউদির এই রাসায়নিক পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে। সাতপাক হবার আগে পর্যন্ত মেয়েদের একটা নিজস্ব সত্তা থাকে—যতই নম্র এবং লজ্জাবিধুরা হোক, সে তখনও আলাদা। পিঁড়িতে বসবার ঠিক আগে বিপত্তি হয়েছে এবং বিয়ে ভেঙে গিয়েছে কিন্তু পাত্রী আবার বধূ সেজে অপর এক শুভলগ্নে হাসি মুখে অন্য কাউকে মালা দিয়েছে—এমন ঘটনা দুর্লভ নয়। কিন্তু ঐ যে সাতপাকের মুহূর্তে কী একটা হয়, আমাদের দেশের মেয়েরা যুগ-যুগান্তের ট্রাডিশনে অকস্মাৎ পাল্টে যায়। এতগুলো লোকের চোখের সামনে, চড়া বিজলীবাতির প্রকাশ্য আলোকে এই আশ্চর্য অনুঘটন হয়; কিন্তু কেউ তা লক্ষ্য করে না; কেউ বিস্মিত হয় না। যে-মেয়ে পিঁড়িতে ওঠে এবং যে-মেয়ে পিঁড়ি থেকে আসে তারা যে এক নয় তা আমাদের খেয়াল থাকে না।

চন্দ্রমল্লিকার ডানহাতটা আলতোভাবে ধরেছিল কমলেশ—বাংলা সিনেমার ফুলশয্যার দৃশ্য এইভাবেই শুরু হয়। চন্দ্রমল্লিকা বাধা দেয়নি। কমলেশ বলেছিল, "মোটেই বরফ-ঠাণ্ডা নয়—বরং···"

"বরং কী?" চন্দ্রমল্লিকা ওর বড় বড় চোখ দুটো বিকশিত করে জানতে চেয়েছিল।

কমলেশ মৃদু হেসে বলেছিল, "কফির মতো উষ্ণ।"

"কফি তো বড্ড গরম থাকে। বেশিক্ষণ হাতে ধরে রাখা যায় না।"

চন্দ্রমল্লিকার উত্তরটা বেশ লেগেছিল কমলেশের।

"হাতে ধরা যায় না, কিন্তু ঠোঁটে নেওয়া যায়," এমন একটা কথা বলবার লোভ হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্রেক কষেছিল কমলেশ। সে শুনেছে, প্রথম রাতে সাবধানে না এগিয়ে তড়িঘড়ি করায় অনেকের সারা জীবনের দাম্পত্য সুখ নষ্ট হয়েছে।

"তোমার নামটা মস্ত বড়, চন্দ্রমল্লিকা", নববধূর নরম হাতটা নিয়ে খেলা করতে-করতে কমলেশ বলেছিল।

"পছন্দ হয়নি?" চন্দ্রমল্লিকা নির্ভয়ে জিজ্ঞেস করেছিল।

"খুব পছন্দ হয়েছে। কিন্তু বেনারসী শাড়ির মতো দামী এবং ভারী।"

চন্দ্রমল্লিকার কপালে চন্দনের ফোঁটাগুলো চকচক করে উঠেছিল। ওর সিঁথিতে মোটা-করে-টানা লাল সিঁদুররেখাও হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। কমলেশ বলেছিল, "তুমি যেমন ফুরফুরে হাল্কা, তেমনি একটা আটপৌরে আদুরে নাম পেলে বেশ মজা হতো।"

চন্দ্রমল্লিকা লজ্জায় সিঁটিয়ে যায়নি, বরং স্বামীর দাবী মেনে নিয়ে উৎসাহ দিয়ে বলেছিল, "আমি যখন তোমার হয়ে গিয়েছি, তখন তোমার যা-খুশী নাম দিও। তা বলে, বাবা-মার সামনে সেই নামে ডেকে বসো না, তাহলে খুব লজ্জায় পড়ে যাবো।"

স্ত্রীর মধুর প্রশ্রয়ে কমলেশ আরও লোভী হয়ে ওর হাতের চুড়িগুলো ওপরের দিকে তুলে এঁটে দিয়েছিল। হাতের কাজ একটু থামিয়ে এবার সে বললো, "তোমার একটা আদুরে নাম আছে ঝুমঝুমি। কিন্তু ঝুমু বললে একটু কম রোমান্টিক মনে হয়। তার চেয়ে আমার যখন যা খুশী সেই নামে ডাকবো—কখনও চন্দ্রমল্লিকা, কখনও চন্দ্রা, কখনও বা ঝুমু।"

কমলেশ এবার স্ত্রীর ডান হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে তুলে নিলো। নিজের হাতের সঙ্গে তুলনা করে বললো, "এই হচ্ছে কুলির হাত—আঙুলগুলো ছড়ালে কুলোর সাইজ হয়ে যাবে। কোথাও কোমলতা নেই, দু-এক জায়গায় কড়াও পড়েছে। আর এই হলো রূপকথার রাজকুমারীর হাত—নরম তুলতুলে—একটু ঠাণ্ডা একটু গরম।"

চন্দ্রমল্লিকা কোনো প্রতিবাদই করলো না। নিজেকেই যখন সমর্পণ করেছে, তখন হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার কোনো মানে হয় না।

কমলেশ এবার পাঞ্জাবির পাশ পকেট থেকে লাল রংয়ের বাক্স বার করলো।

তার মধ্যেই ছিল আংটিটা। আস্তে আস্তে গভীর আদরে এবং খুব সাবধানে কমলেশ সেটা বউ-এর নরম আঙুলে পরিয়ে দিলো। আংটিটা যে এত সুন্দর কমলেশ নিজেই তা কেনবার সময় বুঝতে পারেনি। যে জিনিস যেখানে শোভা পায়!

চন্দ্রমল্লিকা সলজ্জ হাসিতে মুখ ভরিয়ে বললো, "থ্যাংক্‌স।"

"মাপটা কোথা থেকে পেলাম, জিজ্ঞেস করলে না তো?" কমলেশ বলেছিল।

"জানি। সুতপা মাসির কাছে চেয়েছিলে—আরও বলেছিলে, কেউ যেন না জানতে পারে।"

"তাহলে তুমি জানলে কী করে?" কমলেশ অভিযোগ করেছিল।

"বারে! আমার আঙুল আমি জানতে পারবো না? সুতপা মা'সি তবু বলেছিল, আমার এক বয়-ফ্রেণ্ড চেয়ে পাঠিয়েছে।"

আংটি-পরা হাতটা কমলেশ নিজের কপাল ও মুখে ঠেকিয়েছিল। শান্ত ভাবে চন্দ্রমল্লিকা বললো, "তুমি আমাকে এমন সুন্দর আংটি দিলে, অথচ তোমাকে দেবার মতো কিছু নেই।"

এক মুহূর্ত ইতস্তত করলো কমলেশ। তারপর আর সঙ্কোচ রইলো না। সে বলে ফেললো, "উঁহু। দেবার মতো অনেক কিছু আছে।" স্ত্রীর পাতলা রঙীন ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে স্বামীদেবতা এবার যা ইঙ্গিত করলো তা তৎক্ষণাৎ বুঝতে, সম্মতি জানাতে এবং দান করতে চন্দ্রমল্লিকা দ্বিধা করলো না।

সেই ভেলভেটের মতো নরম, সামান্য ভিজে অথচ তাজা মিষ্টি ঠোঁটের প্রথম স্পর্শ এবং সুদীর্ঘ প্রশ্রয় কমলেশের ওষ্ঠে যেন এখনও লেগে রয়েছে। শরীরের ওই বিশেষ অংশটা এখনও অনির্বচনীয় অক্ষয় স্বর্গলোকে পড়ে রয়েছে।

তারপর ওরা দুজনে নির্ভয়ে ছোট্ট এক স্বপ্নের ডিঙিতে চড়ে কখনও দুরন্ত অভিজ্ঞতার অতলান্ত সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছে, কখনও প্রশান্ত প্রেমের সরোবরে ভেসে বেড়িয়েছে। উত্তাল মুহূর্তে কখনও হারিয়ে ফেলেছে নিজেদের, কখনও আবার পরস্পরকে খুঁজে সভয়ে খুব কাছাকাছি সরে এসেছে।

কমলেশ বুঝেছে, এই যে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাওয়ার আদিম আকাঙ্ক্ষা, তা অনেকটা রাসায়নিক বিপ্লবের মতো—ল্যাবরেটরিতে যে-মিলনের চূড়ান্তে পৌঁছে পদার্থ নিজের সত্তা হারিয়ে ফেলে, যে-বিপ্লবের পরে পুরানোকে আর পাওয়া যায় না, নিজেকে নিঃশেষ করে সে নূতনের জন্ম দেয়।

কিন্তু সাগরে ভেলা ভাসিয়েও ওরা দুজনে হাঁপিয়ে ওঠেনি, ব্যস্তও হয়নি। কারণ এই তো সবে শুরু, সামনে পড়ে রয়েছে অনেক সময়। এক মাস

অফিসের কথা পর্যন্ত ভাববার প্রয়োজন নেই কমলেশের।

বধূকে খুব কাছে টেনে নিয়ে কমলেশ বলেছে, "চন্দ্রা, খজুরাহতেই সব পাকা ব্যবস্থা করা আছে। শুভচণ্ডীর পূজোটা শেষ করে ঐদিনই ট্রেনে চড়বো। টিকিট, রিজার্ভেশন, কূপে সব ব্যবস্থা করা আছে। ওখানকার নতুন হোটেলটাও শুনেছি নব-বিবাহিতদের পক্ষে খুব সুন্দর।"

আধুনিকা বধূও উৎসাহিত বোধ করেছে। "বেশ মজা হবে, খুব ঘুরে বেড়ানো যাবে," চন্দ্রা আস্তে-আস্তে বলছে। আত্মসমর্পণের পর তার দেহটা এখনও সুখের বিহ্বলতায় অবশ হয়ে আছে।

নিবিড় আলিঙ্গনশৃঙ্খল থেকে সুদেহিনীকে মুক্তি না দিয়েই কমলেশ বলেছে, "যদি আমি হোটেলের ঘর থেকে বেরোতে না চাই?"

"বেরুবো না! তুমি যা-চাইবে তাই হবে," স্বামীর সব দাবি চন্দ্রমল্লিকা বিনা প্রশ্নে নির্দ্বিধায় মেনে নিতে রাজী আছে।

নিঃশব্দ পদসঞ্চারী রাত্রি এরপর নব-দম্পতির নতুন খেলাঘরে বিনানুমতিতে প্রবেশ করে ওদের দুজনকেই ঘুমের দেশে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। নতুন অভিজ্ঞতায় পরিতৃপ্ত কিন্তু পরিশ্রান্ত দেহটা যে এবার অবসন্ন হয়ে পড়েছে তা বোধহয় চন্দ্রমল্লিকা বুঝতে পেরেছিল। স্বামীকে চুপি-চুপি বলেছিল, "আমি যদি ঘুমিয়ে পড়ি, তাহলে কিন্তু ভোর হলেই তুলে দিও।"

স্বামীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেই মল্লিকা ঘুমিয়ে পড়তে চায়। কমলেশ বললো, "ভোর হলেই উঠতে হবে কেন?"

"নতুন বউ অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে থাকলে বিশ্রী দেখায়। লোকজন হাসাহাসি করে," চন্দ্রমল্লিকা বলেছিল।

"এখানে কেউ তোমাকে কিছু বলবে না। ফুলশয্যার পরের দিনই বউমা ভোর পাঁচটায় উঠে পড়ুক আমাদের বাড়ির কেউ তা প্রত্যাশা করে না।"

"যা বলছি শোনো, লক্ষ্মীটি। আমি ঘুমিয়ে পড়লে তুলে দিও। মা বার বার করে বলে দিয়েছেন—দরকার হলে দুপুরে ঘুমিও, কিন্তু সকালে কিছুতেই আটটা পর্যন্ত ঘরে খিল দিয়ে বিছানায় পড়ে থাকবে না।"

রাতের আলোয় সবার উপস্থিতিতে যে-দরজা বন্ধ করতে আপত্তি নেই, দিনের বেলায় তা খুলতে একটু দেরী হলে জিনিসটা কেন অশ্লীল হয়ে যাবে, কমলেশ বুঝতে পারে না। কিন্তু চন্দ্রার সঙ্গে এই মুহূর্তে তর্ক করবার মন নেই—চন্দ্রা যা-চাইছে তাই পাবে।

আসল সময়ে কমলেশ কিন্তু গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। ভোর

বেলায় ওঠার সযত্ন লালিত অভ্যাসটা আজ সকালে বিশ্বাসভঙ্গ করেছে। কিন্তু চন্দ্রাকে লজ্জায় পড়তে হয়নি, সে নিজেই যথাসময়ে উঠে পড়েছে।

চন্দ্রমল্লিকা প্রথমেই বিধ্বস্ত বিছানার চাদরটা টেনে সোজা করে দিয়েছে, ছেঁড়া ফুলগুলোকে কুড়িয়ে বাস্কেটে ফেলে দিয়েছে এবং অতি সাবধানে চুড়ির আওয়াজ না করে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চিরুনির সাহায্যে নিজের বিশৃঙ্খল চুলগুলোকে শাসনে এনেছে। এবার দরজা খুলে দিয়ে লজ্জাবতী নববধূ ঘরের কোণে চেয়ারে বসেছে এবং মাথায় সামান্য ঘোমটা টেনে দিয়েছে। অপরিচিত পরিবেশে নিজের অস্বস্তি অপনোদনের জন্য চন্দ্রমল্লিকা একখানা বই তুলে নিয়েছে। বইটা সে পড়বার চেষ্টা করছে, কিন্তু একটা লাইনও মাথায় ঢুকছে না।

চন্দ্রার মুখ দেখলে সহজেই বলে দেওয়া যায় সে এখন নিজেকে ভীষণ বড়লোক মনে করছে—বিয়ের মন্ত্র পড়ে সে অকস্মাৎ এত পেয়ে গিয়েছে, যে এক রাত্রি কেন বহু রাত্রি ফেলে-ছড়িয়ে খরচ করলেও নিঃস্ব হবার আশঙ্কা নেই। বিবাহিতা সহপাঠিনীদের কাছে মল্লিকা শুনেছিল অনেক স্বামীদেবতা প্রথম রাত্রেই বড় হ্যাংলামি করে—স্বামী কিন্তু নিজেকে ছোট করেনি। এক রাত্রেই সব ফুরিয়ে যাচ্ছে না, কমলেশ বলেছিল। একান্ত পরিচয়ের প্রথম সুযোগ মল্লিকার জন্যে নির্লজ্জ লোভের মলিনতা বয়ে আনেনি, তার নিজস্ব নিভৃত স্বাধীনতাকেও লণ্ডভণ্ড করেনি।

মল্লিকার বিবাহিতা ননদ ভোরবেলায় উঠে পড়েছিলেন। নববিবাহিতদের দরজা খোলা দেখে তিনি অবাক। বললেন, "ওমা, নতুন বউ এরই মধ্যে উঠে পড়লে? এখনও বাড়ির কেউ তো বিছানা ছাড়েনি।"

চন্দ্রমল্লিকা কোনো কথার উত্তর দেয়নি। মুখে গম্ভীর ভাব দেখালেও একটু লজ্জা লাগছে তার—সিঁথির সিঁদুরটা অনভ্যাসে সমস্ত কপালে ছড়িয়ে গিয়েছে। মুখটা আর একবার মুছে ফেললে হতো।

বিবাহিতা ননদ কোনো কথা না বলে অভিজ্ঞ চোখে মল্লিকার মাথা থেকে পা-পর্যন্ত প্রতি অঙ্গ খুঁটিয়ে দেখেছেন। তাঁর দৃষ্টি বুকের কাছে থমকে দাঁড়াতেই ভীষণ অস্বস্তি বোধ করলো চন্দ্রমল্লিকা—আঁচল কাঁধের ওপর পুরোপুরি ছড়ানো থাকলেও আরও একটু টেনে দিলো।

অতি কৌতূহলী মেয়েরা এই সব মুহূর্তে লজ্জাশরম বিসর্জন দিয়ে নির্মম হয়ে ওঠে, নানা অস্বস্তিকর প্রশ্নের উত্তর চায়। ছোট-বড় জ্ঞান থাকে না, যা-তা মন্তব্য করে বসে, শুনেছে চন্দ্রমল্লিকা। কিন্তু দিদি কিছুই করলেন না। শুধু জিজ্ঞেস করলেন, "ঘুম হয়েছিল তো? নতুন জায়গায় অনেক সময় ঘুম আসে না।"

ঘুমের যে কোনো ব্যাঘাত ঘটেনি তা চন্দ্রমল্লিকা নীরবেই জানিয়ে দিলো। —মুখ ফুটে মিথ্যে কথা বলতে তার কেমন সঙ্কোচ লাগে। দিদি বললেন, "বাথরুম খালি রয়েছে।"

রাতের জামাকাপড় পাল্টে কলঘর থেকে বেরিয়ে চন্দ্রমল্লিকা দেখলো শ্বশুরমশায় অস্থিরভাবে বারান্দায় পায়চারি করছেন। তিনি খোঁজ নিলেন খোকা উঠেছে কিনা।

ফুলশয্যার পরে বেলা দুপুর পর্যন্ত স্বামী নাক ডাকিয়ে ঘুমোক চন্দ্রমল্লিকার তা মোটেই পছন্দ নয়। আটটা বাজতেই কমলেশের পায়ে সে একটা আলতো চিমটি কেটেছিল। পাশ-বালিশটাকে আবার জড়িয়ে ধরবার আগে কমলেশ মুহূর্তের জন্য তাকিয়েছিল।

চন্দ্রমল্লিকা চাপা গলায় বলেছিল, "বাবা তোমার খোঁজ করছেন।"

ঘুম থেকে ধড়মড়িয়ে উঠে কমলেশ সোজা বাইরে চলে যাচ্ছিলো। চন্দ্রমল্লিকা হুমড়ি খেয়ে পথ রোধ করলো। বললো, "মুখটা একটু মুছে নাও। আয়নাতে একটু দেখে নাও, কোথাও কিছু লেগে রইলো কিনা?"

বাইরের বারান্দায় একটা চেয়ারে বাবা চুপচাপ বসেছিলেন। গত রাত্রের টেলিগ্রামখানা সামনেই পড়েছিল। গভীর অভিনন্দনবার্তা নয়, জরুরী টেলিগ্রাম।

"বনার্জি তোদের অফিসের কে হয় রে?" বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

"আমাদের টেকনিক্যাল ডিরেকটর এন ডি বনার্জি," কমলেশ বললো।

"তুই যে বিয়ে করবার জন্য কলকাতায় এসেছিস তা তিনি জানেন?" বাবা আবার গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

"খুব জানেন। ওঁকে নিজের হাতে বিয়ের কার্ড দিয়ে এসেছি। এখানে আসবার দিনে আশীর্বাদ করলেন। বললেন, তেমন অসুবিধে না হলে বউ ভাতে নিশ্চয় আসবেন।"

বাবা আর কথা না-বাড়িয়ে কমলেশের দিকে জরুরী টেলিগ্রামটা এগিয়ে দিলেন। তাতে লেখা—'রিগ্রেট, তোমার ছুটি নাকচ করতে হলো। অবিলম্বে চন্দনপুরে ফিরে এসো। বনার্জি।'

টেলিগ্রাম গতকাল রাত্রেই এসেছে তাও দেখতে পেলো কমলেশ। বাবা ইচ্ছে করেই কমলেশের ফুলশয্যার রাত্রি নষ্ট হতে দেননি।

বাবা শান্তভাবেই ব্যাপারটা নিয়েছেন। কোনো মন্তব্য করলেন না। গম্ভীরভাবেই জানিয়ে দিলেন, "যদুকে আমি ফেয়ারলি প্লেস বুকিং অফিসে পাঠিয়ে দিয়েছি, চন্দনপুর এক্সপ্রেসে একখানা ফার্স্ট ক্লাস টিকিট কিনে আনবে।"

খবরটা এবার দ্রুতবেগে আত্মীয়মহলে ছড়িয়ে পড়েছিল। চন্দ্রমল্লিকার বাড়িতে টেলিফোন যেতেও দেরি হয়নি। এমন আকস্মিক ঘটনার জন্যে কোনোপক্ষই তৈরি ছিল না! দু পক্ষের মধ্যে কয়েকরাউণ্ড আলোচনার পরে ধুলো-পায়ে লগ্নটা সঙ্গে-সঙ্গে সেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

বাপের বাড়িতে ফিরবার সময় চন্দ্রমল্লিকার সঙ্গে কমলেশ ছাড়া আর কেউই ছিল না। আকস্মিক বিচ্ছেদের আশঙ্কায় মল্লিকা বেচারা বেশ মুষড়ে পড়েছে। কমলেশ নিজেও এ-ধরনের বিনা-মেঘে-বজ্রপাতের জন্যে প্রস্তুত ছিল না। চন্দনপুরে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত রহস্যটা মোটেই বোঝা যাচ্ছে না।

আচমকা ব্রেক কষার ফলে ট্রেনটা একটু ধাক্কা দিয়ে থামলো। কমলেশের মনে হলো একটা অপ্রত্যাশিত অন্যায় ধাক্কা খেয়েছে সে। চাকরি কমলেশ একা করে না। হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ লোক ছুটি নিয়েই বিয়ে করতে আসে—কিন্তু ফুলশয্যার রাতে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে কোনো অফিসের কর্তা তাদের বিয়ের আনন্দ ভণ্ডুল করে দেন না।

বাড়ির সবার মন খারাপ। শ্বশুরবাড়ির তো কথাই নেই। তারা ভাবছিল হৈ-চৈ হবে কয়েকদিন, তারপর মেয়ে-জামাইকে হনিমুনে রওনা করে দেওয়া হবে। তা নয় হরিষে বিষাদ। চন্দ্রমল্লিকা বেশ ঘাবড়ে গেছে—ওর দুঃখটাই বেশি, কিন্তু বেচারা ভয় পাচ্ছে, লোকে ওর ঘাড়েই দোষ চাপাবে।

একঘণ্টা মল্লিকাদের বাড়িতে কাটিয়ে ওরা দুজনে আবার ফিরে এসেছিল। কমলেশের বাবা দুপুরে আবার হুকুমনামা জারি করেছিলেন। "খোকাকে অনেকক্ষণ ট্রেনে ধকল সইতে হবে। খেয়ে-দেয়ে চটপট ওকে একটু গড়িয়ে নিতে দাও।"

এই 'গড়িয়ে নেওয়ার' অর্থ কমলেশ বুঝতে পারে। বাবা চাইছেন, নববধূর সঙ্গে আকস্মিক বিচ্ছেদের আগে তারা একান্তে আরও একটু সময় কাটিয়ে নিক। এইটুকু সুযোগ অবশ্যই ওদের দুজনের প্রাপ্য, কারোর আপত্তিও নেই। কিন্তু চন্দ্রার ভীষণ লজ্জা লেগেছিল। সে ঘরে ঢুকতে রাজী হয়নি। প্রায় জোর করেই তাকে স্বামীর ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দরজাটা দিদি ভেজিয়ে দিলেও, মল্লিকা ভিতর থেকে বন্ধ করেনি।

চন্দ্রাকে মুহূর্তের মধ্যে কাছে টেনে নিয়েছিল কমলেশ। কিন্তু বেচারা ভয় পেয়ে সিঁটিয়ে গেছে। বলেছে, "আমি অপয়া, তাই এমন হলো।"

অফিসের ওপর ভীষণ বিরক্তি ধরেছিল কমলেশের। সে কোনোরকমে বলেছিল, "ফার্স্ট রাউণ্ডেই এমন বিচ্ছেদের জন্যে তৈরি ছিলাম না আমরা

ছুজনে। কিন্তু ব্যাপারটা অত সহজে ছাড়ছি না। কয়েক ঘণ্টা পরেই অফিসের কারণটা বোঝা যাবে।"

ট্রেনের কামরায় কয়েক ঘণ্টা কেটে যাওয়ার পর চন্দনপুর ক্রমশই এগিয়ে আসছে। কর্মজীবনের কথা কমলেশের এবার বেশি করে মনে পড়ছে। কয়েকদিন প্রজাপতির ষড়যন্ত্রে চন্দনপুরের কথা প্রায় ভুলেই যেতে বসেছিল কমলেশ।

ছোট-ছোট পাহাড়ে সাজানো ছবির মতো শহর এই চন্দনপুর। ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের এই অঞ্চলকে কেউ চিনতো না। এখানে থাকার মধ্যে তখন ছিল মিলিটারিদের মস্ত ঘাঁটি। মাইলখানেক জায়গা তারের বেড়া দিয়ে ঘিরে তার মধ্যে অজস্র গোপন জিনিস পত্তর রাখা হতো—যা নাকি যুদ্ধের জন্য দরকার।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরেই সেখানে উঠেছে সুবিশাল ফার্টিলাইজার কারখানা—হিন্দুস্থান অ্যাগ্রো-কেমিক্যালসের প্রথম উদ্যোগ চন্দনপুর প্রোজেক্ট। স্বাধীনতার প্রথম দশকে এই চন্দনপুর ছিল সবার দর্শনীয়, সব থেকে স্মার্ট। প্রধানমন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে রাজধানীর শক্তিমানরা, রাষ্ট্রীয় অতিথিদের নিয়ে প্রায়ই আসতেন এই চন্দনপুরে। চীনের চৌ এন লাই থেকে ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজাবেথ পর্যন্ত কেউ বাদ যান নি। চন্দনপুর তাঁদের মুগ্ধ করেছিল।

কি সুন্দর নাম এই চন্দনপুর। কিন্তু এ-যুগে সরকারী ফিতের ফাঁসে স্থানীয় নামের সৌন্দর্য ও স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় না। সংক্ষেপকরণের উদ্ভট উৎসাহে কোনো একজন ছন্দকানা নিষ্ঠাবান অফিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সরকারী ফাইলে লিখেছিলেন: সি-পি। চন্দনপুর প্রোজেক্ট সেই যে সি-পি হলো, আর মুক্তি পায়নি।

কারখানা যেখানে শেষ হয়েছে তার কিছু দূরেই ছিমছাম আধুনিক ডিজাইনের বিরাট লম্বা দোতলা বাড়ি নবাগতদের নজরে পড়ে। আড়াই দশকের বৃদ্ধ-কারখানার সঙ্গে নতুন বাড়িটার কোনো মিলই নেই। সরকারী কোম্পানির অফিস-বাড়ি সচরাচর এমন সুরুচিপূর্ণ হয় না! দূর থেকে দেখলে কোনো আধুনিক রঙ্গশালা বলে ভুল হতে পারে। কিন্তু এইটাই হিন্দুস্থান অ্যাগ্রো-কেমিক্যালস্ ওরফে এইচ-এ-সি গবেষণা বিভাগ।

গেটের কাছে একটা নাকচাপা দারোয়ান বন্দুক হাতে পাথরের মতো

দাঁড়িয়ে আছে। দারোয়ানকে পিছনে ফেলে লাল নুড়ি বিছানো রাস্তা ধরে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। ল্যাবরেটরির প্রধান দরজার গোড়ায় গ্রানাইট পাথরের ওপর খোদাই করা কয়েকটি অক্ষর স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, কয়েক বছর আগে কোনো এক জুলাই প্রভাতে প্রধানমন্ত্রী এই গবেষণাগারের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেছিলেন এবং এই পবিত্র জ্ঞানমন্দিরকে জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছিলেন।

মূল দরজা পেরিয়ে আরও একটু এগিয়ে গেলেই রিসেপশন হল্। সেখানকার দেওয়ালে তামার পাতে তৈরি এক অপরিচিত বিদেশীর অস্পষ্ট রিলিফ মূর্তি আগন্তুকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফলকের তলায় ফরাসীতে কী একটা উক্তিও খোদাই করা রয়েছে, যার অর্থ· "সন্ধান করো, তাকে নিশ্চয় খুঁজে পাবে।" অনেকদিন আগে, অমর ফরাসী বৈজ্ঞানিক নিকোলাস লে ব্লাঙ্ক নাকি এই বিশ্বাস পোষণ করতেন।

লে ব্লাঙ্কের কালজয়ী ছোট্ট এই উক্তিটি দিগম্বর বনার্জি তাঁর অফিস ঘরের টেবিলে কাঁচের তলাতেও রেখে দিয়েছেন। যখনই কোনো সন্দেহ উপস্থিত হয়, হতাশার মেঘ মনের আকাশকে ছেয়ে ফেলবার উপক্রম করে, তখনই দিগম্বর বনার্জি লে ব্লাঙ্কের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকেন। তিনি অকস্মাৎ জীবন্ত হয়ে উঠে ভাবশিষ্যকে স্মরণ করিয়ে দেন—সন্ধান করতে হবে, তবেই তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে।

এখন রাত আটটা। ল্যাবরেটরি বাড়িটা অন্ধকার থাকলেও, বনার্জি সায়েবের অফিস ঘরে চারটে টিউব লাইট জ্বলছে।

টেবিল ল্যাম্পের তলায় ঝুঁকে পড়ে একমনে কতকগুলো এক্স-রে রিপোর্ট দেখছেন দিগম্বর বনার্জি। এক্স-রে পাউডার ডিফ্র্যাকশন প্যাটার্ন সংক্রান্ত রিপোর্ট পড়তে-পড়তে ছোট একটা নোট বুকে দিগম্বর বনার্জি লিখলেন, আগামী কাল সকালেই এক্স-রে ডিপার্টমেন্টের বি এস আয়ারের সঙ্গে কথা বলতে হবে। অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটের ছ'রকম অবস্থা সম্পর্কেই তিনি রিপোর্ট চান। তিন নম্বর ফেজ-এর স্ট্রাকচারে করোগেটেড লেয়ার দেখা যাচ্ছে না কেন?

নোট বইতে মন্তব্য লেখা হঠাৎ বন্ধ করে দিলেন দিগম্বর বনার্জি। আরও একটা দিন অযথা নষ্ট হয়ে যাবে। সময় সংরক্ষণের জন্যে দিগম্বর বনার্জি টেলিফোন রিসিভারটা তুলে নিলেন। তারপর আয়ারের বাড়ির নম্বর ডায়াল করলেন। অন্য যে-কোনো অফিসে রাত আটটার সময় ডিরেক্টরের টেলিফোন পেলে অফিসাররা চিন্তিত হয়ে পড়তেন। কিন্তু চন্দনপুরের

ব্যাপারটা সকলেরই গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে।

দিগম্বর বনার্জি বললেন, "আয়ার, তুমি কি ডিনার করছিলে? আই অ্যাম ভেরি স্যরি। তোমার ডিপার্টমেন্টের এক্স-রে ডাটাগুলো দেখতে-দেখতে হঠাৎ মনে হলো, এক্স-রে ডিপার্টমেন্টের ছেলেরা আজকাল কুলির মতো কাজ করছে, একেবারে মাথা ঘামাচ্ছে না। ইনফ্লুয়েন্স অফ স্ট্রাকচার অন বিহেভিয়ার সম্পর্কে বেনহাম এবং বেস্ট্রিকের যে-পেপারটা আমরা আনিয়েছি, তা ওদের একবার দেখতে বোলো। ডকুমেনটেশন ডিভিসনে ঐ পেপারটা দেড়মাস এসেছে। অথচ তোমার ডিপার্টমেন্টের কোনো ছেলে সেটা এখনও পর্যন্ত নেয়নি শুনলাম।" এরপর শুভরাত্রি জানিয়ে দিগম্বর বনার্জি টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন।

বনার্জি এবার তাঁর অ্যাসিসটেন্ট অধর সিন্‌হাকে ডাকলেন। "অধর, গতকাল কমলেশের কলকাতার ঠিকানায় টেলিগ্রামটা ঠিক গিয়েছিল তো?"

"নিশ্চয় স্যার।" অধর এসব কাজে কখনও ভুল করে না।

"এক্সপ্রেস তো?" দিগম্বর বনার্জি জানতে চাইলেন।

"হ্যাঁ স্যার।"

"হাওড়া-চন্দনপুর এক্সপ্রেস তো এতক্ষণ এসে পড়া উচিত, তাই না?" দিগম্বর বনার্জি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অধরকে জিজ্ঞেস করলেন।

"দেড় ঘণ্টা লেট আছে," অধর খবর দিলো।

বেশ বিরক্ত হলেন দিগম্বর। মনে-মনে ভাবলেন, আমাদের দেশটাই লেটলতিফের দেশ—আমরা কাউকে সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলতে দেবো না। আমরা জন্মজন্মান্তর ধরে লক্ষ কোটি বছরের ওপর নজর রাখছি, সময়ের সীমাহীনতা সম্পর্কে ভারতবর্ষে বেদ উপনিষদ মহাভারত সর্বদা সোচ্চার, তাই তুচ্ছ মিনিট ঘণ্টা দিন অপব্যয় করতে এখানে কেউ লজ্জিত হয় না।

দিগম্বর বনার্জি আবার মনিবন্ধের ঘড়ির দিকে তাকালেন। তারপর নিজের সহকারীকে বাড়ি ফেরার অনুমতি দিয়ে বললেন, "অধর, তোমার তো যাবার সময় হলো। তুমি বরং কমলেশের কোয়ার্টারে একটু ঘুরে যাও—আমার ড্রাইভার তোমাকে নামিয়ে দেবে। ওখানে খবর দিয়ে এসো, ডকটর রায়চৌধুরী ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে আজই দেখা করতে পারেন।"

"আপনি বাড়ি ফিরবেন না?" অধর জিজ্ঞেস করে।

"তোমাকে নামিয়ে দিয়ে গাড়িটা ফিরে আসুক। তারপর দেখা যাবে।"

এই যে বিরাট বাড়িটা এবং এখানে যে কয়েক কোটি টাকার যন্ত্রপাতি এবং শ' চারেক লোক আছেন তাঁদের হর্তাকর্তাবিধাতা বাহান্ন বছরের নোয়েল

দিগম্বর বনার্জি। তিন বছর আগে বনার্জি যখন এইচ-এ-সির ডিরেকটর হলেন, তখন অনেকে আশা করেছিল অন্য ডিরেকটরদের মতো তিনিও কোম্পানির দিল্লীর অফিসে বসবেন।

কিন্তু দিগম্বর বনার্জি অসাধ্য সাধন করেছিলেন। ম্যানেজিং ডিরেকটরকে সোজাসুজি জানিয়েছিলেন, "ডিরেকটর করছেন করুন। মিটিংয়ে ডাকলে আসবো। কিন্তু রিসার্চ ডিরেকটর মাইনাস হিজ ল্যাবরেটরি মানে হয় না। আমাকে চন্দনপুরেই থেকে যেতে হবে।" ম্যানেজিং ডিরেকটর প্রয়োজনীয় অনুমতি না-দিয়ে পারেননি।

চন্দনপুরের সবাই জানতো, হিন্দুস্থান অ্যাগ্রো-কেমিক্যালস্ ল্যাবরেটরি ছেড়ে এন ডি বনার্জি দিল্লী তো দূরের কথা, স্বর্গে গিয়েও শান্তি পাবেন না।

এন ডি বনার্জি কাঁচের তলায় লেখা সেই ছোট্ট কোটেশনটা আবার দেখলেন : সন্ধান করো, তাকে নিশ্চয়ই খুঁজে পাবে।

"কোথায় সন্ধান করবো ? কাকেই বা খুঁজে পাবো ?" দিগম্বর নিজেকেই জিজ্ঞেস করলেন।

নিজের চেয়ারে বসে দক্ষিণের বিশাল জানালা দিয়ে দিগম্বর বনার্জি এবার বাইরে তাকালেন। গত কুড়ি বছরে রাসায়নিক সারবিজ্ঞানে অবিশ্বাস্য অগ্রগতির সঙ্গে-সঙ্গে চন্দনপুর কারখানা তার গুরুত্ব হারিয়েছে—সে এখন বিগতযৌবনা। বুড়ী ফ্যাকটরিকে এই রাতে বেশ সুন্দরী দেখাচ্ছে। কে বলবে, হেড অফিসে বিশেষজ্ঞ কমিটির সভ্যরা ইতিমধ্যেই ঠিক করে ফেলেছেন, নানা রোগে জীর্ণ এই কারখানার পিছনে আর টাকা ঢেলে লাভ নেই। চন্দনপুর প্রোজেক্টের দিন শেষ হয়েছে।

অথচ এই চন্দনপুর কারখানা থেকেই একদিন এইচ-এ-সির সূত্রপাত হয়েছিল। তখন ভারতবর্ষে চাষবাস নিয়ে কর্তাব্যক্তিরা মাথা ঘামাতেন না। চাষ করে গেঁয়ো ভূতরা : গোরুর গাড়ি কিংবা লরিতে বোঝাই হয়ে চাষের ফসল কর্তাদের ভোগের জন্যে শহরে চলে আসবে। মূর্খ চাষা গ্রামে পচবে এবং বাবুরা শহরে ফূর্তি করবেন, এই তো ছিল সামাজিক প্রত্যাশা।

দিগম্বর বনার্জির মনে পড়লো, তিনি নিজেও এই শহুরে বাবুদের দলে ছিলেন। কোনোদিন গ্রামে যাননি, যাবার উৎসাহ বোধ করেননি। চন্দনপুর সার কারখানা বসাবার পিছনে যত না ছিল কৃষিচিন্তা, তার থেকে বেশি ছিল যুদ্ধ থেকে সদ্য ছাঁটাই সৈন্যদের কাজে লাগানোর গরজ। বেকার সৈন্যদের সাকার করতে গিয়ে যদি দেশে কিছু সার তৈরি হয়, মন্দ কী ?

দিগম্বর বনার্জি ভাবলেন, ভাগ্যে চন্দনপুর তৈরি হয়েছিল। পাকেচক্রে

একদিন শহুরে লোকদের ভাতেও টান পড়লো। বোঝা গেল, এবার যদি দুর্ভিক্ষ আসে তাহলে শুধু গাঁয়ের লোক নয়, শহরের বাবুদেরও প্রাণ নিরাপদ থাকবে না। তার ওপর বিদেশীদের অপমান। যারা নিজেদের খাবার উৎপাদন করতে পারে না, যাদের বন্দরে ভিক্ষের গম পৌঁছে দেবার জন্যে দুনিয়ার অর্ধেক জাহাজকে গলদঘর্ম হতে হয় তাদের মুখে বড়-বড় কথা কোন দেশ সহ্য করবে? স্বাধীন ভারতবর্ষ বক্তৃতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েও বিশ্বজনের অবজ্ঞা ও কৌতুকের পাত্র হয়ে উঠলো। দেশের কর্তারা অবশেষে অপমানিত বোধ করলেন!

দিগম্বর বনার্জি জানেন, অপমানে ফল হয়েছে। দিবানিদ্রা থেকে উঠে চোখ মুছতে-মুছতে শহুরে বাবুরা জানতে চাইলেন, চাষীরা কেন চাষ করছে না? এত জমি, এত মানুষ, এত সাধ্যসাধনা, তবে বসুমতী কেন কৃপণা? কেন ফসল নেই?

দুনিয়ার লোকেরা অনেকদিন আগেই যা জানতো, ভারতবর্ষের বাবুরা অবশেষে তার খবর পেলেন। এ-দেশের জমি থেকে শত-শত বছর ধরে নির্মমভাবে আমরা নিয়েই চলেছি—কিন্তু কিছুই ফিরিয়ে দিই না। জননী ধরিত্রীরও ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা আছে। আকাশের বৃষ্টি অনেক সময় তেষ্টা মেটায় কিন্তু খিদে মেটাবার সার কোথায়? বাঁচার মতো ফসল পেতে হলে, অনেক সার চাই।

দিগম্বর বনার্জি তখন সামান্য একজন বিজ্ঞানী। অন্তত দশবার দিল্লীকে লিখেছেন, জমি যা ফসল হিসেবে দিচ্ছে, তা আবার ফিরিয়ে দিতে হবে। এত খাবার প্রাকৃতিক পথে পাবার উপায় নেই—তাই চাই রাসায়নিক সার। সমগ্র পৃথিবীতে এই সার নিয়ে যে কর্মকাণ্ড চলেছে, ভারতবর্ষ তার থেকে পিছিয়ে থাকলে ভুল করবে।

দিগম্বর বনার্জির মনে আছে, দিল্লী দরবারে তন্দ্রা-ছোটার সঙ্গে-সঙ্গেই বাড়তে লাগলো এই হিন্দুস্থান অ্যাগ্রো-কেমিক্যালস্। কৃষি রসায়নের সর্বস্তরে প্রবেশ করবে এই কোম্পানি। চন্দনপুর থেকে যার শুরু তা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়বে ভারতবর্ষের সর্বপ্রান্তে। দিগম্বর বনার্জির ঘরে-টাঙানো ভারতবর্ষের মানচিত্রে লাল এবং সবুজ রঙের অনেকগুলো পিন পোতা রয়েছে, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমের নানা অঞ্চলে। লাল মানে যেসব জায়গায় নতুন কারখানার প্রস্তাব রয়েছে; আর সবুজ মানে যেখানে কারখানা চালু হয়ে গিয়েছে।

কাজ-কর্মের সুবিধার জন্যে এইচ-এ-সির হেড অফিস দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়েছে। কিন্তু গবেষণার কাজ এই চন্দনপুরেই চলছে। দিগম্বর বনার্জির

ধারণা, বড়-বড় শহরে, বিশেষ করে দিল্লীতে জ্ঞানের সাধনা চলে না। সভ্যতার নানা প্রলোভন ওখানে নিরীহ মানুষকে বিপথে নিয়ে যাবার জন্যে অহরহ হাতছানি দিচ্ছে। সর্বক্ষণ চোখের সামনে অনেকগুলো জোচ্চোর ব্যবসাদার এবং ততোধিক অপদার্থ জননেতাদের মোগলাই সুখে থাকতে দেখলে বিজ্ঞান সাধকের তপোভঙ্গ হতে পারে।

আপন জীবনের গতিপথে তাকিয়ে দিগম্বর বনার্জি এই মুহূর্তে অবাক হয়ে যাচ্ছেন। কোথায় ছিলেন, কেমন করে পাকেচক্রে এই এইচ-এ-সির সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন।

দিগম্বর বনার্জি তেমন সামাজিক নন। রাগও আছে তাঁর প্রচণ্ড। কিন্তু রাগতে ইচ্ছে করে না আজকাল। কারণ এইচ-এ-সির কর্মকর্তারা তাঁকে বেঁধে রাখেননি। দিগম্বর বলেছেন, রিসার্চের চাকাই পৃথিবীর কেমিক্যাল শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আজ যা আধুনিক, আগামী কালই তা পচা পুরানো হয়ে যাবে। সুতরাং এগিয়ে যাবার এই তীব্র প্রতিযোগিতায় এইচ-এ-সিকে অংশ নিতে হবে। কোম্পানির কর্তারা তাঁর সঙ্গে একমত। বনার্জিকে তাঁরা এমন স্বাধীনতা দিয়েছেন-যা আজকের এই সরকারীযুগে অবিশ্বাস্য। গবেষণার জন্য তিনি যা চাইবেন তা দিতে প্রস্তুত আছেন বোর্ডের মেম্বাররা। এর ফলেই বিপদে পড়েছেন দিগম্বর বনার্জি। এঁদের বিশ্বাসের যোগ্য হয়ে দেশের প্রত্যাশা মেটাতে পারবেন কিনা ভয় হয় তাঁর।

কত স্বপ্ন দেখেন দিগম্বর বনার্জি। এমন-একদিন আসবে, যেদিন রাসায়নিক সারের আন্তর্জাতিক মানচিত্রে ভারতবর্ষের নাম জ্বলজ্বল করবে। ভারতবর্ষের কোটি-কোটি ক্ষুধার্ত মানুষকে খাবার জোগাবার জন্য যদি লক্ষ-লক্ষ টন ফসফেট, অ্যামোনিয়া এবং পটাশ দরকার হয় তাহলে রসায়ন শিল্পে আমরা কেন পরনির্ভর হয়ে থাকবো ?

দিগম্বর বনার্জির মনে হতাশা ঢোকাবার চেষ্টা করেছেন কেউ-কেউ। তাঁরা বলেন, ইণ্ডিয়াতে নাকি কিছু সম্ভব নয়। এখানে কেউ নাকি চেষ্টা করেও সফল হতে পারে না। সুতরাং বনার্জির কপালেও ব্যর্থতা লেখা আছে।

কিন্তু দিগম্বর বনার্জি ইতিহাসের খোঁজখবর রাখেন। একজন মানুষের জীবন ও সাধনা তাঁকে আশা ভরসা দেয়। তাঁর নাম নিকোলাস লে ব্লাঙ্ক। ১৮০৬ সালে কপর্দকশূন্য হতাশ লে ব্লাঙ্ক অন্য কোনো পথ খুঁজে না পেয়ে যখন আত্মহত্যা করলেন, তখন কি তিনি জানতেন পৃথিবী একদিন তাঁকে আধুনিক রসায়ন শিল্পের পিতা বলে মেনে নেবে? ফ্রান্সের এই ভদ্রলোক চেয়েছিলেন, কম খরচে এমন সব কেমিক্যাল তৈরি করবেন যা মানুষের প্রয়োজনে লাগে।

পৌনে দু'শ বছর আগে লে ব্লাঙ্ক যা চেয়েছিলেন, চন্দনপুরের দিগম্বর বনার্জিও তাই চাইছেন: আরও কম খরচে সার তৈরির পদ্ধতি খুঁজে বেড়াচ্ছেন তিনি।

দিগম্বর বনার্জির মনে পড়লো, লে ব্লাঙ্ক প্রথম আবিষ্কারের অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন একটা প্রতিযোগিতা থেকে। সস্তায় অ্যালকেলি তৈরির উপায় আবিষ্কারের জন্যে ফরাসী বিজ্ঞানপরিষদ বারো হাজার ফ্রাংক পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। মাত্র ১৭৯০ সালের কথা, অথচ পৃথিবীর কেউ তখনও অ্যালকেলি তৈরির সহজ উপায় জানতো না। লে ব্লাঙ্ক সোডিয়াম ক্লোরাইডের সঙ্গে সালফিউরিক অ্যাসিড মিশিয়ে তৈরি করলেন সোডিয়াম সাল্ফেট। তারপর সোডিয়াম সালফেট-এর চাঙড়কে চুনের মধ্যে রেখে কয়লার আগুনে রোস্ট করলেন। পাওয়া গেল কালো রঙের ছাই, যাতে আছে সোডিয়াম কার্বনেট এবং ক্যালসিয়াম সালফাইড। এবার সোডিয়াম কার্বনেটকে জলে গুলে ফেললেন লে ব্লাঙ্ক এবং তারপর দানা বেঁধে পৃথিবীকে উপহার দিলেন উনিশ শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং যুগান্তকারী কেমিক্যাল প্রসেস।

কিন্তু এই রাসায়নিক পদ্ধতি আবিষ্কারের পরিবর্তে একটুও সুখের মুখ দেখেননি লে ব্লাঙ্ক। প্রাইজের টাকা তাঁর হাতে আসেনি। ফরাসী বিপ্লবের সময় তাঁর কারখানা তছনছ এবং বাজেয়াপ্ত হলো। নেপোলিয়ন শেষ পর্যন্ত দয়া করে কারখানা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু কারখানার দরজা খোলার মতো কাঁচা টাকা লে ব্লাঙ্ক যোগাড় করতে পারেননি।

যাদের জন্যে লে ব্লাঙ্ক এত বড় আবিষ্কার করলেন সেই ফরাসীরা তাকিয়েও দেখলো না: কিন্তু ধূর্ত ইংরেজ ব্যবসাদাররা লে ব্লাঙ্কের রাসায়নিক পদ্ধতি নিজের দেশে নিয়ে গিয়ে সাবান তৈরিতে কাজে লাগালো।

এসব খবর আজকালকার ছেলে-ছোকরারা জানে না। দিগম্বর বনার্জি তাই ল্যাবরেটরির ছেলেদের বলেন, "তোমরা ইতিহাসের খবরাখবর রাখবে—শুধু দৈনন্দিন রিসার্চ এবং রিপোর্টে ডুবে থাকলে বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি প্রসারিত হয় না।"

তরুণ বিজ্ঞানীরা কথাটা শোনে, কিন্তু কাজে লাগায় না। আরও কিছু টাকা পেলে দিগম্বর বনার্জি তাঁর গবেষণাগারে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রির ঐতিহাসিক খবরাখবর যোগাড় করবার জন্য একজন সহকারী রাখবেন। প্রিয় শিষ্য নগেন বসুকে এসব কথা দিগম্বর বনার্জি একদিন বলেছিলেন। "নগেন, আজকের যুগে গজদন্তমিনারে বাস করলে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলবে না। বৈজ্ঞানিকদের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকবে; তাদের জানতে হবে দেশের মানুষ কোন পথ থেকে কোথায় যেতে চাইছে; তবেই তো আমরা দেশের

আশা আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তব করে তুলতে পারবো।"

নগেন বলতো, "বৈজ্ঞানিক গবেষণাও এক ধরনের রিলে রেস। তাই না?"

দিগম্বর বনার্জি বলেছিলেন, "নিশ্চয়। না-হলে, সাবান কারখানায় অ্যালকেলি তৈরির যে-বিদ্যে লাগানো হলো, তা এই ক'বছরে কেমন করে পৃথিবীর রূপ পাল্টে দিলো? কয়লা, নুন, চুন, সালফার, বাতাস, জল, পেট্রল, এর মধ্যে থেকে প্রকৃতির সযত্নে লুকনো রহস্য ছিনিয়ে এনে এখন তৈরি হচ্ছে লক্ষ লক্ষ জিনিস—রং, সাবান, খাবার, ওষুধ, সার, প্লাস্টিক, জামা-কাপড় আরও কত কি।"

নগেন বসু মন দিয়ে শুনতো। ছোকরার মধ্যে সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু দিগম্বর বনার্জি তার কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত আঘাত পেয়েছেন। এমন আঘাত যার জন্যে তিনি মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। নগেনকে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন।

গাড়িটা বোধহয় ফিরে এসেছে। ড্রাইভারকে আর আটকে রাখা ঠিক হবে না। দিগম্বর বনার্জি হাতের ব্যাগটা নিয়ে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

লম্বা করিডর দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে দু-পাশের বন্ধ কাঁচের দরজাগুলোর দিকে তাকাচ্ছেন ডকটর নোয়েল দিগম্বর বনার্জি। ফিজিক্যাল রিসার্চ ডিপার্টমেন্টে একটা ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ দু দিন হলো কাজ করছে না। রাওকে তাড়াতাড়ি সারাবার ব্যবস্থা করতে বলেছিলেন দিগম্বর। রাও পরের দিন তাঁকে একটা লম্বা নোট পাঠিয়েছিল। নোটটা পড়ে দিগম্বর বনার্জি একবার ভেবেছিলেন ওকে ডেকে পাঠাবেন। তারপর কী ভেবে, কাগজটা হাতে নিয়ে নিজেই ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি রুমে হাজির হয়েছিলেন। রাও তখন স্পেকট্রোফটোমেট্রির জন্যে নতুন নিযুক্ত অফিসার খোসলার সঙ্গে কথা বলছিল।

দিগম্বর বনার্জিকে দেখে রাও উঠে দাঁড়িয়েছিল। "উঠতে হবে না," এই বলে তিনি পাশের একটা টুল টেনে নিলেন। কাগজটা রাও-এর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "পাশের ঘরেই যখন রয়েছি, তখন চিঠি না-লিখে নিজে আমার কাছে চলে এলে না কেন? মেশিন যখন খারাপ হয়েছে, তখন আগে মেশিন চালু করো, তারপর অন্য সব ফর্মালিটি।"

রাও বললো, "আমি ব্যাপারটা অন রেকর্ড রাখতে চেয়েছিলাম। হাজার হোক সরকারী সম্পত্তি।"

বনার্জি বলেছিলেন, "রাও, আমাদের ডিপার্টমেন্টে তুমি নতুন বদলি হয়ে

এসেছো, তাই তোমার গোটা কয়েক কথা জেনে রাখা দরকার। গভরমেণ্টের অনেক গবেষণাগারে চিঠি লেখালেখি ছাড়া আর কিছুই হয় না। এইচ-এ-সির এই যে বাড়ি দেখছো এখানে বৈজ্ঞানিকদের রাখা হয় গবেষণার জন্যে—চিঠি লেখার জন্যে নয়। আমি সবাইকে বলেছি, তোমাকেও মনে করিয়ে দিচ্ছি—তোমার তদারকিতে যেসব মেশিন রয়েছে সেগুলোকে সরকারের সম্পত্তি ভাববার কোনো প্রয়োজন নেই। সমস্ত যন্ত্রপাতি তোমার নিজের মনে করবে এবং সেইভাবে আদরযত্ন করবে। তার জন্যে যদি কোনো হাঙ্গামা হয়, অডিট যদি কোনো কথা তোলে, সঙ্গে-সঙ্গে বলে দেবে রিসার্চ ডিরেকটর দিগম্বর বনার্জিকে ধরুন গে যান, তাঁর হুকুম মতো কাজ হয়েছে।”

রাও একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল। বনার্জি বলেছিলেন, “আমি চাই তোমরা এখানে নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে বিজ্ঞানের কাজ করে যাও—অকাজ যতটা আছে আমি সামলাবো।”

দিগম্বর বনার্জি এইমাত্র মনে হলো রাওকে বলবেন, “প্রত্যেক যন্ত্র একটু-আধটু মেরামতের কাজ ছেলেদের শিখতে উৎসাহ দিতে। অনেক আধুনিক মেশিন আছে যা মডার্ন মহিলাদের চেয়েও পলকা—কিন্তু ভয় পেয়ে কাজকর্ম বন্ধ করে বসে থাকলে চলবে না। বিদেশী বড়-বড় কোম্পানিরা ভারতীয়দের এই দুর্বলতার কথা জানে—তাই তারা মেশিন বিক্রি করে, কিন্তু মেরামতি এবং স্পেয়ার পার্টসের দড়ি পরিয়ে আমাদের ওঠায় বসায়।”

দিগম্বর বনার্জি সেবার রাশিয়ায় গিয়েছিলেন। দেখলেন প্রত্যেক ল্যাবে বৈজ্ঞানিকরা নিজেদের যন্ত্রগুলোকে বালিকা-বান্ধবীর মতো আদর করে। রুশরা ঠেকে শিখেছে—ওরা কথায়-কথায় ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্মানি থেকে মেশিনের সেলস্‌ম্যানদের ডেকে পাঠাতে পারে না। তাই হাত পা-গুটিয়ে বসে না-থেকে ওরা নিজেরাই যন্ত্রের প্রাথমিক তদারকি এবং মেরামতি কাজগুলো শিখেছে। ব্যাপারটা খুব ভাল লেগেছিল দিগম্বর বনার্জির। অভ্যাসটা চন্দনপুরে চালু করবেন ভাবছেন।

করিডর ধরে সামনে এগিয়ে চললেন দিগম্বর বনার্জি। মাঝে-মাঝে তাঁর মাথায় এই জনহীন বিরাট বাড়িটা একা-একা ঘুরে দেখবার নেশা চেপে বসে। সাত বছর আগে চন্দনপুর প্রোজেক্টের ছোট কেমিক্যাল অ্যানালিসিস রুমে বসে যখন তিনি গবেষণা বিভাগের স্বপ্ন দেখতেন তখন অনেকেই তাঁকে পাগল ভাবতো।

দিগম্বর বনার্জি তখন থেকেই বলছেন, সামনে এমন যুগ আসছে যখন কেমিক্যাল সারের জন্য ভারতবর্ষের চাষীরা কাড়াকাড়ি শুরু করবে। সামান্য এই

চন্দনপুরের সাধ্য কী সেই দাবি মেটায়। তখন লক্ষ-লক্ষ টন সারের জন্য অন্তত দেড়শ দু'শ নাইট্রোজেন তৈরির কারখানা প্রয়োজন হবে। কিন্তু বিদেশীদের কাছে ধার করে, ভিক্ষে মেগে এইসব কারখানা বসানো সম্ভব হবে না। নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার মতো কারিগরী বিদ্যা আমাদের আয়ত্ত করতেই হবে।

দিগম্বর বনার্জির কথায় অনেকে তখন হেসেছিলেন। তাঁরা বলতেন, ফার্টিলাইজার টেকনলজি ছেলের হাতের মোয়া নয়। ইচ্ছে করলেই নিজের চেষ্টায় অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, অ্যামোনিয়াম কার্বনেট বা ইউরিয়া তৈরি করা যায় না। গোটা পৃথিবীতে মাত্র আট-দশটা কোম্পানি আছে যারা কোটি-কোটি ডলার এবং পাউণ্ড গবেষণায় ঢেলে এই বিদ্যা আয়ত্ত করেছে।

দিগম্বর বনার্জি তখন সবে বিদেশ থেকে ফিরে এসেছেন। তিনি বলতেন, "বিলেত আমেরিকা যদি পারে, তবে আমরাও পারবো না কেন? গবেষণার গোড়াপত্তন এখনই হয়ে যাওয়া প্রয়োজন। আর দেরি করা চলবে না।"

চন্দনপুর প্রোজেক্টের আই-সি-এস কর্মকর্তা মিস্টার আচার্য তখন মন্তব্য করেছিলেন, "বনার্জি, তুমি যেসব কথা বলছো তা এদেশের কোনো কারখানায় সম্ভব নয়। গবেষণা যদি করতেই হয় তাহলে গভরমেণ্টকে লিখি, কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে সার সংক্রান্ত গবেষণাকেন্দ্র খুলতে।"

দিগম্বর বনার্জি বলেছিলেন, "ইউনিভারসিটির মাস্টারমশাইরা কোনোদিনই সার তৈরি করতে পারবেন না। বাস্তবের সঙ্গে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সম্পর্ক বড় কম। দেশের সমস্যা এবং সুখ-দুঃখের কোনো খবরই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছয় না। তাঁরা অন্য এক জগতে পড়ে রয়েছেন। আমি চাই, এই চন্দনপুর প্রোজেক্টের সঙ্গেই গবেষণা শুরু হোক, যে-কাজ চন্দনপুর কারখানার সঙ্গেই তাল রেখে চলবে।"

দিগম্বর বনার্জির কথা তখনকার কর্তাদের মনঃপূত হয়নি। তাঁরা ভেবেছেন লোকটা পাগল। বামন হয়ে চাঁদ ধরতে চায় বনার্জি। বাঙালে গোঁ নিয়ে ডুপণ্ট, কেমিকো, আই সি আই, মণ্টিকাটিনির মতো বিশ্বজোড়া প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পাল্লা দেবার লোভ। এই চন্দনপুরের জেনারেল ম্যানেজারই বলেছিলেন, "বনার্জি, একটা জিনিস ভুলো না, এই সব কোম্পানি বছরে যত টাকা গবেষণায় খরচ করে আমাদের কোম্পানির মোট আয়ও তার শতকরা এক ভাগ নয়।"

দিগম্বর বনার্জি জানেন, এ-রকম কথা শুনেই তাঁকে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হতো, যদি-না ইতিমধ্যে কিছু অঘটন ঘটতো। সেসব ঘটনা ঘটেছে বলেই আজ তিনি এই রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন যেখানে শুধু রসায়ন

নয়—ফিজিক্স, এগ্রনমি, বোটানি, জিওলজি, ইনজিনীয়ারিং ইত্যাদি নানা বিষয়ে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে।

ল্যাবরেটরি ভবনের বাইরে এসে দাঁড়ালেন দিগম্বর বনার্জি। মনটা তাঁর মোটেই ভাল নয়। নগেন বসুর খবরটা পাওয়া পর্যন্ত তিনি বেশ বিব্রত হয়ে পড়েছেন।

ট্রেন থেকে নেমে কমলেশ সোজা নিজের কোয়ার্টারে চলে এসেছিল। সেখানে দিগম্বর বনার্জির বার্তা তার জন্যে অপেক্ষা করছিল।

হাত মুখ ধুয়ে রিসার্চ ডিরেকটরের বাংলোর দিকে যেতে-যেতে কমলেশের মন অভিমানে ভরে উঠলো। বিয়ের পর আচমকা এইভাবে তাঁকে ডেকে আনাটা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছে না। বাবা অবশ্য কমলেশকে শান্ত করবার চেষ্টা করেছিলেন। সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলেছিলেন, "ব্যাটাছেলের কাছে চাকরিটা বড় কথা। চাকরি না থাকলে সংসারের সাধ-আহ্লাদ নষ্ট হয়ে যায়। দুনিয়ার আর সবাই তো তোমার কাছ থেকে নেবার তালে রয়েছে—সবার সঙ্গেই তো দেবার সম্পর্ক, এই অফিসটুকু ছাড়া। সুতরাং সেখানে একটু-আধটু অসুবিধে হলে হাসিমুখে মেনে নিতে হবে।"

কিন্তু বাবা যে-যুগে চাকরি করতেন তারপর দিনকাল অনেক পাল্টেছে। মার্চেন্ট অফিসেও সেই ডিকটেটরি যুগ এখন আর নেই। তাছাড়া কমলেশ সরকারী সংস্থায় কাজ করে। সেখানে প্রত্যেক মানুষের কয়েকটা আইনসঙ্গত অধিকার আছে।

সুতপাদি ভোরবেলাতেই টেলিফোনে বুদ্ধি দিয়েছিলেন, "সিক রিপোর্ট করো। বাৎসরিক ছুটিতে এসেও লোক অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। ডাক্তারের সার্টিফিকেট থাকলে, দিগম্বর বনার্জি টিকি পর্যন্ত ছুঁতে পারবে না।"

টেলিগ্রামে অন্য কারুর নাম থাকলে কমলেশ কিছুতেই ফিরে যেতো না। কিন্তু দিগম্বর বনার্জির সঙ্গে তার অন্য সম্পর্ক। চন্দনপুর ল্যাবের ছোকরা বৈজ্ঞানিকরা কেউ তো দিগম্বর বনার্জিকে ঠিক অফিসের বড়কর্তা হিসেবে দেখে না। তিনি সত্যিই তাদের গুরু। আজকের যুগে অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি। রিসার্চ ল্যাবে যে সাড়ে-তিনশ' বৈজ্ঞানিক কাজ করছে তাদের প্রত্যেকের গবেষণার খুঁটিনাটি খবর রাখেন দিগম্বর বনার্জি। কে কী কাজ করছে, গবেষণা

কতখানি এগিয়েছে, তা ফাইল না-দেখেই বলে দিতে পারেন তিনি। অফিসের ভদ্রতা রক্ষা করে 'আপনি' বলার নিয়ম মানেন না দিগম্বর বনার্জি। প্রায় সবাইকে 'তুমি' বলে ডাকেন, দুই একজনকে 'তুই' বলতেও দ্বিধা করেন না।

সব দিকে দিগম্বর বনার্জির তীক্ষ্ণ নজর। কাউকে বলেন, "অজয়, তোমার ভুঁড়ি সামলাও। তোমার ডেট অফ বার্থ তো অমুক সালের অমুক তারিখ। এর মধ্যে এত মোটা হলে কাজ করতে পারবে না।"

কাউকে বলেন, "চিন্তাহরণ, মুখটুখ বেঁকিয়ে অতশত কী ভাবছো? করোসন সম্বন্ধে গবেষণা করতে গিয়ে নিজেকে ক্ষইয়ে ফেলো না। মনের মধ্যে উত্তেজনা থাকলে বড় আবিষ্কার করা যায় না। পৃথিবীর বিখ্যাত-বিখ্যাত আবিষ্কারের ইতিহাস দেখো, হঠাৎ হাল্কা এবং সহজভাবেই প্রথম মতলব এসে গিয়েছে। আর্কিমিডিস তখন বাথ টবে বসেছিলেন, স্যার আইজাক নিউটন আপেল গাছের তলায়।"

চিন্তাহরণ ফিক করে হেসে ফেলেছিল। দিগম্বর বনার্জি বললেন, "হাঙ্গেরিয়ান বায়োকেমিস্ট আলবার্ট সেন্ট জর্জির সঙ্গে একবার আমার আলাপ হয়েছিল। উনি বললেন, বৈজ্ঞানিকদের আসরে যেতে এক-একসময় আমার লজ্জা হয়—সভা এবং সেমিনারে তাঁদের চিন্তাশীল গম্ভীর মুখগুলো দেখলে নিজের সম্বন্ধে ধারণা খারাপ হয়ে যায়। মনে হয় ওঁরা কত জানেন, কত ওঁদের ভাবনা। বিশ্বাসই হতে চায় না যে এঁরা এখনও নোবেল পুরস্কার পাননি। অথচ আমি পেয়ে গিয়েছি।"

কমলেশ রায়চৌধুরীকে দিগম্বর বনার্জিই এই চন্দনপুরে এনেছিলেন। আই-আই-টিতে ডকটরেটের জন্যে কমলেশ যে থীসিস্ জমা দিয়েছিল তার একজন পরীক্ষক ছিলেন বনার্জি। ক্যাটালিস্ট তৈরির কয়েকটা সমস্যা নিয়েই ছিল কমলেশের গবেষণাপত্র। মৌখিক পরীক্ষায় কমলেশকে প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে নানা প্রশ্নে জর্জরিত করেছিলেন দিগম্বর বনার্জি। প্রশ্ন করবার ক্ষমতাও রাখেন ভদ্রলোক। ক্যাটালিস্টের সব রহস্য ভদ্রলোক যেন জেনে বসে আছেন। তর্কযুদ্ধে সন্তুষ্ট হয়ে দিগম্বর বনার্জি অবশেষে কমলেশকে ছুটি দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই রাত্রেই আই-আই-টি গেস্ট হাউস থেকে কমলেশের হোস্টেলে দিগম্বর বনার্জি টেলিফোনে কথা বলেছিলেন।

পাস করবার সুখবরটা দিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন দিগম্বর। তারপর প্রশ্ন করেছিলেন, "নামের পাশে এবার না-হয় ডকটর কথাটা লিখবেন। তারপর কী হবে?"

কমলেশ তখন বিদেশ যাবার স্বপ্ন দেখছিল। বললো, "ভাবছি বিদেশে র